রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য

ড. বাসন্তী চক্রবর্তী

বর্ণমিছিল ॥ ঢাকা



প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশনায়
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৬৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদশিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

প রি চা য়ি কা

'রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে'র ('পুনশ্চ'—১৯৩২ খ্রীঃ থেকে 'শেষলেখা'—১৯৪১ খ্রীঃ) সামগ্রিক আলোচনা এ পর্যন্ত খুব ব্যাপকভাবে বা গভীরভাবে হয়নি, সেজন্য এর প্রকৃত মূল্যায়নও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধ এবং প্রথম পর্যায়ের কাব্যালোচনার সমাপ্তি টেনে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। শেষপর্যায়ের কাব্যের যে 'আঙ্গিক' বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার উপরে দু'চারখানি গ্রন্থ ইদানীন্তন কালে আত্মপ্রকাশ করেছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সমালোচনা-গ্রন্থ হিসেবে দু'একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই সমস্ত খণ্ডবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে অনেক ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। কবি-মানস পরিক্রমার মধ্যে দিয়েই তাঁর কাব্যপরিক্রমা সম্পূর্ণ। কবিমানসিকতা বা কবির স্বকীয় জীবনোপলব্ধির বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারলেই কাব্যের অনুভব যথার্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন—জীবনশিল্পী। সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে যে শিল্পিক জীবনকে তিনি আপন অধিকারে পেতে চেয়েছিলেন, বাণীসাধনায় তার একটি সামগ্রিক রূপ এঁকে যাবার বাসনাও সেই মহৎ প্রাণের ছিল। বিশেষ জীবনবোধ দ্বারাই তাঁর ব্যক্তিজীবন তথা শিল্পিজীবন নিয়ন্ত্রিত, এবং সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনায় সেই 'বোধ' বা 'চেতনা' প্রতিফলিত। জীবনের সামগ্রিক দাবীকে স্বীকার করে নিয়েও, একটি মহৎ প্রাণ—সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে, খণ্ড জীবনবোধ থেকে, দুঃখ-বেদনা-হতাশা ক্লান্তি থেকে, আপন চেষ্টায় এবং কর্মে কতখানি উত্তীর্ণ হতে পারে—সেই মহৎ চেষ্টার ইতিহাস সংগুপ্ত রয়েছে এই শিল্পীর জীবনবাণীতে। প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যসাধনার সঙ্গে শেষপর্যায়ের কাব্যের সেই সাধনময় চেষ্টার একটি নিগূঢ় যোগ রয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে এই জীবনশিল্পীকে দেখলে তাই তাঁর 'পরে শুধু অন্যায় নয়—অবিচার করা হয়। আর এর ফলে লোকসানও হয় অপরিসীম এই আমাদেরই।

তাঁর জীবনই একখানি জীবন্ত কাব্য। সেই কাব্যের সমাপ্তি কোথায় কিভাবে হোল, তার গতি কোন্‌দিকে, উদ্দেশ্য কী—এই সমস্ত দিক থেকে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র মধ্যে দিয়ে সেই অনন্যসাধারণ কবিসত্তাকে চিনে নেবার চেষ্টা হয়েছে।

কাব্যের আলোচনাকে তাই খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা হয়নি।

কাব্যালোচনায় প্রথম 'বহিরঙ্গ' আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রথম অধ্যায়ে তাই 'আঙ্গিক' (ছন্দ, রচনাশৈলী, অলঙ্কার, ভাষা) আলোচনা স্থান পেয়েছে।

কাব্যের 'পাঠান্তর' (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত) কবিমানসিকতার অফুরন্ত এক বিস্ময়। বৈচিত্র্যপিয়াসী কবিমন শিল্পসাধনা করে গেছে অনলসভাবে আজীবন। রূপ-শিল্পীর সেই রহস্যময় মনের বিচিত্র প্রবণতা লুকিয়ে আছে পাঠান্তরের বিচিত্রধর্মী রূপকর্মের মধ্যে।

'অন্তরঙ্গ' আলোচনায় কাব্যের 'ভাবসম্পদে'র কথা এসে পড়ে। শেষপর্যায়ের বিভিন্ন ভাবধর্মী কবিতার মধ্যে কবিমানসের মুক্তিলাভ ঘটেছে নানাভাবে। আত্মসচেতন কবি জগৎ এবং জীবনের পটভূমিতে সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীবনটিকে দাঁড় করিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিতে চেয়েছেন তাকে। তাই 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বহু কবিতার মধ্যে কবির গভীর জীবনদর্শন, তত্ত্ববোধ যেমন আছে, তেমনি অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি থেকে শুরু ক'রে, আপন আবেগ-নিরাবেগমুখর কর্ম-কৌতুকময় জীবনের উচ্ছলতায় ও বেদনায় মিশ্রিত একটি পরিপূর্ণ সার্থক জীবনের স্বাদও ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। কাব্যের ভাবসম্পদের আলোচনায় সেই সামগ্রিক বিচিত্র জীবনবোধের পরিচয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা। জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে দেখা, বা কাব্যের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর আপন কীর্তিতে স্বতঃপ্রকাশিত।

কাব্যালোচনার এই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিকল্পনার মধ্যে ভুল-ত্রুটি অবশ্যই থাকতে পারে। যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ের আলোচনাকেই খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই স্বল্প প্রয়াস কবিকে এবং তাঁর কাব্যকে চিনে নেবার ইঙ্গিত, কবিমানসিকতার দিগ্‌দর্শনের সামান্যতম আভাস।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, কাব্য আলোচনায় খুঁটিনাটি হিসাবনিকাশ বা বিভিন্ন মতবাদকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়নি। কাব্যপাঠের আনন্দ-রস-ধারার প্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা হয়েছে কাব্যালোচনার মধ্যে। যদি এই সামান্য প্রচেষ্টা রসিকজনকে কিঞ্চিৎ আনন্দদানে সমর্থ হয়, আর সেই দুর্লভ মানবাত্মাকে চিনে নিতে কিছু পরিমাণে সাহায্য করে—তবেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক ও সম্পূর্ণ।

অবতরণিকা

প্রথম পর্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার পূর্বে প্রথম পর্যায়ের সাধারণ আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে—আর তারও পূর্বে অনিবার্য হয়ে ওঠে কবিমানসভূমির স্বরূপরহস্য উদ্ঘাটন।

কবি-শিল্পীর জীবনসাধনাই তাঁর কাব্যসাধনা। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে—"না ঋষি কুরুতে কাব্যম্" অর্থাৎ প্রকৃত কাব্যরচনা ঋষি ভিন্ন সম্ভবপর নয়। এই 'ঋষি' অর্থ প্রকৃত জীবনসাধক। যথার্থ কোনো কবির জীবনসাধনায় এবং শিল্পসাধনায় কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। আপন জীবনের গভীর অনুভূতি এবং অনুভূতিলব্ধ বিশ্বাসই তাঁর জীবনদর্শনকে গড়ে তোলে। কবি-মনোভূমির এই উপলব্ধিজাত বিশ্বাসকে সংগঠিত করতে যে সমস্ত উপাদান প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাজ করেছে তাদের কথাও আপনা থেকেই এসে যায়। এদিক থেকে বিচার বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবীন্দ্র-মানস-ভূমির উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে যেমন প্রত্যক্ষে সাহায্য করেছে তাঁর আবাল্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পারিবারিক শিল্প-সাধনা, মহর্ষির ঔপনিষদিক জীবনদর্শন তেমনি এর সঙ্গেই পরোক্ষে মিলিত হয়েছে আপন অন্তরের সহজাত হৃদয়ার্তি। জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে, বিচিত্ররূপে দেখার যে অন্তর্দৃষ্টি—সেই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরশক্তি নিয়েই তিনি পৃথিবীতে চোখ মেলেছিলেন; আর এরই সঙ্গে মিলেছিল অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হৃদয়স্পন্দন। তাই বিরাট এই জগৎসংসারে, বিচিত্র এই প্রকৃতিলোকে এবং আপন জীবননাট্যের অনন্ত সম্ভাবনায় যখনই যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, যখনই রঙে রসে রূপে তারা বিচিত্র বর্ণের ডালি সাজিয়ে তাঁর হৃদয়দ্বারে এসে আহ্বান জানিয়েছে তখনই শিল্পিমন তাকে বরণ করে নিয়েছে—অভিনন্দিত করেছে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শে। পরে তাকেই নন্দিত করেছেন অনির্বচনীয় বাণীশিল্পে।

রবীন্দ্র-কবি-মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এবং কাব্যসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বিভিন্ন সমালোচকের নানামুখী আলোচনা আমাদের সাহায্য করলেও এক্ষেত্রে কবির আপন রচনাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য উপাদান। কবি যতই বলুন না কেন—"কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো" ('কবি'—ক্ষণিকা), একথা আংশিক সত্য হলেও পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে না। কারণ, কবির কাব্য

ধারাবাহিকভাবে যেমন তাঁর জীবনসাধনার পথের আনুপূর্বিক চেষ্টা চিন্তা সাধনার ইতিহাস কখনো সচেতনে কখনো অচেতনে রেখে গেছে—তেমনি আপন শিল্পিসত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণও তিনি করে গেছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, আত্মজীবনীতে, বিবিধ প্রবন্ধে। তাঁর লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলি 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়' ও অন্যান্য এই জাতীয় বহু প্রবন্ধ তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কবি বাল্যকাল থেকে শুরু করে আশিবৎসর বয়সের একটি সার্থক জীবন ও তার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস রেখে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়—"বস্তুতঃ বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ-বৎসরের ইতিহাস রবীন্দ্র-কবি-মানসের প্রকাশ ও পরিণতির ইতিহাস; রবীন্দ্রনাথ ত একক একজন নন, একটি ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান বললেও তাঁকে কম করে বলা হয়, তিনি একা একটা যুগ, এবং এই যুগটির ধর্ম ও প্রকৃতি, রূপ ও রহস্য সমস্তই রবীন্দ্রমানস-প্রকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি অখণ্ড সমগ্র রূপে।"[১]

এ হেন কবিমানসকে সম্পূর্ণরূপে জানতে এবং বুঝতে হলে তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও তাঁর পারিবারিক অবস্থার কথা যেমন এসে পড়ে, তেমনি তাঁর ব্যক্তি-মানসের বিশেষ গঠনকৌশল এবং ধারণ ও বহনক্ষমতার কথাও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও বিশ্লেষণের অবশ্যই অপেক্ষা রাখে। একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত এই কবিমানসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নয়। আর সে দৃষ্টিভঙ্গীও হওয়া চাই দেশ-কাল-ধর্মনিরপেক্ষ রসবোধ-সমন্বিত একটি মুক্ত আত্মার মননশীল সমীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ সেই জাতের কবি যাঁর সৃষ্টি-সমীক্ষা মুক্তির বাণী ঘোষণা করে তাঁর আজন্মের শিল্পসাধনায়।—"মানুষের পিঠে পাখা নেই বটে, মনে আছে। সে ওড়ার সুখেই উড়তে চায় অর্থাৎ সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, তার মধ্যেই আছে মুক্তি—আকাশে পক্ষচালনের ছন্দ।···ধর্মোপদেষ্টা যখন মুক্তির কথা বলেন তখন তিনি বন্ধন ছেদনের পরামর্শ দেন—কিন্তু কাব্যে বন্ধনকেই অবন্ধিত করে—রূপকে ত্যাগ করে না, তার অরূপতাকে উদ্ভাবিত করে। সুন্দরের বাঁশির সুরে টানে বিশ্বের দিকে, কিন্তু টেনে বাঁধে না—টেনে নিয়ে চলে অসীমে, ক্ষণিকের দীনতা থেকে অনির্বচনীয়ের পূর্ণতায়।"[২]

১। রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ—সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। [প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮] প্রবন্ধ—'শেষ অধ্যায়'—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। পৃঃ ৮০

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র-৯ম খণ্ড [প্রকাশ: বিশ্বভারতী: ১৯৬৪]
শ্রীমতী হেমন্ত বালা দেবীকে লিখিত।
পত্র সং—৭৭, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। পৃঃ ১৪১—১৪২

তাঁর কবিধাতুর তাৎপর্য নির্ণয়ে উদ্ধৃত অংশটুকুকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কাব্য-শিল্পের সাধারণ মাপকাঠিতে এ কবিমানসের বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়।

তাঁর চিত্তগহনের পরিপুষ্টিতে বাইরের দিক থেকে যে যে উপাদান কাজ করেছিল তা হোল তাঁর পারিবারিক সৌভাগ্য। এমন একটি পরিবারে এমন পিতার সন্তানরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবারে জন্মানো বোধকরি পরম সৌভাগ্যের ও গর্বের বিষয়। 'ঠাকুরবাড়ি' তখনকার বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে শিক্ষায়, সাহিত্যচর্চায়, জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ছিল প্রতিনিধিস্থানীয়। এরই সঙ্গে ঐশ্বর্যেরও হয়েছিল মণিকাঞ্চনযোগ। চোখ মেলেই কবি তাই দেখতে পেয়েছিলেন মনের ফসলের চাষ বোনা চলেছে সে বাড়ির ঘরে-বাইরে আনাচে-কানাচে। অবশ্য কবি 'আত্মপরিচয়ে'র একস্থানে বলেছেন—"আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।"[১]—তবুও পারিবারিক শিক্ষায় দীক্ষায় যে সুযোগ-সুবিধা তিনি জন্মগত অধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন তা খুব কম ছেলেমেয়ের ভাগ্যেই ঘটে। মস্ত বড় বাড়িতে বহুলোকের মাঝে শিশুরা ছিল নিতান্তই অবহেলিত। অন্দর-মহলেও তাদের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। তাই অতি সাধারণভাবে ভৃত্যরাজক-তন্ত্রের মধ্যে অনাদৃত হয়েই তাঁর দিন কাটে। অল্পবয়সে কত কান্নাকাটি করেই না স্কুলে যান, কিন্তু পরে না যাওয়ার জন্য তত কান্নাই কাঁদতে হয়েছিল। স্কুলের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের ছাঁচে-ঢালা শিক্ষাব্যবস্থাকে কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অগত্যা অভিভাবকেরা তাঁর ডিগ্রিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রইলো না। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, গান-বাজনা, শরীরচর্চা, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান সবকিছু সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্যই অভিভাবকেরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন এবং অতি বালক বয়স থেকেই বিদ্যানুশীলনে তাঁর অসাধারণ অনুরাগও দেখা গিয়েছিল। কবিতা লেখার অভ্যাস চলে তাঁর অতি বালক বয়স থেকেই। সঙ্গীতে সাহিত্যে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী সকলেই ছেলেবেলা থেকে কবিকে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিকতার প্রতি অনুরাগও এই বড়দের কাছ থেকেই পাওয়া।

কিন্তু এ তো গেল তাঁর শিক্ষা-সংস্কৃতিগত বাহ্যিক কতকগুলি উপাদান। ভিতরে ভিতরে সেই অলোকসামান্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে যেন কোন্ অলৌকিক মায়াস্পর্শে। কবির সেই লোকাতীত শিল্পিসত্তা তার জীবনরসের সন্ধান করেছে অন্তরের আরও গোপনতম তলদেশ থেকে—যে সত্তার বা শক্তির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন বোধকরি কারও

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মপরিচয়: রবীন্দ্র রচনাবলী [জন্মশতবার্ষিক সং—১০ম খণ্ড। পৃঃ ২০৮]

পক্ষেই সম্ভব নয়। "তিনি যে একজন লোকোত্তর পুরুষ আজ তা সকলে স্বীকার করবেন। তিনি কায়মনোবাক্যে পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর বিচিত্র জীবন হচ্ছে একটি জীবন্ত কাব্য যা শতদলের মত ফুটে উঠেছে।"[১] এই লোকোত্তর কবিপুরুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আরও বলেছেন—"বড় কবির অন্তরে double personality আছে ; একটি সাংসারিক personality, অপরটি লৌকিক নয় লোকোত্তর প্রকৃতি।"[২] কিন্তু ইউরোপীয় কবিকুলের বিচারে এই মতকে স্বীকার করে নিলেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা গ্রাহ্য নয়। তাঁর ক্ষেত্রে সামাজিক পুরুষ ও কবিপুরুষ পরস্পরের বিরোধী নয়। কবিপুরুষ তাঁর জীবনে যে ভাব ও ভাবনায়, আদর্শে ও সত্যে অনুপ্রাণিত হোত, ব্যক্তিগত জীবনে তার ছিল যথাযথ প্রতিফলন। কবিজনোচিত যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ দ্বারা তিনি ভাবময় জীবনে সিদ্ধ হয়েছিলেন—সেই মার্জিত এবং পরিশীলিত জীবনবোধ তাঁর লৌকিক জীবনের আচার-আচরণে কথায়-বার্তায় বেশভূষায় গার্হস্থ্য জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হোত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে স্বতন্ত্র করে তাঁর কবিজীবনের আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাঁর জীবনসাধনার মূল মন্ত্রই হোল সত্য এবং সুন্দরকে বাস্তবে রূপায়িত করা। লোকোত্তর জীবনের সাধনসম্পদকে তাই লৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই তাঁর সামাজিক জীবন এবং কাব্যজীবনের সব থেকে বড় সংকল্প।

এই কবিসত্তারই সত্যকার পরিচয় আছে তাঁর আত্ম-জৈবনিক স্বীকৃতিতে। 'আত্ম-পরিচয়ে'র প্রথমেই তিনি বলেছেন—"এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।…আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র

১। প্রমথ চৌধুরী- "রবীন্দ্রনাথ" [শ্রী রণজিৎ কুমার সেন সম্পাদিত]
[প্রকাশ : রবীন্দ্রশতবার্ষিকী, ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—॥ রবীন্দ্র পরিচয় ॥ পৃঃ ২৫

২। প্রমথ চৌধুরী—"রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ—॥ চিটেফোঁটা ॥ পৃঃ ৫১

অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় জানিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।"[১] এই অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় অনেক পরে। কিন্তু এই সত্তাটির প্রথম আভাস আমরা পাই ঠাকুরবাড়ির গণ্ডিবন্ধনের মধ্যে বদ্ধ সেই ছোট্ট বালকটির মধ্যে—যে ছাদ, চিলে কুঠরী এবং দরজা জানলার ফাঁকফুকর দিয়ে এই আকাশ-বাতাসের সঙ্গে তার ঘরছাড়া মনকে উদাস করে দিত। তার সঙ্গী ছিল একটা পুরোনো বট, একসার নারকেল গাছ, আর একটা পুকুর। এই নিয়েই কত প্রভাত—কত দ্বিপ্রহর—কত সন্ধ্যা ঐ বালক স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দিত। অতবড় বাড়ির ভিড়ের মধ্যেও সে ছিল একান্ত একা-একাকী-নিঃসঙ্গ! তাই 'ছেলেবেলা'র একজায়গায় বলেছেন—"আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ।"[২] এই মুক্তিকামী শিশু-মনটিই প্রথম মুক্তি পেয়েছিল পিতার সঙ্গে উপনয়নের পর হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে। একদিকে পিতার স্নেহ-শৃঙ্খলার মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা, অপরদিকে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে অবাধ স্বাধীনতা—বালকের মনকে পুষ্ট করে তুললো এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে, উপনিষদের বৈদিক সাধনাকে তখন থেকেই মহর্ষি বীজমন্ত্ররূপে তাঁর জীবনে সঞ্চারিত করে দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই চললো কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃত, ইংরাজি, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান—সবকিছু সম্বন্ধে অত্যন্ত নিয়মিত পাঠগ্রহণ। তারই সঙ্গে বলিষ্ঠ জীবনগঠনে আচরণীয় কতকগুলি নিয়মনিষ্ঠাও তিনি কবিকে অভ্যাস করিয়ে দিলেন। এইভাবে একদিকে জ্ঞানে কর্মে তাঁকে যেমন বলিষ্ঠ-ভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন অপরদিকে অধ্যাত্মজীবনবোধ ওতপ্রোতভাবে তাঁর কবিমানসে একটি সজীব রূপ নিয়ে যেন ফুটে ওঠে সে চেষ্টারও ত্রুটি করলেন না। এই সময় থেকেই প্রকৃতির রূপ-রস-বৈচিত্র্যে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ধরা দিতে লাগলো, অর্থাৎ কবিশিল্পীর বিশেষ মানসিকতার মূল কয়েকটি প্রবণতা এখান থেকেই দৃঢ়মূল হোল। লোকোত্তর এই প্রতিভার অভিব্যক্তিতে এরাই ধীরে ধীরে এমনভাবে সহায়তা করেছে, যাতে করে জগৎ-জীবন এবং বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতিলোকের গ্রহনক্ষত্র গাছপালার সঙ্গে কবি মানবলোকের এক অলক্ষ্য যোগ অনুভব করেন। বিশ্বসৃষ্টিকর্তার অনির্বচনীয় শক্তিও নিগূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। তাই 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র যুগে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে প্রভাতসূর্যের ধরণীর বুক থেকে অন্ধকারের যবনিকা উত্তোলন কবিমানসে বিশেষ তাৎপর্য বয়ে আনতে পেরেছিল। আর আপন ব্যক্তিস্বরূপের

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মপরিচয়—[রবীন্দ্র-রচনাবলী-জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১০ম খণ্ড]। পৃঃ ১৬৭

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছেলেবেলা—রবীন্দ্র-রচনাবলী [জন্মশতবার্ষিক সং ১০ম খণ্ড। পৃঃ ১৪৮]

অন্তরালে যে শক্তি তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়েছে সেই 'অন্তর্যামী' শক্তিকেও বিশেষ চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখলেন। তাঁর উপলব্ধিতে তাই সত্য হয়ে উঠলো, মূর্ত হয়ে উঠলো কয়েকটি স্থায়ী বিশ্বাস—যে উপলব্ধিজাত বিশ্বাসই তাঁর বিশেষ জীবনদর্শনকে গড়ে তুলেছিল। এ নিয়ে তর্ক চলে না, যুক্তি চলে না, রবীন্দ্রনাথ যা রবীন্দ্রনাথ তাই-ই। তাঁর জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে তাঁর কাব্য বা সাহিত্য-শিল্প-সাধনা অর্থহীন।

এই বিশেষ উপলব্ধিজাত জীবনদর্শনটি কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়—মানবতার একটা পরিপূর্ণ রূপের সাধনা তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার অন্তর্গত। ব্যক্তি মানুষের চিন্তা-চেষ্টা-প্রেরণা মহামানবের সার্বিক চেষ্টায় বিধৃত এবং এই মানবাত্মার সঙ্গে সৃষ্টির সেই পরম একের যোগ কল্পনা করে কবি এই মানবতার একটি মুক্ত স্বরূপ আঁকার চেষ্টা করেছেন।—

> "মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়,যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে।···এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ-মানুষের সাধনা।···
>
> ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেচে বিশ্বমানসলোকে—যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি।"[১]

এই দুর্লভ মনুষ্যত্বের সাধনাই তাঁর জীবনসাধনার বা জীবনদর্শনের প্রথম এবং শেষ কথা। সৃষ্টির অলক্ষ্যে যে মহাশক্তি গোপনে কাজ করে চলেছেন, তাঁর পরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেই কবি মনুষ্যত্বেব জয়ঘোষণা করেছেন। তাই প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মমতে আঘাত হেনেই কবি মানবতার পরিপূর্ণ ধর্মবোধের সন্ধান করেছেন এবং ক্ষণকালীন এই মানবজন্মের মধ্যেই চিরন্তন সত্য সুন্দরের সাধনা করেছেন। তাই 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' ('৩০' সং—নৈবেদ্য), 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' ('১' সং—আরোগ্য)—এ কথা তাঁর কাব্যসাধনার মূল মন্ত্র। তাই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব—"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে" ('৩৩৯' সং—পূজা)।

এই যে পরিপূর্ণ মানবতার স্বরূপ কল্পনা, এর সার্থকতা ত্যাগে, ধর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে,

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্র-রচনাবলী [জন্মশতবার্ষিক সং ১২শ খণ্ড] পৃঃ ৫৬৯

মহৎ কর্মে। সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশ মানবের মধ্যে এবং প্রকৃতিজগতে। তাই দু'চোখ ভরে প্রকৃতির সেই লীলারসে মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে জীবনকে সত্য এবং সুন্দর করে তুলতে হবে। এই সত্য সুন্দরের সাধনা হবে দেশ-কাল-ধর্মনিরপেক্ষ। সকলকে ভালোবেসে, সকলের জন্য আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই ক্ষুদ্র মানবজন্মকে সার্থক করে তুলতে হবে—পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। কবির জীবনদর্শনে এই বিশ্বমানবতাবোধ সৃষ্টিকর্তার পরমা শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত—অর্থাৎ 'ব্রহ্মবাদ' এখানে গোপনে কাজ করে গেছে। কিন্তু আপন উপলব্ধিজাত সত্যবোধের মধ্যে দিয়ে কবি একে বিচিত্রভাবে রূপ দিয়ে গেছেন। বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দনই কবির হৃদয়বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছে।

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ওঠাই এই মহত্তর জীবনের সাধনা। তা বলে জীবনের এই দীনতা-মলিনতাকে অস্বীকার করে নয়, তাকে সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি দিয়েই মনুষ্যত্বের সত্য স্বরূপটিকে চিনে নেওয়ার প্রয়োজন। তাকে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত করার দরকার। নিজের জীবন দিয়েই কবি জীবনের এই সত্যবোধে পৌঁছেছিলেন—

> "আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের মধ্যে যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মন্থন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। বৈষ্ণব কবিরা আমার এই আত্মভোগের নৈবেদ্য ভরে তোলবার সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা চালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রস বৈ সঃ নন—তাই একসময় আমার ধিক্কার এলো—সেই নিমজ্জন দশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্মের মধ্যে তপস্যা।...বিশ্বকর্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হতে হয়, বীর্যবান হতে হয়, জ্ঞানী হতে হয়। বিশুদ্ধ কর্মে সত্য সর্বতোভাবে সপ্রমাণ হন—জ্ঞানে, রসে, তেজে—পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা সত্যকর্মে, বিশ্বকর্মে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিশেষ জীবনদর্শনের এই মূল অভিব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রাখলেই তাঁর কাব্য সমালোচনা যথার্থ এবং খাঁটি হওয়া সম্ভব। কবিমানসের সত্য স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে না পারলে কাব্যসাধনার মূল তাৎপর্যটিও অগোচরেই রয়ে যাবে।

সেই কবিস্বরূপের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টাই 'শেষপর্যায়ের কাব্য' আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র [৯ম খণ্ড : শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত। পত্র সং ৪, ২১শে এপ্রিল ১৯৩১ পৃঃ ১১]

কিন্তু একথাও অবশ্য স্মরণীয়—কবিসত্তা, কবিচিত্ত, কবিকৃতি এগুলিকে নানাদিক থেকে ধারণা ও ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা ভাগ করে, বিচার করে, বিশ্লেষণ করে উপস্থাপিত করেছি বটে, আসলে তা অবিভাজ্য। কবিকে বুঝতে হলে নানা ভাবভঙ্গী রূপ-রসের বৈচিত্র্য যেমন বুঝতে হবে, সর্বত্র অনুস্যূত ঐক্যটিও ধরে রাখতে হবে। প্রকৃতি-মানুষ-ঈশ্বর (জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-প্রেম,) কবিমানসে, উপলব্ধিতে, রচনায়—সবই তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, সমন্বিত।

এই ঐক্যবোধের দৃষ্টি নিয়েই কাব্য আলোচনার এবং আস্বাদনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

কবিমানসের সাধারণ আলোচনার পর কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য বিষয় "রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য"। এই "শেষপর্যায়" বলতে কবিজীবনের শেষ দশবৎসরের কাব্যনির্ঝরকে ধরা হয়েছে। 'পুনশ্চ' দিয়েই তার শুরু। 'পরিশেষে' কবি তাঁর কাব্যফুলের সাজি নানা রঙের ফুলে ভরিয়ে দিয়ে এ জন্মের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন বলে ভেবেছিলেন; কিন্তু দিনের শেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে আবার নূতন পালা শুরু করার ডাক এলো তাঁর জীবনে। এলো নূতন যুগের নূতন দাবি নিয়ে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, চলমান জীবনধর্মিতায় এ একেবারে কবির কাব্যজীবনে সত্যিই নূতন পালা শুরু। তাই এখান থেকেই কবির গোধূলিবেলার সমস্ত রচনাকে 'শেষ-পর্যায়' ধরে নিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত।

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্য'কে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়ে উঠলেও—এ প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'প্রথম'-কে বাদ দিয়ে 'শেষে'র পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। গাছের মূল বা কাণ্ড না থাকলে শাখা বা পত্র-পুষ্পের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। বিশেষতঃ তার জীবনরসের সংবাদ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে, নইলে পত্র-পুষ্পের পুষ্টি বা জীবনধর্মিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। "বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে, সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।"[১]

১। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী—"রবীন্দ্রনাথ" [বিশ্বভারতী সং—আশ্বিন, ১৩৫৩] 'নিবেদন'—পৃঃ ⁄৹

তাই শেষ পর্যায়ের কাব্য সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে প্রথম পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সত্যকার জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তবেই প্রথম জীবনের সঙ্গে শেষজীবনের কাব্যধারার প্রধান মিল বা স্বাতন্ত্র্য কোথায় সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণায় আসা সম্ভব। কবির মূল জীবনাদর্শের তাৎপর্যটিকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেই তাঁর পূর্বাপর কাব্যধারার বিবর্তন-রেখাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সন্ধ্যাসংগীত' (প্রকাশকাল—আনুমানিক ১২৮৯ সাল) থেকে 'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯ সাল) পর্যন্ত কবির কাব্যধারার বিভিন্ন যুগে কবি-মানসিকতার একটি ক্রমবিকাশ-ধারাকে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র যুগে কবির ভাব অস্পষ্ট, ছন্দ গতানুগতিক—কাব্যজীবনের ইতিহাসে এই অপরিণত শক্তির রচনার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর বিশেষ কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল'কে কবি স্বয়ং বলেছেন—"এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা নৈবেদ্যে আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"[১]

কবির এই মন্তব্যকেই সমালোচক ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইহার মানবমুখিতা; কালিদাসের পরে এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।"[২]

জগৎ, জীবন, স্নেহ, প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি সম্পর্কে কবিমনের জীবনজিজ্ঞাসা এখান থেকেই শুরু। মর্ত্যপৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসা—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কড়ি ও কোমল [রবীন্দ্র-রচনাবলী—শতবার্ষিকী সং—১ম খণ্ড : 'কবির মন্তব্য'—পৃঃ ১৪৭]

২। প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ [১ম খণ্ড : সং—আশ্বিন-১৩৬৮ : ভূমিকা—পৃঃ ৵০

ভুবনে' এবং মানুষের প্রতিও তাঁর একান্ত প্রেম 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে এই অপরিণত শক্তির রচনার মধ্যেই—যা পরবর্তী কালের সমস্ত কাব্যগুলির বুকে বিভিন্ন ভাবে ভাষায় ছন্দে লুকিয়ে আছে। স্বদেশচেতনা—যা কবির কাব্যের একটি মূল সুর—তাও এই যুগের কাব্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল। আপনাকে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা এবং হৃদয়দুয়ারকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি এ যুগেই প্রথম অভিব্যক্ত। মৃত্যুও এই সময় থেকেই তাঁর মনে একটি স্থায়ী প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে, যা তাঁর সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার একটি মূল উপাদান।

আসলে কবির জীবনদর্শনের কয়েকটি মূল উপাদানকে এখান থেকেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। যদিও কবির অনুভবে বা উপলব্ধিতে তারা তখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি। সেই ভাব বা কল্পনাকে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতাও তাঁর তখনও দেখা দেয়নি। কবির ভাষায় 'মানসী'তেই "কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[১]

কবির ভাব ভাষা ছন্দ তার বহু পরীক্ষার জড়তাকে কাটিয়ে উঠে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে এখানে। পরবর্তীকালের 'সোনার তরী', 'চিত্রা' সেই সিদ্ধিকেই বহন করছে। তার ভাবে ভাষায় প্রকাশভঙ্গিতে অনেক স্বতঃস্ফূর্ততা। কবির জীবনে এই যুগেই যুক্ত হোল বিশ্বপ্রকৃতি একটি উজ্জ্বলতর মহিমায়। শিলাইদহ অঞ্চলের বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি এবং পদ্মানদীর এটা একটা মহৎ দান কবির জীবনে। কবি দু'চোখ ভরে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রূপ-রস-সৌন্দর্যকে দেখলেন এবং অসীম অনির্বচনীয় সৃষ্টি শক্তির লীলাকে বিশ্বপ্রকৃতির লীলার মধ্যে দিয়ে সম্ভোগ করতে চাইলেন। প্রকৃতি তার সজীব ও সক্রিয় সত্তা নিয়ে কবির কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠলো।

আপন অন্তরের অলক্ষ্য সৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে কবি এই যুগেই সচেতন হয়ে উঠলেন। এই শক্তি 'জীবনদেবতা' রূপে বারবার তাঁকে 'আহ্বান' জানিয়েছে নূতন নূতন পথে যাত্রার। প্রেরণা যুগিয়েছে গোপনে দুর্বার প্রাণশক্তিতে এগিয়ে চলার। কবিমনে প্রশ্ন জাগে, 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?' ("নিরুদ্দেশ যাত্রা"—সোনারতরী)। রোমান্টিক কবিমনের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যকল্পনা এ যুগে সার্থকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেচে। বাস্তব জগতের তুচ্ছতা, দীনতা, গ্লানি, আদর্শ-বিচ্যুতি কবিমনকে জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। কিন্তু রোমান্টিক কবিমনের একটা বিশেষ প্রবণতা এর মধ্যে দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হোল এই যে, জীবনরসিক কবি বাস্তবের নগ্নতা থেকে

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—[মানসী—রবীন্দ্র-রচনাবলী—১ম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিকী সং : সূচনা—পৃঃ ২১৬]

পলায়ন করে জীবনকে ভোগ করতে চান নি, কিংবা কল্পলোকের উচ্চসৌধে বাস করতে রাজী নয়—জীবনকে তার সামগ্রিক সত্য নিয়েই স্বীকার করতে চান।

তাই এই জীবনশিল্পীর সাধনা হোল—সীমিত এই খণ্ডজীবনের মধ্যে সৌন্দর্যের, প্রেমের, সত্যের আদর্শলোককে প্রতিষ্ঠা করার। তুচ্ছ এই মানবজন্মের মধ্যে অপূর্ণতা প্রচুর; কিন্তু এই অপূর্ণতাকে মূল্য দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়। যে সৌন্দর্য প্রেম প্রীতি আমাদের কল্পনায় আদর্শলোকের সামগ্রী—সেই 'সুন্দর'কে যদি ক্ষণস্থায়ী এই মানবজন্মে সার্থক করে তোলা যায় তবেই 'অসীম'কে 'সীমা'র বাঁধনে বাঁধা সম্ভব। এই পূর্ণতার সাধনাই মানবসভ্যতার তথা মহামানবের সাধনা। এর থেকেই কবিমনে জাগ্রত হয়ে ওঠে মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম এবং মানবজীবনের বিভিন্ন আশা-নিরাশা কর্ম-চেষ্টা চিন্তা-ভাবনার দ্বন্দ্ব।

কবি পরবর্তী যুগে ('কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি) মানবইতিহাসের সাধনসত্যটিকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। অতীত ভারতের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে মানবতার একটি পরিপূর্ণ চিত্রের অনুসন্ধান করেছেন। মানবের এই কর্মসাধনা কবির কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এই জীবনসাধনাকে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে যোগযুক্ত করে দেখার চেষ্টায় বলিষ্ঠতর। এক্ষেত্রে মহর্ষির শিক্ষা এবং উপনিষদের বিশেষ জীবনদর্শন তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। মধ্যযুগের 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এই সমস্ত ভাবধারাই অনেক বেশি বলিষ্ঠ সুদৃঢ় উপলব্ধিতে প্রকাশিত। কবিমন প্রচলিত ঈশ্বরবিশ্বাস বা ধর্মবোধকে স্বীকার করেনি, মানবকে ভালবাসাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেছে। তাই সৎকর্ম, মঙ্গলচিন্তা এবং সত্যপ্রতিষ্ঠা তাঁর নিকট জীবনের শ্রেয় ধর্ম। এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত এইরূপ—

> "আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে···
>
> ···দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে, অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থসামর্থ্য সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোন দেশেই নেই।"[১]

তাঁর কর্মের—চিন্তার সমস্ত ধারাই যে এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে, তার প্রধান কারণ

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র", ৯ম খণ্ড—শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত। (সং—বিশ্বভারতী—১৯৬৪) পত্র সং-১৯, ১৪ জুন ১৯৩১। পৃঃ ৪২-৪৩-৪৪।

আপন জীবনধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কাছ থেকে—যেখানে মানবকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়া হয়েছে—

"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েচি উপনিষদ থেকে,—যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দারোগায় নয়, পাণ্ডা-পুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত করে কর্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য জানুক বা না জানুক।"[১]

মানুষের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখার এই বোধ থেকেই মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে ঈশ্বরপ্রেম বলে কবি অনুভব করতে পারেন। মানবের এই খণ্ড আত্মার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে আপনার যোগকে কবি অনুভব করার চেষ্টা করেছেন—

"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা কিছু, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমি আমার ছোটো আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়ো আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।"[২]

কবিমনের এই মানসিক স্থিতি এবং জগৎ ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয়েছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ যোগকে একান্তভাবে আপন চেতনায় উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর মনেও দেখা দিয়েছে সংশয়। সে চিত্ত-বিক্ষোভের ইতিহাসও ছড়িয়ে রয়েছে নানা রচনায়।

'গীতালি'র পরবর্তী যুগের প্রধান প্রধান কাব্য 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'পরিশেষ'—প্রভৃতির মধ্যেও 'আত্মচেতনা', 'অধ্যাত্মচেতনা', 'মর্ত্যচেতনা' (প্রকৃতি, মানব—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা, প্রেমচেতনা, মৃত্যুচেতনা) এইভাবে বিশেষ জীবনবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। কবি তাঁর শিল্পসাধনার মধ্যে দিয়ে যে চরম সিদ্ধির বা পরিপূর্ণতার সন্ধান করেছেন সেই পূর্ণতা হয়তো কবির কল্পনা ছাড়া বাস্তব জগতে অন্য কোথাও নেই। কিন্তু জীবনধর্মী কবি মাঝে মাঝে হতাশ হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে ভোলেন নি।—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—[চিঠিপত্র" : ৯ম খণ্ড—শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
পত্র সং-২০, ১৮ জুন ১৯৩১, পৃঃ ৪৬]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড : শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
[সং—বিশ্বভারতী-১৯৬৪] পত্র সং—২৩, ২৭ জুন ১৯৩১ পৃঃ ৫৬

"সমগ্র মানুষ জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, আত্মানুভূতিতে জীবলোকসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণে বড়।

…কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে কোন প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশু-মানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,—ইতিহাস যার মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করচে।"[১]

সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানুষের এই চিরন্তন সত্যরূপটির প্রতিষ্ঠাই কবি করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনসাধনার তথা শিল্পসাধনার মধ্যে দিয়ে।

শেষপর্যায়ের কাব্যসাধনায়ও তিনি তাঁর জীবনদর্শনের এই সমস্ত মূল প্রেরণার সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হননি। তবে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি তাঁকে অনেক বেশি জীবনসচেতন করে তুলেছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিছু কিছু পার্থক্য 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' কাব্য থেকেই লক্ষণীয়। মনের উর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক স্তরে চৈতন্যের ধ্যান করেছেন কবি। অন্ন, প্রাণ, মনের উর্ধ্বে ভাবময় লোকের সাধনায় কবি কখনো কখনো মগ্ন হয়েছেন, কাব্যসাধনার তীর্থে ঋষিসুলভ চৈতন্যসাধনার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। শেষপর্যায়ের কাব্যে, কবিঋষির এই জীবনসত্যবোধ অন্যতম আকর্ষণীয় সম্পদ। দীর্ঘ জীবনের শিল্পসাধনার ফলে কবি এখন অনেক বেশি শিল্পসচেতন,—সিদ্ধিও তাঁর করায়ত্ত, তাই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ বয়সেও চালিয়ে গেছেন; এজন্য সামান্য একটা 'শালিখ' বা 'নেড়িকুকুর'ও এ পর্বে তাঁর কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। এইভাবে অতি তুচ্ছ বিষয়ও কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে এ যুগে।

'মৃত্যু' কবির উপলব্ধিতে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ থেকেই নানা রূপে ধরা পড়েছে; কিন্তু 'প্রান্তিকে'র আগে 'মৃত্যুর' প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। ভাবময় 'মৃত্যু' এই সময়ে কবিজীবনকে তার অন্ধকার গুহার তলদেশ পর্যন্ত দেখিয়ে এনেছে।

ভাবসম্পদের দিক থেকে 'স্মৃতিচেতনা'ও অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে শেষপর্যায়ের কাব্যের। আর আছে 'বিচিত্র জীবনচেতনা'। 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি', 'প্রহাসিনী' প্রভৃতি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিঠিপত্র' [৯ম খণ্ড]—শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
[প্রকাশ: বিশ্বভারতী ১৯৬৪]
পত্র সং—২৯, ২০ জুলাই ১৯৩১, পৃঃ ৬৭-৬৮

কাব্যের মধ্যে কবির কৌতুকপ্রবণ শিশুমনের পরিচয় যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। শিল্পিমনের অফুরন্ত জীবনীশক্তি আজও যে অম্লান, অক্ষুণ্ণ এগুলি তার প্রমাণ।

খুঁটিয়ে আলোচনা করলে তাই দেখা যায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে শেষপর্যায়ের কাব্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও মূল জীবনদর্শনের হের-ফের কিছু ঘটেনি। "কবিজীবনের শেষ দশটি বৎসর একটি নূতন অধ্যায়, কিন্তু পুরাতন প্রবহমাণ জীবনধারার প্রাক্তন অধ্যায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত নয়, তাদের সঙ্গে ভিতরকার ঐক্যসূত্রে গাঁথা; একটু অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় নূতন অধ্যায়টি পুরাতন অধ্যায়গুলিরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধে গাঁথা জীবনপ্রবাহের পূর্ণ ঐতিহাসিক রূপ।[১]

কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে যে 'আঙ্গিক' বৈশিষ্ট্য এই পর্যায়ের কাব্যের প্রথম আকর্ষণীয় উপাদান তা হোল 'গদ্যছন্দ'। শেষপর্যায়ের কাব্যের 'প্রথম অধ্যায়ে' এই গদ্য-ছন্দের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শেষপর্যায়ের কাব্যের অন্যান্য ছন্দ-বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পকলা, অলঙ্কার, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কিত আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্গত।

বহিরঙ্গের দিক থেকে 'পাঠান্তর' 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনার পর আসে অন্তরঙ্গ আলোচনার কথা। অন্তরঙ্গ আলোচনার দিক থেকে শেষপর্যায়ের কাব্যের বিচিত্র ভাবসম্পদ তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 'বিভিন্ন চেতনা' পর্যায়ে আলোচিত। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বিপুল ভাবসম্পদকে 'আত্মচেতনা', 'অধ্যাত্মচেতনা', 'প্রকৃতিচেতনা', 'মানবচেতনা'—'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা', 'প্রেমচেতনা', 'মৃত্যুচেতনা' (৩য় অধ্যায়), 'স্মৃতিচেতনা' (৪র্থ অধ্যায়), 'বিচিত্র জীবনচেতনা' (৫ম অধ্যায়) ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন 'চেতনা' হচ্ছে একটি প্রবাহের মতো; প্রত্যেকটি ভাগকে 'ভাব' বা 'চেতনা' অনুসারে একেবারে স্বতন্ত্র করে দেখা সম্ভব নয়। কবিমানসে একটি চিন্তার সঙ্গে আর একটি চিন্তা এমন ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত যে, এদের বাইরের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত করা গেলেও অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রে তারা পরস্পর গ্রথিত। কাব্যের ভাবসম্পদের আলোচনায় সেই মূল ঐক্যতত্ত্বের কথাটি বিস্মৃত হলে চলবে না।

কবিমানসিকতা এবং প্রথম পর্যায়ের কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর, 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র ব্যাপক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

১। "রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ"—সম্পাদনা-শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮] প্রবন্ধ—"শেষ অধ্যায়"—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। পৃঃ ৮৩

ছন্দ / রচনাশৈলী / অলঙ্কার / ভাষা

কাব্যের "আঙ্গিক" আলোচনা বলতে তার বহিরঙ্গ অঙ্গ সৌষ্ঠবের বিচার-বিশ্লেষণ বোঝায়। আঙ্গিক বিচারে, শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির 'ছন্দ', 'রচনাশৈলী', 'অলঙ্কার' এবং 'ভাষা'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনা 'প্রথম অধ্যায়ে'র আলোচ্য বিষয়বস্তু।

ছন্দ

গদ্যছন্দ

সাধারণ আলোচনা

'পরিশেষ'-এ কবি তাঁর কাব্যজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'পুনশ্চ' দিয়ে তাকে নূতন আঙ্গিকে বরণ করে নিতে হোল। বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা বাদ দিয়ে প্রথম যেটা চোখে পড়ে বা এর আকর্ষণীয় আবেদন তা হোল এর 'আঙ্গিক' বৈশিষ্ট্য। 'পুনশ্চ' কাব্যে যার শুভ সূচনা—'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র মধ্যে তার পরিপূর্ণতা।

'পুনশ্চ' কাব্যে কবি যে নূতন বাগ্‌বিন্যাস বা রচনাশৈলীর প্রবর্তন করলেন, তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চিরাচরিত বাঁধা ছন্দের মায়াজালকে কাটিয়ে কবি ভাবকে যেন মুক্তি দিলেন সহজ চলমান ছন্দে। বাইরের দিক থেকে কোনো বাঁধা ধরা নিয়মকে এ ছন্দ স্বীকার করলো না—অন্তরে লুকিয়ে রাখলো গোপন ছন্দের রেশ। ভাবের পক্ষবিস্তারেই এর পর্ব, চরণ, স্তবকের জন্ম। গদ্যের চলনে এ ছন্দের বিস্তার বলে নাম হোল "গদ্যছন্দ"—আর 'অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ' ('নাটক'—পুনশ্চ)—তাই "ভাবচ্ছন্দ"।

আপাতদৃষ্টিতে ছন্দোকুশলী শিল্পিহাতের এই নূতন দান অনেকের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেও এবং কৌতূহলী পাঠকের মনে এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগলেও, কবির জীবনে শিল্পসিদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিচিত্র প্রয়াসকে লক্ষ্য করা যায়—এ যেন তার অনিবার্য পরিণতি। 'গদ্যছন্দ' সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত এবং প্রচেষ্টার কথা কবি 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ' এবং 'গদ্যকাব্য' প্রবন্ধে, এছাড়া 'পুনশ্চে'র ভূমিকায়, বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে, আলাপ-আলোচনায় এবং 'ছন্দ' গ্রন্থের কিছু কিছু আলোচনায়, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ

করে গেছেন। এর থেকেই জানা যায়, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়ে কবি প্রথম ধরতে পেরেছিলেন যে, গদ্যচলনের মধ্যে কাব্যের রস অনুপ্রবেশ করাতে পারলে ঐ ছন্দের কাব্যধর্মী হয়ে ওঠার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না। আসলে "কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে ;—ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"[১]

কাব্যের এই মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্যেই গদ্যছন্দের জন্মরহস্য লুক্কায়িত। "১৩২৬ সনের কাছাকাছি কোনো সময়ে 'পুষ্পাঞ্জলি'র রূপান্তর সাধনের আবেগে নূতন গদ্যছন্দ এল লেখনীর মুখে।

…'পুষ্পাঞ্জলি' আর 'লিপিকা'র প্রথমাংশের বহু রচনা পরস্পর মিলিয়ে পড়লে পরস্পরের মধ্যে কত মিল আছে তা লক্ষ্যগোচর হয়। নিজের অথবা অন্যের বহুদিনের বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ সম্ভবপর আবৃত্তির নিয়মে 'লিপিকা'র বাক্যগুলি ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন ছত্ররূপে সাজাননি বা সাজাতে সাহস করেননি কবি।

…যা হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন্ পথে কি ভাবে 'গদ্যছন্দ' এল বাংলা সাহিত্যে আর কী এক তিরস্করণী মন্ত্রে তার আবির্ভাব রইল প্রায় লুকানো। অবশেষে ১৩৩৯ সালে দ্বিধা ও সংশয় ঘুচে গেল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই নূতন ছন্দের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ল, এবং তারই ফলে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' কাব্যে আমরা যে নূতন কবিত্ব সম্পদের প্রাচুর্যে চকিত হয়ে উঠলাম, অনেকে উগ্র প্রতিবাদও করলেন, তা করুন—এর আকার প্রকার সবই নূতন।"[২]

গদ্যছন্দকে মূল্যদান সম্পর্কে কবির বিভিন্ন কৈফিয়তকে স্মরণে রেখেও একথা বোধ হয় সহজেই বলা চলে যে, কবির দীর্ঘজীবনের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে ছন্দ ও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর যে সচেতনতা—তাই-ই এ প্রচেষ্টার মুখ্য কারণ। তাঁর শিল্পিমানসে প্রথমাবধিই কয়েকটি জিনিস কাজ করে চলেছিল—তা হচ্ছে কাব্যের আসল সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা। তিনি শুধু মহাকবি হয়ে অজস্র কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা করেননি—বাংলা ভাষা ও ছন্দের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েও রীতিমত্ত গবেষণা করেছেন। "ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্গঠন, কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাংলাভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎ বাঙালির বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত যে মূল-তত্ত্বগুলি, তার উপরেই বাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য, তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তিনি যখন ঐ তত্ত্বগুলি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী [১৪শ খণ্ড—জন্মশতবার্ষিক সং] "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রবন্ধ—"কাব্য ও ছন্দ"—পৃঃ ৫২৪

২। শ্রীকানাই সামন্ত—"রবীন্দ্রপ্রতিভা" [প্রকাশ—২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮] প্রবন্ধ—"রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী" পৃঃ ১৮৩, ১৮৬-১৮৭

আবিষ্কার করে কাব্যের ধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতিকে তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন থেকেই বাংলা ছন্দ নবতর সার্থকতা ও ঐশ্বর্যলাভের পথের সন্ধান পেয়েছে।"[১] এর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কেও তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। সেজন্যই প্রচলিত বাঁধাছন্দের নিয়মকে লঙ্ঘন করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সর্বোপরি এইটুকু বলা চলে, যে সাধনা এতদিন ধীরে ধীরে তার পথ কেটে চলছিল বিশশতকের নূতন যুগচেতনা তাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় কবি পরম উৎসাহে এর সৌন্দর্য-স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করলেন, প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যাও করলেন। 'ভাবচ্ছন্দ'কে এইভাবে মূল্যদানের পিছনে কবিমানসে কয়েকটি প্রেরণা গোপনে কাজ

কবিমানসের কয়েকটি প্রবণতা

(১) জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা—বেদ, উপনিষদ, লৌকিক ছড়ার ছন্দের মধ্যে যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

(২) বাংলা-সাহিত্যের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লেখক এবং কবিদের সক্রিয় চেষ্টা।

(৩) বর্তমান যুগজীবনে অতিবাস্তব ঘটনাকে ও জীবন-সচেতনতাকে মূল্যদান।

(৪) পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব।

ছন্দোমুক্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার ইতিহাসকে বিশেষ রূপে জানতে হলে উপরি-উক্ত কারণগুলির প্রত্যেকটিকে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা দরকার। কবি যাই বলুন না কেন, কবির মানসপটে এই সমস্ত কারণগুলি যে সচেতনে এবং অবচেতনে দুই অবস্থাতেই সমানে কাজ করে গেছে—তা এর পূর্ববর্তী ইতিহাসের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়।

(১) পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—মানুষের মনের আদিম চেষ্টা লিপিবদ্ধ রয়েছে এই 'ভাবচ্ছন্দে'র মধ্যে। বেদ, উপনিষদ, বাইবেল এবং গ্রীক ও হিন্দুধর্মের পুরাণ সমূহের মধ্যে মানুষের মনের উপলব্ধ ভাবগুলি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল সুরের অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে। কিন্তু ভাব বা সুরধর্মিতার বিচারে এরা কাব্য আখ্যা পেলেও ছন্দের দিক থেকে বিশেষ কোনো মিলের বন্ধনকে, এরা স্বীকার করেনি। ভাবের স্বাভাবিক পরিপূর্তির

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—"ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ"—[সং-১ আষাঢ় ১৩৫২] পৃঃ ৩

দিকে লক্ষ্য রেখেই এ সব গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি বিন্যাস করা হয়েছে। সুতরাং পরবর্তীকালের 'গদ্যছন্দ' বা 'ভাবচ্ছন্দে'র আদি রূপের সন্ধান এর মধ্যে করা যেতে পারে।

গল্পের আধারে যে কোনো ভাবধর্মী এবং চিন্তাগর্ভ রচনাকে 'চার' মাত্রার পর্ববিভাগে কেটে কেটে উচ্চারণ করার প্রবণতা আমাদের গল্পশোনা ও গল্পবলা স্বাভাবিক মনেরই সৃষ্টি। বাংলা ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলেই এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে শ্বাসগ্রহণের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা যেমন লুকিয়ে থাকে অর্থাৎ একটি অনায়াসলব্ধ ধ্বনিবিন্যাস—তেমনি ভাবকেও এর মধ্যে বেঁধে সহজে লোকের মনে পৌঁছে দেওয়া যায়। অথচ চারমাত্রার এই গল্প-বলার ঢঙটির মধ্যে একটি অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্দের সৃষ্টি হওয়ায়, এও মনের মধ্যে সুরের রেশ জাগিয়ে তোলে। ভাবের এই স্বতঃস্ফূর্ততা মানুষের অবচেতন মনে যে ধ্বনিস্পন্দন জাগায় তার থেকেই 'লৌকিক ছন্দে'র জন্ম। বাংলার ছড়াগুলি ও বাউলগান তাই সাধারণ লোকের অচেতন শিল্পসাধনা হলেও জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্ম দিয়ে এরা চিরঅমর। কবিগুরু ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য-সন্ধানী হলেও জাতীয় জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে সচেতন শিল্পি-মানসে স্বীকার করেছেন এবং পূর্ণ মূল্যও দিয়েছেন, তাই বলেছেন—

> "সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড় সৃষ্টি। আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।
>
> চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার ও ঘুম-পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়।
>
> ...চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে' যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।"[১]

"ঠাকুরমার ঝুলি" থেকে একটুখানি অংশ তুলে নিয়ে দেখা যেতে পারে কি ভাবে এর মধ্যে গদ্যছন্দের আদি রূপটি লুকিয়ে আছে।

> "এক রাজপুত্র আর এক রাখাল, দুইজনে বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখন তিনি রাজা হইবেন, রাখাল বন্ধুকে তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।
>
> রাখাল বলল,—"আচ্ছা"।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"বাংলা-ভাষা পরিচয়" [১ম সং] পৃঃ ৬২-৬৩, ৬৪

দুইজনে মনের সুখে থাকেন। রাখাল মাঠে গরু চরাইয়া আসে, দুই বন্ধুতে গলাগলি হইয়া গাছতলে বসেন। রাখাল বাঁশী বাজায়, রাজপুত্র শোনেন। এইরূপে দিন যায়।"[১]

এইটুকুকে পঙক্তিবিভাগ করে লিখলে—

এক রাজপুত্র
আর এক রাখাল,
দুইজনে বন্ধু।
রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন
যখন তিনি রাজা হইবেন,
রাখাল বন্ধুকে
তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।
রাখাল বলিল,—"আচ্ছা"।
দুইজনে মনের সুখে থাকেন। ··

এইভাবে দেখা যায় সাধুভাষার ক্রিয়াপদগুলিকে উঠিয়ে দিলে একে 'গদ্যকবিতা' বলতে বাধে না। কয়েকটি শব্দকেও অবশ্য চলিত ভাষায় ব্যবহার করতে হবে। তবে ভাব অনুসারে এই যে কেটে কেটে উচ্চারণ, চলতি ছন্দের এই প্রবণতার মধ্যেই "গদ্যছন্দে"র পরবর্তীকালীন রূপটি আত্মগোপন করেছিল—একথা, হয়তো নিঃসন্দেহেই বলা চলতে পারে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত মন্তব্যকেও স্মরণ করা যায়।

(২) ছন্দোমুক্তির সাধনায় বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লেখক ও কবি-সম্প্রদায়ের সক্রিয় চেষ্টাও কবিকে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। ছন্দোমুক্তির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করলেই দেখা যায় বেশ সচেতনভাবেই বহু লেখক এবং কবিগোষ্ঠী এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কবিও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কাজেই কাব্যের এই ছন্দোমুক্তির সাধনা রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টা মাত্র নয়—পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের সমবেত দান।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে যে প্রথম গদ্য-রচনায় ছন্দোমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল—এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব উক্তি স্মরণীয়—

"গদ্যের পদগুলির মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি

১। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—ঠাকুরমার ঝুলি [সপ্তদশ সং] পৃঃ ৬৯

অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া…বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"[১]

বিদ্যাসাগরের এই 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আরও বেশি সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর 'কবিতা-পুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এই গ্রন্থের 'মেঘ', 'বৃষ্টি', ও 'খদ্যোত' এই তিনটি রচনার মধ্যে গদ্যকবিতার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন—

"কবিতা পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্যপ্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সংগত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেকস্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য।…কাব্যে গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ* তিনটি গদ্যকবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।"

["কবিতাপুস্তক"—১৮৭৮, বিজ্ঞাপন]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বীকৃতিই প্রমাণ করে, গদ্যকবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এমন কি, 'গদ্যকবিতা' নামটি পর্যন্ত তিনি দিয়ে গেলেন। প্রচলিত বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন ক'রে গদ্যের চলনের মধ্যে কাব্যরসকে যে অনুপ্রবেশ করানো চলতে পারে, সেকথা তিনি সগৌরবে ঘোষণা করে গেলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের গদ্যরচনার মধ্যেই পদ্যের এই শিল্পসুষমা আরও বেশি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'পালামৌ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার এই বিশেষ ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—

"এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁছেচে অথচ কোন বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।"[২]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ছন্দ" সং—বিশ্বভারতী ১৯৬২ ॥ পাঠপরিচয় ॥ 'গদ্যছন্দ' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত পৃঃ ৪২৯

* দ্রঃ "বসুধারা"—বৈশাখ ১৩৭২
প্রবন্ধ—"রবীন্দ্রনাথ ও গদ্যকবিতা"—শ্রীরামবহাল তেওয়ারী

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ছন্দ" সং- বিশ্বভারতী ১৯৬২ "গদ্যছন্দ" পৃঃ ১৫২-১৫৩

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত সমালোচনা থেকেই, তিনি যে এ সম্পর্কে কতদূর পর্যন্ত সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যকবিতা রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত রাখলেও এই রচনাকে কবিতার মত খণ্ডিত অংশে পঙ্‌ক্তিবিভাগ করে সাজাননি। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'বর্ষার মেঘ' নামক একটি গদ্যকবিতা 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় (১৮৪৮ জুলাই) প্রথম প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম এই বাক্‌ছন্দের বিভাগ অনুসারে ভেঙে ভেঙে বিন্যস্ত করে এই গদ্যকবিতাকে সাজান এবং নাম দেন 'পদ্যপঙ্‌ক্তিক গদ্য'। কবিতাটির শেষে পাদটীকায় তিনি বলেন,—"যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ।" এর পর ১৮৮৪ সনের অগস্ট মাসে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে তিনি এই পদ্যপৌঙক্তিক গদ্যের ব্যবহার করেন।*

কিন্তু এ তো গেল বাংলা সাহিত্যে গদ্যের পদ্যাভিমুখিতার নিদর্শন। এ ছাড়া পদ্যেরও গদ্যাভিমুখিতার ভিতর দিয়ে 'গদ্যকবিতা' জন্ম নেয়।

কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালই প্রথম সুরের আশ্রয় ত্যাগ করে রচনায় গদ্যাভিমুখিতার সূত্রপাত করেন।

এই পথ বেয়েই মধুসূদনের হাতে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের আত্মপ্রকাশ। পদ্যবন্ধের গদ্যবন্ধের অভিমুখে এই প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। 'ছেদ' ও 'যতি'র সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বন্ধনকে কাটিয়ে ভাব অনেকখানি মুক্তি পেল এখানে। কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের বেড়ি তখনও তার পায়ে পরানো।

গিরীশচন্দ্রও তাঁর নাটকের সংলাপ রচনায় গদ্যসুলভ বাক্‌ভঙ্গির অনুসরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের জন্ম দিলেন। ছন্দের বন্ধনমুক্তির এটাই দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র (১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ কবির বয়স ২১-২২ বছর) অসমপঙক্তিক পদ্যবন্ধ রচনার মধ্যে এই প্রবণতার মৃদু স্পর্শ আভাষিত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে, কবিতায় গদ্যের লক্ষণ বা গদ্যে কবিতার লক্ষণ মাঝে মাঝে লক্ষ্যগোচর হয়। কাজেই পদ্যের এই গদ্যচলনভঙ্গী কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন কিছু উপাদান নয়—নূতন হোল একে সোজাসুজি 'গদ্যকবিতা' বলে মূল্যদান। মানুষের অতিরিক্ত বাস্তব সচেতনতা একে নূতন মূল্য দিয়ে গ্রহণ ক'রলো।

(৩) কাব্যের চলনের দিক থেকে এই গদ্যছন্দকে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে,

*দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছন্দ'—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত "পাঠপরিচয়" ২য় সং পৃঃ ৪২৩

অতিবাস্তবতাকে গ্রহণ করার তৃতীয় কারণ—আধুনিক যুগের যুগযন্ত্রণাকে এবং অতিরিক্ত বাস্তব সচেতনতাকে মূল্যদান।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসকে ভাঙাগড়ার যুগ বলে ধরে নেওয়া যায়। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। যান্ত্রিক জীবনের প্রভাব মানুষের মনের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নূতন মূল্যবোধ ঘোষিত হোল। ব্যক্তিগত ও সমাজ-কেন্দ্রিক জীবনবোধের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হোল। মানুষের জীবনে এবং চিন্তায় এরই ফলে দেখা দিল বিভিন্ন জটিলতা। মানুষ হারিয়ে ফেললো জীবনের স্থায়ী সূক্ষ্ম আবেগপ্রবণতাকে। পরম স্থিতি শান্তি ও মাধুর্যবোধের ক্ষেত্র থেকে সে যেন ছিটকে এসে পড়লো জীবনের বহুমুখী জীবন-যন্ত্রণার মধ্যে। মানুষের স্থায়ী সত্যবোধ, কল্যাণবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ থেকে সে যেন ভ্রষ্ট হয়ে গেল। এই ডামাডোলের বাজারে আপন মনের চিরন্তন বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে আঁকড়ে রাখা সত্যি খুবই কঠিন! মনুষ্যত্বের স্থায়ী মূল্যবোধকে মর্যাদা দিতে গেলেই তিনি হবেন 'রোম্যান্টিক', হবেন 'জীবনবিমুখ', 'অবাস্তব'। এক্ষেত্রে আপন মনের স্বকীয় ধ্যান-ধারণাকে সামনে রেখে পথ চলা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় কবি ও সাহিত্যিকরা কোন্ পথ গ্রহণ ক'রবেন? নূতন যুগ—আধুনিক যুগের এই নূতন জীবনবোধ তাঁদের নাড়া দিল; নাড়া দিল মূল ভিত্তি ধরেই—তাতে অনেকে সাড়াও দিলেন। "কাব্য যদি জীবনের মুকুর হয় তবে এই জটিল যুগের প্রতিবিম্ব তাকে জটিল করে তুলবে এতে আশ্চর্য কি?...আধুনিক কবিরা তাঁদের অব্যবহিত অগ্রজদের সুকোমল, শিথিল, অতিমর্ত্য কাব্যকলা বর্জন করলেন।"[১]

কিন্তু জীবনের এই অতিমর্ত্যবোধকে বর্জন ক'রে আধুনিক কবিরা যে জটিলতাকে রূপ দিতে চাইলেন তাতে জীবনের কামনা-বাসনা, ক্ষোভ, দেহজ ও রূপজ মোহ, সমাজের নানা ক্লিষ্ট-খিন্ন-জীবনচিত্র রূপ পেল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো সত্যবোধকে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল্য দিতে পারলেন না। প্রতিষ্ঠিত কাব্যাদর্শ এবং জীবনসত্যের সম্বন্ধে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাঁদের মনে দেখা দিল। জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন নাস্তিকতা, তীব্র অসন্তোষ এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ধরা পড়লো এবং এটাই কাব্যের উপজীব্য। তাই প্রচলিত রোম্যান্টিকতা, ভাবালুতা, আদর্শবাদ ও আস্তিক্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ দেখা দিল আধুনিক কবিদের অতিরিক্ত জীবনসচেতন কাব্য কবিতা।

১। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় [২য় সং আশ্বিন, ১৩৬৬]
প্রবন্ধ—'আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমিকা' [পৃঃ ২১, ২০]

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠেই এঁদের রচনা বিশিষ্ট পথ ধরেছিল। কোনো কোনো আধুনিক কবি জীবনে, জগতে বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোথাও কোনো মাধুর্যের লেশমাত্র সন্ধান পেলেন না। মানুষকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়ে অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের নালিশ। রোম্যান্টিক কবিদের অজানার আকর্ষণকে তীব্র ব্যঙ্গ হেনেই কোনো কবি বললেন—

অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি, শোনো মোটামুটি, কোনোখানে সে যে নাই।
['ঘুমের ঘোরে'—অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'কল্লোল যুগে'র কোনো কোনো আধুনিক কবির "মনে হোল তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হোল তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন ".[১]

রোম্যান্টিক কবিকুলের শাশ্বত সৌন্দর্যবোধকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত হান্‌তে কেউ কেউ দ্বিধা করলেন না।

হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্রঠাকুর।
[বিষ্ণু দে—'ছেদ'-উর্বশী ও আর্টেমিস]

কিন্তু আধুনিক কাব্যের এই উদ্যত এবং উদ্ধত অবিশ্বাস জীবনের যথার্থ রূপকে তুলে ধরতে কিঞ্চিৎ সমর্থ হলেও, তার কলুষ এবং আবিলতা যতখানি স্থান অধিকার করলো, ততখানি জীবনের কোনো স্থায়ী সত্যবোধের বা প্রকৃত জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে চাইলো না। সমস্ত পুরাতন ধারণা ও বিশ্বাসকে মোহ ও মায়া বলে উড়িয়ে দিলেও নূতন কোনো জীবনের বাণী বা আদর্শ তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। "…যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতার পরিচয় আধুনিক কাব্যে থাকলেও জীবনদর্শনের দিক্ দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। চলিত জীবনযাত্রার নেতিবাচক সমালোচনাই তাতে প্রধানতঃ আছে, কিন্তু মহৎ কাব্যের উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধির পরিচয় তাতে নেই, নবজীবনের বাণী বা আদর্শ তাতে রূপায়িত হয়নি। ছিটেফোঁটা টুক্‌রো টাক্‌রা প্রত্যয়

১। শ্রীবুদ্ধদেব বসু—'সাহিত্যচর্চা' [সং—বৈশাখ, ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—"রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক"—৪ পৃঃ ১১৮

এখানে ওখানে অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনসম্বন্ধে একটা সামগ্রিক উপলব্ধির অভাব আছে।"[১]

এই বস্তুমুখী জীবন-জিজ্ঞাসাকে আধুনিক কবিরা যে বাহনে প্রকাশ করলেন তা হোল 'গদ্যবাচনভঙ্গী'। ভাবের দিক থেকে তাঁরা যেমন প্রচলিত সমস্ত সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, আঙ্গিকের দিক থেকেও তেমনি ছন্দের কোনো প্রচলিত বন্ধনকে স্বীকার করতে চাইলেন না। ভাষা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প সবকিছুর ক্ষেত্রেই দেখা দিল একটা বিদ্রোহের মনোভাব। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই গদ্যছন্দ বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোল।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যে 'লিপিকা' (১৯২২ খ্রীঃ) যুগের ভীরুতাকে কাটিয়ে সরাসরি গদ্যছন্দের নূতন মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশধর্মিতার দিক থেকে কিছু কিছু নূতনত্ব এ যুগের কাব্যে দেখা দিলেও, যে সহজ দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখেছিলেন তার মূল্যবোধ কিছুমাত্র কমে গেল না। এই সাম্প্রতিক কালের কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাই তাঁর রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

"রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতিতে আস্থা, শাশ্বত সত্যে অবিচলিত বিশ্বাস, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা এবং অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতি উনবিংশ শতকের ভিক্টোরীয় শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগে গড়ে উঠেছিল। এর কিছুটা ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন, কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছ থেকে।"[২] কাজেই দীর্ঘ জীবনের সাধনায় তিনি জীবনে যে সমন্বয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই মানসিক স্থৈর্যকে কোনো কারণেই নষ্ট হতে দেন নি। ব্যক্তি মানুষের চারিত্রিক উন্নতি এবং পূর্ণতার দিকেই তাই তাঁর লক্ষ্য। ঘোর দুর্দিনের মাঝেও মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া তাঁর আদর্শ নয়।

তাঁর সাহিত্য সাধনায়ও এই সমন্বয়ধর্মী মনোভাব কাজ করে গেছে। এই জগৎ ও জীবনের অন্তরালে তিনি এক রহস্যময় শক্তির লীলাতে বিশ্বাস করেছেন এবং সেই অলক্ষ্য শক্তির সঙ্গে মানবের ঘনিষ্ঠ যোগকেও অনুভব করেছেন। কিন্তু চিরন্তন মানবের জ্ঞানের, কর্মের, প্রেমের এবং ত্যাগের সাধনাতেই মানুষের জয়যাত্রা সার্থক। তাই তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল তত্ত্ব—"রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন

১। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—"আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা" ১ম সং ১৩৬৭
প্রবন্ধ—'আধুনিক বাংলা কবিতা' পৃঃ ৭৯

২। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী—'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' [২য় সং, আশ্বিন ১৩৬৬]
প্রবন্ধ—'আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমিকা' পৃঃ ২৫

করে দেখা।"[১] শেষজীবনের কাব্যগুলিতেও তিনি জীবনের এই মূলীভূত চিন্তা ও উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আসেননি।

গদ্যছন্দকে তাই 'পুনশ্চ' কাব্যে গ্রহণ করে পরবর্তী কাব্যত্রয়ের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক যাই-ই হোক না কেন, তাকে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ করে তোলাই শিল্পীর যথার্থ সাধনা। প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর সহজ দৃষ্টিতে বস্তুজগৎকে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে দেখতে হবে এবং আপন মনের মণিকোঠায় তাকে শিল্পমণ্ডিত করে সত্যকার কাব্য করে তুলতে হবে। তাই এ যুগে একটা শালিখ, চড়ুই, নেড়িকুকুর, ছেলেটা, একজন লোক—তাদের স্ব স্ব স্থানে থেকেও কাব্যের ক্ষেত্রে যথার্থ আসন করে নিয়েছে। কবি তাদের নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গদ্যবাচনভঙ্গি তাকে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এই 'গদ্যছন্দ' বা 'ভাবচ্ছন্দ' যে কেবল অতিবাস্তব বিষয়বস্তুকে এবং চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে সক্ষম, তা নয়। কবি এই ছন্দের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যলোক থেকে অচৈতন্য-লোকের সমস্ত ভাব এবং ভাবনা, উপলব্ধি এবং জীবনচেতনাকে কাব্যোত্তীর্ণ করে, এক অভাবনীয় শিল্পসাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আধুনিক কবিদের অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁকে সে যুগে সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ জীবন থেকে সরে গিয়ে অমর্ত্যলোকের গান শুনিয়েছেন তিনি। তাই সাম্প্রতিক কালের আধুনিক কবিরা তাঁর 'ঐকতান' কবিতার ('আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র-পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'—'১০'সং, জন্মদিনে) ব্যাখ্যা করে বললেন—কবির নিজের স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি 'কৃষাণের জীবনের শরিক' ('১০' সং—'জন্মদিনে') হতে পারেন নি। কিন্তু কবির এই কবিতার মর্মব্যাখ্যা তাঁদের অগোচরেই রয়ে গেল। কবির কাব্যপ্রচেষ্টা প্রথম জীবন থেকেই বিচিত্রের সাধনা করেছে—পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক—সমস্ত জগতের বিভিন্ন ভাব এবং ভাবনা, চিন্তা এবং চেষ্টাকে রঙে রসে ছবি এঁকে গেছেন তিনি। মানসিক জগতের বস্তুমোহ, ভাবমোহকে অতিক্রম করে অধ্যাত্ম-বোধের চরম সীমায় পৌঁছেছেন; কিন্তু আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধের সাগরসঙ্গমে গিয়েও কবি দেখেছেন—মানুষের চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, উপলব্ধির কোনো সীমা নির্ণয় সম্ভব নয়। কবি বুঝলেন—

শেষ নাই যে শেষ কথা কে বলবে—

['৬০৬' সং—পূজা]

তাই সর্বত্রগামিতা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে, অপূর্ণ এই মানবের

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের পথে" (রবীন্দ্র-রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সং ১৪শ খণ্ড) 'সৃষ্টি' পৃঃ ৩২৩

চেষ্টায় তা কি কখনও সম্ভব? বস্তুতঃ তিনি যে জীবনবিমুখ কবি নন, তাঁর অজস্র রচনাই তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু সত্যসুন্দরের যে মূল্যবোধকে মানুষের জীবনে তিনি সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন—কাব্যে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আর 'পুনশ্চ' দিয়ে সেই কথাটাই আর একবার বলে নিতে চেয়েছেন 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র মধ্যে। নূতন যুগের জীবন-চেতনা তাই তাঁকে নাড়া দিয়ে নূতন কিছু শিল্পকর্ম করিয়ে নিল।

(৪) বিশ শতকের এই উগ্র বাস্তববাদ এবং জীবনের নূতন মূল্যায়ন, ইউরোপীয় শিক্ষা এবং জীবনবোধ থেকেই আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে এসেছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে এ ব্যাপারে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত—একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন। তাঁর কোনো কোনো চিঠিপত্রের মধ্যে এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়—

> "তাছাড়া সাহিত্যের বিচারশক্তিও প্রাদেশিকতা কাটিয়ে উদার হয়ে উঠবে। আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল স্বদেশের নয়। দুইয়ের মিল করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা কালোহি বলবত্তরঃ—তোমার চেয়ে তার জোর বেশি—তার সঙ্গে রফা করতেই হবে।"[১]

ঐ একই ব্যক্তিকে লেখা অন্য একখানি চিঠিতেও দেখা যায়—

> "কিন্তু সাহিত্য-বিচারবুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েছ তা আমি মনে করিনে। না পাবার প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখতে পাওনি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমায় কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে ভিতের উপর তার বাসা ফাঁদছে সে ভিতটা য়ুরোপীয়।"[২]

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যুগধর্মকে তিনি একেবারেই অস্বীকার করেননি। কালের দাবী যে মানতেই হবে তা তাঁর জানা আছে। তাছাড়া সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে তিনি কোনো

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিঠিপত্র' [৯ম খণ্ড] শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
পত্রসংখ্যা-১০৭, ৫ ডিসেম্বর ১৯৩২ [পৃঃ ১৯০]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিঠিপত্র' [৯ম খণ্ড] শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
পত্রসংখ্যা-১১, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ [পৃঃ ২৮]

সাহিত্য বা সংস্কৃতিকে দেখেন নি। যথার্থ শিল্পীর মধ্যে যে উদার, ব্যাপক, বিশুদ্ধ, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যাশা করা যায়—তা তাঁর ছিল।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা অন্য একখানি চিঠিতেও কবির এ সম্পর্কিত মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে—

> …"ইংরাজের প্রাকৃতন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি।
>
> …কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্ধা মাত্র।
>
> …কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না।
>
> …সাহিত্য সর্বদেশেই এই কথা প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ নিকেতন চিরপুরাতন।"[১]

এই সমস্ত আলোচনাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কবি তাঁর চিত্তদ্বারকে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। বিদেশের এবং বিদেশী সাহিত্যের যা কিছু ভালো তাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু চিরন্তনকে আঘাত হানার প্রতি আধুনিক সাহিত্যিক বা কবিদের যে উদ্ধত মনোভাব তাকেও সুস্থ মানসিকতা বলে স্বীকার করেননি।

সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যের এই 'Free Verse' বা 'ভাবচ্ছন্দে'র প্রভাবও তাঁর মনে কাজ করে গেছে। কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে কবি একে বর্জন করেননি।

ইংরেজী সাহিত্যেও কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দোমুক্তির এই বিশেষ চেষ্টা উনিশ শতকে বেশ সচেতন ভাবেই দেখা দিয়েছিল। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই poetic diction বাদ দিয়ে ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যিক বাচনভঙ্গী সব ত্যাগ করে সাধারণ কয়েকটি কথার ভাবগত ঐক্যকে নিষ্কাশিত করে মহৎ কবিতার জন্ম দিলেন। বায়রণ এর তীব্র ব্যঙ্গ করে

বলেছিলেন—"Prose is verse and verse is merely prose."[১] মনে হয় তখন থেকেই কাব্যে ভাবছন্দের অধিকার নিয়ে তর্কের সূত্রপাত।

"ছন্দোমুক্তির পথে ইংরাজী সাহিত্যে জেরার্ড ম্যানলি হপ্‌কিনস্ (১৮৪৪-১৮৮৯ খ্রীঃ)-এর 'স্প্র্যাং রিদিম্' এবং ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান (১৮১৯-১৮৯২ খ্রীঃ)-এর 'থট্‌রিদিম' যুগান্তর উপস্থিত করে।"[২] এই 'থট্‌রিদিম'কেই বাংলায় 'ভাবছন্দ' বলা হয়। পরবর্তী কালে 'এজরা পাউণ্ড', 'এলিয়ট', 'ওয়েন'—একে নূতন মূল্য দিলেন। এলিয়টের The Waste Land ভাব ভাষা ছন্দের দিক থেকে ইংরাজী কাব্যে 'আধুনিকতার প্রথম কীর্তিস্তম্ভ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং বাংলা আধুনিক কাব্যেরও দিক্‌নির্দেশ করেছে। এই সমস্ত আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাব্যের জগৎকে বাস্তব জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রচনাকে অতিমাত্রায় জীবনধর্মী করে তুললেন। তাঁদের রচনার এই বিশিষ্ট গুণ রবীন্দ্রনাথকে যে নাড়া দেয়নি একথা জোর করে বোধ হয় বলা চলে না। কাব্যের যে বন্ধনমুক্তির চেষ্টা তিনি প্রথম জীবন থেকে শুরু করেছিলেন, নূতন যুগের আধুনিক ইউরোপীয় এবং বাঙালী কবিদের হাতে যখন তা পুরোপুরি স্বীয় মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হোল—তখন কবিও তাঁর অনেকদিনের ভীরু ইচ্ছাকে লোকচক্ষুর গোচরে আনলেন। 'লিপিক'ার গল্পধর্মী রচনার মধ্যে এ আর আত্মগোপন করে রইল না। গদ্যছন্দের রূপ ও রীতির আধারে পরিবেশন করলেন সেই 'চিরকালের স্তব্ধতা' ও 'চলতিকালের চাঞ্চল্য'কে ['নাটক' —পুনশ্চ]।

'ভাবছন্দ'কে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করার এই সমস্ত প্রেরণাকে সত্য বলে ধরে নিলেও, কৌতূহলী পাঠকের মনে তথাপি নানা প্রশ্ন থেকে যায়। যে কবি ছন্দের রাজা, ছন্দের যাদুকর, সুরের মহাসাধক, তিনিই আবার ছন্দের মাধ্যমে সুরের বৈচিত্র্য সাধনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ ক'রে বাণীর চিত্রসাধনায় আত্মমগ্ন হলেন এর যথার্থ কারণ কি? সুরের সাধনা তো তাঁর সহজাত প্রবণতা, তাঁর সৃষ্ট অজস্র সঙ্গীত (দুই হাজারেরও বেশী) এবং বিভিন্ন কাব্যের বাণীসুষমার বিচিত্র ঝঙ্কার তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তথাপি সেই কবি সুরের মায়াকে ত্যাগ করলেন কি ভাবে?

রবীন্দ্রমানসের বিপুল পরিধি এবং তার ব্যাপকতা ও গভীরতার সন্ধান করলেই আমরা এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাই। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' বা 'গীতাঞ্জলি'র যুগে আমরা যে কবিকে পাই—তিনি কতকটা আত্মগত ও আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু

১। Byron—'English birds and Scotch Reviewers'

২। শ্রীসুনীল গুপ্ত—"রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গ—গদ্যকবিতা।" [সং—৭ই ভাদ্র, ১৮৮৮ শকাব্দ] পৃঃ ৯৬ ;

'বলাকা'র যুগ থেকেই পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক কর্মচঞ্চল জীবনবাদ এবং আধুনিক-সাহিত্যের নূতন ব্যাখ্যার সঙ্গে কবি গভীরভাবে যোগযুক্ত হন। তাঁর মনের অফুরন্ত গ্রহণক্ষমতা বলে তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আপন চিন্তা এবং চেতনাকেও মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। কাজেই 'বলাকা'র যুগ থেকে কবির কাব্যে কয়েকটি নূতন প্রবণতা দেখা দিল। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের এই দাবী—ছন্দকে বর্জন করে কাব্যের মধ্যে গদ্যের সহজ সুষমাকে আনার চেষ্টাকে, তিনিও ধীরে ধীরে ফলবতী করে তুলতে চাইলেন।

এছাড়া আরও একটি কারণ স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসে। কবি শেষজীবনের দিকে চিত্রশিল্পের সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন; প্রায় তিন হাজারের মত চিত্র তিনি আঁকেন। এই নূতন শিল্পসাধনার কালে তাঁর মনে সহজভাবেই এই চিত্রকে একটি বাণীরূপ দেবার ইচ্ছা জাগে। বৈচিত্র্যপিয়াসী মনের এই নূতন পরিকল্পনা আমাদের কাছে একটি আশ্চর্য ঘটনা হলেও অতি স্বাভাবিক সত্য। ছন্দের মাধ্যমে বাণীরূপের যে চিত্র কবি আঁকেন, তার আবেদন তো প্রধানতঃ মনের কাছে নয়, কানের কাছে। সুরের ধ্বনিমাধুর্য ধরা পড়ে কানে, চিত্র সেখানে মুখ্য নয়। কিন্তু ভাষার বাণীরূপ যদি চিত্রকেই প্রধান করে তুলতে চায়, তবে তো অনিবার্য কারণেই ছন্দ দূরে সরে যায় এবং দেখা দেয় গদ্যভঙ্গিমা। তাই শেষজীবনের এই চিত্রশিল্পের সাধনা স্বাভাবিকভাবেই এই নূতন আঙ্গিককে সহায়তা করলো, একথা বোধহয় গভীরভাবে তাঁর মানস বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে।

'গদ্যছন্দ'কে কাব্যের ক্ষেত্রে মূল্যদানের কারণ

উপরিলিখিত প্রেরণাগুলি 'গদ্যছন্দ'কে বা 'ভাবচ্ছন্দ'কে রূপদানের সূত্র হিসেবে কবিমনে যেমন কাজ করে গেছে—তেমনি এই ছন্দকে কাব্যের ক্ষেত্রে মূল্য দেবার কারণ হিসেবেও কয়েকটি যুক্তি কবি দেখিয়েছেন।

১. কবির প্রথম যুক্তি—গদ্যের ক্ষেত্রে কাব্যকে নামিয়ে আনতে পারলে দেখা যাবে এর অধিকার বেড়ে গেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও সাধারণতঃ গদ্য-পদ্যের একটা ভেদ মেনে চলতে হোত। কিন্তু কবি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে সাধারণ বস্তু পর্যন্ত সকলেই এর মধ্যে ঠাঁই করে নিতে পারে। এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব অভিমত—

"প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটা স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে তুচ্ছতা পড়ে

ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি 'গদ্যছন্দের'র মধ্যে আছে।"[১]

২. দ্বিতীয়তঃ, কবির মতে—"কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"[২] ..."কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক।"[৩] সুতরাং যে রচনা বচনাতীতের স্বাদ বয়ে আনবে, মনের মধ্যে অনির্বচনীয় সুরের স্পন্দন জাগাতে পারবে—তা গদ্য বা পদ্য যে রূপেই আসুক না কেন তাকে কাব্য বলে স্বীকার করে নেওয়ায় দ্বিধা করা উচিত নয়।

৩. তৃতীয়তঃ, 'ভাব' এর মধ্যে সহজে মুক্তি পায়। কারণ, পদ্যের বাঁধাধরা ছন্দের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে নিয়ম বাঁচিয়ে চলতে চলতে ভাব সহজে পা ফেলে চলবার অবকাশ পায় না।

'গদ্যছন্দে'র রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য

'গদ্যছন্দ'কে কাব্যে মূল্য দেবার এই সমস্ত কারণের মধ্যেই 'গদ্যছন্দে'র বা 'ভাবচ্ছন্দে'র মূল স্বরূপটি লুকিয়ে আছে। 'গদ্যছন্দ' কথাটিই তো আপাতবিরোধী। যা গদ্য—তাতে আবার ছন্দ থাকে কিভাবে? এই 'ছন্দে'র বৈশিষ্ট্য কি? 'পদ্যছন্দ' অপেক্ষা 'গদ্যছন্দে'র তফাত কোথায়? তবে কি যে কোনো বিষয়কে আশ্রয় করে ক' লাইন রচনাই কাব্যপদবাচ্য হবে এবং লেখক মাত্রেই কবি হবেন?

কবি নিজেই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নানা আলোচনার মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করেছেন। কবির মতে—গদ্যকবিতার 'ছন্দ' আছে, তবে তা সুপ্রত্যক্ষ নয়। এর ভাবের মধ্যেই এর পরিমিতিবোধ সংগুপ্ত। যথার্থ রসিকের নিকট সেটা সুপ্রত্যক্ষ। এর পঙ্‌ক্তি-বিভাগ হয় ভাব অনুসারে—তাই এর নাম 'ভাবচ্ছন্দ'। বাচনভঙ্গি, শব্দ, ভাব, চিত্র—সবকিছুই গদ্যের অনুরূপ হওয়ায় 'গদ্যছন্দ' নাম দেওয়া হয়েছে, এর ছন্দকে হাতে তুলে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের স্বরূপ" ['রবীন্দ্র-রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সং] পৃঃ ৫২৩
'কাব্যে গদ্যরীতি'—

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের স্বরূপ" ['রবীন্দ্র-রচনাবলী', প্রবন্ধ—'কাব্য ও ছন্দ'
জন্মশতবার্ষিক সং পৃঃ ৫২৪ ১৪শ খণ্ড]

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের স্বরূপ" ['রবীন্দ্র-রচনাবলী', প্রবন্ধ—'কাব্য ও ছন্দ'
জন্মশতবার্ষিকী সং পৃঃ ৫২৫ ১৪শ খণ্ড]

দেখানো যাবে না বটে—কিন্তু এর মধ্যে ছন্দ নেই মনে করলে ভুল করা হবে। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'নাটক' কবিতায় কবি তাই বলেছেন—

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।

কাজেই এই ছন্দকে আয়ত্ত করা সহজ নয়; কারণ—

অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে। ['নাটক'—পুনশ্চ]

উঁচুদরের শিল্পবোধ না থাকলে এই ছন্দকে যে আয়ত্ত করা যাবে না—একে অধিকার করতে হলে যে 'রাজপ্রতাপ' চাই, সে সম্পর্কে কবি সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন। 'গদ্য' লেখা সহজ বলেই 'গদ্যছন্দ' লেখা সহজ নয়।

'পদ্যছন্দে'র সঙ্গে 'গদ্যছন্দে'র মূল প্রভেদটা তাহলে কোথায়? 'পদ্যছন্দে' প্রতিটি চরণ একটি বিশেষ কাঠামোকে মেনে চলে। চরণের শেষে মিলকে রক্ষা করে প্রতিটি স্তবকে বিশেষ কোনো বন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পৌনঃপুনিক উচ্চারণে বিশেষ তাল-মান-ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু 'গদ্যছন্দে' বা 'ভাবচ্ছন্দে' পঙক্তিবিভাগ হয় ভাব অনুসারে। 'ছেদ' এবং 'যতি'কে স্বতন্ত্র করে দেখা হয়। 'অর্থপর্ব' 'ধ্বনিপর্বে'র অনুসরণ করে না। ভাবের এই স্বাধীনতাই মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগকে মুক্তি দিল। তাই এই ছন্দের মধ্যে 'পর্ব' বা 'চরণ' কোনো নির্দিষ্ট 'ছক'কে প্রতিটি পর্বে বা চরণে মানতে বাধ্য নয়। অথচ 'ভাব' একটি অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করে চলে। এ-কারণে এই ছন্দের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাবচ্ছন্দ'। কবি তাঁর নিজস্ব ভাষায় এই ছন্দোবৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

…"গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মেরপথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।"[১]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের স্বরূপ" [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং প্রবন্ধ—'কাব্য ও ছন্দ'—[পৃঃ ৫২৫-৫২৬]

অথচ গদ্যকবিতায় ভাবপর্বের মাত্রা-সংখ্যা ও চরণের পর্বসংখ্যার মধ্যে সমতা না থাকলেও পুরোপুরি যে অসমতা নেই, অর্থাৎ এর মধ্যে পদ্যছন্দের আভাসও যে বর্তমান—সে কথারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।—"সেইজন্যেই যতই সামান্য হোক এর মধ্যে বাক্য-সংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা তেবৃছা চাহনি রাখতে হয়েছে।"[১]

ছন্দোমুক্তির সাধনা—দীর্ঘজীবনের ছন্দোসাধনার ক্রমপরিণত রূপ

গদ্যছন্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবি শেষ জীবনে আলোচনা করলেও, কাব্যসাধনার প্রথম থেকেই তিনি যে বাঁধা ছন্দের নিয়মকে কাটিয়ে কাব্যকে সহজ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সচেতনভাবে—তা তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আধুনিক যুগের দাবীকে তিনি ততটুকুই স্বীকার করেছেন, যেখানে সাহিত্যের মূল সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হয় নি। যুগের দাবীতে রুচির কোনো রকম বিকৃতিকে স্বীকৃতি দিতে তিনি নারাজ। সুতরাং যুগের দাবীতে তিনি গদ্যছন্দকে সাহিত্যে পূর্ণ মূল্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন এটা একমাত্র সত্য কারণ নয়। এ সম্পর্কে কবির অভিমত—

> "তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য যাকে আমরা আধুনিক বলছি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি, তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে—তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হোতে পারে, সনাতনীও হোতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।…যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম!
>
> তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিব্যক্তি নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতঃই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলকলাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদল করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"[২]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— —"ছন্দ" [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং]
"গদ্যছন্দ—৫ [পৃঃ ২৭৭]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র"—[১১শ খণ্ড—প্রকাশ: বিশ্বভারতী ১৯৭৪]
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পৃঃ ২৩৮-২৩৯
পত্র সং—১০৭, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

অথচ সাহিত্যের স্থায়ী সত্যকে বজায় রেখে তার রূপবদল বা রীতিবদলকে আর্টের দিক থেকে গ্রহণ করতে তাঁর কোনো আপত্তি তো নেই-ই, পরন্তু তাঁর প্রাথমিক কাব্যচর্চার মধ্যেও সেই সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। "রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক ভুল-ভ্রান্তিই শেষ পর্যন্ত মর্যাদাবান; এবং তাঁর স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রত্যেকটি পরীক্ষাপ্রসূত, প্রত্যেকের পিছনে প্রাতিস্বিক উপলব্ধির অনিবার্য তাগিদ নিহিত আছে।"[১] ভাব ভাষার ক্ষেত্রে তিনি যেমন একটা পরিচ্ছন্ন সংযমবোধের সাধনা করেছেন, ছন্দোমুক্তির দিকেও বিভিন্ন রূপাঙ্গিকের পরীক্ষায় তাঁর চেষ্টাকে নিয়োজিত রেখেছেন। সুতরাং গদ্যছন্দকে এইভাবে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে নূতন কালের দাবীকে মেটানো বা 'গীতাঞ্জলি'কে ইংরাজিতে অনুবাদের উপলক্ষই মুখ্য কারণ কিছু নয়—এ সিদ্ধির পিছনে দীর্ঘকালীন অধ্যবসায়ের ইতিহাস সংগুপ্ত।

ছন্দ সম্পর্কে কবি যে কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই সচেতন এবং বৈচিত্র্যপিয়াসী কবিমন নূতন নূতন বাঁকে তাঁর কাব্যতরণীকে ভিড়িয়ে যে আনন্দ পেয়েছেন, তা তাঁর একখানি চিঠি থেকেই জানতে পারা যায়—

> "আমার বয়স যখন আঠারো তখন আমি প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে সুরু করেছিলুম। আমার সেই ছন্দের কাব্যকে তৎকালীন সাহিত্যের প্রবীন মুরুব্বিরা "কাব্যি" বলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছিলেন।
>
> ···সাহিত্যে আজও আমার কাব্যতরণী চালাবার জন্য আমারই মনের উনপঞ্চাশ বায়ুর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়, তার কোনো দমকা এসে আমার রচনাকে প্রচলিত ধারার বাইরে নতুন বাঁকে যদি নিয়ে যায় তো জানি তোমরা পাড়িতে দাঁড়িয়ে হয়তো কর্ণধারকে গাল পাড়বে। কিন্তু এ রকম গাল অনেক খেয়েছি, ভালো লাগেনি,—কিন্তু বাঁক বদল করি নি—আজও অন্য পন্থা আমার নেই—তাতে বকশিশ পাই আর না পাই।"[২]

দেখা যাচ্ছে, কবি অতি অল্প বয়স থেকেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং নিজের বিশ্বাসে আস্থাবান। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র রচনায় পয়ারের অসমপঙ্‌ক্তিক পদ্যবন্ধ

১। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—"কুলায় ও কালপুরুষ" [প্রকাশ: আষাঢ়, ১৩৬৪]
প্রবন্ধ—'রবিশস্য'—পৃঃ ১৪

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" [৯ম খণ্ড: শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত
পত্র সং—১০১, ২১শে অক্টোবর ১৯৩২: পৃঃ ১৭৬-১৭৭, ১৭৮]

লয়ের মধ্যে গদ্যানুস্মৃতির প্রভাবকে লক্ষ্য করা যায়। ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র রচনাকাল ১২৮৯ সাল। কবির বয়স তখন একুশ বছর। অধিকাংশ রচনাই দুই বছরের মধ্যে লেখা। কবির বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বছর। এই যুগের কবিতাকেই মনে হয় মুরুব্বিরা “কাব্যি” বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র ‘সন্ধ্যা’ কবিতায়—

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশ তলে | বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া |
মৃদু মৃদু ও কী কথা | কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে |
নিখিলের মুখ পানে চেয়ে |

এই অসমপঙ্‌ক্তিক পদ্যবদ্ধ রচনার মধ্যে গদ্যের ভাবীকালীন রূপটি গোপনে লুকিয়ে ছিল। ‘প্রভাতসংগীতে’রও (১২৯০ সাল) ‘অনন্তজীবন’ কবিতায়—

নাই তোর | নাই রে ভাবনা,
এ জগতে | কিছুই মরে না |
নদীস্রোতে | কোটি কোটি | মৃত্তিকার কণা
ভেসে আসে, | সাগরে মিশায়
জান না | কোথায় তারা যায় !

এখানেও ঐ একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। ‘প্রভাতসংগীতে’ তিনমাত্রার ছন্দ দেখা দিলেও, যুক্তাক্ষর তখনই দু'মাত্রার মূল্য পায় নি।

পরবর্তী কাব্য ‘ছবি ও গান’ ছন্দের দিকে অনেক অগ্রসর। ‘চল্‌তি ভাষা’ যে আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এ কাব্যের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে এবং কবির ‘ভাষায় ও ছন্দে’ যে একটা ‘মেলামেশা’ আরম্ভ হয়েছে, তা কবি এ কাব্যের ‘গ্রন্থপরিচয়ে’ বলেছেন—

“ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোন কোন গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সকল পাঠকের কান আছে তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন—বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর ; হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।”

‘ছবি ও গানে’র ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একখানি চিঠিতেও কবি বলেছেন—

“ছবি ও গানে তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেচ—ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে

গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়, আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী—বালক বয়সেও স্পর্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবিলীলা সুরু করেছি—বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করিনে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে।…আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই বলে মনে কোরো না ইটের পাজা পোড়েনি, মিস্ত্রির মজুরির অভাব।"[১]

ছবি ও গানের 'গ্রন্থপরিচয়' ছাড়া 'ভূমিকা'য়ও কবি বলেছেন— …"চল্‌তি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল"।

এই সমস্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যায় কবি তাঁর রচনার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি যে 'বিদ্রোহী' এবং পয়ারকে ভেঙে নিজের ইচ্ছামত ছন্দে কাব্য লিখতে সুরু করেছিলেন—তা নিজেই স্বীকার করেছেন। পরবর্তী কালের গদ্যছন্দের সাফল্য যে এই সমস্ত চেষ্টারই সার্থক এবং পরিণত রূপ—সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকে না। ছবি ও গানের 'একাকিনী' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

একটি মেয়ে | একেলা
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে | চলেছে
চারি দিকে | সোনার ধান | ফলেছে।

অথবা, 'বিদায়' (ছবি ও গান) কবিতার—

সে যখন | বিদায় নিয়ে | গেল,
(তখন) নবমীর চাঁদ | অস্তাচলে | যায়
গভীর রাতি | নিঝুম চারি | দিক ;
আকাশেতে | তারা অনি | মিখ,
ধরণী | নীরবে ঘু | মায়।

এইসব 'তিন' এবং 'চার' মাত্রার ছন্দে লৌকিক ছন্দের তীর্যক বাচনভঙ্গিটি লুকিয়ে আছে। তাছাড়া ভাষার দিক থেকেও 'চলেছে', 'ফলেছে', 'নিয়ে গেল' প্রভৃতি কথ্য ভাষা গদ্যপ্রাণতার পরিচয় বহন করছে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" [৯ম খণ্ড] শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র সং—৫৯, দার্জিলিং, ১৫ নভেম্বর ১৯৩১ [পৃঃ ১২১—১২২]

কিন্তু 'ছবি ও গানে' ছন্দ সম্পর্কে কবি সচেতন হলেও ভাষার জাদুটি তখনও তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। গতানুগতিকতাকে তখনও তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভাবের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দের সার্থক মিলন ঘটাতে তাঁকে 'মানসী' কাব্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'মানসী'র 'সূচনা'য়—

> "আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[১]

ছন্দের ক্ষেত্রে 'মানসী' ও 'সোনার তরী'তে বিজোড় মাত্রার বিচিত্র ব্যবহার। কবি এখানে ছন্দের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' (১২৯৭) কবিতায় মুক্তক বন্ধের প্রথম সূত্রপাত—

বৃথা এ ক্রন্দন |
বৃথা এ অনল-ভরা | দুরন্ত কামনা |
রবি অস্ত যায় |
অরণ্যেতে অন্ধকার | আকাশেতে আলো |
সন্ধ্যা-নত-আঁখি |
ধীরে আসে | দিবার পশ্চাতে |
বহে কি না বহে
বিদায় বিষাদ শ্রান্ত | সন্ধ্যার বাতাস |

ভাব অনুসারে এখানে ছেদের ব্যবহার হয়েছে। নির্দিষ্ট মাত্রার, নির্দিষ্ট পর্বের বা চরণের পরে ছেদ-যতি বসেনি। ভাব অনুসারে তা চরণ থেকে চরণান্তরে এগিয়ে গেছে। চরণশেষে অন্তমিলের ব্যবহারও হয়নি। গদ্য-কবিতার বাচনভঙ্গিটিকে এ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ভাবীকালীন গদ্য-কবিতার প্রথম পদক্ষেপ এখানেই লক্ষ্য-গোচর হয়।

'নিষ্ফল কামনা'য় (মানসী) যে মুক্তক বন্ধের সুরু, তার ব্যাপক প্রয়োগ 'বলাকা'য় (১৯১৬ খ্রীঃ) ও 'পলাতকা'য় (১৯১৮ খ্রীঃ)।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে এ অনেকটা অগ্রসর। পয়ারের পূর্ববর্তী আদর্শ থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কত স্বতন্ত্র। প্রতি চরণে ১৪ মাত্রার বন্ধন ব্যতীত আর কোনো

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী—[জন্মশতবার্ষিক সং—১ম খণ্ড কবিতা]
'মানসী'—সূচনা—পৃঃ ২১৬

বাঁধা নিয়মকেই এ ছন্দ স্বীকার করেনি। ভাব অনুসারে 'ছেদ' ও 'যতি' চরণ থেকে চরণান্তরে এগিয়ে গেছে। চরণের শেষে অন্তমিলকেও মাইকেল উঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থ-যতি ('ছেদ'), ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতিকে অনুসরণ করেনি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাবের এই মুক্তি 'বলাকা' কাব্যে আরও সুষ্ঠু পরিণত রূপ নিয়ে আবির্ভূত। 'বলাকা'য় সাধু ও চলিত বাংলার মুক্তক। ছেদ ও যতির নির্দিষ্ট কোনো বন্ধনকে স্বীকার না করে, এমনকি পর্বে বা চরণে মাত্রাসংখ্যার বিশেষ কোনো 'ছক'কে না মেনে এ ছন্দ ভাবকে একেবারে সহজ সাবলীল ছন্দে মুক্তি দিল। কিন্তু কাব্যের একটি বিশেষ নিয়মকে কবি এখানে মেনেছেন—তা হোল চরণান্তিক মিল। 'বলাকা'য় চরণগুলিকে বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে ভেঙে কবি সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে মিল রক্ষিত। এতে কাব্যের প্রবহমানতা কমে যায়নি—ধ্বনিমাধুর্য বেড়েছে।—

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে |
তব কুঞ্জবনে | *
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী |
যেইক্ষণে দেয় ভরি |
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল | *
বিদায় গোধূলি আসে | ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল | ***

['সাজাহান'—বলাকা]

অথবা—

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি | সে মুহূর্তে | কিছু তব নাই, |
তুমি তাই |
পবিত্র সদাই | **
তোমার চরণস্পর্শে | বিশ্বধূলি*
মলিনতা যায় ভুলি |
পলকে পলকে | *
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে | ঝলকে ঝলকে | **

['চঞ্চলা'—বলাকা]

"বিভিন্ন মাপের পংক্তিতে নেচে উঠে, পর্বকে ইচ্ছানুরূপ গড়ে তুলে ভাবের সঞ্চরমানতায় এই যে স্বাধীনতা, পরবর্তী গদ্যছন্দের এই হল প্রস্তুতিপর্ব।"[১] এখানে পঙ্‌ক্তিগুলিকে

১। শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' পর্ব"—[প্রঃ ১৮ই ভাদ্র—১৩৭৩]
প্রথম অধ্যায়—'ভাবছন্দ'—পৃঃ ৭

ভাবের অনুসারী করে সাজানো হয়েছে—এর জন্য একটা গতি বা প্রবহমানতা এসেছে। কিন্তু ছন্দের বিশেষ কোনো কাঠামোকে না মেনে কবি কাব্যের ক্ষতিকে যেন পূরণ করতে চেয়েছেন যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি ও প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষে অন্তমিলের সমাবেশে। প্রতি চরণে মাত্রাসমতাকে রক্ষা না ক'রে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে এ ছন্দ বন্ধনমুক্তির পথে কাব্যকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। 'বলাকা'-ছন্দের এই অন্তমিলের মাধুর্য এবং ভাবের প্রবহমানতা এমন এক গতিপ্রাণতার সৃষ্টি করেছে যে এ ছন্দের তুলনা বিরল। কাব্য মানুষকে যে কত উঁচুদরের ভাবকল্পনার মধ্যে লীন করে দিতে পারে এ তারই চরম নিদর্শন।

কিন্তু কোনোরকম সিদ্ধির মধ্যেই কবি স্থিতিলাভ করতে পারেন নি, বা চাননি, তাই তো পরবর্তী কালের বিচিত্র কাব্যসম্ভারকে আমরা পেলাম।

কিন্তু বলাকার সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ এবং ভাবের ঊর্ধ্বগামিতা কাব্যকে কল্পলোকের সামগ্রী করে তুলেছে ; কবির সাধনা তো ছন্দ ও ভাবকে সহজ চলনের চালে ব্যবহার করা যায় কি না ; পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজির মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না! এ নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন কবি। তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তারপর আর একবার অবনীন্দ্রনাথকেও অনুরোধ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', 'ক্ষীরের পুতুল' 'ভূতপত্‌রীর দেশ' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে লৌকিক ছন্দ যেন পুনর্জন্ম পেল। তাঁর 'পাহাড়িয়া' নামক চারটি গদ্য-কবিতা 'বিচিত্রা' (১৩৩৪ শ্রাবণ—কার্তিক) পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু কবির মত এই যে, "তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি" ('পুনশ্চ' কাব্যের 'ভূমিকা')।

কবি নিজেই তাই এ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন 'পুনশ্চে'র যুগে। কিন্তু 'বলাকা'র পর 'পুনশ্চে' আসার পথেও তাঁর বিভিন্ন প্রচেষ্টার ইতিহাস লুকিয়ে আছে কাব্যসাধনার যাত্রাপথে। 'পলাতকা'র (১৯১৮ খ্রীঃ) চলতি বাংলার মুক্তক ছন্দ থেকেই গদ্যছন্দের উদ্ভব বলে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায়। বিষয়বস্তুও এখানে ঊর্ধ্বলোকের ভাব-কল্পনা নয়—নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চলন তার চালচলনে। অর্থাৎ কবি আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন সহজ স্বচ্ছন্দতার দিকে—

কানাই বলাই।
কালেজেতে | পড়ছে দুটি | ভাই।

এমন সময় | গোপনে এক | রাতে
অপূর্ব তার | মায়ের বাক্স | ভাঙল আপন | হাতে,
করল চুরি | পান্নামোতির | হার ;
থিয়েটারের | সখ চেপেছে | তার।

['মায়ের সম্মান'—পলাতকা]

'বলাকা'র মত পঙ্‌ক্তি-শেষে অন্তমিলটি রক্ষিত। মোটামুটি স্বরবৃত্তের মুক্তক ঢঙ্‌টি বজায় রেখেছেন। কিন্তু চলিত ভাষা ও তার ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, কথ্য বাচনভঙ্গিতে, সর্বোপরি বিষয়বস্তুর বাস্তব জীবনধর্মিতায় এ একেবারে আমাদের ঘরোয়া জিনিস হয়ে উঠেছে। অন্তমিল এবং পর্বের সমমাত্রিকতাকে উঠিয়ে দিলে এ একেবারে 'পুনশ্চে'র যে কোনো কবিতার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। মুক্তক বন্ধের পর্বগঠনে যে মাত্রা-পরিমাপ ছিল—সেটা ছিন্ন হওয়াতেই মাত্রা-পরিমাপহীন বিশুদ্ধ 'বাক্‌ছন্দ' বা 'গদ্যকবিতার ছন্দে'র জন্ম হোল। রচয়িতার ভাবের অনুবর্তী হওয়ায় নাম হোল 'ভাবচ্ছন্দ'।

সেই রচনাকেই 'গদ্যকবিতা' বলা চলতে পারে যার মধ্যে কাব্যের রসের কথাটা আছে। 'ছন্দ' বাইরের একটা উপাদান মাত্র, তার বিশেষ নিয়ম-কানুনগুলো খানিকটা বন্ধনও বটে। তাই এই ছন্দোমুক্তির পথেই গদ্যকবিতার জন্ম হোল। দু'ভাবে এর জন্ম হতে পারে—(১) গদ্যের পদ্যাভিমুখিতায় অর্থাৎ গদ্যের মধ্যে পদ্যের ভাব ও প্রবণতা, ভাষা, অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্দন বা সুরসঙ্গতি প্রবেশ করিয়ে ; এবং (২) পদ্যের মধ্যে গদ্যের ভাষা, বাচনভঙ্গি এনে, ও ছেদ, যতি, মাত্রার বাঁধাধরা নিয়মকে অস্বীকার করে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রূপায়ণের প্রচেষ্টাকে যদি ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যে, প্রথম-যুগের থেকেই পদ্যের বাঁধাধরা নিয়মকে একটু একটু করে উঠিয়ে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত 'পুনশ্চে'র গদ্যকবিতার জন্ম হোল। এ প্রচেষ্টাকে বলা যায়—'পদ্যের গদ্যাভিমুখিতা'।

কিন্তু 'লিপিকা'র মধ্যে কবি গদ্যের আধারে পদ্যের যে রূপ প্রচলন করলেন—তাকেও তো পঙক্তিবিভাগ করে সাজালে গদ্যকবিতাই দাঁড়ায়। 'শেষের কবিতা'রও কোনো কোনো অংশে গদ্যের বাচনভঙ্গির মধ্যে পদ্যের সুষমা এসে লেগেছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টাকে 'গদ্যের পদ্যাভিমুখিতা' বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তকে'র কোনো কোনো রচনাকে যে শ্রেণীর গদ্যককবিতা বলা যায়—এও সেই শ্রেণীর রচনা।

সর্ববন্ধনহীন 'ভাবচ্ছন্দে'র প্রথম প্রকাশ 'লিপিকা'র (১৯২২ খ্রীঃ) কয়েকটি লেখায়। লিপিকার রচনাগুলি ১৩২৪ সালের (১৯১৮ খ্রীঃ) মাঘ মাস থেকে ১৩২৯ (১৯২২ খ্রীঃ) সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। লিপিকাতেই যে কবি

সচেতন ভাবে কোনো কোনো জায়গায় গদ্যকবিতাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 'পুনশ্চ' কাব্যের 'ভূমিকা'য়।

লিপিকার 'প্রশ্ন', 'একটি দিন,' 'পায়ে চলার পথ'—প্রভৃতি রচনাকে গদ্যকবিতা বলে স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। 'পায়ে চলার পথ'-এ দেখা যায়—

> এই তো পায়ে চলার পথ। এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ওপারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে ; ······

একে গদ্যকবিতা হিসেবে পঙক্তিবিভাগ করে সাজালে দাঁড়ায়—

এই তো পায়ে চলার পথ।
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,
মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,
খেয়াঘাটের পাশে
বটগাছতলায়।
তার পরে,
ওপারের ভাঙা ঘাট থেকে
বেঁকে চলে গেছে
গ্রামের মধ্যে ;

এমনি ক'রে 'লিপিকা'র অধিকাংশ রচনাকেই ভাব অনুসারে পঙ্‌ক্তি বিভাগ করে সাজিয়ে দেখানো যেতে পারে যে গদ্যকবিতার ভঙ্গি, সুর, ভাষা, মাধুর্য এই রচনার মধ্যে কেমনতরো কৌশলে বিন্যস্ত।

'লিপিকা' থেকে 'পুনশ্চে' আসার পথে মাঝখানে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গদ্যকবিতার একটি আদি খসড়া লক্ষণীয়। "মিলিয়ে পড়তে গেলে দেখা যাবে 'শেষের কবিতা'র অনেক অংশেরই চেনা প্রতিধ্বনি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা হয়ে ফিরে এসেছে। ভঙ্গি একই। শুধু পাঠের রীতিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য 'পুনশ্চ' গ্রন্থে পংক্তিগুলোকে সিঁড়ি ভেঙে সাজানো হয়েছে মাত্র।"[১] রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে যে আটপৌরে ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, তার শক্তি ও ঔজ্জ্বল্যের এক চরম নিদর্শন রয়ে গেছে এই 'শেষের কবিতা' গ্রন্থে। 'আধুনিক কবি' এবং 'আধুনিক কাব্য' সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব এখানে গোপন থাকেনি।

১। "কবিতা"—পৌষ ১৩৬৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা—২
প্রবন্ধ—'আধুনিক কবি অমিত রায়'—শ্রীনরেশ গুহ। পৃঃ ১৩৪

'লিপিকা'র ঐ প্রচেষ্টারই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ 'পুনশ্চ'। পূর্ববর্তী কাব্য "পরিশেষের মধ্যে গদ্যছন্দে কবিতা শুরু হয়, তারই ধারা চলে 'পুনশ্চ'-এ। গদ্যছন্দের প্রথম রচনা 'শিশুতীর্থ' (১৩৩৮, পৌষ)। তার পরে লেখা 'শাপমোচন'কেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রচনার সহিত 'পরিশেষ' 'পুনশ্চ'র গদ্যছন্দে রচিত কবিতার পার্থক্য যথেষ্ট; প্রথম দুইটি নাটকধর্মী। এবারকার কবিতাগুলি কিছু লিরিকধর্মী, তবে বেশির ভাগ চিত্র বা গল্পধর্মী—যাহার আদিরূপ প্রকাশ পায় 'লিপিকা' 'ভীরুতা'য়"।[১]

কিন্তু 'পুনশ্চ' কাব্যের সব কবিতাও গদ্যছন্দে লেখা নয়। এ সম্পর্কে কবির যে নিজস্ব মন্তব্য রয়েছে তাও স্মরণীয়।

> ..."অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে; কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। 'কোমল গান্ধার', শালিখ', 'অস্থানে', 'ঘরছাড়া', 'ছুটি', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন'—এই সাতটি কবিতায় মিল নেই, চলতি বাংলার ছন্দ আছে। 'মৃত্যু' কবিতায় আছে সাধু বাংলার ছন্দ; 'খেলনার মুক্তি' প্রভৃতি যে ছয়টি কবিতা 'পরিশেষ' থেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়েছে সেগুলিতেও তাই; এই সাতটি কবিতায় সাধু ছন্দ ব্যবহৃত হলেও সাধু ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়নি—সাধু ছন্দে হসন্ত মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এছাড়া এই কাব্যের অনেক কবিতাই অল্পবিস্তর ছন্দঘেঁষা, আগাগোড়া ছন্দ রক্ষিত না হলেও নানা স্থানেই কিছু কিছু ছন্দ এসে পড়েছে"।[২]

সুতরাং 'পুনশ্চ' কাব্যে গদ্যছন্দের প্রথম প্রচেষ্টা ফলবতী হয়ে উঠলেও ঐ কাব্যের সমস্ত কবিতা যে সেই ছাঁদের মধ্যে তখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি তা কবির উপর্যুক্ত মন্তব্যই প্রমাণ করে। এ প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্য পরবর্তী তিনখানি গদ্যকবিতাগ্রন্থের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল।

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রজীবনী"—৩য় খণ্ড [২য় সং—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮]। পৃঃ ৪৪০

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ছন্দ"—[প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত : রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ'—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পত্র ২, পৃঃ ২৬৪

গদ্যছন্দ সম্পর্কে নানামুখী সমালোচনা—

গদ্যছন্দকে মূল্যদান সম্পর্কে কবি যত যুক্তিই দেখান না কেন, বিভিন্ন সমালোচকের মনে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। কারও কারও মতে—রবীন্দ্রনাথের এই 'গদ্যছন্দ' তাঁর 'পদ্যছন্দ' বা 'শ্রুতিছন্দে'র পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। "ভাব-অর্থ-নিরপেক্ষ চিত্রকলার রেখা-লেখ বিলাসের মত, অতিশয় তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুকে জীর্ণ ভাব ও জরাগ্রস্ত কল্পনাকে কেবল ভঙ্গিমার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা কবি-কর্ম নহে। এ সকল রচনায় যে 'রিদ্‌ম' আছে, তাহার কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই; টানা সহজ গদ্যে সেটুকু অনায়াসে চলিতে পারে, তার জন্য নূতন পঙ্‌ক্তি প্রথার প্রয়োজন নাই।[১]"

আবার বাংলাসাহিত্যের অন্য একজন বিশিষ্ট সমালোচকেরও এ সম্পর্কে মন্তব্য—

> "গদ্যকবিতাতেও গদ্যোচিত তথ্যপ্রধান মনোভাব লেখককে অতি পল্লবিত মুখরতা ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে।"[২]

এইভাবে গদ্যছন্দের অধিকার এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠক এবং সমালোচকের মনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই নূতন ভঙ্গিমা সম্পর্কে এইরকম নানা মত উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে।

সম্পূর্ণ বিপরীত মতও আবার লক্ষ্য করা যায়—

> "এই সকল কাব্যগ্রন্থে এমন অনেক কবিতা আছে যাহা অন্য ঋতুতে লিখিত যে কোন কবিতার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। অথচ ইহাদের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী কবিতার সুর হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন"।[৩]

এইরূপ বিভিন্নধর্মী মতবাদের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়—মতবাদ জিনিসটিই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের মতবাদ পুষ্ট। সুতরাং এ সমস্তের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়।

১। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার—'সাহিত্যবিতান" [৩য় সং-ভাদ্র, ১৩৬৮ : প্রবন্ধ-'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা'-পৃঃ ৬২]

২। শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়—"বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা" [সং-বৈশাখ, ১৩৬৪ : প্রবন্ধ-'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা'-পৃঃ ২৫১]

৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—"রবীন্দ্রনাথ" [৪র্থ সং : ॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রকাব্যে শেষপর্যায়—১' পৃঃ ১৪৭]

গদ্যকবিতা সম্পর্কে কবির বিভিন্ন মতবাদকেও অনেকে কবিজনোচিত উচ্ছ্বাসবাহুল্য বলে মনে করেছেন। কাব্যের অধিকারকে বাড়াবার জন্যে যে কবি গদ্যছন্দকে আসন ছেড়ে দিলেন, কবির এই মতবাদেরও অনেক সমালোচনা হয়েছে। মনে হয় কবির দু'একটি কবিতার আলোচনার মাধ্যমে কবির উচ্ছ্বাসকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করলে কবির মহৎ উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তে পারে।

গদ্যছন্দে'র স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবিমনেও সংশয়

কবি তাঁর কবিজনোচিত সপ্রসংশ দৃষ্টিতে 'গদ্যছন্দে'র নানা ভাবে জয়ঘোষণা করলেও এ সম্পর্কে পাঠকমনে যে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে—সে সম্পর্কে সদা সচেতন ছিলেন। আর বোধ করি, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেও দ্বিধা কম ছিল না। বাস্তবিক 'গদ্যছন্দ' বা 'গদ্যকবিতা' 'পদ্যছন্দ' বা পদ্যকবিতার মর্যাদা পাবে কি-না ; এর সিদ্ধি সম্পর্কে তিনি নিজেও যে সব সময় নিঃসংশয় হতে পারেন নি, তারও বহু প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় ছড়িয়ে আছে। কবি মংপুতে তাঁর একটা গদ্য-কবিতার উপর কলম চালাতে চালাতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন—

> "দেখ আবার ওটা নিয়ে পড়েছি। গদ্য-কবিতার বেলা ঐ হয়, ওর একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই বলে ওই বারবার ঠিক করতে হয়, কোন্ শব্দটা হচ্ছে, কোন্‌টা হচ্ছে না। এ যদি মিলের ছন্দ হোত তাহলে কি একটা নিয়ে এমন তিন দিন ধরে পড়তুম, তার একটা ছাঁচ আছে, তার মধ্যে পড়লে হু হু করে চললো, কিন্তু এ তা নয়। এ যে কি, কেন যে এটা ঠিক হচ্ছে আর ওটা হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে বলতে পারবো না যদি জিজ্ঞাসা কর। অথচ ওরও একটা ছন্দ আছে।"[১]

উক্ত কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করে তিনি আরও বলেছিলেন—

> "এই গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও মেটেনি তাই কিছুতেই মন ঠিক হয় না। বারবার লিখি আর বদলাই, উল্টেপাল্টে একটা কথা জুড়ে একটা বা ছেঁটে, ও একটা শিল্প"।[২]

এই সমস্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়—এই নূতন পরীক্ষার সিদ্ধি সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো স্থায়ী বিশ্বাস ছিল না। 'নূতন কালে'র ('পুনশ্চ') দাবীতে এ সম্পর্কে কবি একটা পরীক্ষায় নেমেছেন মাত্র।

১। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী—"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" [সং-অক্টোবর, ১৯৬৭ ॥ চতুর্থ পর্ব ॥ পৃঃ ১৭৫]
২। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী—"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" [সং-অক্টোবর ১৯৬৭ঃ পৃঃ ১৭৮ ॥ চতুর্থ পর্ব ॥ পৃঃ ১৭৫]

কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে নূতনকাল,—তার দাবী এবং গদ্য কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে কবির মনোভাব—

কয়েকটি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি নূতনকাল এবং দাবীর কথা তুলে ধরেছেন। এই 'নূতনকালে'র (পুনশ্চ) দাবীকে কবি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এর সম্পর্কে দ্বিধাও তাঁর ঘোচে নি। 'পুনশ্চে'র পূর্ববর্তী কাব্য 'পরিশেষ' থেকেই কবির এই মনোভাব সুস্পষ্ট।

তাঁর জীবনে 'শেষ রাগিণীর বীণ' ('লীলাসঙ্গিনী'—পূরবী) বেজেছে; তাই জীবন সম্পর্কে নানা দ্বিধা—নানা দ্বন্দ্ব—সব ছেড়ে যাবার অব্যক্ত বেদনা। 'নূতন কাল' (পুনশ্চ) তার নূতন দাবী নিয়ে আসে অথচ সে দাবী পূরণের সামর্থ্য কবির আর নেই। আধুনিক যুগের কাব্যকে পথ ছেড়ে দিয়ে কবি যে বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যাবেন এবং 'নূতন কাল' তার দাবী নিয়ে সে আসনে অধিষ্ঠিত হবে—তা নিয়েও কবিমনে নানা প্রশ্ন।

এই নূতন যুগের দাবীকে কবি স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছেন—তাই এই নূতনের সঙ্গে নবীন হয়ে মিলে যেতে চেয়েছেন। কবির বিশ্বাস তাঁর সে ক্ষমতা আজও আছে। সেই চিরশ্যামল কচি মনটি আজও মরেনি। তাঁর আত্মসমালোচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

> "অমিয়, তুমি জানো, চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকাচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে, পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করি নি—বোধ হচ্ছে না করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট।[১]

তাই নূতনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার দাবী তাঁর প্রাণে আজও আছে। কালের সেই দাবী অনুসারে তিনিও চেষ্টা করেন নূতন কিছু দান রেখে যেতে।—

তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।

['আগন্তুক'—পরিশেষ]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" [১১শ খণ্ড বিশ্বভারতী ১৯৭৪] পত্র সং ১০৭ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ পৃঃ ২৩৫—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা।

এইভাবে 'স্তুতি-নিন্দা-হিসাবের অপেক্ষা না রেখে' ('আগন্তুক'—পরিশেষ) কবির হাতে যা আছে সেই বড়ো দান দিয়ে যেতে চান একালের হাতে। কিন্তু নূতন শ্রোতার কাছে এ দান কতখানি মূল্য পাবে—তা নিয়েও কবিমনে সংশয়। কবি অবশ্য নূতন কালকে তার আসন ছেড়ে দিতে রাজি—

আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।

তাই 'পরিশেষ'-এ জীবনের সব পালা শেষ করে 'পুনশ্চ' দিয়ে দিনের শেষে আবার পালা শুরু করতে হোল—

তাই ফিরে আসতে হোল আর একবার। দিনের শেষে নূতন পালা আবার করেছি শুরু

তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে।

['নূতন কাল'—পুনশ্চ]

কিন্তু কবি বেশ জানেন—

দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।

['নূতন কাল'—পুনশ্চ]

তবুও আকাঙ্ক্ষা জাগে—

যেন গর্ব করে বলতে পার
আমি তোমাদেরও বটে,

['নূতন কাল'—পুনশ্চ]

তথাপি কবিমনে সন্দেহ জাগে,—হয়তো—

একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

['নূতন কাল'—পুনশ্চ]

পুনশ্চ কাব্যের 'নূতন কাল' ছাড়াও 'কোপাই' এবং 'নাটক' কবিতায় রূপকচ্ছলে কবি গদ্যছন্দের রূপ-রীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'কোপাই' (পুনশ্চ) কবিতায় কোপাই নদীর গরিমাহীন ছন্দের সঙ্গে গদ্যছন্দের তুলনা করেছেন কবি। আর 'পদ্মা'নদীর 'আভিজাতিক' ছন্দের সঙ্গে ঐতিহ্যপূর্ণ সাধুভাষার তুলনা করেছেন। পদ্মার আভিজাতিক ছন্দ সম্পর্কে কবি বলছেন—

পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়িতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।

['কোপাই'—পুনশ্চ]

কিন্তু 'কোপাই'-এর 'প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই'—['কোপাই'—পুনশ্চ]

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধু ভাষা বলে না।

['কোপাই'—পুনশ্চ]

কবি এইভাবে প্রাচীন গরিমাযুক্ত আভিজাতিক ছন্দের সঙ্গে আধুনিক কালের গদ্য-ছন্দের তুলনা করেছেন এই কবিতায়। গদ্যছন্দের ভাষা যে সাধুভাষা না হয়ে গৃহস্থপাড়ার চলতি ভাষা, এবং বিষয়বস্তু হিসেবে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা যে তার নিরাবরণ স্বচ্ছতা এবং তুচ্ছতা নিয়েই কাব্যমর্যাদা পাবে—সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। কবির গদ্যকাব্যগুচ্ছের মুখবন্ধ রূপে কাজ করেছে এ কবিতা।

দ্বিতীয় কবিতা 'নাটকে' (পুনশ্চ) এই গদ্য এবং পদ্য সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট অভিমত আরও সুপ্রত্যক্ষ, আরও জোরালো—

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দ তরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা-ছন্দের বাইরে জমাল আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।

বাস্তবিক পদ্যের এই ছন্দপ্রবণতা যেন মানুষের আদিমনেরই সৃষ্টি। এর বৈচিত্র্যও তরঙ্গের কলকল্লোলে। কিন্তু গদ্যের আঙিনায় কোনো বাছবিচার নেই।

কিন্তু তা বলে গদ্যের মধ্যে ছন্দ নেই বা সুরসঙ্গতি নেই—এ কথা যেন মনে না ভাবা হয়। পদ্যের ছন্দ সুপ্রত্যক্ষ—কানের কাছে এর আবেদন ধরা পড়ে। আর গদ্যের ছন্দ অন্তর্নিহিত—বাইরে এর স্রোতের বেগ না থাকলেও অন্তরের কাছে আছে এর আবেদন।

'পত্র' (পুনশ্চ) কবিতায় কবি রসিকতা করে বলেছেন যে, তিনি এ যুগে ছাপার কালিদাস হয়ে জন্মে 'জটলা-পাকানোর যুগে' ('পত্র'—পুনশ্চ) ঠিক সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। আধুনিক যুগের কাব্যের দুর্গতি তাঁকে ব্যথাই দিয়েছে। কবির ভাষায় আজকাল—

কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাসে চড়ে। ['পত্র'—পুনশ্চ]

তাই—

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে,—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে। ['পত্র'—পুনশ্চ]

'শেষ সপ্তক' কাব্যের 'কুড়ি', 'চব্বিশ' ও 'পঁচিশ' সংখ্যক কবিতার মধ্যেও গদ্য-কবিতা সম্পর্কে কবির মনোভাব পরিস্ফুট।

'কুড়ি' সংখ্যক কবিতায় কবির মনে হল তাঁর পূর্ববর্তী রচনা বড় বেশি কোমল, স্পর্শকাতর—এরা যেন অবগুণ্ঠনে ঢাকা অন্তঃপুরিকা। বড় বেশি নৈপুণ্যের বাঁধনে বাঁধা এরা। খোলা সভায় আসার মত অসংকোচ ভাব নেই এদের। কবি তাই নূতন রীতির গদ্য-কবিতার মধ্যে সেই কঠিন সাধনাকে ঠাঁই দিতে চান—

"যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।"

['কুড়ি' সং—শেষসপ্তক]

'চব্বিশ' সংখ্যক কবিতায় কবি টবে সাজানো সুসংযত গাছের সঙ্গে ছন্দের আভিজাত্যে বাঁধা কবিতার মুক্তিহীন বন্দীজীবনের তুলনা করেছেন। আর সমুন্নত স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের মর্যাদা নিয়ে মুক্ত যে পল্লবপুঞ্জ তার সঙ্গে বেড়া-ভাঙা ছন্দের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পান কবি। তিনি বলছেন তাঁর কবিতাবলী আজ—

ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চ হাসি অসংযত,

কবি গর্ব করে বলেন—

আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা। ['চব্বিশ' সং—শেষসপ্তক]

এই নূতন রীতির কাব্যনির্ঝর ছুটে চলে তার আপন খেয়ালে—তাকে আর বাঁধাধরা শৃঙ্খলার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাই—

মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনসাক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে। ['চব্বিশ' সং—শেষসপ্তক:]

তাকে খুঁজতে হবে।

'পঁচিশ' (শেষসপ্তক) সংখ্যাকেও কবি বলছেন—

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।

এরা যেন 'মোগল বাদশার জেনেনা, রাজ আদরে অলংকৃত' ('পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক), কিন্তু আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা। এইভাবে পদ্যছন্দের ঐতিহ্যের বন্ধনকে কবি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পাঁচিলের ওপারে সুদীর্ঘ য়ুকলিপ্‌টাস্‌ ও সোনাঝুরি অবারিত আকাশে বাতাসে তাদের মুক্তি ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে আছে। কবি দেখেছেন এদের—

অনেকদিন•••······অন্য মনে ['পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক]

কিন্তু—

আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।

['পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক]

বেশ বোঝা যায়—গদ্যছন্দের মূল বৈশিষ্ট্যকে এই বর্ণনার ভিতর দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন। তাই পদ্যকবিতার মধ্যে গদ্যের 'সমুন্নত স্বাধীনতা'কে, ('পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক) মুক্তিকে আনার পণ কবি করেন—

······"টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,

ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব

বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে। ['পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক]

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতায় কবি তাঁর নাতনি 'সুনয়নী'কে গদ্যকাব্য শোনাতে দ্বিধা করছিলেন—কারণ সে সুরসিকা, এর মূল্য দেবে না হয়তো। কিন্তু সে কবিকে বললে—

"তোমার কণ্ঠস্বরে

গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।" ['ময়ূরের দৃষ্টি'—আকাশপ্রদীপ]

কবি এই দুটি সংক্ষিপ্ত পঙ্ক্তির মধ্যে দিয়ে গদ্যছন্দের মূল বৈশিষ্ট্যটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রতিভা থাকলে গদ্যকে কাব্যের রঙে রাঙিয়ে দেওয়া যায়—নাই বা থাকলো তাতে তথাকথিত ছন্দের দোলা। গদ্যকবিতা স্পষ্টতর প্রমাণ করেছে যে, কবিতায় ছন্দটা প্রয়োজনীয় বস্তু হলেও তাকে বহিরঙ্গের মানমর্যাদা দেওয়াই সঙ্গত।

কবি গদ্যকবিতা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত এইভাবে বিভিন্ন কাব্যের কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

গদ্যকবিতা, 'কবিতা' হিসাবে কতদূর সার্থক হয়েছে—

এইবার কবির 'ভাবছন্দে'র উপর লেখা বিভিন্ন কাব্যের কয়েকটি কবিতাকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ভাবের অনুগামী হয়ে কবির কল্পনা বা উপলব্ধি কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বস্তুজগৎকে সহজ-দৃষ্টিতে দেখে, তাকে যথাযথভাবে রূপ দিয়েও কাব্য করে তোলা যায় কি না ?

'পুনশ্চে'র 'পুকুরধারে' কবিতায়

বেলা পড়ে এল।

বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,

বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,

টলমল করছে পুকুরের জল,

ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবিলেবুর পাতা।

চেয়ে দেখি আর মনে হয়

এ যেন আর কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;

আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে

দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।

স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

পর্ব বা চরণ গঠনে বলাই বাহুল্য এখানে কোনো মাত্রাসমতাকে মানা হয়নি। পদ্যছন্দের অন্ত্যমিলকেও রক্ষা করা হয়নি। শুধু ভাব অনুসারে পঙ্‌ক্তিগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে যার স্মৃতি হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—সে 'কল্পনা' যুগের 'মালবিকা' নয়, 'উর্বশী'-ও নয়। যার কথা মনে পড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—

সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,

অথচ একটা অব্যক্ত বেদনা, অস্পষ্ট কথা তার হৃদয়কে মথিত করে তোলে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের শতসহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা-চিন্তা-ভাবনার মাঝে এই দু'একটি মধুর টুকরো স্মৃতিকে কবি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'একজন লোক' (পুনশ্চ) কবিতায়—

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
সেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

যে কোনো অপরিচিত একজন লোক সম্বন্ধে কবিমনের এই অনুভব তাঁর কাব্যে এই প্রথম। তাকে নিয়ে কবিমনে ক্ষণিকের যে ভাবনার জাল বোনা—তাই গদ্যের

সহজ বাচনভঙ্গিতে ধরা পড়ে আমাদের মনের কাছে পৌঁছে দেয় নতুন খবর। এই হচ্ছে সহজ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জগৎকে চোখ মেলে দেখা। ছবি আঁকতে জানলে ভাষার তুলিতে অতি তুচ্ছ বস্তু এবং বিষয়ও যে রসোত্তীর্ণ হতে পারে তা এ যুগের অনেক কবিতা থেকেই বোঝা যায়। কবির মতে—কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে ভাবকে যে অনেকখানি মুক্তি দেওয়া যায় এই ভাবচ্ছন্দের মধ্যে—তার প্রমাণ 'পুনশ্চে'র বহু কবিতাই দিয়েছে।

কিন্তু একাধিক সমালোচক এ তথ্য স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন 'পুনশ্চে'র অধিকাংশ কবিতার মধ্যে গল্পরস পরিবেশন করে কবি ছন্দের অভাবকে ঢাকার চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে 'শেষসপ্তক' বা 'পত্রপুট' কাব্যের কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—যেখানে গল্পরস নেই, অথচ কাব্যরস গভীর সৌন্দর্যে উচ্ছলিত। এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই গদ্যছন্দের সার্থকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'আট' সংখ্যক কবিতায় জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার ভিতর দিয়ে কবিমনের যে দার্শনিক মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে, গদ্যছন্দের সাবলীল স্ফূর্তিতে তার আত্মঘোষণা—

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

"পত্রপুট' কাব্যের 'বারো' সংখ্যকেও—

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে।
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।

এই জীবনের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া এবং সমগ্র জীবনের দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি

'ভাবচ্ছন্দে'র স্বতঃস্ফূর্ত বাণীসুষমায় ব্যঞ্জিত। কবির হৃদয়-পত্রপুটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তারা সহস্র ধারায়—

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে,
আমি বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লব স্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে। ['তেরো' সং—পত্রপুট]

আপন আত্মার নিগূঢ় সত্তাটির সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ ক'রেছেন এখানে কবি। দেহগত চাওয়ার সঙ্গে মনোগত পাওয়ার যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব তার একটি নিখুঁত ছবি এঁকেছেন—

এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্ত রূপ। ['দশ' সং—পত্রপুট]

ছন্দোহীন এই সহজ বাণীসাধনার মধ্যে আত্মার মুক্ত রূপের সত্য সন্ধান করে ফিরেছেন কবি। মানবলোক ও প্রকৃতিলোককে অতিক্রম করে তাঁর চিন্তাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন সুদূর গ্রহনক্ষত্রলোকে।

কিন্তু এই সমস্ত কবিতায় বিশেষণ ও দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদের দ্বারা কবি যেন ছন্দের অভাবকে ঢাকতে চেয়েছেন—এ রকম সন্দেহ অনেকেরই মনে জাগে। কবিমনেও এ ভাবনা উঁকি দিয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে 'পত্রপুটে'র শেষ ('আঠারো' সংখ্যক) কবিতায় কবি নিজের উদ্দেশ্যেই বলেছেন—

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাত্তি,
এইবার থামো তুমি।……

মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি
উপকরণের স্তূপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাঁকি
অমৃতের স্থান রোধি। নির্মাণ নেশায় যদি মাত
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো।

'শ্যামলী' কাব্যে এসে কবি যেন তাই অনেক বেশি সংযত হয়ে সহজ সুরে বীণার তার যোজনা করলেন। এখানে ভাব-ভাষা প্রকাশভঙ্গি গদ্যরচনা-ভঙ্গির সহজ সাবলীলতায় অনেক বেশি সার্থক। কবি নিজের 'আমি' (শ্যামলী)-কে আবিষ্কার করলেন—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
... ...
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

'শ্যামলী'র ভাবচ্ছন্দে শিল্পের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ—যা কবির দীর্ঘকালের সাধনলব্ধ সম্পদ।—

বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ ['আমি'—শ্যামলী]

কবি আঁকলেন 'শেষ পহরে' (শ্যামলী)—

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলা-ফেলারই স্বাদ ভোলানো।
পথের পথিকও পারে, তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরোতেই।

জীবনকে কত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা। ভাষা-ভঙ্গি কত সহজ—কত আটপৌরে—অথচ কত মর্মস্পর্শী। যে-কোনো রকমের ভাবকে কবি অনাড়ম্বর ভাষার সহজ অভিব্যক্তিতে প্রাণবান করে তোলেন—

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।

তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার জবাবে। ['শ্যামলী'—শ্যামলী]

কবি প্রচলিত পদ্যছন্দের সমস্ত বন্ধনকে কাটিয়ে এখন ভাবকে মুক্তি দিয়েছেন তার সহজ চলমানতায়। কোনো রকম বন্ধন—কোনো রকম দ্বিধাই আর অবশিষ্ট নেই।

এখন, এ সমস্ত কবিতা সত্য সত্যই রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—তা বিচার-বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার জিনিস নয়। তা রসিকজনের আস্বাদনের ব্যাপার।

কাব্যের সার্থকতা বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, বিষয়ীর আত্মস্থতা এবং প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততার মাপকাঠিতে তার যথার্থ মূল্য বিচার্য। অতএব বস্তু অপেক্ষা ভাবের পরিচ্ছন্ন আত্মপ্রকাশের উপর নির্ভর করে কাব্যের সার্থকতা বিচার। নূতন যুগের বস্তুধর্মী জীবনচেতনাকে স্বীকৃতি দিয়েই কবি কাব্য গড়তে চাইলেন এবং কাব্যের আত্মাকে আবিষ্কার করতেও চাইলেন। তাই রোমান্টিক মনের কবিকল্পনায় সিঞ্চিত হয়ে জীবনের সুন্দর অতিমর্ত্য দিকগুলিই কেবল মূল্য পেল না, সামান্য শালিখ, বালক, গুব্‌রে পোকা, নেড়িকুকুরও তাদের স্ব স্ব স্থানে ঠাঁই করে নিল। কবিও পরীক্ষা করে নিলেন—প্রত্যেকটি বস্তুকে তার নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল রেখেও নিতান্ত আটপৌরে ভাষায় রচনার জাদুতে সকলের হৃদয়দ্বারে তাদের ঠাঁই করে দেওয়া যায় কিনা।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ থেকেই কবি গতানুগতিকতাকে কাটিয়ে কাব্যের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান করে ফিরেছেন। ছন্দ যে কাব্যের ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হলেও তার আত্মা নয়, এই উপলব্ধিকে দীর্ঘ জীবনসাধনায় এতদিনে সার্থক করে তুলেছেন এই সমস্ত গদ্যকাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে।

কোনো কোনো সমালোচক তাঁর গদ্যকবিতার দু'একটিকে বাছাই করে নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই সমস্ত ভাব বা চিত্র তাঁর পদ্যকাব্যের মধ্যে আরও বেশি গাঢ় ও উচ্চাঙ্গের ভাববাহী হয়ে সমৃদ্ধ। সে তুলনায় ভাবচ্ছন্দের মধ্যে তারা অনেক বেশি হাল্‌কা এবং পান্‌সে। কবিকল্পনার এটা ঊর্ধ্বগতির লক্ষণ নয়, বার্ধক্যে কবিকল্পনার দীনতাই এর জন্য দায়ী।

এই সমস্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে এই কথাই বলা যায় যে—বিভিন্ন যুগের কাব্যকে আর এক যুগের বা বিশেষ একটি কবিতাকে আর একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে উৎকর্ষ বিচার কখনোই সম্ভব নয়। কবির দীর্ঘ জীবনের শিল্পসাধনায় তাঁর বহু বিচিত্রমুখী সৃষ্টি নানা ভাবে দান রেখে গেছে। ভাবের দিক থেকে তাদের মধ্যে যেমন অনেকস্থানে একটি সামগ্রিক অখণ্ডতা আছে, বা কবির বিশেষ উপলব্ধি বা জীবনচেতনাকে তারা যেমন উদ্‌ঘাটিত করেছে, তেমনি রূপ, রীতি, ভাষা, চিত্র, ছন্দ—এদিক থেকেও একজন

উচুঁদরের শিল্পী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নানা বৈচিত্র্যের সাধনা করে চলেছেন। সেই শিল্পসাধনার ইতিহাসে বর্তমানকালের দাবীকে মূল্য দিয়ে কবি শুধু দেখিয়ে গেলেন যে, বিষয়বস্তু যাই-ই হোক না কেন, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে রচনা করে তোলা চাই। কেবল ভঙ্গি দিয়েই চোখ ভোলালে চলবে না—যথার্থ রসিকের বোধদৃষ্টির কাছে তার আসল উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হওয়া দরকার।

'ভাবচ্ছন্দে'র সাধনায় কবি তাঁর সেই উদ্দেশ্যকেই রূপ দিয়ে গেলেন। 'ভাবচ্ছন্দ' নামেই প্রকাশ, ভাবের ছন্দ, শব্দের ছন্দ নয়। এটি 'শোনার' ব্যাপার নয়, 'ভাবার' ব্যাপার, অন্তরের গভীর গোপনে মৌনের আনন্দে অনুভাবনার ব্যাপার। শব্দচ্ছন্দে আমাদের 'কান' অভ্যস্ত; কিন্তু মনে রাখতে হবে গদ্যছন্দ বা ভাবচ্ছন্দে 'কান' উপবাসী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু 'প্রাণ' নয়। রসিক যে প্রাণ, তার কাছেই গদ্যছন্দ বা ভাবচ্ছন্দের আবেদন। এটি কানের মধ্যে দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে না, পরন্তু ভাবসৌন্দর্যের আনন্দ মহিমায় একেবারে সরাসরি প্রাণে করে প্রবেশ।

ভাবচ্ছন্দের এই শিল্পবৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করতে পারলে এ ছন্দের বিরুদ্ধে আর তর্ক ওঠে না।

শেষপর্যায়ের কাব্যে অন্যান্য ছন্দ-সাধনা

পদ্যছন্দ

গদ্যছন্দে বা ভাবচ্ছন্দে লিখিত যে কাব্য নিয়ে 'শেষপর্যায়ে'র সুরু—সেই গদ্যছন্দের জন্ম-ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায়—কাব্য সাধনার প্রাথমিক যুগ থেকেই ছন্দ সম্পর্কে কবি কিরূপ সচেতন ছিলেন। ছন্দ যে কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ না হলেও অত্যাজ্য নয়—ছন্দের ঝঙ্কার, হিল্লোল, সুরমাধুর্য, নৃত্যলীলা কাব্যকে যে রসলোকে কতখানি উত্তীর্ণ করে দেয়, তা রবীন্দ্র-প্রবর্তিত বিচিত্র ছন্দের কারুকার্য এবং দীপ্তির দিকে লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যায়। "ছন্দ কাব্যের কেবল বাহ্য সৌষ্ঠব ও আভরণ নহে। ইহার সহিত কবিতার একটা নিগূঢ়, মর্মগত ঐক্য আছে, ইহা কাব্যের আত্মার অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।"[১]

রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় রূপকেই সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' যে গদ্যছন্দের ক্ষেত্রে তিনি একটি অভিনব কৃতিত্ব রেখে গেলেন, কাব্যের ক্ষেত্রে সেই ছন্দোমুক্তি একদিনেই ঘটেনি। পদ্যছন্দের তথা বাংলা ভাষার ধ্বনিশিল্পের রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘকাল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা॥ [সং—বৈশাখ ১৩৬৪
—রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা—(২) পৃঃ ২৪৫]

দিয়ে যে সার্থকতার তীর্থে তিনি পৌঁছান—তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এই গদ্যছন্দ। কিন্তু ভাবচ্ছন্দের মধ্যে কাব্যের আত্মাকে বন্ধনমুক্তির স্বাধীনতা দিলেও এবং কাব্যের নূতন এই পরীক্ষায় কবি কৃতকার্য হলেও পদ্যছন্দ সাধনাও চললো তাঁর এরই ফাঁকে ফাঁকে। 'শ্যামলী'র পরবর্তী কাব্যগুচ্ছের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের বিচিত্র শব্দচ্ছন্দ সাধনার নানা কলা-কৌশল বর্তমান। শব্দচ্ছন্দের মধ্যে যে সুর বা ধ্বনি-ঝঙ্কার তার মনোমুগ্ধকর মায়াজালকে কাটানো কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সারা জীবন সুরের সাধনা করে গেছেন তিনি। গীতিকার এবং সুরকার হিসাবে এই সুরসাধনার একাগ্র মনোভাব তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রেও কাজ করে গেছে। তাই ভাবের সুরসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁর মন স্বভাবতই সুরের ডানায় ভর দিয়ে মুক্তি খুঁজেছে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকে—সুরলোকে।

বাস্তবিক "রবীন্দ্রনাথের ছন্দোগত প্রয়োগ-কৌশলের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাতেই ধ্বনিগত নৃত্য ও সংগীতের যুগপৎ অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। কোন্ জাদুমন্ত্রের প্রভাবে বাংলা ছন্দকে এরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে তরঙ্গিত ও ঝঙ্কৃত করে তোলা সম্ভবপর হল, তার আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। ……বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছন্দসমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধি হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু কবিগুরুই নন, তিনি আমাদের ছন্দোগুরুও বটেন।"[১]

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' পদ্যছন্দের যে বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়—সেই সিদ্ধির পিছনে কবির দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা সংগুপ্ত। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী যুগে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ছন্দের বহুল প্রয়োগ ছিল তা হোল প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ—আর লৌকিক ছড়ার ছন্দ বা বলবৃত্ত ছন্দ। এ সমস্ত ছন্দের মূল তত্ত্ব বা নীতিটি কি—তা নিয়ে তখনও পর্যন্ত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করার প্রয়াস 'সন্ধ্যাসংগীতে'র (১৮৮১-৮২) যুগ থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। তবুও যে পর্যন্ত না বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নীতি ও শক্তিটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন—সে পর্যন্ত ছন্দের বন্ধনমুক্তির রহস্য কবির অগোচরেই রয়ে গেছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'সূচনা'য় কবি তাই বলেছেন—"সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল।" কিন্তু এ সম্পর্কেও কবি তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সচেতন যে—"তখনও পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ" (প্রভাতসংগীত—সূচনা)। 'ছবি ও গানে' এসে সেই কবিই কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে বললেন—"আমার ভাষায়

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'॥ [প্রঃ আষাঢ়, ১৩৫২ পৃঃ ৩-৪]

ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল (সূচনা)"। এইভাবে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'মানসী'র পূর্বযুগ পর্যন্ত কবির অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ও নিয়মভাঙার সাধনা। তারপর 'মানসী'তে এসে ছন্দকে কালব্যাপ্তিগত ধ্বনির উপর প্রথম প্রতিষ্ঠিত করাই ছন্দকে সুষ্ঠু ও সুসংহত রূপ দেবার প্রথম সার্থক প্রয়াস। কবির নিজের ভাষায়—আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে (মানসী—সূচনা)।

"বাংলা কাব্যের ছন্দোভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন ছন্দোবন্ধ উপহার দিয়াছেন (সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত); কিন্তু এইগুলি তাঁহার শক্তির যথার্থ পরিচায়ক নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বহুযুগ-প্রচলিত কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কারে, অপরিচ্ছন্ন গীতি-ছন্দের শোধনে ও সঙ্গতি স্থাপনে। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতিকবিতা ভাবের দিক দিয়া যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের ছন্দ ছিল কৃত্রিমভাবে বাহির হইতে গৃহীত। ইহারা কোথাও গঠনে শিথিল, কোথাও উচ্চারণে অস্বাভাবিক, কোথাও বা ভাবের সহিত অসঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের (পয়ার জাতীয় ছন্দের) পদমর্যাদা'। হ্রস্বনিঃশ্বাসের লঘুচালে, অর্থাৎ হ্রস্বপর্বে গঠিত হইলে পয়ার-জাতীয় ছন্দে আর পয়ারত্ব থাকে না। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দেন—পর্বদৈর্ঘ্যের উপরেই বাংলা ছন্দ নির্ভর করে, ব্যক্তিগত খেয়ালের উপরে নহে। পর্বদৈর্ঘ্যের উপরে ছন্দের উচ্চারণভঙ্গিকে স্থির-প্রতিষ্ঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দকে বস্তুনিষ্ঠ, নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলেন। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব অভূত-পূর্ব ও অতুলনীয়। ছন্দের স্বাভাবিকীকরণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে 'ছন্দোগুরু'।"[১]

অক্ষরবৃত্ত বাংলা ছন্দের আদি এবং অকৃত্রিম রূপ। কিন্তু প্রাচীনকালে এই ছন্দে গঠিত সকল রচনাই গীত হোত—সুতরাং কবিতাপাঠের মধ্যে একটি সুর বা তান স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যেত। এ কারণে ছন্দের মাত্রাগণনা বা গঠনপারিপাট্যের ব্যাপারে কবিরা যথেষ্ট সচেতন হননি। ধ্বনির ঘাটতিকে বা উচ্চারণের কৃত্রিমতাকে সুরের দ্বারা পূরণ করে নেওয়ার ফলে ছন্দকে বস্তুনিষ্ঠ করার দিকে কবিদের তেমন মনোযোগ দেখা যায়নি। বিশেষ করে হলন্ত অক্ষর ব্যবহার বা যুক্তাক্ষর ব্যবহারে শব্দের যে চরণমধ্যে স্থানবিশেষে তারতম্য ঘটে সেদিকে খুব সচেতন দৃষ্টি রবীন্দ্রপূর্ব কবিরা দেননি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী যুক্ত অক্ষরকে ভেঙে এবং হলন্ত অক্ষরকে কিছুটা মূল্য দিয়ে কাব্যের

১। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য—'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন'
[—বাংলাছন্দে রবীন্দ্রযুগ—পৃঃ ৪১৫-৪২৪]

ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পেলেও উচ্চারণের ব্যাপারে বা ধ্বনিশিল্পের বিচারে বহুস্থানেই তা ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথই তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টিতে এই ত্রুটি ধরতে পারেন এবং ভাষার ব্যবহারে এই কৃত্রিমতাকে বর্জন করে যুক্তবর্ণকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে এবং শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনিকে দুই অক্ষরে প্রসারিত করে ছন্দকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়ই মাত্রাগণনার সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির জন্য মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পয়ারের প্রভাবমুক্ত হয়ে বাংলা ছন্দ-জগতে একটি সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। সংস্কৃত কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয় মেলে এবং বৈষ্ণব গীতিকবিতার মধ্যে দিয়ে বাংলা কাব্য-জগতে এ ছন্দ যথেষ্ট আসন করে নেয়। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে তার সুস্পষ্ট পার্থক্য রবীন্দ্র পূর্ব কবিরা সব সময় রাখতে পারেন নি। "মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অক্ষরবৃত্তের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন তাহা নহে, অবাঙালী উচ্চারণের কৃত্রিমতা হইতেও মুক্তি. দিয়াছেন"।[১] বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবির হাতে এ ছন্দ তার সুষ্ঠু পরিণত রূপ প্রাপ্ত হোল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'র মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রভাব তাঁর মনের উপর ছোটবেলা থেকেই যে কাজ করেছিল তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তাই শেষপর্যন্ত অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই।

সংস্কৃত ভাষার দীর্ঘস্বরযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে প্রত্নরীতি এবং রবীন্দ্রপ্রবর্তিত আধুনিক মাত্রাবৃত্তকে নব্যরীতি নাম দিয়েছেন ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নব্যরীতির প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত ছিলেন তাই নয়—প্রত্নরীতির নির্দোষ ও বিচিত্র ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধহস্ত। যদিও এ সমস্ত রচনা পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কোন কবিতা নয়—সুর সহযোগে গীত হওয়ার যোগ্য। 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' (কল্পনা, ভারতলক্ষ্মী) বা 'ভুবনেশ্বর হে' (গীতবিতান, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০৯) ইত্যাদি পদকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে বাংলাভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যটি যে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না—গীতিকবিতার উপযোগী ধ্বনি বিস্তারের মাধুর্য এ ছন্দে রক্ষিত হলেও বাংলা ভাষায় আমরা যে উচ্চারণের সময় ধ্বনিবিশেষের উপর ঝোঁক (accent, প্রস্বর) দিয়ে থাকি — ঐ ঝোঁকের বা প্রস্বরেব মধ্যেই যে ভাষার আসল শক্তিটি নিহিত এ তত্ত্বটি তাঁর মনে

১। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য—॥ ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন ॥ [পৃঃ ৪২৪]

বহুকাল আগেই উঁকি মেরেছিল। কবিজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই এই প্রস্বরটুকুসহ সমগ্র উচ্চারণ পদ্ধতিটাকেই কবি সেইজন্য কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এর প্রথম নিদর্শন মেলে ১২৮৭ সালে রচিত আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাকিনী অংশের বাংলা অনুবাদে—

ঝড় বাদলে | আবার কখন
মিলব মোরা | তিনজনে।

এর পর 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দস্যু এবং 'কালমৃগয়া'র বিদূষক ও শিকারীদের উক্তিতেও ঐ ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। এর কিছুকাল পরে 'প্রভাতসংগীতে'র 'উৎসর্গপত্রে' ঐ ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এর থেকে অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে, এই ছন্দের শক্তি ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কবিমনে ক্রমশই আস্থা দেখা দিচ্ছিল। 'রামপ্রসাদী' ছন্দ যে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং বাংলা ছন্দ যে এই 'রামপ্রসাদী ছন্দে'র উচ্চারণ-তত্ত্বটিকে মূল্য দিয়ে ভাষা ও ছন্দের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এ কারণে বাংলা ভাষার হসন্ত ধ্বনিটিকে কাজে লাগিয়ে কবি এই 'লৌকিক ছন্দ'টিকে (বলবৃত্ত, স্বরবৃত্ত) 'ছবি ও গান' (১২৯০—মাতাল) এবং কড়ি ও কোমল (১৮৮৬—'সাতভাই চম্পা')-এর মধ্যে ব্যবহার করে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু এই দু'খানি গ্রন্থেই এ ছন্দের ব্যবহারে বহু সন্দেহ ও শৈথিল্য দেখা যায়। সন্দেহ এই কারণে যে, এই লৌকিক ছন্দটি হাল্কা রচনা ছাড়া গুরুগম্ভীর কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে কিনা এবং বেশ কিছুদিন তিনি এ ছন্দ রচনায় বিরত ছিলেন। অবশেষে 'কথা' ও শেষে 'ক্ষণিকা'তে এসে এই ছন্দ তার পূর্ণ মর্যাদায় এবং ঔজ্জ্বল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং 'প্রাকৃত বাংলা ছন্দ' বা 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' নাম নিয়ে তাঁর হাতে সুগঠিত, সুসংস্কৃত ও শক্তিশালী হয়ে দেখা দিল। 'মানসী'র ন্যায় 'ক্ষণিকা'ও ছন্দ-বিবর্তনের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচক।

কিন্তু গভীরভাবে গভীর সুরের কথা এ ছন্দে বলা যায় কিনা—এ নিয়ে দ্বিধা ঘোচেনি কবির দীর্ঘকাল। 'শিশু'র পর 'উৎসর্গে'র (১৯০৩-৪) কয়েকটি কবিতার মধ্যে এ ছন্দের শক্তিশালিতা ও গভীর ভাবের বাহন হবার যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হোল। তারপর 'খেয়া'র সময় থেকে (১৯০৫-৬) তিনি নিঃসংশয়ে একে গভীর ভাবপ্রকাশের বাহন রূপে ব্যবহার করলেন।

এই প্রাকৃত বাংলাছন্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য এবং প্রস্বরস্থাপন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই নির্মিত। অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেবল্-এর সংখ্যাগত সৌষম্য

মেনে চলা এর ধর্ম এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বরপর্বের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে বলে এ ছন্দের নাম হয়েছে স্বরবৃত্ত এবং প্রতি পর্বের প্রথমেই প্রস্বর (বা 'বল') পড়ে বলে অপর নাম 'বলবৃত্ত'।

প্রাচীন বাংলার লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন হচ্ছে এই বলবৃত্ত ছন্দ। ভারতচন্দ্রের পূর্বে মধ্যযুগের সাহিত্য থেকেও এই লৌকিক (ধামালি) ছন্দের পরিচয় মেলে। রামপ্রসাদ সেন ও ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় এই ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্রও এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব—তিনি এই লৌকিক ছন্দটিকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে এনে একে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করে এর বহুল শক্তি ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এতে বাংলা কাব্যসাহিত্যের সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে।

"বাংলাভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য উচ্চারণরীতি ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি নিয়ে রচনাকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রাবৃত্ত (morie), স্বরবৃত্ত (syllabic) ও যৌগিক (composite) এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। ধ্বনির একক বা unit নির্ণয় এবং তার প্রয়োগের বিভিন্ন প্রণালী থেকেই বাংলা ছন্দের এই তিনটি ধারার উৎপত্তি হয়েছে। কয়েকটি এককের বিভিন্ন রকম সমাবেশের ফলে যে ছন্দপর্ব উৎপন্ন হয় তার ভিতরকার গঠনকৌশলের উপরেই ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করে। আর ঐ ছন্দপর্বের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের বাহ্য আকৃতি। ছন্দপর্বের নির্মাণ ও তার বিচিত্র সমাবেশ, এই উভয় ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও কৌশল অপরিসীম।"[১]

বাংলা ছন্দের জগতে মোটামুটিভাবে এই তিন প্রকারের ছন্দ-বন্ধকেই আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এই তিনটি ছন্দের ক্ষেত্রেই বাঁধাধরা কতকগুলি নিয়ম মেনে চলার অঙ্গীকার রয়ে যায়। যেমন—(১) পর্বের বা চরণের মাত্রাসমতা, (২) যুগ্মধ্বনি বা অযুগ্মধ্বনির স্থানবিশেষে একমাত্রিকতা বা দ্বিমাত্রিকতা এবং (৩) প্রস্বর স্থাপনের নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রীতি-নিয়ম বাংলা ছন্দকে অনেক সময় নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে করে তোলে। অতি অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতিগুলি যেন বৈচিত্র্যহীন হয়ে না পড়ে তার জন্য তাঁর অক্লান্ত সাধনার কথা ভাবলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। ছন্দের কাজই হচ্ছে পাঠকের রসবোধকে জাগ্রত করা—সুতরাং পর্ববন্ধের, স্তবকবন্ধের এবং মিল স্থাপনের বিভিন্ন কারিকুরির মাধ্যমে নিস্তরঙ্গ ধ্বনিপ্রবাহে তিনি স্পন্দন সৃষ্টির চেষ্টা

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'॥ [পৃঃ ৫৪]

করেছেন বহুভাবে। চরণের পূর্বে অতিপর্ব স্থাপন করে এবং কোথাও বা মাত্রার ফাঁক রেখে, কোথাও বা অপ্রত্যাশিত মিলের চমক লাগিয়ে কতরকম উপায়ে যে বাংলা ছন্দের প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন কবি তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলা ছন্দের প্রত্যেকটি রীতিই স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি পর্বে এবং চরণে সমমাত্রাকে স্বীকার করে নেয়—অসম বা বিসম মাত্রার স্থান তাতে খুবই কম।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত পয়ার পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকে ১৪ অক্ষর এবং ১৪ মাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল প্রতি চরণে। আবার ঐ ১৪ মাত্রার ভাগও ছিল ৮+৬ এই রীতিতে। এই ১৪ মাত্রার সঙ্গে পরবর্তীকালে ২ মাত্রা যোগ হয়ে ১৬ মাত্রার চরণ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ আরও ২ মাত্রা যোগ করে 'দীর্ঘপয়ার' বা 'বর্ধিত পয়ার' নাম দেন। এইভাবে বিভিন্ন কলায় সাজিয়ে অক্ষরবৃত্তের একঘেয়ে তানের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বন্ধের প্রচলন ছিল। কবি এই প্রচলিত ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি 'বন্ধ'কে নিয়ে বিভিন্নভাবে পর্ব, চরণ, স্তবক গঠন করে অক্ষরবৃত্তের একটানা নিস্তরঙ্গ সুরধ্বনির মধ্যে গতি আনার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ পয়ারকে কবি দু'লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি—অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মত বহু পঙ্‌ক্তির মধ্যে তাকে মুক্ত ও প্রবহমান করে তোলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ারের এই একঘেয়েমিকে দূর করার জন্য শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর শব্দের প্রচুর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, তাঁর এই চিন্তাধারা আতিশয্যদোষে দুষ্ট হলেও এই প্রবণতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পয়ারের দ্বিপংক্তিক মিল ও ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটালেন কবি ছেদ ও যতিকে চরণ থেকে চরণান্তরে বইয়ে দিয়ে। এইভাবে ছন্দরাণীর কিছুটা বন্ধনমুক্তি ঘটলো বটে, কিন্তু প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ১৪ অক্ষরের বন্ধনটিকে তিনিও স্বীকার করে নিলেন। …"চরণাতিক্রমী অমিত্রছন্দকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ছন্দোদমনের জন্য মধুসূদন উহাকে করিয়াছেন মিলবর্জিত; অপরপক্ষে ছন্দপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় উহাকে করিয়াছেন মিলসংযুক্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী এই উভয় ক্রিয়াই স্বাভাবিক। ছন্দোগত কৃত্রিমতা বর্জনে রবীন্দ্রপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। বাংলা গীতিছন্দে অ-বাঙালী উচ্চারণ বর্জন এবং খামখেয়ালী উচ্চারণের পরিবর্তে উচ্চারণ-ভঙ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্বভিত্তিক করিয়া তোলাই হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিকীকরণ।"[১]

মধুসূদন-প্রবর্তিত এই অমিত্রাক্ষর ও প্রবহমান পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ আরও স্বাধীনতা

১। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য—'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন'॥ [পৃঃ ১১৪]

দান করে 'মুক্তক' রূপ দেন। প্রবহমান পয়ারের প্রতি পংক্তির নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার বন্ধনকে ছিন্ন করেই এই 'মুক্তক' ছন্দের জন্ম 'বলাকা'র যুগে (১৯১৬)। কিন্তু মনে রাখতে হবে পদ্য মানে পদবন্ধ রচনা—ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পক্ষে কোনো-না-কোনো বন্ধন স্বীকার্য; তবে যে বন্ধন ছন্দের প্রাণ বা মূল নীতি অর্থাৎ পর্বগঠন পদ্ধতি ও যতিস্থাপন রীতি—তাই হচ্ছে অপরিহার্য বন্ধন। আর যে বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য নয়—অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি-গঠন, শ্লোকনির্মাণ পদ্ধতি ও মিলস্থাপনের রীতি—তা স্থলবিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের বাধা হলেও অধিকাংশ স্থলে ছন্দের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। 'মুক্তক' ছন্দকেও এই অপরিহার্য বন্ধনকে স্বীকার করতে হয়। অনেকে মনে করেন 'মুক্তক' ছন্দ ইংরাজী সাহিত্য থেকে আমদানি, কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমে যায় না। বাইরের দিক থেকে Blank Verse-এর সঙ্গে মিল থাকলেও বাংলা ভাষার অন্তর-প্রকৃতি অনুসারে এ ছন্দ একেবারে স্বতন্ত্র।

মুক্তক ছন্দের জন্ম 'বলাকা'র যুগে হলেও কাব্যসাধনার প্রথম যুগে প্রচলিত ছন্দের বাঁধনকে ভাঙার যে প্রয়াস, তার মধ্যেই এ ছন্দের জন্ম-ইতিহাস লুকানো। 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র 'তারকার আত্মহত্যা' তার প্রথম নিদর্শন। 'প্রভাতসংগীতে'ও এই মুক্তকল্প ছন্দের আভাস আছে। অবশেষে 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'য় (১৮৮৭) এর প্রথম পূর্ণ প্রকাশিত রূপ দেখা যায়। সমিল প্রবহমান ছন্দরূপে 'মানসী'র 'মেঘদূত' (১৮৯০) কবিতাটির প্রথম পরিচয়। দীর্ঘপয়ারের প্রথম নমুনা 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' (১৮৯৩) ও 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) কবিতা। 'প্রান্তিকে' (১৯৩৮) অমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ারের সন্ধান মেলে।

অসমসংখ্যক মাত্রা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরোধিতা করে। সেজন্য ঊনমাত্রিক পয়ার (১৩ মাত্রার) এবং চৌপদী রচনায় অক্ষরবৃত্ত অথবা মাত্রাবৃত্ত কোন্ রীতিটি গ্রহণীয় এ নিয়ে কাব্যসাধনার প্রথম থেকে কবিমনে নানা প্রশ্ন ছিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে এর সার্থক প্রয়োগ দেখান শেষজীবনের কাব্যে। মাত্রাবৃত্ত ঢঙে এ ছন্দ উদ্দাম চঞ্চল হয়ে নেচে ছুটে চলেছে।

অক্ষরবৃত্ত রীতির সমস্ত রকম ছন্দবন্ধই স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত রীতিতে অনায়াসে চালানো সম্ভব—এ তত্ত্বটিও রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন। 'পূরবী' কাব্যের 'পূরবী' কবিতাটি আঠারো মাত্রার প্রবহমান বলবৃত্ত পয়ার। 'বলাকা'তেই বলবৃত্ত মুক্তকের প্রথম দেখা মেলে (২৬ সং)। বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে 'মানসী' ও 'ক্ষণিকা'র ন্যায় 'বলাকা'র স্থানও খুব উচ্চে।

'বলাকা'তেই বলবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হলেও 'পলাতকা' কাব্যেই এ ছন্দের অন্তর্নিহিত

শক্তিটি উদ্‌ঘাটিত হোল। চলতি বাংলার লৌকিক ছন্দের শক্তি কতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ। 'পুনশ্চে' (ছুটি) অমিল বলবৃত্ত মুক্তকের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে 'জন্মদিন' (২৪ সং) ও 'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল'ও 'পরিচয়' এই অমিল বলবৃত্ত মুক্তকের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বলবৃত্ত ছন্দে সাধারণত প্রতিপর্বে চার অক্ষর (সিলেবল্) এবং সাড়ে চার মাত্রা থাকে এবং প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। অনেক সময় ত্রিমাত্রিক ধ্বনি সম্প্রসারিত হয়ে মাত্রার ফাঁকটুকুকে পূরণ করে। ধ্বনি সম্প্রসারণের ন্যায় ধ্বনি সংকোচনেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অক্ষরবৃত্ত ও বলবৃত্তের মত মাত্রাবৃত্ত রীতিতেও দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধ রচনা করা সম্ভব। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রতিপর্বে চার, পাঁচ, ছয় কিংবা সাত মাত্রার সমাবেশ হতে পারে। এই হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নব্য মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দেখা মেলে 'মানসী'তে এবং সেখানেই ঐ চার প্রকারের মাত্রাবৃত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্মাত্রিক পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করা চলতে পারে—এ নিয়ে প্রথম যুগ থেকেই কবি চেষ্টা চালিয়েছিলেন—কিন্তু মাত্রাবৃত্ত পয়ারে সার্থকতা লাভ করেন অনেক পরে। পঞ্চমাত্রিক ছন্দ প্রথম লৌকিক ছন্দের মতো ব্যবহৃত হোত কিন্তু পরবর্তীকালে এ ছন্দ অতি সার্থক রূপ লাভ করে তাঁর হাতে। 'মানসীতে' এর প্রথম সার্থক প্রয়োগ—পরে অতি শক্তিশালী রূপ নিয়ে বাংলাছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। রবীন্দ্রনাথই এ ছন্দের স্বরূপ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেন। সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দ খুব কমই দেখা যায়। মাত্রাবৃত্ত রীতিতে বিভিন্ন প্রকারের পর্ব গঠন করে রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। কবিতায় দুই পঙ্‌ক্তির সমাবেশের নাম যুগ্মক (couplet); তিন ও চার পঙ্‌ক্তির সমাবেশকে যথাক্রমে ত্রিক (triplet) ও চতুষ্ক (quartet) বলা হয় এবং চারের অধিক প্রণালীবদ্ধ রূপকে বলা হয় কুলক (stanza)। কুলকের পঙক্তিগুলি সমপ্রণালীতে রচিত হওয়া চাই, কিন্তু সমায়তন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। সব রকম শ্লোকবন্ধেই পঙক্তিপ্রান্তের মিল একটি বিশেষ রীতিকে মেনে চলে। যুগ্মকের মিল দুই পঙক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ত্রিকবন্ধের মিল পারম্পরিক; চতুষ্কের পর্যায়ক্রমিক অথবা প্রথমের সঙ্গে চতুর্থের, দ্বিতীয়ের সঙ্গে তৃতীয়ের। কুলকে পাঁচের পর ছয়, সাত, আট, নয় প্রভৃতি বিভিন্ন পঙক্তির সমাবেশ হতে পারে। এর মধ্যে দ্বিপঙক্তিক মিল, ত্রিপঙক্তিক মিল প্রভৃতির বিভিন্ন রকম সবাবেশ ঘটিয়ে এবং পঙক্তির অসমান সমাবেশের ফলে ছন্দবন্ধের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

শেষপর্যায়ের কাব্যে তিনপ্রকারের ছন্দবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য সৃষ্টির নিদর্শন মেলে এবং বার্ধক্যেও কবিমনের রসসৃষ্টির ও রূপসৃষ্টির কলাকৌশল দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

'শেষপর্যায়ে'র পদ্যছন্দ সাধনার ক্ষেত্রে কবি কি বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন তা এ যুগের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং লৌকিক স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দের চিত্তচমৎকারী বৈশিষ্ট্যের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'শেষপর্যায়ে'র পদ্যকাব্যগুলির সাধারণ ছন্দোস্পন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে এদের মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া'—লৌকিক বলবৃত্ত ছন্দের এবং কখনো কখনো মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়।

(২) 'বীথিকা', 'সেঁজুতি', 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যে পূর্ববর্তী পদ্যছন্দের (অক্ষরবৃত্ত, বলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত) বিচিত্র শিল্পকলার ব্যবহার।

(৩) 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা'য় অক্ষরবৃত্ত (অমিল প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার, মুক্তক প্রভৃতি) ছন্দের মোটামুটি নিয়মকে মেনে নিলেও নানা কৌশলে এর মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার চেষ্টা।

(৪) 'বিচিত্রিতা', 'প্রহাসিনী' এবং' প্রান্তিক' প্রভৃতি কাব্যে বিভিন্ন ছাঁদের ছন্দো-স্পন্দ লক্ষ্যগোচর হয়।

মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ের এ সমস্ত কাব্যগুলির ছন্দোস্পন্দ সম্পর্কে বলা চলে তারা বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে চললেও নিয়মের বন্ধনে যেন ধরা দেয়নি। আজীবন ছন্দের সাধনা করে এর তাল-মান-ধ্বনিস্পন্দ সম্পর্কে কবি এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, বন্ধনের মধ্যে মুক্তি কোথায় তা তাঁর অধিকারে। প্রচলিত নিয়মের বাঁধনকে তো তিনি অনেক আগেই ভাঙ্‌তে সুরু করেছিলেন কিন্তু ছন্দের মধ্যেও অছন্দের যে স্বাধীনতা তা তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার—"আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচবোধ করি নাই।"[১]

উপরিউক্ত কাব্যগুলির ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে কবির এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতখানি—সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণায় আসা যায়।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ' ['প্রঃ ১৯০৬ জুলাই, পরিবর্ধিত সং ১৯৬২ নভেম্বর]
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত—'সংগীত ও ছন্দ', [পৃঃ ২১]

(১) 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া'—লৌকিক স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যটিকে রক্ষা করার চেষ্টা—কিন্তু নানা ধরনের ব্যতিক্রমও সুস্পষ্ট। বলবৃত্ত ছন্দের প্রধান নিয়ম প্রতি পর্বে সাধারণতঃ চার অক্ষর (সিলেবল্) এবং সাড়ে চার মাত্রার অবস্থান, এর মধ্যে দুটি যুগ্মধ্বনি—অথবা একটি যুগ্মধ্বনি অথবা একমাত্রার ফাঁক ; কখনো কখনো ব্যতিক্রম হিসাবে চারটি অযুগ্মধ্বনি ও দু'মাত্রার ফাঁকও থাকে। বলবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের ন্যায় পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ত্রিক, কুলক—প্রভৃতি সকল রকম বন্ধেরই রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছেন। এই সমস্ত প্রচলিত চরণবন্ধ বা স্তবকবন্ধকে আবার বিভিন্ন পঙক্তিতে সাজিয়ে নানা ভাবে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করেছেন। মিলের ব্যাপারেও বিভিন্ন প্রকারের কারিকুরি লক্ষ্য করা যায়।

'খাপছাড়ার' (৩৩ সং)—

নাম তার | ডাক্তার | ময়জন
বাতাসে মে | শায় কড়া | পয়জন
গনিয়া দে | খিল, বড়ো | বহরের
একখানা | রীতিমত | শহরের
টি্ঁকে আছে | নাবালক | নয়জন। [৩৩ সং—খাপছাড়া]

পাঁচটি পঙক্তিতে এই মাত্রাবৃত্ত কুলকটিকে রচনা করা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৫ম পঙক্তির শেষে পঙক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করেছেন এবং এটা যথার্থ মিলের দৃষ্টান্ত। কেননা প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য। ৩য় ও ৪র্থ পঙক্তির ক্ষেত্রেও ঐ একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

কোথাও বা দীর্ঘ চরণকে দুইটি পঙক্তিতে সাজিয়ে ভিন্ন রকম ধ্বনি সমাবেশের চেষ্টা—

সময় চ | লেই যায়
নিত্য এ | নালিশে
উদ্‌বেগে | ছিল ভুপু
মাথা রেখে | বালিশে।

এখানে 'নিত্য এ'—এই পর্বে চারটি সিলেবল্ পাওয়া যায় না এবং যুগ্মধ্বনি বা অযুগ্মধ্বনি কিংবা দু'এক মাত্রার ফাঁক নিয়ে সাড়ে চার মাত্রার সংযোগও ঘটেনি। কিন্তু আমাদের উচ্চারণের দীর্ঘতা দিয়ে অনেক সময়ে এই ফাঁককে আমরা পূরণ করে নিই।

চরণগুলিকে অনেক সময় ইচ্ছানুরূপ সাজিয়ে, মিলের দিক থেকে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে চমৎকারিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন কবি। শেষের দিকের কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত মিলের চুম্বকি দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিনের চেষ্টায়

তিনি যেন এখন ছন্দ নিয়ে খেলা করে চলেছেন। তার সহজ গতিভঙ্গি বন্ধনের সৃষ্টি না করে ধ্বনিব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেছে।—

বটে আমি | উদ্ধত ;
নই তবু | ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে | মেয়েদের | সাথে মোর | যুদ্ধ তো

[৬৬ সং—খাপছাড়া]

প্রথম চরণকে দুটি পঙক্তিতে ভেঙে সাজিয়ে এবং পঙক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা হয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একঘেয়েমির মধ্যে। এতে ছন্দের ঢঙই যেন পাল্টে গেছে।

'ছড়ার ছবি' কাব্যে ছড়া গেঁথে গেঁথে কবি ছবি এঁকে চলেছেন। এ কাব্যের 'ভূমিকা'য় কবি বলেছেন—"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।" সাধারণতঃ ছড়ার নিয়মে প্রতি চরণের শেষে মিল দিয়ে দুই দুই চরণে ভাবকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে দুই চরণের শেষে মিল রক্ষা করে গেলেও ভাবের দিক থেকে সে এগিয়ে চলেছে চরণ থেকে চরণান্তরে—'বলাকা' বা 'পলাতকা'র যুগের মত। একে সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক বা বলবৃত্ত মুক্তক বলা যায়। যেমন 'পদ্মায়' (ছড়ার ছবি) কবিতায়—

অলসদিনের | উড়নি খানার | পরশ আকাশ | হতে
বুলিয়ে যেত | মায়ার মন্ত্র | আমার দেহে | মনে।
তারই মধ্যে | আসত ক্ষণে | ক্ষণে
দূর কোকিলের সুর,
মধুর হত | আশ্বিনে রোদ্ | দুর।

অসমান পঙক্তিতে এই মুক্তকটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পঙক্তির শেষে মিল রক্ষিত। কিন্তু ছন্দের গতি বা প্রবাহ উদ্দাম বেগে নেচে ছুটে চলেছে। এর ছন্দ দেখলেই বোঝা যায় 'মেয়েদের মেয়েলি আলাপ' আর 'ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপে' ('ভূমিকা'—ছড়ার ছবি) এর গাথুনি নয়—বেশ পাকা হাতের বাঁধুনি ; নেচে ছুটে চলেছে। ভাবকে গতিদান করে একটি কল্পলোক থেকে আর একটি কল্পলোকে ডানা মেলেছে। প্রত্যেকটি পর্বে যুগ্ম ও অযুগ্মধ্বনির সমাবেশে চার সিলেবল্ ও সাড়ে চার মাত্রা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যেখানে তার অভাব ঘটেছে সেখানে দু'এক মাত্রার ফাঁক পূরণ করে নেবার চেষ্টা হয়েছে। এই ফাঁক পূরণের দ্বারা ধ্বনি সম্প্রসারণের

ন্যায় ধ্বনি সংকোচনের দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এখানে 'বুলিয়ে যেত' এই পাঁচটি সিলেবল্‌কে টেনে উচ্চারণ করে ধ্বনি সংকোচন করা হয়েছে। ধ্বনি সংকোচনের ন্যায় সম্প্রসারণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।—

ভারত ভূমির | সব ঠিকানাই | ভুলি-যদি | দেবে,
যোগীনদাদার | ভূগোল গোললা | গল্প-মনে | রইবে।

[ছড়ার ছবি—'যোগীনদা']

এখানে 'ভুলি-যদি' এই পর্বের মধ্যে যে মাত্রার ফাঁক রয়েছে তা আবৃত্তি করবার সময় টেনে পড়ে পূর্ণ করে নেওয়া হয়।

তিন ধ্বনির পর্বে সাধারণত তৃতীয় এবং কখনও কখনও প্রথম ধ্বনির পরেও ফাঁক থাকতে পারে; তবে এ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। 'ছড়ার ছবি'র 'ভজহরি' কবিতায়—

একদিন সে | ফাগুন মাসে | মাকে এসে | বলল,
গোধূলিতে | মেয়ের আমার | বিয়ে হবে | কল্য।
ডাকবে যখন | টিয়ে
বরকর্তা | রবেন বসে | কানে আঙুল | দিয়ে।

এখানে 'একদিন সে' এবং 'বরকর্তা' ত্রিস্বর পর্ব কিন্তু আমাদের উচ্চারণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে একটু টেনে উচ্চারণ করে এই ফাঁক পূরণ করে নেওয়া হয়। এই ত্রিস্বর পর্ব বা তিন সিলেবল্‌-এর পর্ব প্রতি পঙ্‌ক্তির গোড়াতে থাকলে ছন্দের প্রবাহ অভিনব ভঙ্গিতে দুলে উঠে তাকে চিত্তচমৎকারী করে তোলে। বাংলার লোকসাহিত্য থেকে এই ত্রিস্বর পর্বটিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু "রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তিনি যে শুধু লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দটিকেই সুমার্জিত করে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়েছেন তা নয়; তিনি লৌকিক ছন্দের ঐ ত্রিস্বর পর্বযোগের বিচিত্র ভঙ্গিটির মাধুর্যও সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন এবং লোকসাহিত্যের তুচ্ছতা মোচন করে ও তাকে সুনিয়মিত করে বাংলা কাব্যের নূতন বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন।"[১]

আবার চতুঃস্বরপর্বিক অর্থাৎ চার চার সিলেবল্‌-এ বিভক্ত পর্বের মাঝখানে মাঝে মাঝে এই ত্রিস্বর-এর সমাবেশ দেখা যায়। বলবৃত্ত ছন্দে রচিত অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই এ রকম বৈচিত্র্য কিছু-না-কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটিকেও রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য থেকে গ্রহণ করেন। 'ছড়ার ছবি'-র 'যোগীনদা' কবিতায়—

ইতিমধ্যে | যোগীনদাদা | 'হাৎরাশজং' | শনে
গেছেন লেগে | চায়ের সঙ্গে | পাঁউরুটি দং | শনে।

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' [পৃঃ ৮৭]

এখানে চতুঃস্বরপর্বের মধ্যে 'হাৎরাশজং'—এই ত্রিস্বর পর্বটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ছড়া'র প্রত্যেকটি কবিতার প্রতিটি চরণ চতুঃস্বরপর্বিক। অন্তে মিলযুক্ত বলবৃত্ত লৌকিক ছড়ার ছন্দে গঠিত। যেমন—

স্থবল দাদা | আনল টেনে | আদম দিঘির | পাড়ে,
লাল বাঁদরের | নাচন সেথায় | রামছাগলের | ঘাড়ে।

[১ সং—'ছড়া']

আবার—

কদমাগঞ্জ | উজাড় করে
আসছিল মাল | মালদহে,
চড়ায় পড়ে | নৌকাডুবি |
হল যখন | কালদহে,

[২ সং—'ছড়া']

এইভাবে দীর্ঘ চরণকে অনেক সময় দুটি পঙ্ক্তিতে ভাগ করে দিয়েছেন কবি—এতে বৈচিত্র্যও এসেছে।

(২) ছন্দের দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হয়—'বীথিকা', সেঁজুতি', 'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক' ও 'সানাই' কাব্য ক'খানির মধ্যে।

এ সমস্ত কাব্যে তাঁর পূর্বে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্যবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু প্রত্যেকটি প্রচলিত রীতি বা পদ্ধতির মধ্যেই নানা রকমের বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টাও লক্ষ্য করবার মত। 'পয়ার', 'মহাপয়ার', 'ত্রিপদী', 'চৌপদী', 'প্রবহমান' বা 'মুক্তক' অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সকল প্রকার বন্ধ এবং সেই সঙ্গে মাত্রাবৃত্ত ও বলবৃত্তের মধ্যে কত রকমে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তা এই যুগের এই সমস্ত কাব্যের ছন্দোস্পন্দ নিয়ে আলোচনা করলেই প্রত্যক্ষগোচর হয়। মাত্রার দিক থেকে প্রতি চরণকে কোথাও ১৮, ১৬, ১৪—আবার কোথাও ১০, ৮ প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করেছেন। এই চরণকেও আবার নানারূপ পর্ববন্ধে বিন্যস্ত করেছেন। ১০+৮, ১০+৬, ১০+৪, বা ৮+১০, ৬+১০, ৪+১০ কিংবা ৮+২, ৬+৪, ৪+৬ ইত্যাদি বিভিন্ন কলায় এই যুগের বহু কবিতার চরণ-পর্ব-পঙ্ক্তিকে গঠন করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষষ্ঠমাত্রিক পর্বের ছন্দ নির্মাণ করেছেন এবং পর্বসমতাকে উঠিয়ে দিয়ে, ছেদ-যতির অর্থানুসারে প্রয়োগ করে মুক্তকবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব বিভিন্ন ঢঙে ব্যবহার করে পদ্যছন্দের ক্ষেত্রে কবির দীর্ঘকালের সাধনাকে অতি সার্থক রূপ দান করেছেন। এতে করে প্রচলিত ছন্দ-বন্ধের মধ্যে একঘেয়েমির পরিবর্তে চমৎকারিত্ব এসেছে। এই কাব্যগুলির ছন্দোবৈশিষ্ট্য

সম্পর্কে ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় মন্তব্য করেছেন—এই কাব্যগুলিতে "আর এক জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—…'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথ পয়ারের বেড়া ভাঙিয়া যে নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন এখানে সেই স্বাধীনতাই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কাব্যের মধ্যে গদ্যের সহজ অবাধ গতি সঞ্চারিত করা।"[১]

মিলের দিক থেকেও পয়ারের মত পরস্পর দুই চরণে অথবা ১ম-৩য়ে, ২য়-৪র্থে, আবার তারই মধ্যে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭মে মিল রক্ষা করে ৮মের সঙ্গে ২য় বা ৪র্থের মিল ঘটিয়েছেন। মহাপয়ারের ১০+৮ বা ৮+১০ মাত্রাকেও পরস্পর দুই চরণে মিল রেখেও কী সুন্দর ধ্বনিস্পন্দন এনেছেন। পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা একঘেয়েমি আনে নি। মাত্রার মধ্যেও ৬-কে ৫+১, ৩+৩, বা ৮-কে ৫+৩, ৬+২ ইত্যাদি নানা ভাবে ভেঙে সাজিয়ে বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দের সৃষ্টি করেছেন।

সারা জীবনের পরীক্ষালব্ধ ভাষাজ্ঞান, শব্দের ধ্বনিস্পন্দন এবং সুরধ্বনির তাল-মান-লয় তাঁর সূক্ষ্ম অনুভবের নিকট এমনভাবে ধরা পড়েছে যে কবি ইচ্ছামত তাকে কাজে লাগিয়েছেন। মনে হয়, এ সমস্ত ক্ষেত্রে মিলের খাতিরে কবি শব্দ চয়ন করেননি, শব্দের উপর তাঁর এত অধিক দখল যে মিল আপনি এসে বাঁধা পড়েছে। এতে ছন্দের বিশেষ শৃঙ্খলা বন্ধনের মধ্যেও নানা রকমের গতি বা চাঞ্চল্য এসে নানা সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করেছে। মনে হয়, কবি সারাজীবন ধরে সংগীত ও নৃত্যনাট্য সাধনার মধ্য দিয়ে সুর-তাল-লয়-বিশিষ্ট যে ছন্দরূপের সাধনা করেছেন—এই সমস্ত মিলের ছন্দের ধ্বনিসুষমায় তারা যেন স্বতঃই ঝঙ্কৃত। 'বীথিকা' ও 'সানাই' কাব্যের অনেকগুলি কবিতাই তো গান।

ভাবছন্দের অনাড়ম্বর সহজ সাধনার পর শব্দছন্দের এই সমস্ত রকমারি পারিপাট্য কবির শিল্পসাধনা সম্পর্কে সকলের মনেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বার্ধক্যে কবি তাঁর পূর্বের উঁচুদরের কল্পনার স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অলস কল্পনার খামখেয়ালিপনাকে চরিতার্থ করতে গদ্যছন্দের অতি তুচ্ছ বাস্তব জগতে নেমে এসেছেন, অনেকের মনের এই সন্দেহের জবাব দিলেন যেন কবি এই সমস্ত গ্রন্থের চিত্তচমৎকারী ছন্দসৃষ্টির মাধ্যমে। বরং গদ্যছন্দের বিশেষ ধরনটি কবির পুরোপুরি আয়ত্তে আসায়, পদ্যছন্দের মধ্যে গদ্যের সহজ সাবলীলতাকে আনতে পেরেছেন। তাই এ সমস্ত কাব্যের বহু কবিতার মধ্যে যে 'মুক্তক' ছন্দ রয়েছে গদ্যের ভাষা বাচনভঙ্গি সবকিছুর সমবায়ে তা এত স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে যে 'বলাকা', 'পলাতকা'র ছন্দ থেকে তা কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১। শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত—'রবীন্দ্রনাথ' [৪র্থ সং, নবম পরিচ্ছেদ-৫, 'রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্যায়'—(২) পৃঃ ১৯৩]

পয়ারের ক্ষেত্রেও বহু অভিনবত্ব এনেছেন কবি। পর্বগঠনে চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষষ্ঠমাত্রিক নানারকম কলায় এদের সাজিয়েছেন এবং ১৮ মাত্রার দীর্ঘ চরণকে দুটি পঙক্তিতে ভেঙে অন্তে মিল রেখে সাজিয়ে বৈচিত্র্য এনেছেন। পঙক্তিবন্ধে এবং স্তবক-বন্ধে নানা ধরনের বৈচিত্র্যে লক্ষ্য করা যায়। অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিস্পন্দের মধ্যে যে সুরের একঘেয়েমি আছে তাকে পর্ববন্ধ, পঙক্তিবন্ধ এবং স্তবকবন্ধের বিচিত্র কলাকৌশলে সজ্জিত করায় সুরমাধুর্যে অভিনবত্ব এসেছে। "বাংলা ছন্দে তিনি যে কত অসংখ্য ভঙ্গিতে পর্ববন্ধ (বা পংক্তিগঠন) ও শ্লোকবন্ধ (বা Stanza) রচনার রীতি প্রবর্তন করেছেন, বাংলা ভাষার নিস্তরঙ্গ ছন্দে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) ও সুরমাধুর্য (melody) জাগিয়ে তুলেছেন, সে সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা না করলে বাংলা ছন্দে তাঁর দানের পরিমাণ যে কত বিচিত্র ও অফুরন্ত তার ধারণা করা যায় না।"[১]

'বীথিকা', 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যের বিচিত্র পর্ববন্ধ বা স্তবকবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়। 'বীথিকা'য় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র পর্ববন্ধ বা স্তবকবন্ধের রূপ লক্ষ্যগোচর হয়। 'আশ্বিনে' কবিতায়—

আকাশ আজিকে | নির্মলতম | নীল,
উজ্জ্বল আজি | চাঁপার বরণ | আলো ;
সবুজে সোনায় | ভূলোকে দ্যুলোকে | মিল
দূরে চাওয়া মোর | নয়নে লেগেছে ভালো।

এখানে ১৪ মাত্রার এক একটি পঙক্তি—মিল পর্যায়ক্রমিক—পব ষষ্ঠমাত্রিক ; পর্ববন্ধে বা স্তবকবন্ধে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। এরই পাশে ১০ মাত্রার পঙক্তিতে পয়ারের ছাঁদে গঠিত 'পত্র' কবিতাটি—

অবকাশ | ঘোরতর | অল্প,
অতএব | কবে লিখি | গল্প
সময়টা | বিনাকাজে | ন্যস্ত
তা নিয়েই | সর্বদা | ব্যস্ত।

অতি সাধারণ ছন্দ-বন্ধে রচিত। কিন্তু এদের পাশাপাশি 'জয়ী' অথবা 'মুক্ত' (বীথিকা) কবিতার পর্ববন্ধে বা স্তবকবন্ধে কত বৈচিত্র্য! 'জয়ী' কবিতায়—

রূপহীন বর্ণহীন | চিরস্তব্ধ নাই শব্দ সুর
মহাতৃষ্ণা মরুতলে | মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর

১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন— 'ছন্দোজিজ্ঞাসা' [পৃঃ ১৫৫

সে মহা নৈঃশব্দ্য মাঝে | বেজে ওঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঙক্তি ৮+১০ এইরূপ কলায় বিভক্ত—শেষ পঙক্তি ৬ মাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত পর্ব। পর্ব-চরণের এই মাত্রাবৈচিত্র্য বা পঙক্তিবৈচিত্র্য ছন্দের ধ্বনি-তরঙ্গেও যথেষ্ট অভিনবত্ব এনেছে তা স্বতঃই প্রমাণিত। অবার 'যুটু' কবিতাটিকে এর পাশে রাখলে দেখা যায়—

ফাল্গুনের পূর্ণিমায় | আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হল | অধীর মর্মর কলরবে।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে ;
আমাদের দূত হয়ে | তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে | বসন্তেরে করেছে আহ্বান।

এই স্তবকটি ছয়টি পঙক্তিতে বিন্যস্ত 'কুলকে'র নিদর্শন। ১ম, ২য় পঙক্তি এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ পঙক্তি ৮+১০=১৮ কলার তুটি পর্বে বিভক্ত এবং মাঝখানের ৩য় ও ৪র্থ পঙক্তি ১০ কলার সংক্ষিপ্ত পঙক্তিতে গঠিত। এই স্তবকবন্ধের মধ্যে ছন্দের স্বতন্ত্র এক দোলা পরিলক্ষিত হয়। এরই সঙ্গে তুলনা করলে 'পথিক' কবিতার পঙক্তিবন্ধে ও স্তবকবন্ধে কত অভিনবত্ব !

তুমি আছ বসি | তোমার ঘরের | দ্বারে
ছোটো | তব সং | সারে।
মনখানি যবে | ধায় বাহিরের | পানে
ভিতরে আবার | টানে।
বাঁধন বিহীন | দূর
বাজাইয়া যায় | সুর,
বেদনার ছায়া | পড়ে তব আঁখি | 'পরে,
নিঃশ্বাস ফেলি | মন্দ গমন | ফিরে চলে যাও | ঘরে।

পর্ববন্ধ ৬ মাত্রায় বিভক্ত হলেও পঙক্তিবন্ধে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় সেটি ছন্দের ধ্বনি-স্পন্দে চমৎকারিত্ব এনেছে।

এই ৬ মাত্রার পর্ববন্ধে 'নবজাতকে'র 'অবর্জিত' কবিতাটিও লেখা। কিন্তু ৬+৬+২ =১৪ মাত্রার ত্রিপদীকে এমন ভঙ্গিতে এমন পঙক্তিবন্ধে সজ্জিত করেছেন যে সুরমাধুর্যে আবার আর এক ধরনের নূতনত্ব এসেছে।—

আমি চলে গেলে | ফেলে রেখে যাব | পিছু
চিরকাল মনে | রাখিবে এমন | কিছু,
মূঢ়তা করা | তা নিয়ে মিথ্যে | ভেবে।
ধুলোর খাজনা | শোধ করে নেবে | ধুলো,
চুকে গিয়ে তবু | বাকি রবে যত | গুলো
গরজ যাদের | তারাই তা খুঁজে | নেবে।

মাত্রাবৃত্ত ঢঙের ছন্দেও পঞ্চমাত্রিক পর্ব বিভিন্ন কবিতায় দেখা গেলেও পঙক্তিবন্ধ স্তবকবন্ধের বৈচিত্র্যানুসারে ছন্দোস্পন্দে তারা স্বতন্ত্র দোলার সৃষ্টি করে। যেমন 'অন্তরতম' কবিতার—

আপন মনে | যে কামনার | চলেছি পিছু | পিছু
নহে সে বেশি | কিছু
মরুভূমিতে | করেছি আনা | গোনা
তৃষিত হিয়া | চেয়েছে যাহা | নহে সে হীরা | সোনা,
পর্ণপুটে | একটু শুধু | জল,
উৎসতটে | খেজুর বনে | ক্ষণিক ছায়া | তল,

এরই সঙ্গে তুলনা করলে (পাঠিকা—'বীথিকা') দেখা যায়—

বৃষ্টিভেজা | যে ফুলহার
শ্রাবণসাঝে | তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল | ঘেরি,
গন্ধ তারি | স্বপ্ন সম
লাগিছে মনে, | যেন সে মম
বিগত জন | মেরি।

এই কবিতাটির পর্ববিভাগও পঞ্চমাত্রিক। মনে হয় ত্রিপদীবন্ধকে এইরূপ পঙক্তিবিন্যাস করায় সুরঝঙ্কার ভিন্নতর হয়েছে। কিন্তু ঐ 'পাঠিকা' কবিতাটির ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ প্রভৃতি স্তবকগুলিতে স্তবকের প্রথমে একটি এবং শেষে একটি, আরও দুটি করে পঙক্তি অতিরিক্ত যুক্ত হয়ে একই কবিতার মধ্যে স্তবক গঠনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছে।

'বীথিকা'র 'নবপরিচয়' কবিতায় ৫+৪ মাত্রার সমবায়ে গঠিত মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ঢঙের ছন্দকে অভিনব একটি পঙক্তিবন্ধে পরিবেশন করা হয়; এতে ধ্বনিস্পন্দন আবার অন্য জাতের হয়েছে।—

জন্ম মোর | বহি যবে
খেয়ার তরী | এল ভবে
যে-আমি এল | সে-তরীখানি | বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু | বারে বারে
প্রথম হতে | জানি তারে
পরিচিত সে | পুরানো সব | চেয়ে।

'প্রণতি' কবিতাটির ছন্দোস্পন্দও 'নবপরিচয়' কবিতার অনুরূপ। কেবল পর্ববিভাগ 'নবপরিচয়'-এ ৫+৪ অসম ও সমমাত্রার সমন্বয়, কিন্তু 'প্রণতি' কবিতায় ৫+৫ করে মাত্রাবৃত্তের ঢঙে পঞ্চমাত্রিক পর্বে চরণগুলিকে সাজানো।—

প্রণাম আমি | পাঠানু গানে
উদয়গিরি | শিখরপানে
অস্ত মহা | সাগরতট | হতে

এর জন্য সমমাত্রিকের স্থিতিবোধ অপেক্ষা বিষমমাত্রার চাঞ্চল্য এসে একে বৈচিত্র্যমুখর ক'রে তুলেছে।

নব্যরীতির চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত 'বীথিকা'র 'উদাসীন' কবিতাটি চৌপদী-ত্রিপদীর সমবায়ে গঠিত হয়ে উদ্দাম চঞ্চল বেগে নেচে ছুটে চলেছে।—

তোমারে ডা | কিনু যবে | কুঞ্জ ব | নে
তখনো আ | মের বনে | গন্ধ ছি | ল
জানি না কী | লাগি ছিলে | অন্য ম | নে,
তোমার দু | য়ার কেন | বন্ধ ছি | ল।
একদিন | শাখা ভরি | এল ফল | গুচ্ছ,
ভরা অন | জলি মোর | করি গেল | তুচ্ছ,
পূর্ণতা | পানে আঁখি | অন্ধ ছি | ল।

আবার 'বনস্পতি' (বীথিকা) কবিতায় অক্ষরবৃত্ত মুক্তকের ঢঙকে লক্ষ্য করা যায়। এ কবিতার ধ্বনিপ্রবাহ 'বলাকা' ছন্দের অনুরূপ—

কোথা হতে পেলে তুমি | অতি পুরাতন
এ যৌবন, |
হে তরু প্রবীণ |
প্রতিদিন

জরাকে ঝরাও তুমি। কী নিগূঢ় তেজে,
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।

শেষজীবনের পদ্যছন্দে লেখা কাব্যগুলির মধ্যে 'বীথিকা' সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে মোটামুটিভাবে পদ্যছন্দের বিভিন্ন বন্ধের উপর রবীন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব প্রকাশিত এবং অভিনবত্ব সৃষ্টির যে সমস্ত প্রয়াস তা লক্ষিতব্য। এজন্যই 'বীথিকা' থেকে বিভিন্ন রূপের কবিতা সংগ্রহ করে দেখা গেল কী অজস্র সম্ভারে কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর দেহ ভূষিত করেছেন।

'সেঁজুতি' কাব্যের মধ্যেও বিচিত্র ছন্দের কবিতার বাস। প্রথম কবিতা 'জন্মদিন' 'প্রান্তিক' কাব্যের ন্যায় ১৮ মাত্রার পঙক্তিতে প্রবহমান পয়ারছন্দে লিখিত। কিন্তু তারপর নানা রকমের ছন্দ বিভিন্ন কবিতায় এসেছে। ছন্দের মধ্যে দোলা লাগাবার যে কত রকমের ভঙ্গি, মিলের নানা রকম কারিকুরিতে তার নেচে চলার ভঙ্গির মধ্যে কত যে মাদকতা তা সত্যিই পুলকিত বিস্ময় জাগায়।

দ্বিতীয় কবিতা 'পত্রোত্তরে'র (সেঁজুতি)—

দুঃখ পেয়েছি, | দৈন্য ঘিরেছে, | অশ্লীল দিনে | রাতে
দেখেছি কুশ্রী | তারে ;
মানুষের প্রাণে | বিষ মিশায়েছে | মানুষ আপন | হাতে
ঘটেছে তা বারে | বারে।
তবু তো বধির | করেনি শ্রবণ | কভু
বেসুর ছাপায়ে | কে দিয়েছে সুর | আনি,
পরুষ কলুষ | ঝঞ্ঝায় শুনি | তবু
চির দিবসের | শান্ত শিবের | বাণী।

ছন্দোবৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে মাত্রাবৃত্তের চাল লক্ষ্য করা যায়। ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব নিয়ে পঙক্তিগুলি গঠিত। পঙক্তি এবং স্তবক গঠনে এখানে মাঝে মাঝে যে পর্বের ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁকটুকুই নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। মাত্রাবৃত্ত ঢঙে ষণ্মাত্রপর্বিক মুক্তক বিশেষ নজরে আসে না। কারণ ৬ মাত্রার পর্বে মুক্তকের চটুল গতিটিকে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছন্দ নিয়ে খেলা করতে করতে রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে এমনই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে বিভিন্ন পর্ব সংস্থানের মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এ ছন্দকেও শেষ পর্যন্ত গতিশীল বা ধাবমান করে তুলেছিলেন।

'সেঁজুতি' কাব্যের 'যাবার মুখে' কবিতায় এই ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।—

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা | টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে | ধূলি পরে, চোরা
মৃত্যুই যার | অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু | ফাঁক |
যাক এ জীবন | পুঞ্জিত তার | জঞ্জাল নিয়ে | যাক।

এ কবিতার ধ্বনিস্পন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিমত যেন 'গড়িয়ে' চলেছে। এর প্রথম ৬টি লাইন আসলে ১০ পর্বের একটি বিরাট পঙক্তি। প্রত্যেকটি পর্ব ষষ্ঠ-মাত্রিক। এই বিরাট পঙক্তিটি কোথাও অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত নয়—সুতরাং এর গতি ছুটে চলার গতি। এই দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে কবির চরমতম সিদ্ধিলাভের নিদর্শন।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'ময়ূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুটি বাদে সমস্ত কবিতাই মুক্তবন্ধ ছন্দে রচিত। প্রত্যেক পঙক্তির শেষে অন্ত্যমিলটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ঐ দুটি কবিতা গদ্যছন্দে লিখিত।

'সানাই' কাব্যে তেমনি বলবৃত্ত মুক্তকের অমিল ও সমিল দুই রূপই সার্থকভাবে জন্ম নিয়েছে। বলবৃত্ত মুক্তকের সমিল রূপ 'পলাতকা' কাব্যেই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে এ ছন্দের মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা এসেছে।

'স্বল্প' (সানাই) কবিতার প্রথমাংশে পঙক্তিগুলিকে বিশেষ ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে অন্তে মিল রেখে চতুর্মাত্রিক পর্বে। চতুর্থ চরণটিকে দুইটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।—

জানি আমি, | ছোটো আমার | ঠাঁই
তাহার বেশি | কিছুই চাহি | নাই।
দিয়ো আমায় | সবার চেয়ে | অল্প তোমার | দান,
নিজের হাতে | দাও তুলে তো
রইবে অফু | রান।

অমিল বলবৃত্ত মুক্তকের প্রথম জন্ম হয় 'পুনশ্চে'র 'ছুটি' কবিতার মধ্যে। পরবর্তীকালে 'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল' ও 'পরিচয়' কবিতায় এই স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত অমিল মুক্তক ছন্দকে দেখতে পাওয়া যায়। 'পরিচয়' কবিতার মধ্যে অমিল বলবৃত্ত মুক্তক রচনার দক্ষতা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।—

অচিন কবি, | তোমার কথার | ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত | একটি ছায়া | ছবি,
স্বপ্ন ঘোড়ায় | চড়ে তুমি | খুঁজতে বেরি | য়েছ
তোমার মান | সীকে
সীমাবিহীন | তেপান্তরে।

বলবৃত্ত মুক্তকে পঙক্তিবন্ধে ও স্তবকবন্ধে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কবিতাকে যে কতটা গতিশীল ও লীলাসুন্দর করে তোলা যায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'সানাই' কাব্যের 'কর্ণধার' কবিতাটি।—

ওগো আমার | প্রাণের কর্ণ | ধার,
দিকে দিকে | ঢেউ জাগালো
লীলার পারা | বার
আলোকছায়া | চমকিছে
ক্ষণেক আগে | ক্ষণেক পিছে
আমার আঁধার | ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণি | মার।
ওগো কর্ণ | ধার
ডাইনে বাঁয়ে | দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মি | থ্যার।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হয় 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য়। এ সমস্ত কাব্যে অক্ষরবৃত্তের ঢঙটিই পুনরায় অনুসৃত। কিন্তু তার মধ্যেই নানা ধরনের বৈচিত্র্য এনে অভিনব করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। পর্ব গঠনের ক্ষেত্রে ৪, ৬, ৮, ১০ প্রভৃতি কলাকে অনুসরণ করেছেন কবি, কিন্তু প্রত্যেক পঙক্তিতে বা চরণে এমনকি একটি পঙক্তি বা চরণের বিভিন্ন পর্বে একই সংখ্যক মাত্রার পুনরাবৃত্তি নেই। বিভিন্ন কলার সমবায়ে গঠিত পর্বগুলিকে একই পঙক্তি বা চরণের মধ্যে পাশাপাশি ঠাঁই করে দেওয়ায় এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে পয়ারের বিশেষ গাম্ভীর্য এবং স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে নৃত্যের চাঞ্চল্যকে স্থান করে দিয়ে বিশেষ চমৎকারিত্ব আনার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া মিলের ব্যাপারেও কোথাও কোথাও পয়ারের প্রতি দুই চরণের মিল রক্ষার ন্যায় এখানেও মিল দেখা গেলেও সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়মে পঙক্তি বা চরণ গঠিত হয়নি। অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মুক্তক ছন্দে এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই রচিত। তাই ভাবের গতি অনুসারে 'ছেদ' ও 'যতি' চরণ থেকে চরণান্তরে এগিয়ে গেছে। কিন্তু

'বলাকা'র মত প্রত্যেক পঙক্তির শেষে মিল রক্ষা করা হয়নি। মিল রক্ষার জন্য দুই মাত্রা থেকে ১৬ বা ১৮ মাত্রা পর্যন্ত চরণ বা পঙক্তি বিন্যস্ত হয়নি। সব থেকে কম মাত্রার পর্ব দুই, চার। পয়ারের নির্দিষ্ট মাত্রাবন্ধনকে তিনি অনেক আগেই লঙ্ঘন করেছিলেন। যেমন পয়ারের ৮+৬=১৪, এই নির্দিষ্ট কলাকে অস্বীকার করে কবি ১০+৮=১৮, ১০+৬=১৬, ৮+৮=১৬ প্রভৃতি বিচিত্র কলায় পয়ারের ঢঙটিকে সাজান। এতে পয়ারের একঘেয়েমি নষ্ট হয়ে বৈচিত্র্য এসেছিল তাঁর কাব্যে অনেক আগে থেকেই।

'মানসী'র যুগ থেকেই ১৪ মাত্রাকে গতানুগতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এমনভাবে সাজান তাতেই ছন্দের ধ্বনির হের-ফের ঘটে বৈচিত্র্য এসেছিল।—

(১) ছিলাম নিশিদিন | আনমনে উদাসী
(২) পুরোনো সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে

প্রভৃতি চরণে মোট ১৪ মাত্রা ৭+৭=১৪ এইভাবে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু পর্বাঙ্গের সূক্ষ্ম বিচারে মনে হচ্ছে প্রথম চরণে ৭+৭ মাত্রা ৩+৪=৭, ৪+৩=৭, এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ৭ মাত্রা ৩+৪=৭, ৩+৪=৭ এইভাবে বিভক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র দোলার সৃষ্টি হয়েছে। দুটি চরণ পড়লেই বোঝা যায় প্রথম উদাহরণ থেকে দ্বিতীয় উদাহরণ কত স্বতন্ত্র! ছন্দের দোলও পয়ারের গতানুগতিকতা থেকে কত অভিনব!

শেষজীবনের এই সমস্ত কাব্যগুলিতেও কবি এই রকম বাঁধাধরা নিয়মকে মেনেও তার মধ্যে থেকে মুক্তিলাভের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। "এই জাতীয় কবিতার ছন্দের গতিতে বহু বৈষম্য ও বৈপরীত্য দেখা যায়; কিন্তু ছন্দের তাল ঠিক আছে। ছন্দের প্রধান লক্ষণ তার পদক্ষেপ। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরে যতির অস্তিত্ব এখানে সুস্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে মোটামুটিভাবে একটা নিয়মের আভাসও আছে। ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যত প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন, 'আরোগ্য', 'রোগশয্যায়' প্রভৃতি কবিতাগুলি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে ছন্দের গতি যথেষ্ট স্বাধীনতা পাইয়াছে। তবু যতির বহুল প্রয়োগের জন্য এবং ব্যতিরেক থাকা সত্ত্বেও মাত্রার সাম্যের জন্য পদ্যছন্দের স্বকীয়তা নষ্ট হয় নাই।"[১]

এই সমস্ত কাব্যের বিভিন্ন কবিতার প্রত্যেক চরণে ১৪ মাত্রাকে বা অন্ত্যমিলকে কবি স্বীকৃতি দেননি। এক-একটি চরণকে বিভিন্ন পঙক্তিতে সাজানো হয়েছে এবং এই পঙক্তি-বিন্যাসের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য রচনার বা অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস নেই। পয়ারের মত

১। শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত—'রবীন্দ্রনাথ'—'রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্যায়' [পৃঃ ১৮৮-৮৯]

পর পর পঙক্তিগুলি বিন্যস্ত হয়েছে, শুধু প্রতি পঙক্তি বা চরণে বা পর্বে পয়ারের মত নির্দিষ্ট মাত্রাসমতাকে মানা হয়নি। এই পঙক্তিগুলি ২ মাত্রা থেকে শুরু করে ৪, ৬, ৮, ১০ প্রভৃতি মাত্রাযুক্ত বিভিন্ন পর্বে গঠিত। সমমাত্রার পর্ব সবই। অনেকটা 'বলাকা'র মত কিন্তু পঙক্তিপ্রান্তিক মিলকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পঙক্তিবিন্যাসের মধ্যেও কোনো শিল্পসৌন্দর্যের আভাস নেই। পয়ারের মত ভাবের পরিসমাপ্তিও দুই চরণে ঘটেনি। এ সমস্ত কারণে ভাব তার সহজ সাবলীল প্রাণাবেগেই বহে গেছে। এর নাম হয়েছে অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মুক্তক ছন্দ। গদ্যছন্দের পথ বেয়েই বাক্‌ছন্দের এই বিশেষ রীতিটির জন্ম। ছন্দের কোনো কোনো বন্ধনকে স্বীকার করেও ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য এসেছে এর মধ্যে। "আধুনিক কবিও একথা ঘোষণা করেন যে কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য।···গদ্যছন্দই আধুনিক কবিতার প্রাণ নয়, আধুনিক কবিতার পরিচয় বাক্‌ছন্দ। প্রাত্যহিক বাচনের শব্দভঙ্গি, স্বরভঙ্গি আর শ্বাসক্ষেপভঙ্গি যে ছন্দে একত্রে বেঁধে নেওয়া যায়, সেই ত্রিবেণীর প্রতি আধুনিক কবিতার দৃষ্টি, যাকে ভুল করে কেউ গদ্যছন্দ ভাবেন। গদ্যছন্দ বা মুক্তছন্দ ঐ সিদ্ধির পথে অন্যতম উপায়, কিন্তু এর কোনোটাই একমাত্র পন্থা নয় এবং ইমেজিস্ট সদস্যরাও জানিয়েছিলেন যে তাঁরা মুক্তছন্দকেই কাব্যরচনার একতম প্রকরণ বলে দাবি করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকবিতার ছন্দের চেয়ে বরং তাঁর অন্ত্য-কবিতার ছন্দে এই বাক্‌রীতিকে অর্জন করেন আর একটু সার্থকভাবে 'প্রান্তিক'-এ কিংবা 'শেষলেখা'য়। বাক্যরচনার অতি সচেতন বিপর্যাস নেই, ছন্দ-অভাব মিটিয়ে নেবার জন্য অলংকার-চাতুর্যের প্রতি অনাবশ্যক পক্ষপাত নেই, অথচ আর্যমন্ত্রের উদাত্ততা এবং প্রাত্যহিকের বাচন সেখানে কত অনায়াসে সাযুজ্য পেল। এ-ও পূর্ণ অর্থে মুক্ত-ছন্দ নয়, কিন্তু তার সবচেয়ে সমীপবর্তী রূপ। এই রূপের দিকে দৃষ্টি থেকেই আমাদের আধুনিক ছন্দের জন্ম।"[১] সুতরাং অন্ত্যকবিতার ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে এক বিশেষ সিদ্ধির ক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন তা এই সমস্ত কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষার সংক্ষিপ্তি, দীপ্তি এবং ধ্বনিগাম্ভীর্য এর ছন্দকে দৃঢ় ভাবসমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভাষা ও ছন্দের এই বলিষ্ঠ সংহত রূপ এই ছন্দের মধ্যে চাঞ্চল্য অপেক্ষা গাম্ভীর্য এনেছে। কবির দীর্ঘ জীবনের ছন্দ-সাধনার এ এক চরমতম সিদ্ধি। কয়েকটি কবিতার আলোচনা করলেই কবির এই কৃতিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় আসা যায়। 'ছেদ' অধিকাংশ স্থলেই ভাবকে অনুসরণ করে যে-কোনো চরণের শেষে বসেছে।

'রোগশয্যায়' কাব্যের 'চার' সংখ্যকে—

অজস্র দিনের আলো, |
জানি একদিন |
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ |
ফিরায়ে নেবার দাবি | জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।

অথবা, 'নবম' (রোগশয্যায়) সংখ্যকে—

হে প্রাচীন তমস্বিনী ; |
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায় |
মনে মনে হেরিতেছি |
কালের প্রথম কল্পে | নিরন্তর অন্ধকারে।
বসেছ স্থষ্টির ধ্যানে |
কী ভীষণ একা, |
বোবা তুমি, | অন্ধ তুমি।

'আরোগ্য' কাব্যের 'প্রথম' সংখ্যকে তেমনি—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি |
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি |
এই মহামন্ত্রখানি, |
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

'জন্মদিনে'র 'সতের' সংখ্যকেও—

সেই পুরাতন কালে | ইতিহাস যবে |
সংবাদে ছিল না | মুখরিত |
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে।
আজিকার এই মতো | প্রাণযাত্রা কল্লোলিত প্রাতে।

অথবা, 'শেষলেখা' কাব্যের 'দুই' সংখ্যকে—

রাহুর মতন মৃত্যু, |
শুধু ফেলে ছায়া, |
পারে না করিতে গ্রাস | জীবনের স্বর্গীয় অমৃত |
জড়ের কবলে |
একথা নিশ্চিত মনে জানি।

এই সমস্ত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা ক'রলেই দেখা যায় এই চারখানি কাব্যের সমস্ত কবিতাই মোটামুটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাবিভাগকে অনুসরণ করেছে। অন্ত্যমিলের ব্যাপারে কোনো বিশেষ নিয়মকে মানেনি। দীর্ঘ চরণকে বিভিন্ন পঙক্তিতে ভেঙে কখনো তার মধ্যে মিল রক্ষা করেছেন, কখনো বা ভাবকে চরণ থেকে চরণান্তরে বইয়ে দিয়েছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ঢঙটিকে মোটামুটি অনুসরণ করা হলেও, ভাবের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য গদ্যছন্দের স্বতঃস্ফূর্ততা এ যুগের কাব্যগুলিকে সজীব করে তুলেছে।

(৪) 'বিচিত্রিতা', 'প্রান্তিক' ও 'প্রহাসিনী' কাব্যে ছন্দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এ-কারণে একই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলে এদের বিচার করা চলে না।

'বিচিত্রিতা'র ছন্দোস্পন্দও বহু বিচিত্র। অধিকাংশ কবিতার ছন্দ অবশ্য 'মুক্তক'। অন্ত্যে মিল রেখে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ঢঙে মাত্রাবিভাগ করে ভাব অনুসারে পঙক্তি গঠন করা হয়েছে এবং অর্থানুসারে ছেদ টানা হয়েছে। 'আরশি', 'হার', 'মরীচিকা', 'শ্যামলা', 'একাকিনী', 'প্রকাশিতা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'পুষ্পচয়িনী', 'যুগল', 'কালোঘোড়া', 'বিদায়' প্রভৃতি এই জাতীয় মুক্তবন্ধ ছন্দের দৃষ্টান্ত।

'প্রকাশিতা'র (বিচিত্রিতা)—

আজ তুমি ছোট বটে, | যার সঙ্গে গাঁঠ-ছড়া বাঁধা
যেন তার আধা।
অধিকার গর্বভরে
সে তোমারে নিয়ে চলে | নিজ ঘরে।

অথবা—

আমি থাকি একা, ।
এই বাতায়নে বসে | একবৃন্তে যুগলকে দেখা
সেই মোর সার্থকতা।
বুঝিতে পারি সে কথা।
লোকে লোকে | কী আগ্রহ অহরহ
করিছে সন্ধান
আপনার বাহিরেতে | কোথা হবে আপনার দান।

এ মুক্তক ছন্দ 'বলাকা'র অনুরূপ।

'বেসুর' ও 'ঝাঁকড়াচুল' কবিতা দুটি স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত ছন্দের ঢঙে দ্বিপদী ও ত্রিপদীর সমন্বয়ে গঠিত। চতুর্মাত্রিক পর্বে পঙক্তিগুলি বিন্যস্ত। 'বেসুর' কবিতার—

ভাগ্য তাহার | ভুল করেছে, | প্রাণের তান | পুরার
গানের সাথে | মিল হল না | বেসুরো ঝং | কার।
এমন ত্রুটি | ঘটল কিসে
আপনি ও তা | বোঝে নি সে,
অভাব কোথাও | নেই-যে কিছুই | এই কি অভাব | তার,

প্রথম দুই চরণ দ্বিপদী; পরবর্তী দুটি পঙক্তি এবং চতুর্থ চরণটিকে ত্রিপদীরূপে সাজানো যায়—আবার তৃতীয় দীর্ঘ চরণটিকে দুটি পঙক্তিতে বিভক্তও করা যায়। এরূপ স্তবক-বন্ধের নাম কুলক। 'ঝাঁকড়াচুল' কবিতাটিও একই ঢঙের।

'দ্বারে' (বিচিত্রিতা) কবিতাটির মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এক অপূর্ব পর্ববন্ধ, চরণবন্ধ-এবং স্তবকবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।—

একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে,
অতীতের দ্বার রুদ্ধ | তোমার পশ্চাতে
সেথা হল অবসান
বসন্তের সব দান,
উৎসবের সব বাতি | নিবে গেল রাতে।

এই স্তবকটি বিচিত্র পঙক্তি ও চরণে গঠিত। প্রথম দুই পঙক্তিকে একপদী বলে মনে হচ্ছে। প্রথম পঙক্তি ১০ মাত্রার; দ্বিতীয় পঙক্তি দুই পর্বের—১ম পর্ব ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার। ৩য় ও ৪র্থ পঙক্তি মনে হয় একটি ১৬ মাত্রার চরণকে দুটি ৮ মাত্রার পর্বে বিভক্ত করে অন্তে মিল রেখে দুটি স্বতন্ত্র পঙক্তিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম পঙক্তিটি দ্বিতীয় পঙক্তির অনুরূপ— ৮+৬=১৪ মাত্রার দুটি পর্বে বিভক্ত। পঙক্তি প্রান্তিক মিলও প্রথম ও দ্বিতীয়র সঙ্গে রক্ষিত। এ কবিতার প্রত্যেকটি স্তবকই ঐ একই রকম ভঙ্গিতে সজ্জিত। এইভাবে প্রচলিত ছন্দবন্ধের মধ্যে নানা রকম বৈচিত্র্যের দ্বারা স্বাদ বাড়ানো হয়েছে। পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা ছন্দে গাম্ভীর্য এনেছে।

'স্যাকরা' কবিতায় বলবৃত্ত পয়ার ছন্দের ঢঙটিকে লক্ষ্য করা যায়। ৪ মাত্রার ৩টি পর্বে প্রত্যেকটি চরণ গঠিত। কিন্তু প্রত্যেক চরণের শেষ পর্বটিকে একটি পঙক্তির আকারে খণ্ডিত করে ব্যবহার করায় একটি অদ্ভুত ধ্বনিস্পন্দের সৃষ্টি হয়েছে।—

কার লাগি এই | গয়না গড়াও।
যতন ভরে
স্যাকরা বলে, | একা আমার |
প্রিয়ার তরে।

'নীহারিকা' কবিতায় আবার মাত্রাবৃত্তের ঢঙ লক্ষ্য করা যায়। ৬ ও ৭ মাত্রার পর্বের সমন্বয়ে চরণগুলি গঠিত। দীর্ঘ চরণকে দুটি পঙক্তিতে ভেঙে সাজিয়ে এক-একটি স্তবক গঠিত হয়েছে। পঙক্তিপ্রান্তিক মিলগুলি কোথাও পারস্পরিক, কোথাও পর্যায়ক্রমিক।—

বাদল শেষের | আবেশ আছে | ছুঁয়ে
তমাল ছায়া | তলে,
সজনে গাছের | ডাল পড়েছে | নুয়ে
দিঘির প্রান্ত | জলে
অস্তরবির | পথতাকানো | মেঘে
কালোর বুকে | আলোর বেদন | লেগে ;
কেন এমন | ক্ষণে
কে যেন সে | উঠল হঠাৎ | জেগে
আমার শূন্য | মনে।

'যাত্রা', 'কন্যাবিদায়' (বিচিত্রিতা) প্রভৃতি আবার ভিন্ন ধরনের কবিতা। অনেকটা সনেটের ভঙ্গি। ছেদ ও যতি চরণের যে-কোনো স্থানে পড়েছে। 'যাত্রা' কবিতায় ১৮ মাত্রার চরণকে বিভিন্নভাবে ভেঙে ভেঙে সাজানো হয়েছে।

'কন্যাবিদায়ে' (বিচিত্রিতা) চোদ্দ মাত্রার সহযোগে গঠিত পঙক্তিতে ছেদ ও যতি ভাব অনুসারে চরণ থেকে চরণান্তরে এগিয়ে গেছে। কিন্তু পঙক্তিগুলিকে ৮+৬, বা ৬+৮ এভাবে মোটামুটি সাজিয়েও কোনো কোনো স্থানে ১০+৪, কিংবা ৪+১০ করে সাজানো হয়েছে। অমিত্রাক্ষর থেকে এর মাত্রাবিভাগে বৈচিত্র্য এসেছে। পঙক্তি-প্রান্তিক মিলকেও রক্ষা করা হয়েছে। এ-ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে এ ছন্দকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। মাত্রাসমতাকে ঠিক রেখে শুধু চরণ বা পঙক্তি সাজানোর নানা ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে পয়ার ছন্দের যে কত রকম স্পন্দন আনা যায়—রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনের কাব্যগুলিতে তার চরম পরীক্ষা করে গেছেন। 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলির পরিকল্পনাও যেমন বিচিত্র ভাবকল্পনা থেকে জন্ম নিয়েছে, তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রেও ছোট কাব্যখানি নানা বৈচিত্র্য এনে সুরমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে।

'প্রান্তিকে'র ছন্দে সনেটীয় ভঙ্গিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তা বলে সনেটের ন্যায় ১৪ চরণেই পরিসমাপ্তি হয়নি বা সনেটের 'অষ্টক'-'ষটকে'র বন্ধনকেও স্বীকার করেননি। প্রত্যেক পঙক্তিতে ১৮ মাত্রার চালকে রক্ষা করে গেছেন।

'প্রথম' সংখ্যকে—

বিশ্বের আলোকলুপ্ত | তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, | জীবনের দিগন্ত আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি | স্তরে স্তরে দিল ধৌত কবি
ব্যথার দ্রাবক রসে, | দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে | দৃঢ় হস্তে নিঃশব্দ মার্জনা

বিষয়বস্তু কবির অন্তর্জীবনের গভীর গম্ভীর এক বেদনাময় অভিজ্ঞতা। পঙক্তির শেষে মিল রক্ষা করা হয়নি। ভাব চরণ থেকে চরণান্তরে বহে চলেছে। এরই মাঝে কোনো কোনো কবিতায় অন্ত্যমিলটিকে বজায় রেখে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা।—

যাবার সময় হল | বিহঙ্গের এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি | ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। | শুষ্কপত্র জীর্ণপুষ্প-সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে | যাবে উড়ে রজনী প্রভাতে
অন্তসিন্ধু পরপারে।

[১৪ সং—প্রান্তিক]

দুটি কবিতায়ই ১৮ মাত্রাকে ৮+১০=১৮ এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু ১৪ সংখ্যকে অন্ত্যমিলটিকে বজায় রাখা হয়েছে।

'প্রহাসিনী'র অধিকাংশ কবিতাই পয়ারের ন্যায় মিত্রাক্ষর বন্ধনে আবদ্ধ। প্রতি চরণের মাত্রা সমত ও বিশেষ নিয়মে শৃঙ্খলিত। তবে প্রতিটি কবিতা একই ছন্দবন্ধে রচিত নয়।

প্রথম কবিতা 'আধুনিকা'য়—

চিঠি তব | পড়িলাম, | বলিবার | নাই মোর,
তাপ কিছু | আছে তাহে, | সন্তাপ | তাই মোর।

১৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পয়ারে রচিত। প্রতি চরণে চারটি করে চার মাত্রার পর্ব। চার মাত্রার এই পর্ববিভাগের জন্য মাত্রাবৃত্তের সুরধর্মিতা অপেক্ষা এ ছন্দকে কেটে কেটে উচ্চারণ করায় স্বতন্ত্র ধ্বনিস্পন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

'রঙ্গ' কবিতায় স্বরবৃত্ত পয়ারের চালটি লক্ষ্য করা যায়—

এ তো বড়ো | রঙ্গ, জাদু, | এ তো বড়ো | রঙ্গ
চার মিঠে | দেখাতে পার | যাব তোমার | সঙ্গ

বরফি মিঠে | জিলাফি মিঠে | মিঠে শোন | পাপড়ি
তাহার অধিক | মিঠে, কন্যা, | কোমল হাতের | চাপড়ি

মাত্রাবৃত্ত পয়ারও (১৬ মাত্রার) চতুর্মাত্রিক পর্বে কত সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করেছে তাঁর হাতে তার নিদর্শনও শেষবয়সের কবিতার মধ্যে রয়ে গেছে | 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতায়—

সকলের | শেষ ভাই
সাতভাই | চম্পার
পথ চেয়ে | বসেছিল
দৈবাৎ | কম্পার।

'পলাতকা' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ঢঙে রচিত। ত্রিপদীর প্রথম দুই পদকে পর পর সমান্তরালভাবে সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ১০ মাত্রার পঙক্তিকে ৪+৪+২ =১০ এইভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এ সমস্ত কারণে মাত্রাবৃত্তের চাঞ্চল্য অপেক্ষা সুরের ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য এসেছে।—

কোথা তুমি | গেলে যে মো | টরে
শহরের | গলির কো | টরে,
একজামি | নেশনের | তাড়া
কেতাবের | পরে ঝুঁকে | থাক,
বেণীর ড | গাও দেখি | নাকো,
দিনে রাতে | পাইনে যে | সাড়া।

'গৌড়ীরীতি' (প্রহাসিনী) কবিতায় ২০ মাত্রার চরণকে দুই পঙক্তিতে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় পঙক্তির সঙ্গে চতুর্থের মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার ১২ মাত্রার প্রথম পঙক্তিতে সব সময়েই ৬ ও ১২ মাত্রার শেষে অপর একটি মিল বজায় রেখেছেন। মাত্রাবৃত্ত ঢঙে এই ষন্মাত্রিক পর্বের পয়ারটির উৎকর্ষ লক্ষ্য করবার মত।

নাহি চাহিতেই | ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি | থলি,
লোকে তার 'পরে | মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই | বলি।

'মাল্যতত্ত্ব' কবিতাটি বলবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। ৪ মাত্রার পর্ববিভাগে বিভক্ত সমিল মুক্তক।

লাইব্রেরিঘর | টেবিলল্যাম্পো | জ্বালা,
লেগেছি প্রুফ | -করেকশনে | গলায় কুন্দ | মালা
ডেস্কে আছে | দুই পা তোলা, | বিজন ঘরে | একা,
এমন সময় | নাত্‌নি দিলেন | দেখা।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বিভিন্ন কবিতার পর্ববন্ধ, চরণবন্ধ, স্তবকবন্ধের আলোচনা থেকে এইভাবে দেখা যায় যে, প্রচলিত সমস্ত বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করে ছন্দের ক্ষেত্রে নানা রকমের মাধুর্য আনার চেষ্টা করে গেছেন কবি প্রথম জীবন থেকেই। শেষপর্যায়ের কাব্যে এসে সেই সিদ্ধি বা সফলতা যেন সম্পূর্ণতা পেয়েছে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। ছন্দের এই বিচিত্র রূপকল্প আমাদের অতি পরিচিত চেনাশোনার জগৎকে নিত্যনূতন অনুভবে অনুপম করে তোলে। অতি পরিচিত বিষয়ও এর আচ্ছাদনে বিন্যস্ত হয়ে অভিনব রূপ নিয়ে দেখা দেয় আমাদের চেতনলোকের কাছে। "ছন্দের আচ্ছাদন বস্তুজগতের স্বাভাবিকতাকে পাল্টে দেয়, পাল্টে দেয় আমাদের চেতনলোকের স্বাভাবিকতা, বস্তুজগৎ চেতনার জগতে সে আনে ছন্দহীনতা, আনে বিশৃঙ্খলা।"[১] সুতরাং ছন্দের এই নিত্যনূতন রূপসজ্জায় মণ্ডিত হয়ে কাব্যও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় ভাবসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দ সাধনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বহুমুখী ছন্দ-রচনার মাঝে।

শেষপর্যায়ের কাব্যের শিল্পরূপ অলঙ্কার/ভাষা

॥ শিল্পরূপ ॥

বহিরঙ্গের দিক থেকে ছন্দকে বাদ দিলে কাব্যের আরও নানা দিক থাকে—তার শিল্পরীতি, অলঙ্কার ও ভাষা। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাব, ভাষা—এই সবকিছুর সুষ্ঠু সার্থক প্রকাশেই শিল্পসৃষ্টি রসনিষ্পত্তি লাভ করতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরীতি, অলঙ্কার বা ভাষার আলোচনা প্রথম যুগের কাব্য থেকে করলেই দেখা যায়, তাঁর আদিপর্বের কাব্যশিল্পে তিনি ভারতীয় এবং বাংলা ভাষার

১। চতুরঙ্গ—ত্রৈমাসিক পত্রিকা [কার্তিক—পৌষ ১৩৭৮, বর্ষ ৩৩—সম্পাদক হুমায়ুন কবির প্রবন্ধ—"ছন্দ" : শ্রীঅশোক সরকার পৃঃ ১৭৯]

ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিলেন; শুধু স্বীকার করেননি, বহুস্থানে অনুকরণও করেছেন। প্রাচীন কবিকুলের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিগণ এবং পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই তাঁর রচনার ভঙ্গিতে, ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগে পড়েছিল। তাছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, বায়রন—এঁদের প্রভাবও কাজ করে গেছে গোপনে তাঁর শিল্পচেতনায়।

বাঙালীচিত্তের এবং গীতিকবির স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কবি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং তাঁর প্রথম দিককার রচনায় এই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা অনেকস্থানে রচনার সংহতিতে অতিশয়োক্তি দোষ ঘটিয়েছে। কখনো কখনো অতিকথন, ভাবের আবেগধর্মিতা কবিতার সুষ্ঠু পরিণতিতে বাধার সৃষ্টি ক'রে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ভাবের ক্ষেত্রে কাব্যের মধ্যে এই অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা আতিশয্য কবির বিপুল সৃষ্টি-সম্ভারের মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। প্রথম দিককার রচনায় এই ত্রুটি পরিমাণে অনেক বেশি। "বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার দ্রুত পরিণতির পথে দুটি বিশেষ বাধা ছিল। প্রথমত, বাংলা সাহিত্যে কোনো সুদীর্ঘ, সুদৃঢ় কাব্য-ঐতিহ্যের অভাব এবং দ্বিতীয়ত সূক্ষ্ম আভাসময় উচ্চাঙ্গের লিরিক রচনার প্রয়োজনের অনুপাতে সেকালের বাংলাভাষার আপেক্ষিক অপরিণতি।"[১]

অথচ ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, রচনাশিল্পের গাঢ় সংহত বাক্‌ভঙ্গিতে তাঁর বহু কবিতা এমন শিল্পগৌরব লাভ করেছে যা পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ভাবের গভীরতায়, উপলব্ধির আত্মস্থতায় মনুষ্যহৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বোধের এমন কোনো দিক নেই যা কবির বাণীনৈপুণ্যে ধরা পড়েনি। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে এবং মানবজীবনবোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে—সমস্যাগুলিকে তিনি কী নিপুণ জাদুকরের মতই না অলৌকিক প্রতিভাস্পর্শে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিভিন্ন চিত্রসমবায়ে তাদের নানা ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতির পথপার্শ্বে নাম-না-জানা ছোট্ট ফুল থেকে শুরু করে বিরাট নক্ষত্রলোকের অজানিত রহস্য তাঁর কল্পনার জাদুতে ধরা পড়ে মুখরিত। মানব সভ্যতার আদি-অন্ত-দেশ-কাল অনালিঙ্গিত সত্যবোধ কবির চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে ক্ষণকালীন জীবযাত্রার ইতিহাসকে মূল্যবান করে তুলেছে। এই জীবনের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্যের বিচিত্র জীবনচেতনাকে কল্পনাবলে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে সকলের হৃদয়দ্বারে

১। শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ—"রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ" [প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/নভেম্বর—১৯৬৯
[প্রবন্ধ : রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য—২ পৃঃ ৬২]

পৌঁছে দিয়েছেন কবি। এই সামগ্রিক অখণ্ড জীবনবোধ আবার ভাবে-ভাষায় সার্থক শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে চিরকালের মানুষের মনের কথা রূপে নন্দিত।

যে অ-লৌকিক 'জাদুস্পর্শে' কবির এই অখণ্ড জীবনবোধ এবং বিশ্বজনীন সর্বানুভব, আর বিশ্ববিমোহিত প্রকৃতিপ্রেম কাব্যোৎকর্ষ লাভ করলো তা হলো কবির অসামান্য প্রকাশক্ষমতা। এই প্রকাশক্ষমতা একা ভাব নয়—ছন্দ নয়—অলঙ্কার নয়—ভাষা নয়—এ সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পসাধনা। এই শিল্পসাধনার চরমতম সার্থকতার তীর্থে পৌঁছাতে তাঁকে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। মহৎ শিল্পিজীবনের এই সুদুর্লভ সিদ্ধি অনায়াসলভ্য নয়—বা দু'একদিনের সামান্য চেষ্টা নয়। প্রথম থেকেই তাঁর অকুণ্ঠ অধ্যবসায় এবং শিল্পসচেতন জীবনবোধ একটি জাগ্রত মনন তাঁকে দান করেছিল। সেই সদাসতর্ক সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা এই বিরাট প্রতিভাকে শিল্পসিদ্ধির এক অপার্থিব রহস্যলোকে পৌঁছে দিল।

কিন্তু প্রথমযুগের কাব্যসাধনা থেকে লক্ষ্য করলে এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা ক্রমবিকাশকে দেখতে পাওয়া যায়। কবি যে ভাষা নিয়ে, শিল্পরীতি নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা চালিয়েছেন, তা তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যধারার শিল্পরূপ এবং ভাষার ক্রমবিবর্তনকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। 'প্রভাত-সংগীতে'র সূচনায় কবি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"মনের মধ্যে নানাভাব আন্দোলিত হলেও, 'এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয়নি, তখনও পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ।...এ সমস্ত লেখার আর কোনো মূল্য থাকলেও সে ষোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।"[১]

'ছবি ও গানে'ও যে "অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো-ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয়নি"[২]—এ সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ সচেতন। এর পর 'মানসী' যে পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নানা দিক দিয়ে বিশেষতঃ শিল্পের দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর তা কবির ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা' থেকেই জানা যায়—"কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[৩]

এই শিল্পপ্রচেষ্টা যে 'সোনার তরী' থেকে ক্রমশঃই সার্থকতার এক-একটি ধাপকে অতিক্রম করে করে শেষ পর্যন্ত শিল্পসিদ্ধির একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা 'বলাকা', 'পূরবী', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'সানাই', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের বিশিষ্ট কবিতার

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'প্রভাত-সংগীত' [জন্মশতবার্ষিক সং ১ম খণ্ড সূচনা পৃঃ ৪০]
২। ঐ —'ছবি ও গান' [জন্মশতবার্ষিক সং ১ম খণ্ড সূচনা পৃঃ ৮১]
৩। ঐ —'মানসী' [জন্মশতবার্ষিক সং ১ম খণ্ড সূচনা পৃঃ ১১৬]

আলোচনা করলেই ধরা পড়ে। ভাষার জড়তা, রচনার শৈথিল্য, অলঙ্করণের বাহুল্যকে কাটিয়ে কবি তখন এমন এক শিল্পবোধে প্রতিষ্ঠিত যে, যে-কোনো রকমের সৃষ্টি তাঁর করতলগত। অনায়াসলভ্য হয়েছে তাঁর বাক্‌ভঙ্গি; ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার আপনা থেকে এসে ধরা পড়েছে তাঁর বাণীসুষমায়। স্বতঃস্ফূর্ত বাচনভঙ্গি আপনিই শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে ভাবকে গতিদান করেছে। কেবল অ-লৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি বলেই নয়, অসাধারণ সুরশিল্পী ও চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর শিল্পিমনের যে সুরবোধ এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিভা—ভাষার রূপনির্মিতির ক্ষেত্রে তাঁর এই সমস্ত গুণাবলীও কাব্যের বাণীসুষমাকে ব্যঞ্জনাধর্মী ও চিত্রধর্মী করে তুলেছে। শৈল্পিক প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাবের অনুসঙ্গী হয়ে ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, রচনাভঙ্গী আপনিই যেন বন্দী হয়েছে তাঁর হাতে। তাই প্রথম যুগের কাব্যসাধনায় যে সযত্ন প্রয়াস অতি আবশ্যিক ছিল, পরবর্তীকালে তা অনায়াসলভ্য হয়। অলঙ্কার, ভাষা এ-সবের আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

॥ অলঙ্কার ॥

কাব্যে অলঙ্কারের আলোচনা করতে গেলেই কাব্যের ক্ষেত্রে এর স্থান কতখানি, প্রয়োজনীয়তা কি, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। 'অলঙ্কার' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা করলেই দেখা যায় অলঙ্কার হচ্ছে সাজসজ্জার বাহ্যিক উপকরণ। এর থেকেই বলা চলে এ কাব্যের দেহ নয়, আত্মা তো নয়ই—অঙ্গসজ্জা। সুতরাং নিরাভরণ রূপও যদি কাব্যের রসনিষ্পত্তি ঘটাতে পারে, তাহলে এর প্রয়োজনীয়তা কি?

প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নানা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাদেব সংজ্ঞা ও জাতিনির্ণয়ও করেছেন। ধ্বনিকার অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

রসক্ষিপ্ততয়া যস্যবন্ধঃ শক্যক্রিয়োভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌমতঃ॥

ধ্বন্যালোক, ২।১৭

'-রস কর্তৃক আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইলে যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত একই প্রযত্নে যাহা সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহাই ধ্বনিশাস্ত্রে অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।'

এখানে অলঙ্কারের দুইটি লক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, রসক্ষিপ্ততা ও অপৃথগ্‌যত্ন-সম্পাদ্যতা। প্রকৃতপক্ষে লক্ষণ দুইটি নহে, একটিই মাত্র; কেননা, ফলতঃ

উভয়ই এক। অলঙ্কার রসদ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপ-সৃষ্টির পথে অলঙ্কারকে আকর্ষণ করে, অথবা অলঙ্কার যেন রসের রূপে পরিণতির পথে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অতএব রস ও অলঙ্কার মহাকবির অপৃথক যত্ন বা একক প্রযত্ন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এইজন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কার ভিন্ন বস্তু হয় না, উপমাদি অলঙ্কার বাচ্যস্বরূপ হইয়া রসময় রূপ সৃষ্টি করে।"[১]

কাব্য সমালোচকও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রসিকের দৃষ্টি নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কারের স্থান এবং শেষপর্যায়ের কাব্যে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অধ্যক্ষ শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' (২য় সং ভাদ্র ১৩৬৩, পৃঃ ॥৶০) গ্রন্থের আলোচনার একস্থানে বলেছেন—"অলঙ্কার বাইরের থেকে এসে সাহিত্যের রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে না; মানুষের স্বভাবেই তার জন্ম। অলঙ্কারের নাম পর্যন্ত যে কখনো শোনে নাই এমন নিরক্ষর মানুষও নিত্যকার প্রয়োজনসাধনের ভাষায় অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করে থাকে। চাঁদপারা ছেলে, আমার সাত রাজার ধন সাগরছেঁচা মাণিক, মুখটি শুকিয়ে যেন আমচুর হয়ে গেছে, বিত্তের সাগর—এমন শত শত উপমা, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, রূপক চলতি কথাবার্তায় অহরহ শোনা যায়। এরাই স্বচ্ছন্দ গতিতে সাহিত্যে আসে। মানুষের শিক্ষা, রুচি, প্রকাশশক্তির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরাও বিবর্তিত হতে থাকে বিচিত্রভাবে।"

বাস্তবিক অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মনের যে সুন্দরের অনুভব তাকেই আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে চাই। ভাবের একটি প্রত্যক্ষ সত্যরূপ আঁকতে চাই। কিন্তু ভাবকে রূপ দেবে তো ভাষা; সেই ভাষা সম্পর্কেও সকলের বোধ সমান নয়। ঠিক কি ভাবে বললে বা বোঝালে অর্থাৎ ঠিক ছবিটি কেমন করে আঁকতে পারলে মানুষের চিত্তকে যে সে আকর্ষণ করতে পারবে এবং রসবোধ জাগাতে সমর্থ হবে, তার জন্যেই বস্তুজগৎ থেকে কবি নানা উপমা হাতড়ে বেড়ান। এর মধ্যে থেকে উপমান উপমেয় সংগ্রহ করে রূপগত বা গুণগত সাদৃশ্য খাড়া করে আমাদের বোধের মধ্যে তাকে ধরতে চান। অব্যক্ত ভাবকে যখন ব্যক্তরূপে প্রকাশ করার বাসনা জাগে তখনই তাকে আশ্রয় নিতে হয় এমনি সাজসজ্জার। যাকে আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, অনুভব করি, তাকেই মনের মত করে সজ্জিত করতে চাই। মা তাঁর সন্তানকে সাজান মনের মত করে; ভালোবাসার ধনকে আমরা অলঙ্কারে সজ্জিত করে দেখতে ভালোবাসি,

১। সুধীর দাশগুপ্ত—'কাব্যালোক', [২য় সং পৌষ, ১৩৬৫, "শব্দ ও অর্থ"—পৃঃ ৩১২]

তার একটি সুসজ্জিত প্রকাশও দেখতে চাই। অনুভবকে এই বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দেখার প্রবৃত্তির মধ্যেই মানুষের মনের অপার্থিব আনন্দবোধ এবং রসবোধ সংগুপ্ত। এর থেকেই মানুষের মন বিভিন্ন শিল্পের জন্ম দিয়েছে। অপ্রয়োজনের আনন্দবোধ থেকেই এদের জন্ম। এছাড়া······"ভাবকে রসরূপ দান করতে হলে, আবেগানুভূতির তীব্রতা তার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হলে কাব্যে অলঙ্করণের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে, 'Try to be precise, you are bound to be metaphorical.' (J. Middleton Murry)

বিশেষকে নির্বিশেষ সার্বজনীনত্ব দান, তুচ্ছকে অসামান্য মহিমা দান করার জন্যও অলঙ্কারের সাহায্য নিতে হয়।······

···ভাবকে প্রত্যক্ষতা দান, অমূর্ত (abstract) ভাবকে মূর্ত (concrete) করে তোলা, বর্ণনাতীত সৌন্দর্যব্যাকুলতাকে বচনীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন অলঙ্কারের।"[১]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্পর্কে নানা আলোচনা করে গেছেন। তিনি তো কেবল কবিতা লেখেননি, সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁর দান অফুরন্ত। সাহিত্যের তথ্য, সত্য, উপকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, তাৎপর্য, ভাষা—এ সমস্ত নানা বিষয় নিয়ে তিনি বহু আলোচনা সমালোচনা করে গেছেন। কাজেই অলঙ্কারের আলোচনায় এ সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় মতামতও কম মূল্যবান নয়। কাব্যের অলঙ্কার সম্বন্ধে কবি একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে অলঙ্কার হচ্ছে 'ছবি'। "···কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।···উপমা রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।"[২] কবি অন্যত্র বলেছেন—"অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ" ('সাহিত্যের পথে' : রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড 'সাহিত্যধর্ম' পৃঃ ৪০২)। অপর একটি প্রবন্ধেও কবি বলেছেন—"কাব্যের আর একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা।···খুশি হয়েছি···এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। ···যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।"[৩]

কবির এই সমস্ত মন্তব্য থেকে কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" : [অলঙ্করণ ও শিল্পীমন—পৃঃ ৩০-৩১]
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্য" [জন্মশতবার্ষিকী সং ১৩শ খণ্ড : সাহিত্যের তাৎপর্য—পৃঃ ১৩৮-১৩৯]
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যের স্বরূপ' [জন্মশতবার্ষিকী সং ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৫১০-৫১১]

ধারণায় আসা যায়। "অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য"[১]—সেই রসের কথাটা ব্যক্ত করতে হয় কারুকাজে। কত তার ইশারা—কত তার আড়াল—কত তার সুষমা!

কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে কবি অলঙ্কার প্রয়োগে প্রাচীন ভারতীয় কবিদের এবং বাংলা সাহিত্যের তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের অনেক ক্ষেত্রেই অনুকরণকরেছেন। সে-জন্য বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত উপমান-উপমেয়কে গ্রহণ করে প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী অলঙ্কার নির্মাণ করেছেন। কবির স্বকীয়তা সেই যুগে ততখানি সুস্পষ্ট হয়নি, যতখানি তা গতানুগতিক এবং পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু কৈশোর-যৌবনের এই অনুকরণপ্রিয়তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে কবি নিজেও লজ্জাবোধ করেন নি। বরং এই আত্ম-সচেতনতাই সমস্ত জড়তাকে কাটিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁকে একটি স্বকীয় আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর সারস্বত সাধনা তাই পরবর্তীকালে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল —"রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার ব্যবহার ভাষার ভূষামাত্র নয়, ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের শব্দশক্তির জ্যোতিঃপ্রকাশ।"[২] এই কারণেই "প্রচলিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের খুঁটিনাটি সূত্র মিলাইয়া রবীন্দ্রকাব্যের অলংকরণ রীতির আলোচনা সমীচীন নহে।"[৩]

বাস্তবিক অলঙ্কার তাঁর 'ভাষার ভূষামাত্র নয়'—'শব্দশক্তির জ্যোতিঃপ্রকাশ,—একথা অত্যন্ত সত্য। কাব্যের যে চমৎকারিত্ব আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে, তা তত্ত্ব নয়, ভাব নয়, বিষয় নয়, কবির বিশেষ বাচনভঙ্গি যা শব্দসুষমার সুষ্ঠু প্রয়োগে জন্মলাভ করে। এই শব্দসুষমাও নির্ভর করে শব্দশক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষমতার উপর এবং তা ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে অলঙ্কৃত ভাষার যথার্থ প্রয়োগে। কবির মতে তাই—"ভাবের ভাষা যদি কিছু অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলঙ্কার থাকে উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।"[৪]

শব্দশক্তির প্রয়োগ পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের হাতে তাই এমন বৈচিত্র্য এবং গভীরতায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে, যাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শ দিয়ে ক্ষণকালের বিশেষ দুর্লভ মুহূর্তেই এর যথার্থ মর্ম হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। বিচিত্র ভাবের কত বিচিত্র প্রকাশই না ঘটেছে তাঁর

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যের পথে' [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড প্রঃ ১৩৫৪
সাহিত্য ধর্ম—পৃঃ ৪০২]

২। শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত—'রবীন্দ্রকাব্য ভাষা', [প্রকাশ ১৯৬১ পৃঃ ১৯৭]

৩। শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত—'রবীন্দ্রকাব্যভাষা' [প্রকাশ ১৯৬১, পৃঃ ১৯৭]

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বাংলাভাষা পরিচয়' [রবীন্দ্র-রচনাবলী—জন্মশতবার্ষিকী সং ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৪৪৭]

বাণীভঙ্গিতে। অলঙ্কারের কত সাবলীল প্রকাশ একে সূক্ষ্ম গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছে।

"শিল্পীর সজ্ঞান মানস কর্ষণার ফলশ্রুতি রূপেও অনেক সময় কাব্যে অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুভূতি বাণীবদ্ধ হবার সময় কবির অন্তরের অবচেতন প্রবাহ থেকেও তা স্বতোৎসারিত হয়।

স্রষ্টার মানসোৎকর্ষের উপর অলঙ্কারের চারুত্ব নির্ভর করে, কবির প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যের বিভূতি অলঙ্কারকে দ্যুতিসমুজ্জ্বল করে তোলে, প্রথাগত জীর্ণ অলঙ্কার লাভ করে নবত্ব।

কাব্যে প্রযুক্ত অলঙ্কাররাজি কবির আন্তরজীবনের পরিচয়বাহী কিনা—এ প্রশ্নও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। উত্তরে হয়তো বলা যায় যে কবির আন্তরজীবন ও বহির্জীবনের, ব্যক্তি ও কবির, তাঁর ধ্যান ও মননের সঙ্গে কবির কাব্যে প্রযুক্ত অলঙ্কার সমূহের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। 'Style is the man'—এই সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত।"[১]

অলঙ্কারের চিরাচরিত প্রয়োগরীতিকে প্রথম দিকে অধিকমাত্রায় গ্রহণ করলেও ক্রমশঃ কাব্যের আত্মাকে তিনি এমনভাবে নিজের শিল্পিমনে একাত্ম করে নিয়েছিলেন যে, অতি অনায়াসেই উঁচুদরের আলঙ্কারিক হয়ে উঠলেন। এই একাত্মতাবোধ কেবল পরীক্ষা প্রয়োগ বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে নয়—শিল্পিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে। পরিণত বয়সের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে অলঙ্কার তাই কাব্যের বা ভাষার স্বতন্ত্র কোনো রূপসজ্জা বা ভূষণমাত্র নয়—তাঁর দেহ এবং আত্মার মিলিত সৌন্দর্যসত্তা, যাকে রাবীন্দ্রিক সুভাষিত বলা যায়। এই অলঙ্কারের সার্থক অভ্যাগমে যে চিত্র এবং চিত্রকল্প কাব্যের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে তার উৎকর্ষবোধের মধ্যেই শিল্পীর যথার্থ পরিচয়।

রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগের প্রতি কবির পক্ষপাত সব সময়েই সমান নয়। কোন সময় পক্ষপাত অধিক—কোন সময়ে অপেক্ষাকৃত কম।

কাব্যসাধনার প্রাথমিক যুগে আত্মানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির যুগে অলঙ্কার রচনা অত্যন্ত গতানুগতিক—কবিমানসের বিশেষ অনুরক্তি বা স্বকীয়তা একে দীপ্তিমান করে তুলতে পারেনি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম ও সৌন্দর্যোপাসনার যুগে ('মানসী'—'ক্ষণিকা') যেমন অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বৈচিত্র্যে অভিনবত্বে এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিতে কবির অসাধারণ বাক্‌সিদ্ধির পরিচয়বাহী।

অধ্যাত্মভাবনার যুগে আবার অলঙ্কার ব্যবহারের প্রতি তেমন অনুরাগ দেখা যায় না। কিন্তু 'পলাতকা'য় 'মাটি মায়ের কোলে' যখন আবার প্রত্যাবর্তন করলেন কবি, তখন

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—'রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার' [পৃঃ ৩৪-৩৫]

জেগেছে আবার অলঙ্কারের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু শেষপর্যায়ে এসে আবার অলঙ্কারের প্রতি দেখা দিয়েছে অনীহা।

হৃদয়ের অমূর্ত ভাবকে কবি অলঙ্কারের সাহায্যেই মূর্ত করে তোলেন। শব্দের সাহায্যে কবি এই অমূর্ত ভাবকে প্রত্যক্ষতা দান করেন। ভাষা বা শব্দ দুইভাবে কাব্যে রসের ব্যঞ্জনা বয়ে আনতে পারে—এক, শব্দের ধ্বনিরূপে—এর আশ্রয়ে গড়ে ওঠে শব্দালঙ্কার; আর, অর্থের সাহায্যে প্রাণ পায় ভাষার চিত্ররূপ, অর্থালঙ্কারে যার পরিপূর্ণ চমৎকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই দুই রূপের সাধনাতেই সিদ্ধপুরুষ। ভাষার ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ তাঁর বাক্‌প্রতিমায় সার্থক ভাবে ধরা পড়েছে। শব্দের বাহ্যিক পারিপাট্যের মধ্যে দিয়ে যে শব্দালঙ্কারের জন্ম তার মধ্যে অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। এর আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের কাছে। কিন্তু সুররসিক কবি শব্দের এই ধ্বনিমাধুর্য যে কী নিগূঢ় স্পন্দন তুলতে পারে তার নূপুরের বোলে, তার বহু প্রমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রেখে গেছেন তাঁর সমগ্র জীবনের রচনাসম্ভারে। যেমন—

চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ

['আবির্ভাব'—ক্ষণিকা]

অথবা,

কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি, ['বর্ষামঙ্গল'—কল্পনা]

এ সমস্ত চরণের অর্থদ্যোতনা আমাদের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসবার আগেই তার সুরধ্বনি কান এবং মন মাতিয়ে তোলে। কবির মধ্যযুগের কাব্যসাধনায় এই অনুপ্রাস-বৈশিষ্ট্য ছন্দের ক্ষেত্রে এমন প্রভাব এনেছে যে, ভাব এবং ধ্বনিগাম্ভীর্য অপার্থিব রহস্যবোধে অভিভূত করে দেয় পাঠককে। যেমন—

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিলরেখা লুটিল চারিপাশ। ['সাগরিকা'—মহুয়া]

অথবা,

ধরা নাহি দিলে ধরিব দুপায়
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রূপায়— ['পুরস্কার'—সোনার তরী]

অথবা,

নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎচঞ্চলা। ['উর্বশী'—চিত্রা]

এইরূপ বহু উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখানো যেতে পারে অনুপ্রাস শুধু একই বর্ণের অথবা শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উচ্চারণে নয়, শ্রুতিগত ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যেসব ধ্বনি-সাদৃশ্যে তাদের খুব বেশি কাজে লাগিয়েছেন কবি। এর ফলে ভাষার ধ্বনিপ্রাণতা কবির ক্রমশঃ এমন অনুশাসনে এসেছে যে, বর্ণধ্বনি বা শব্দধ্বনির এই অনুপ্রাসধর্মিতা শেষ পর্যায়ের বহু কবিতার ছন্দের অভাবকে পূরণ করে একটা অলক্ষ্য ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করেছে। যেমন—

একপারে বালুর চর,
নির্ভিক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত ['কোপাই'—পুনশ্চ]

অথবা,

বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মত। ['কোপাই'—পুনশ্চ]

অথবা,

রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিলরেখায়
['খোয়াই'-পুনশ্চ]

অথবা, বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস।
['চার-সং' —শেষ সপ্তক]

এ সমস্ত অনুপ্রাসের জন্য কবিকে সযত্ন প্রয়াস করতে হয়নি; এরা যেন ভাবের অনুসঙ্গী হয়ে ভাষার প্রবাহে আপনিই লেখনীমুখে এসে গেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর শব্দশক্তির প্রাণসম্পদ।

অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে অর্থের দিক থেকে শব্দ কাব্যকে চিত্রধর্মী ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে তোলে। "রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা প্রধানতঃ চিত্রধর্মী। তাঁর কল্পনা যে চিত্রসৃষ্টিশীল সে কথা জানার জন্য তাঁর চিত্রকলায় যাবার প্রয়োজন নেই, কাব্যেই তার অজস্র সাক্ষ্য"।[১] শব্দালঙ্কারে শব্দের পরিবর্তন ঘটালেই অলঙ্কারের নিশ্চিত মৃত্যু কিন্তু অর্থালঙ্কারে প্রতিশব্দ ব্যবহারের দ্বারাও অলঙ্কারটিকে বজায় রাখা যায়। অর্থালঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে

১। শ্রীঅমলেন্দু বসু—"রবীন্দ্রায়ণ"—[১ম খণ্ড ১৯৬১ শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত "সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র" : রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা পৃঃ ১৬৪]

নানাভাবে—"বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে, বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে, ভাববাচক বিশেষ্যকে বস্তুবাচক রূপে, অথবা ব্যক্তিবাচকরূপে, অচেতনে মনুষ্যচেতনার আরোপ করে। এ ছাড়াও বিশেষণ বিপর্যস, ক্রিয়া বিপর্যস অথবা এক ইন্দ্রিয়ের গোচররূপে প্রকাশ, বিরোধাভাস, অঙ্গের অথবা অংশের স্থানে অঙ্গী অথবা অংশী, টাইপের পরিবর্তে ব্যক্তি······রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিমান অলঙ্কারের বিপুল ঐশ্বর্য।······উপমা ও রূপকের প্রকাশে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহারে অথবা সমাস-প্রয়োগে রবীন্দ্ররীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব।"[১]

উপমা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। একটি উপমেয় বা উপমান খাড়া করে কবি একের পর এক তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিত্রযোজনা করে গেছেন।

"রবীন্দ্রনাথ কবি এবং মূলতঃ প্রকৃতির কবি। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের তিন-চতুর্থাংশ প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের কথাচিত্র। এই চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কবি প্রধানত সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার ব্যবহার করেছেন: "সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার কবি-পাঠক উভয়েরই যে এত প্রিয়, তার প্রধান কারণ এরা চিত্রধর্মী ভাবকে মূর্তিমান করে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।"[২] ('অলঙ্কারচন্দ্রিকা': শ্যামাপদ চক্রবর্তী)

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি যেন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "কালিদাসের যেমন 'উপমা' রবীন্দ্রনাথের তেমনি 'উৎপ্রেক্ষা'। বিচিত্র অর্থালঙ্কারের মধ্যে 'উৎপ্রেক্ষা' এমন একটি অলঙ্কার মায়ারূপ রচনার পক্ষে যার ব্যবহার অপরিহার্য।······'উপমা'য় বর্ণিতব্য চিত্র বা বিষয় স্পষ্টতর হয় সত্য, কিন্তু উৎপ্রেক্ষায় চিত্র শুধু স্পষ্টতর হয় না, মায়ারূপের অর্থাৎ রহস্যময়তার স্বপ্নরোমাঞ্চে হয় লীলাসুন্দর। উপমায় উপমানের ঔজ্জ্বল্যে উপমেয়টি নবরূপ ধারণ করে বটে, তবু উপমানের সঙ্গে তার ভেদটি, পার্থক্যটি থেকেই যায়। উৎপ্রেক্ষায় এই ভেদটি থাকে না। উপমানের রূপস্বপ্ন উপমেয়তে আরোপিত হয়ে উপমেয়কে অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়টিকে অভাবনীয় দিব্যোজ্জ্বল্যে অভিনব করে তোলে।"[৩]

সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তি অলংকার প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। প্রথমযুগে কবিচেতনা প্রকৃতির সঙ্গে আপন সত্তার যে যোগসূত্রটি আবিষ্কার করেছিল—তার মধ্যে রোমান্টিক ভাবনাই প্রধান ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে অধ্যাত্মভাবনার প্রভাবে প্রকৃতির

১। শ্রীসুনন্দা দত্ত—"রবীন্দ্রকাব্য-ভাষা" [প্রঃ ১৯৬১]
অলঙ্কার [পৃঃ ১৯৯, ২০০, ২০১]

২। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" [পৃঃ ৪৯]

৩। শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রনাথের মহুয়া" [পৃঃ ১৬০]

যে প্রাণময়তার সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছেন তা তাঁর সুগভীর ধ্যান ও মনন কল্পনার ফলশ্রুতি। প্রকৃতির একটি সজীব সত্তা-কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে—মানুষ ও প্রকৃতিকে ভাবের জগতে একাকার করে দিয়ে কবি বহু চিত্র কল্পনা করেছেন। এর ফলে এত বেশি বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে যে কাব্য যেন জীবন্ত মূর্তি ধারণ করেছে। প্রকৃতির এই জীবনময়তা সমাসোক্তি অলংকারের মধ্যে দিয়ে এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যে চিরাচরিত সাদৃশ্য কল্পনার মধ্যেও কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা প্রোজ্জ্বল। "সেইজন্য সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিয়েও কবি রবীন্দ্রনাথ সমাসোক্তি রচনার সময় তাঁর মৌলিক প্রকৃতিচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সমাসোক্তি অলঙ্কার তাই পূর্বজ সংস্কৃত কবিগণের কাব্যের সমাসোক্তি থেকে স্বরূপত ভিন্ন; সংস্কৃত অলঙ্কারে তা মূলতঃ আরোপিত, অপরপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যে তা কবির মর্মগত প্রত্যয়ের অভিজ্ঞান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে সমাসোক্তি অলঙ্কারের জীবনময়তার কথা উল্লেখযোগ্য।"[১]

সাধারণভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রথম যুগের কাব্যে সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তির বহুল প্রয়োগ—কবিকল্পনার আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তাই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে কবির মননকল্পনা এলায়িত ভাবকে সংযত, সংহত-নিটোল রসঘন শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য 'মানসী'র পর থেকে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে শুধু অজস্রতা নয়—সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এ যুগের অলঙ্কার সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের অমূল্য সম্পদ। "দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে গুণক্রিয়াগত অপ্রত্যাশিত সাধর্ম্য আবিষ্কারের চকিত বিস্ময়ই অলঙ্কারকে দীপ্ত করে তোলে" ('রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার'—জটাধারী মালাকার, পৃঃ ৭৯)। রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্যায়ে এইরূপ অপ্রত্যাশিত চমকের চকিত বিস্ময় আমাদের ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত করে তোলে। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে শব্দচিত্র অঙ্কন করেছেন তা তাঁর সৃষ্ট রঙ তুলির চিত্র অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নয়। 'মানসী'র প্রথম দিকের অলঙ্কারে গতানুগতিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। কবি-কল্পনার অভিনবত্বের দ্যুতিতে তা সমুদ্ভাসিত নয়। কিন্তু অনুভূতির নিবিড়তা, উপলব্ধির গভীরতা ও অকৃত্রিমতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত আবেগ কবিকে ক্রমশঃ সুনিশ্চিত আত্মপ্রত্যয় দান করেছে; ফলে অলঙ্কার নির্মাণে তাঁর শিল্পিমনের দক্ষতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই ছন্দের মত অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কবি ক্রমশঃ স্বনির্ভর ও শক্তিমান হয়ে উঠেছেন। 'মানসী'র ব্যঞ্জনাগর্ভ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কবিপ্রতিভার হিরণদ্যুতির স্পর্শে তা এমন লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে যে কবিকল্পনার স্বনির্ভরতা এবং মনোভঙ্গিটুকু লক্ষ্য করবার মতো।

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" [পৃঃ ১৪৯]

পরবর্তী কাব্য 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালীর' যুগে কবিভাবনার ঊর্ধ্বায়ণ চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। সমাসোক্তি-স্বভাবোক্তি অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথ এর আগে অজস্র রচনা করেছেন কিন্তু তারা অনেক সময়ই বিবৃতি সর্বস্বতার উধ্বে উঠতে পারে নি—কিন্তু এ কাব্যে তার স্বতঃস্ফূর্ততা এমন স্বাভাবিক হয়েছে যে কবির 'আনন্দিত আত্মার রসবিলাসের চিত্র' বলে এগুলিকে ধরে নেওয়া যায়।

উপমা-রূপকের ক্ষেত্রেও কবির স্বকীয়তা দার্শনিক প্রত্যয় ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রোজ্জ্বল। এজাতীয় অলঙ্কার সিদ্ধির পরিচয় এর আগের কাব্যে দেখা যায়নি। উপমান-উপমেয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বা নির্বিশেষ থেকে বিশেষে যে সঞ্চরণ তাতে কবিভাবনা প্রত্যক্ষতা লাভ করে অনন্য হয়ে উঠেছে। রূপকের অভেদ কল্পনার ক্ষেত্রেও কবিকল্পনা প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে।

সোনার তরীর ন্যায় চিত্রায়ও কবি-কল্পনার দীপ্তি অলঙ্কারকে বর্ণবহুল করে তুলেছে।

চৈতালীর পর অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অজস্রতা যেমন কমেছে—তেমনি তার হিরণদ্যুতিও অনেকটা নিষ্প্রভ।

নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগে বাইরের দিক থেকে ছন্দ-অলঙ্কারের স্থান পূরণ করেছে অনেকটা সুরমাধুর্য—আর ভাবের দিক থেকে মনন-কল্পনা এবং দার্শনিক জীবন-জিজ্ঞাসা প্রাধান্য লাভ করায়—অলঙ্কার সম্পর্কে কবির অমনোযোগ খুবই স্বাভাবিক।

"স্মরণের কবি যে সকল অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন সেগুলি প্রধানত প্রথাস্মৃত, ঐতিহ্য পরম্পরায় আগত, এবং বহু ব্যবহারের ফলে বিবর্ণপ্রায়।

...গতানুগতিকতার উধ্বে উঠতে না পারার জন্য এই সমস্ত অলঙ্কার নূতন কোন রসাবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি"।[১]

'উৎসর্গে'র অনুপ্রাসের হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অলঙ্কারের ক্ষেত্রে রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত বলেই মনে হয়।

'উৎসর্গে'র পর 'খেয়া' কাব্যেও বিভিন্ন অলঙ্কারের রূপসৌন্দর্যের ও গুণোৎকর্ষের বিচার করলে দেখা যায় কবি পূর্ববর্তী ঐশ্বর্যের যুগের তুলনায় কোনো অংশে ন্যূন নহেন। সমাসোক্তি অলঙ্কারের মধ্যে প্রকৃতি-প্রেমিক কবির মনের যোগটি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে।

'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ' যুগের কাব্যগুলির অলঙ্কার শিঞ্জনমুখর নয়, ভাবৈশ্বর্যে মন্থর। কিন্তু কবি-কল্পনা আবার পরিচিত ধরণীর দিকে ডানা মেলেছে—কাজেই

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" [পৃঃ ১১৪]

অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং বর্ণাঢ্যতাও লক্ষ্য করার মত। 'বলাকা'য় জগৎ ও জীবনের মধ্যে দিয়ে কবি যে চৈতন্যলোকের মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন সেখানে অভেদাত্মক রূপক ও প্রাণচেতনার সজীবতায় মূর্ত সমাসোক্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মত। রূপকের তুলনায় উপমা অলঙ্কারের সংখ্যা স্বল্প হলেও সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। উৎপ্রেক্ষা রচনাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

'মহুয়া' কাব্যে প্রণয়ের সাধনবেগের সঙ্গে সঙ্গে প্রসাধন কলাও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। 'বনবাণী'তে স্বভাবতঃই সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রাচুর্য—'পরিশেষ'-এ কবি স্মৃতিচারণ করেছেন আপন শৈশব-জগতে। সমাসোক্তি ও ভাবিক অলঙ্কার তাই এখানেও দীপ্তিময়। কবি-কল্পনার বর্ণাঢ্যতা এখনও অম্লান। বার্ধক্যের অলস কল্পনা কবির লেখনীকে পঙ্গু করে তোলেনি। বর্ণালি ছবি আঁকায় তাঁর লেখনী আজও সমান সক্রিয়।

শেষপর্যায়ে এসে গদ্যচ্ছন্দ কাব্যের বাহন হয়েছে যে সমস্ত কাব্যে, সেখানে কাব্যের আলঙ্কারিক দিকটা কবি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে হাল্‌কা করতে চেয়েছেন—দ্বিতীয়ত কবির ভাষায় এরা 'বসন্তের ফুল নয় প্রৌঢ় ঋতুর ফসল (সূচনা, নবজাতক), সুতরাং বাইরের দিক থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' কিন্তু এ সমস্ত কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে কবির এ যুগের কাব্যগুলিতে অলঙ্কার বিষয়ানুগামিনী কিন্তু একেবারে বর্জিত নয়। এবং পদ্যের আটপৌরে রূপের মধ্যে 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা'র প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করলেও অলঙ্কারের দিক থেকেও 'পুনশ্চ' 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র কোনো কোনো কবিতা রূপসৌন্দর্যের দ্যুতিতে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য কল্পনার জন্য কখনো বাস্তব জগতের সাধারণ বিষয়বস্তু থেকে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের চিত্র গ্রহণ করেছেন। কখনো বা প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন আবার কখনো বা গতানুগতিকের আবরণে তা ম্লান হয়ে গেছে।

এ যুগের অলঙ্কার সম্বন্ধে সমালোচকের এই মন্তব্যকে সাধারণভাবে যথার্থ বলে মনে হয়—"সৃষ্টির যে অবাধ রসোল্লাস আমরা রবীন্দ্রকাব্যের অন্যান্য অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি—এখানে তার স্ফূর্তি যেন কিছু পরিমাণে মন্থরগতি; প্রৌঢ় ঋতুর ফসল বলেই বুঝি বা কল্পনার সেই হিরণদ্যুতি এখানে কিছুটা নিষ্প্রভ। কাব্যলক্ষ্মীকে গদ্যের সাজ পরাতে গিয়ে কবি তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বলে মনে হয়। তাই নূতনত্বের চমক থাকলেও 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে'র সুর এখানে তেমন করে ধ্বনিত হয়নি। কাব্যরীতির অভিনবত্ব ও কবির কাব্যবিমুখ মনোভাব তাই তাকে অপরীক্ষিত নূতন

সাদৃশ্য চিন্তায় নিয়োজিত করেছে।…এদের পশ্চাতে মনন-কর্ষণার সন্ধান-প্রয়াস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্যের যুগে ('সোনারতরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা') বিভিন্ন জাতের অলঙ্কারে যে সমস্ত উপমান-উপমেয়কে ব্যবহার করেছেন তা অনেক স্থানেই ঐতিহ্যানুসারী। শেষপর্যায়ের কাব্যে এরা নিটোল বস্তুমূর্তি ও ভাবমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের এমন তুচ্ছ বস্তুজগৎ থেকে কবি উপাদান সংগ্রহ করেছেন যে, কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের স্বচ্ছন্দ অধিকারকে দেখে বিস্ময় জাগে। ভাষার এবং অলঙ্কারের এই সহজতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই গদ্যচ্ছন্দের বাণীভঙ্গিতে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। কবি এখন অলঙ্কার নির্মাণের জন্য আকাশ-বাতাস হাতড়ে বেড়াচ্ছেন না, বা সবসময় প্রাচীন কবিদের প্রসিদ্ধ উপমান-উপমেয়কে গ্রহণ করছেন না—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই সে সব উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ পর্যায়ের বিভিন্ন জাতের অলঙ্কারের আলোচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', শ্যামলী', 'সানাই', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা', প্রভৃতি কাব্যের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করলেই তাদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগকুশলতার তাৎপর্যটিকে লক্ষ্য করা যায়।

এ যুগের কিছু কিছু উপমা অলঙ্কার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই উপমান-উপমেয়কে সংগ্রহ করে নিয়ে অভিনব স্বাদ বয়ে এনেছে—

(১) বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো।

[কোপাই-পুনশ্চ]

(২) এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়-সওয়ার বর্গিসৈন্যের মত।

[খোয়াই-পুনশ্চ]

(৩) পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো

[শিশুতীর্থ-পুনশ্চ].

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" [পৃঃ ১৮৬-১৮৭]

(৪) অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো,
রাত্রিকে দেবে ফেনিল করে।

[১সং-পত্রপুট]

(৫) যেতেই হবে
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।

[বাসাবদল-সানাই]

(৬) আমার ছুটি চারদিকে ধূ ধূ করছে
ধান কেটে নেওয়া খেতের মতো।

[৩ সং-পত্রপুট]

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এই সমস্ত উপমা অলঙ্কারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় কত সাধারণ ক্ষেত্র থেকেই না কবি তাঁর উপমা সংগ্রহ করে কাব্যের অঙ্গসজ্জা রচনা করেছেন। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র গদ্যচ্ছন্দের খাতিরেই যে অলঙ্কার দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার আভরণে অঙ্গসজ্জা করেছে তা নয়, ভাষা-ভাব-জীবনবোধ কবির এমন স্বচ্ছ হয়েছে যে কাব্যের জাত বাঁচিয়ে তাকে আর বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, প্রাত্যহিক জীবনবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্ষার যৌবনশ্রীপূর্ণা মাত্‌লা নদীর সঙ্গে 'মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ে'র তুলনা (কোপাই-পুনশ্চ), ঘোড়-সওয়ার বর্গিসৈন্যের সঙ্গে কালবৈশাখী ঝড়ের তুলনা (খোয়াই-পুনশ্চ), মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের সঙ্গে পাহাড়তলির অন্ধকারের তুলনা (শিশুতীর্থ-পুনশ্চ)—রবীন্দ্র-সাহিত্যে সত্যিই অভিনব উপমা। এ সমস্ত উপমার সাধর্ম্য আবিষ্কারে মনন-কর্ষণা যতখানি কাজ করেছে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাস' ততখানি নয়।

গদ্যকাব্যগুচ্ছ ছাড়াও কবিতা যেখানে বিভিন্ন ছন্দের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়েছে শেষপর্যায়ের সেই সমস্ত কবিতাতেও অলঙ্কার বহু সময় সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে।

কিন্তু কখনো কখনো উপমান-উপমেয়ের সাধর্ম্য আবিষ্কার এমন ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে যে, সৌন্দর্যসৃষ্টির সহায়করূপে এ সমস্ত অলঙ্কারের চমৎকৃতিতে মন ভরে যায়।

অলস মন্থর গড়িয়ে-চলা দিনের খুঁড়িয়ে-চলা গতির সঙ্গে ব্যাণ্ডেজে বাঁধা খোঁড়া পায়ের চলার সঙ্গে তুলনা (বাসাবদল-সানাই) সত্যিই অভিনব—ব্যবহারে এবং ভাবকল্পনায়।

তেমনি ধান-কাটা ক্ষেতের রিক্ততা-শূন্যতা নিঃস্বতার সঙ্গে অলস কর্মহীন মন্থর ছুটির দিনগুলির তুলনা (৩ সং-পত্রপুট) নূতন স্বাদ বয়ে এনেছে কাব্যজগতে।

এই পর্যায়ের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে।—

(১) মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।

[খোয়াই-পুনশ্চ]

(২) জামরুল গাছে ধরেছে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।

[উৎসর্গ-শ্যামলী]

(৩) ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।

[তেঁতুলের ফুল-শ্যামলী]

(৪) আল্‌গা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতই যেন বলি-পড়া ললাট।

[যাত্রাপথ-আকাশপ্রদীপ]

কিন্তু কখনো কখনো সমাপ্তির যুগের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারগুলি অন্যান্য সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের বিচারে বহুস্থানে কাব্যগন্ধী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে অভিনবত্বেরও দাবি করতে পারে।

(১) হাওয়া উঠেছে শিশিরে শিরশিরিয়ে
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা

[ছুটির আয়োজন—পুনশ্চ]

(২) কচি শ্যামল তার রঙটি ;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।

[৩০ সং—শেষ সপ্তক]

(৩) আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা।

[নিমন্ত্রণ—বীথিকা]

সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে প্রকৃতির সঙ্গে কবি-প্রাণের সহজ মিতালির পরিচয় মেলে। বহু মনোজ্ঞ চিত্রের সমাবেশে তারা অনেক স্থানে সার্থক হয়ে উঠেছে।

সমাসোক্তি অলঙ্কারের কয়টি উদাহরণ—

(১) তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধূলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা।

[মুক্তি—পুনশ্চ]

(২) শিউলি ফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পূজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

[পয়লা আশ্বিন—পুনশ্চ]

(৩) ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।

[আসা-যাওয়া—সানাই]

(৪) মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাগার কুঞ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়

[৮ সং—রোগশয্যায়]

স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের দু'একটি নিদর্শন—

(১) কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল, রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।

* * *

ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধ-গন্ধ।

[৪ সং—শে. স.]

(২) আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচি ধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।

[মুক্তি—বীথিকা]

(৩) ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে।

* * *

সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা।

[স্বপ্ন—শ্যামলী]

প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত অলঙ্কার তাকে যেন সজীব করে তুলেছে। মাঝে মাঝে পরিপূর্ণতার সার্থকতায় মন স্বভাবতঃই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এও সেইসঙ্গে "লক্ষণীয় যে রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যান্য যুগের বিভিন্ন কাব্যের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রগুলির মধ্যে এক গূঢ় ঐক্যানুসন্ধানী উৎসুক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে শিথিল এলায়িত চেতনার লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি পরিস্ফুট; কবি যেন এখানে খণ্ডেই সন্তুষ্ট, খণ্ডকে অখণ্ডে গাঁথার উদ্যম নিঃশেষিত।"[১]

রূপক অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায়, অভেদ কল্পনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো সনাতনী ভাব-কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন—মাঝে মাঝে কিছু কিছু চিত্র উচ্চাঙ্গের না হলেও বিরল বলে এদের স্বাদে নূতনত্বের আমেজ আছে।—

১। শ্রীজটাধারী মালাকার—"রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার" [পৃঃ ১৯২]

(১) ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

[কোপাই—পুনশ্চ]

(২) ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।

[৪ সং—শে স]

(৩) সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে

[৩ সং—পত্রপুট]

(৪) সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে
মাটিতে বাতাসে।

[স্কুল-পালানো—আ প্র]

(৫) গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা
প্রাণ হোথা বোবা।

[জল—আকাশপ্রদীপ]

শেষপর্যায়ের কাব্যের 'প্রান্তিক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা'য় ভাবের উর্ধ্বগামিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অলঙ্কারও অনেক সময় প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই গতানুগতিক—বহু ব্যবহারের মালিন্য এদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।—

(১) হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।

[৬ সং—প্রান্তিক]

(২) এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

[৭ সং—প্রান্তিক]

(৩) প্রাণীকত এসেছিল
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে

[১১ সং—রোগশয্যায়]

(৪) আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি, কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।

[২৬ সং—রোগশয্যায়]

(৫) পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।

[৫ সং—জন্মদিনে]

(৬) যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য-শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,

[২১ সং—জন্মদিনে]

ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সমস্ত অলঙ্কারে যে গুরুগম্ভীর চিত্র যোজনা হয়েছে তার রূপসৌন্দর্য সনাতনী। কিন্তু সাধু ও চলিত ভাষার এখানে যেমন আত্মিক মিলন ঘটেছে, তেমনি উপমান-উপমেয়রূপে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেছেন, প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী হয়েও তা কবির নিজস্ব প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

অলঙ্কারের সুষ্ঠ চিত্রাঙ্কন তখনই সম্ভব যখন কবির ভাষার পরে আত্যন্তিক জ্ঞান থাকে। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

॥ ভাষা ॥

ভাষা প্রতীকের কাজ করে। সুতরাং মানুষের মনের বিচিত্র ভাবকল্পনার এবং বহির্বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে ভাষাই একের হৃদয়ের অব্যক্ত রূপটিকে ব্যক্তরূপে প্রকাশ করছে। ভাব মনের মধ্যে কেঁদে মরলেও ভাষা-ভারতীর

প্রসাদ না পেলে যে কোনোকিছু করবার নেই, তা কবি প্রথম যুগেই বুঝেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই প্রাচীন, নবীন, দেশী-বিদেশী সমস্ত ভাষার বুৎপত্তি অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের প্রচলিত অর্থ, যথার্থ অর্থ, কাব্যের বিশেষ ব্যবহারে অর্থের হেরফের এ-সব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। "শব্দের প্রচলিত অর্থের বাচকতা সীমাবদ্ধ। তাই শব্দার্থকে কখনো প্রসারিত কখনো সংকোচিত, কখনো বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপে কবিসাহিত্যিকেরা প্রয়োগ করেন। শব্দের অর্থান্তর রবীন্দ্র সাহিত্যে বিচিত্রভাবে সাধিত হয়েছে।"[১]

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনার সময় বৈষ্ণবপদাবলীর টীকা-টিপ্পনী নিয়ে তিনি কিরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে খাতা বোঝাই করেছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে। তারপর সুদীর্ঘ ৬৫ বছর ভাষার কারবার ক'রতে ক'রতে তিনি প্রত্যেকটি শব্দের সুর ধ্বনি ধারণ ও বহন ক্ষমতা সম্পর্কে এত বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, পরবর্তীকালে কাব্যের প্রয়োজনে নিজেই কিছু কিছু শব্দের জন্ম দিয়েছেন। কাব্যের খাতিরে ভাষার এই রূপান্তর ঘটানো যে কিছুমাত্র অন্যায় নয়, বরং শব্দশক্তির বলবৃদ্ধির চরম পরীক্ষা, এবং আমাদেরও মনের দিক থেকে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে সম্পর্কে কবির মতামতকে স্মরণ করা যেতে পারে--

"মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ, দুঃখ, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ।...কিন্তু সুখ, দুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়, উর্ধ্বে যায়; তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে।"[১]

হৃদয়ের সূক্ষ্ম বোধকে বাহ্যিক রূপ দেবার জন্যই ভাষা-নৈপুণ্যের প্রয়োজন। কবি একে বোঝানোর জন্য একস্থানে বলেছেন—

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে

['তথ্য ও সত্য'—সাহিত্যের পথে]

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা'—[শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬]॥ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ॥
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রপ্রয়োগে শব্দের অর্থান্তর' [পৃঃ ৬৫]—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বাংলা ভাষা পরিচয়'—[জন্মশতবার্ষিক সং—১৪শ খণ্ড]। প্রবন্ধ ৪ [পৃঃ ৪৪৭]

এই 'জুতুয়া' শব্দটি কোনো অভিধানের পাতায় নেই। মায়ের ভালোবাসা খোকাকে ঘিরে যে একটি স্বতন্ত্র হৃদয়বোধের জগৎ নির্মাণ করেছে, সেখানেই এই 'জুতুয়া'র জন্ম। এইভাবে মানুষ তার হৃদয়ের বিচিত্র উপলব্ধিকে যখন রূপ দিতে চেয়েছে ভাষার মাধ্যমে, তখন ভাষাও জন্ম নিয়েছে নূতন নূতন প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পীর হাতে।

শব্দশক্তিকে এই বিশেষ অনুভবের মাধ্যমে দেখার ফলে শব্দের সীমাবদ্ধ বাচকতাকে ছাড়িয়ে তা বিচিত্র অর্থগৌরবে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই কবি বাংলা, সংস্কৃত, প্রাচীন, নবীন, দেশী, বিদেশী সমস্ত শব্দেরই বিশেষ শক্তিকে অধিগত করেছিলেন, আর এই অধিকার কত যে গভীর তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় তাঁর শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য দেখে এবং সেই শব্দের ইঙ্গিতবাহী অর্থদ্যোতনায় ও ব্যঞ্জনায়।

আধুনিক কবিদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচীন ও আধুনিক শব্দ বাছাই করে এবং বহু শব্দ নির্মাণ করে ব্যবহার করেন। নামধাতু ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেন। "রবীন্দ্ররচনার প্রথম দিকের অধিকাংশ নামধাতুই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মঙ্গলকবিরা, বৈষ্ণবকবিরা, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন ও বিহারীলাল প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্রনাথের উত্তমর্ণ।"[১]

তৎসম, তৎভব, দেশী, বিদেশী, সমস্ত শব্দকেই কবি নির্বিচারে পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। কথ্য ও উপভাষার পদও স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে ভাবের অনুসঙ্গী হয়ে। সাধু ও চলিত ভাষারও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। শেষের দিকের রচনায় এই প্রবণতা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যায়ের কাব্যে তৎসম বা অর্ধতৎসম শব্দের সংখ্যা পূর্বযুগের থেকে সংখ্যায় কম হলেও একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি।

পরবর্তীকালে কাব্যের খাতিরে অনেক নূতন নূতন শব্দের জন্মদান করেন, এবং পরিবর্তন ঘটান, কবি নিজেই। 'অনুকার' শব্দকে তিনিই প্রথম 'নামধাতু' রূপে ব্যবহার করেন। ছন্দের খাতিরে অনেক অপ্রচলিত শব্দকে তিনি যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি শব্দের বা পদের শেষধ্বনির পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন মিল রক্ষার জন্য বা মাত্রা সমতার জন্য।

ইংরাজী অথবা হিন্দী শব্দ সরস রচনায় মাঝে মাঝে এসেছে।

অপ্রাণিবাচক শব্দকে প্রাণিবাচক শব্দ রূপে ব্যবহার এবং বস্তুবাচক বা ভাববাচক পদে চেতন পদার্থের ধর্মের আরোপ করে কবি কাব্যজগতে এক বিশেষ পরিবর্তন এনেছেন।

শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক,' 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র কাব্যছন্দে

১। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'—সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় [বর্ষ ২৭ সং-৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮]
প্রবন্ধ—'নামধাতু প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ'—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস [পৃঃ ৩৫৮

যেমন গদ্যচ্ছন্দের আধিপত্য ঘোষিত, তেমনি ভাষার দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব এসেছে। এ সমস্ত কাব্যের বহুস্থানে কাব্যভাষার ও সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়নি। ছন্দের বাঁধাধরা চালচলনকে বর্জন করায়, ভাষাও কোনোরকম বন্ধনকে স্বীকার করেনি। ক্রিয়াপদ চলিত হলেও নামপদের ব্যবহারে কবি কোনো বাছবিচার করেন নি।

ছন্দের ও মিলের বেড়া ভাঙার ফলে নূতন শব্দের সৃষ্টিতে ও পুরানো শব্দের অর্থ সম্প্রসারণেরও স্বাধীনতা এসেছে। শেষপর্যায়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথের শব্দসৃষ্টিশীলতার অবিস্মরণীয় পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু-চলিতে, তৎসমে-তৎভবে, দেশী-বিদেশীতে মিশেল হয়ে এ ভাষা একেবারে কাব্যের জগতে নূতন ছাড়পত্র ঘোষণা করেছে।

কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিতে রবীন্দ্রকাব্যভাষাকে মোটামুটি 'চারটি' ভাগে ভাগ করা যায়।—

(১) 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ থেকে 'কড়ি ও 'কোমল' :

ভাষা তখনও আত্মপ্রকাশের সুষ্ঠ পথ পায়নি—পুরানো কাব্যভাষার অনুকরণ মাত্র।

(২) 'মানসী' থেকে 'পরিশেষ' :

ভাষা এ যুগে পরিপক্কতার সঙ্গে অনির্বচনীয় গীতি-সুষমার বিচিত্র তানে নানা ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত।

(৩) 'পুনশ্চ' থেকে 'ছড়ার ছবি' :

কথ্যভাষার একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। কাব্যজগতের সমস্ত পুরানো সংস্কারকে কাটিয়ে কবি তাকে আমাদের প্রতিদিনের চেনা-শোনা জগতের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। "ভাষাকে সহজ করে তোলার ইচ্ছা, প্রকাশভঙ্গিকে সহজ করে আনার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মূল নীতি।······নিরাভরণতার সাধনা বিশেষ করে নজরে পড়ে রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্যায়ের ভাষায়।"[১]

মাঝে মাঝে অবশ্য ছন্দের স্থান পূরণের জন্য বাগ্‌বাহুল্য বা ভাষার আতিশয্যও চোখে পড়ে। তৎসম শব্দ বা যুক্তাক্ষর অনেকটা কম—একেবারে বর্জিত হয়নি। 'ছিন্নপত্র', 'লিপিকা' বা 'শেষের কবিতা'র ভাষার সঙ্গে এর সখ্যতা। এ যুগের কাব্যভাষা হয়েছে সম্পূর্ণভাবেই গদ্যধর্মী। শ্রেষ্ঠ গদ্যের সমস্ত রকম গুণাবলী আত্মসাত করেই এ কাব্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যেন আধুনিক যুগের গদ্য-পদ্যের ভাষার ভেদরেখাকে ঘুচিয়ে দিতে চাইলেন তাঁর এই 'পুনশ্চ' যুগের কাব্যসাধনায়।

১। 'কবি ও কবিতা'—[৪র্থ বর্ষ ১ম সং] প্রঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা' [পৃঃ ৮৫]—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

"রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ভাষাকে অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাঁর ভাষা-প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়। বরং যখনই ভাষায় মনন এসেছে অনুভূতি ও কল্পনার সাথী হয়ে তখনই ভাষায় নূতন প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে। আবার যখনই আখ্যান বা নাটকীয়তার উপাদান এসে গেছে তখনই ভাসা নবরূপ ধারণ করেছে।"[১]

সুতরাং তাঁর রচনার বিপুলসৃষ্ট সম্ভারে বিষয়বৈচিত্র্য এবং রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়, তার উপযোগী হয়ে ভাষাও যেন নূতন দ্যোতনায় ও অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত।

শিশুকাব্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তা খুব কম শিশু সাহিত্যিকের হাতেই দেখতে পাওয়া যায়—এমন কি দুর্লভও বলা চলে। শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার ও অসম্ভব চিন্তা-ভাবনার বাহক হয়ে তারা জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। শিশুমনের অসংলগ্ন ভাবকল্পনার বাহক হয়ে এই সমস্ত ভাষা অস্পষ্ট গতিবিধিকে রূপ দিয়েছে ভাষার রূপচিত্রে। মা ও শিশু দু'জনের একটা স্বতন্ত্র জগৎ যেমন 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে গড়ে উঠেছিল, তেমনি শেষপর্যায়ের কাব্যে বালক মনের অস্ফুট স্বপ্ন-কল্পনা ছড়ার ছন্দে ও ভাষায় সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে রূপ পেয়েছে।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করে দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়—

তিমি ওঠে গা গা করে,
চিঁ চিঁ করে চিংড়ি;
ইলিশ বেহাগ ভাজে
যেন মধু নিংড়ি;

[৫৫ সং—খাপছাড়া]

অথবা—
হাস্যদমনকারী গুরু—
নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।

[৫৯ সং—খাপছাড়া]

১। 'কবি ও কবিতা'—[৪র্থ বর্ষ ১ম সং] প্রঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা'—[পৃঃ ১২০]—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

অথবা— নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।
... ...
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।

['ভজহরি'—ছড়ার ছবি]

অথবা— দাড়িটা তার নাড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি।
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।

[১ সং—ছড়া]

অথবা— গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।

[৭ সং—ছড়া]

অথবা— পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
... ...
জমিদারের বুড়ো হাতি হেলেদুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

['ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'—আকাশপ্রদীপ]

এই সমস্ত রচনার মধ্যে এমন বিচিত্র শব্দের ব্যবহার হয়েছে যা পূর্বে কাব্যের আসরে কখনো ঠাঁই পায়নি। কবি নিজে ছন্দের স্থান পূরণের জন্য বা মিল রক্ষার জন্য বা শিশুমনের রহস্য কল্পনার বা ধ্বনিবোধের চমৎকারিতার জন্য বহু শব্দের নিজেই জন্ম দিয়েছেন বা প্রচলিত কথ্য ভাষার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে অভিনব শব্দস্পন্দ এনেছেন। 'চিংড়ির চিঁ চিঁ করা' (৫৫ সং—খাপছাড়া) বা 'হাস্যদমনকারী গুরুর নাম 'বশীশ্বর' এবং ছাত্র 'হসীশ্বর' (৫৯ সং—খাপছাড়া) সত্যিই সকলের মনে হাসির বন্যা বইয়ে দেয়। আবার 'গঙ্গাফড়িঙের একরত্তি' না ঘুমানো ('ভজহরি'—ছড়ার ছবি) বা 'ডুগডুগি' বাজা

কিংবা 'বুগবুগি' ('বুগবুগ' করা) জল ওঠা কবির নিজস্ব সৃষ্টি—এই শব্দের ব্যবহার। অথবা 'গলদা চিংড়ি'র 'তিংড়িমিংড়ি' করা ('৭' সং—ছড়া)—এই 'তিংড়িমিংড়ি' শব্দটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি, বা 'পাকুড়তলির মাঠ', 'বামুনমারা দিঘির ঘাট' এই সমস্ত শব্দচয়ন কবির অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক। 'বুড়ো হাতি'র গলায় ঘণ্টা যে 'ঢঙঢঙিয়ে দোলে' ('ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'—আকাশপ্রদীপ) এই সুন্দর শব্দটি একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে শিশুদের চোখের সামনে; শুধু ছবি নয়, ছবির সঙ্গে সঙ্গে 'হেলে দুলে' চলার ছন্দ এবং 'ঘণ্টা'র দোলনের স্পন্দনটুকুও অনুভবে আসে।

স্বীকার করতেই হয় এই শব্দচয়নক্ষমতা কবির শব্দশক্তির প্রতি অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে এবং বহুস্থানে শিশুমনের উপযোগী এই সমস্ত ভাষা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর নিজের অজস্র রচনার সঙ্গেও এর জুড়ি মেলে না। 'ছড়া' কাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি মন্তব্যকে স্মরণ না করে পারা যায় না—"রবীন্দ্রনাথের ছড়াকাব্যের ভাষা যেন কাগজের নৌকা—যার গতি ও অঙ্গের সৌকুমার্যের কাছে যান্ত্রিক জলযান যেন লজ্জায় বিনত হয়ে পড়ে।"[১]

বার্ধক্যে শিশুমনের উপযোগী এই সমস্ত ভাষার জন্ম দিয়ে কবি যে নূতন ছড়ার জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর চিরকিশোর মনটির পরিচয়টিকেই বহন করছে।

(৪) 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা' :

চতুর্থ পর্যায়ের ভাষাকে লক্ষ্য করা যায় 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা' কাব্যে। বিষয়বৈচিত্র্যে এ যুগে, অনেক নূতন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। রোগের নিদারুণ অভিজ্ঞতা, বেদনার তিক্ততা, অচৈতন্যলোকের অন্ধকার গুহাগহ্বর থেকে ফিরে আসা, এবং 'নূতন চোখে বিশ্ব দেখা' কবিকে যেন নূতন উপলব্ধিতে আত্মস্থ করে দিয়েছিল। আবেগ ও উচ্ছলতাকে কাটিয়ে উঠে ভাষা তাই এই যুগে এমন গম্ভীর ও সংহত হয়ে উঠেছে যে, একে একমাত্র মন্ত্রের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়। "শক্তিমান কবির আত্মবিকাশের পরিণত পর্যায়ে বাক্-ব্যঞ্জনা ইন্দ্রিয়জ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার অভিসারী…বাক্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জ :এবং কোনো কোনো সময় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ইঙ্গিত দিতে পারা কবির প্রধান শৈল্পিক লক্ষণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের বা শিল্পের চেয়েও বড়ো যে অন্তর্গূঢ় সত্তা তারও স্বাক্ষর।"[২]

১। 'কবি ও কবিতা'—[৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা শ্রীপঞ্চমী ;১৩৭৫]
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা' [পৃঃ ১০৮]—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

২। "রবীন্দ্রায়ণ" (১ম খণ্ড)—সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন [সং ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র : রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমা' [পৃঃ ১৫৪]—শ্রীঅমলেন্দু বসু।

এই ইন্দ্রিয়াতীত অন্তর্গূঢ় ভাবকে প্রকাশ করতে কবি যে ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তা দীর্ঘদিনের সাধনলব্ধ সম্পদ। তৎসম শব্দের আধিক্য বিশেষভাবেই লক্ষ্যগোচর হয় অলঙ্কার ও চিত্রসংস্থাপনেও গাম্ভীর্য ও ঋজুতা একটি দৃঢ় সংহতি এনেছে কাব্যবোধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এই স্তরের ভাষাশৈলীকে তুলনা করেছেন 'মোজাইক করা কারুশিল্পের'[১] সঙ্গে। বিচিত্র বর্ণের ও আকৃতির মোজাইক পাথরে যেন খোদিত হয়েছে এর শিল্পকলা। রচনার ভঙ্গী ঐতিহ্যধর্মী; গাঁথুনি নিরেট, সেই সঙ্গে বর্ণসুষমা ও চিত্রের পারিপাট্য অভিনব শিল্পকলার জন্ম দিয়েছে। ভাবের দিক থেকে কবি যেমন চৈতন্যলোক থেকে অচৈতন্যলোকের শেষ সীমায় পৌঁছাতে চেয়েছিলেন, ভাষাও তদুপযোগী জানা-অজানার অব্যক্ত অস্পষ্ট অনালোকের আভাস বয়ে এনেছে। এই পর্যায়ে তাই—"শব্দকারু বদলে গেছে ভাষার নব আঙ্গিকে। ছত্রের দুঃসাহসী সংক্ষেপ; বাক্যে শিল্পিত কার্পণ্য; ছন্দে সংহত ও নিবিষ্ট গতির মর্যাদা। মাঝে মাঝে বিনয়, আত্মগ্লানি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মশুদ্ধি, ভাষার সুর বদলে দিয়েছে। অনুপ্রাসে উগ্রতা নেই, উন্মুখতা নেই। এই অন্তর্মুখী ভাষার ধ্বনিকৌশল যেন চেতনার গভীরে চলে যায়। ছত্রচ্ছেদ, ভাষার ধ্বনিবিন্যাস ও সতত প্রবহমান গতি এত নিপুণ ও নিশ্চিত যে মিল (সাধারণ অর্থে) আছে কি নেই যেন বোঝাই যায় না। মিলের অভাব নেই, অনভাবও নেই—ধ্বনিশিল্পের এ এক অভিনব আঙ্গিক।…ভাষায় এদের কারুকর্ম বড় সূক্ষ্ম।"[২] যেমন—

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। [৩ সং—প্রান্তিক]

অথবা,

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান; [৫ সং—আরোগ্য]

১। দ্রঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্র সরণী" [প্রঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯] সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ২ ॥ 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—[পৃঃ ৩৩৬]

২। "কবি ও কবিতা"—[৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা: শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫] প্রবন্ধ—রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা'—[পৃঃ ১১৭] শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

অথবা, মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি
আমি সেই বাণী। [৯ সং—জন্মদিনে]

অথবা, 'রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। [২ সং—শেষলেখা]

এই সমস্ত ভাষার নিরেট গাঁথুনি ভাবের গাম্ভীর্যকে এমন দীপ্তি, সংহতি ও স্বতঃস্ফূর্তি দান করেছে যে, কাব্য যেন জীবনের সমস্ত উচ্ছলতা ও ভাবাবেগকে কাটিয়ে অন্তরের নিগূঢ় সত্যবোধকে, আত্মার অ-জাগর মূর্তিকে স্বতঃই প্রকাশ করতে সমর্থ।

রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে ভাষার এই ক্রমপরিণতিকে লক্ষ্য করে বলা যায়, এ সিদ্ধি দীর্ঘকালের ভাষাশিল্পের সাধনার ফল—আত্মার পরিপূর্ণ মূল্য দিয়ে যা কেনা। তাই এর সম্পূর্ণ মূল্য নিরূপণ বোধকরি সম্ভবও নয়, সাধ্যও নয়। কেবল আপন চৈতন্যকে জাগ্রত রেখেই এর উপলব্ধি সম্ভব।

বহিরঙ্গের দিক থেকে 'রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সমস্ত আলোচনা কিঞ্চিৎ প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র। কাব্যের সমস্ত দিক, বিশেষতঃ তার অনির্বচনীয় প্রকাশধর্মকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না—কিছুটা চেষ্টা করা যায় এইমাত্র—এর যথার্থ পরিমাপ রসিকজনের সহৃদয় উপলব্ধিতে এবং আস্বাদনে।

রূপ / রীতি / বৈশিষ্ট্য

বহিরঙ্গের দিক থেকে 'পাঠান্তর'কে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র অপর একটি বৈশিষ্ট্য ব'লে উল্লেখ করা যায়। একই ভাবের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিবর্তন এবং রূপান্তর এর উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। একটি রূপকে কবি একবার আকৃতি দিয়ে তৃপ্ত হননি—তাই দেখা যায় কখনো চিঠিকে কবিতায়, গদ্যকবিতাকে পদ্যকবিতায়, পদ্যকবিতাকে গদ্যকবিতায়, গানকে কবিতায়—এভাবে একটি 'আদিপাঠকে' বা 'খসড়া রূপকে' নানা রূপে সাজিয়ে দেখতে চেয়েছেন। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির এ প্রবণতা শুধু এ যুগের কাব্যেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—প্রথম যুগ থেকেই একই বিষয়বস্তুকে নানা রূপের মধ্যে ঢেলে সাজিয়ে বিভিন্নভাবে রসোপভোগ করার একটা আকাঙ্ক্ষা বরাবরই তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু শেষের দিকে, তুলনায়, সেই প্রবণতা আরও বেশি কার্যকরী হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের 'পাঠান্তর' বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই এ পর্যন্ত প্রায় পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর "রবীন্দ্র-বিচিত্রা" গ্রন্থে "রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর", প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন এবং এই প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য ক'রেছেন—

"রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তত্ত্ব-সংক্রান্ত। ইহার প্রয়োজন ও মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐখানে থামিয়া থাকা উচিত নয়। এবারে তত্ত্বের স্তর হইতে বস্তুর স্তরে, ভাবের স্তর হইতে রসের স্তরে নামিয়া আসা আবশ্যক। তত্ত্ববিচারের মূল্য যতই হোক রসবিচারের চেয়ে বেশি নয়—আর শেষপর্যন্ত তত্ত্ববিচারও রসবিচারের আনুষঙ্গিক ; কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য রসোপলব্ধিতে সহায়তা। পাঠান্তরবিচার রসবিচারেরই অঙ্গ।"[১]

তাছাড়া তাঁর মতে কবিতার 'খসড়া' রূপ থেকে পরিপূর্ণ একটি রূপের ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে কবিমানসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে—কবি যেন খসড়ার মধ্যে নেপথ্যে রহিয়া যান।

বাস্তবিক 'পাঠান্তরে'র সূক্ষ্ম আলোচনার দ্বারা কবির শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন কৌশল যেমন আমাদের অধিগম্য হয়—তেমনি কবিমানসের বিশেষ মানসিকতার সঙ্গেও আমাদের

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্র-বিচিত্রা" [সং ২রা আষাঢ়, ১৩৬৪]
'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠান্তর' [পৃঃ ২৭]

পরিচয় ঘটে। কবির কাছে আমরা বিষয়ও চাই না, তত্ত্বও চাই না—যা চাই তা হচ্ছে 'রস' এবং এই রসের আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ভাবে-ভাষায়-শিল্পনৈপুণ্যে চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয়ে কোনো শিল্পবস্তু আমাদের চিত্ত জয় ক'রে নিতে পারে। কবিও শিল্পসৃষ্টি করেন এই রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং কাব্যরস আস্বাদনের জন্য—'পাঠান্তরে'র মধ্যে কবিমানসের কোন্ মানসিকতা গোপনে কাজ করেছে, সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সুবিধাই হয়।

পাঠান্তরের আলোচনা ক'রতে গিয়ে দেখা যায় এমন অনেক সার্থক কবিতা আছে যাদের ললাটে কবি বর্জন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে 'পাঠান্তরে'র গাদায় নিক্ষেপ করে (দ্রঃ রবীন্দ্র-বিচিত্রা—'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠান্তর'—প্র. না. বি. পৃঃ ১১) একটি রূপকেই চূড়ান্ত বলে মর্যাদা দিয়েছেন—কখনো বা দুটি কবিতাকে এক করা হয়েছে—কখনো বা এককে দুইয়ে পরিণত করা হয়েছে। কবির এই সমস্ত প্রবণতাকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় মনে করেন 'এই শিল্পগত অস্থিরতা এক প্রকার আত্মাগত অশান্তি হইতে উদ্ভূত'।[১] এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক যাহাতে কবির অন্তর্লোক সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে।"[২]

যাই হোক, বর্তমান আলোচনায় কবির সেই অন্তর্লোকের রহস্য উদ্‌ঘাটনের দ্বারাই মনে হয় কবিমনের এই প্রবণতার উত্তর মিলতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক, শিল্পিমানস সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য—রহস্যাবৃত; এমন কি কবি নিজেও স্বীকার করেছেন, যে-মন সৃষ্টি করে, সৃষ্টির পরে সে সাধারণ পাঠকের মত একজন মাত্র। সুতরাং এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা সবই অনুমানসাপেক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ নয়। তবু মনে হয়, কবি-মানসটিকে 'পাঠান্তর' আলোচনার পূর্বে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সৃষ্টিশীল শিল্পিমানসের অন্তর্লোক সম্পর্কে আলোচনা ক'রলেই দেখা যায় কোনো কবি বা সাহিত্যিকের কোনো রচনাই বোধ করি প্রাথমিক চিন্তার ফসল নয়। শিল্পিমনে কোনো কল্পনা বা বিষয় দানা বেঁধে ওঠা মাত্র তাঁর মনের মধ্যে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। রচনার মধ্যে যে সুষ্ঠু পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই—তার আগে শিল্পীর মানসলোকে তারা বিচিত্র ভাবাবেগের সৃষ্টি করে—এবং ক্রমশঃ একটি সুষ্ঠু সংযত রূপের মধ্যে মুক্তি খোঁজে। তাই 'পাঠান্তরে'র কারণ হিসেবে কবিমনের বিচিত্র মানস-প্রতিক্রিয়াকে কয়েকটি সূত্রে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে—

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্র-বিচিত্রা" [সং ২রা আষাঢ়, ১৩৬৪]
'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠান্তর' [পৃঃ ১৩]

২। ঐ ঐ [পৃঃ ১৩-১৪]

১। শিল্পিমন অনেক সময় প্রথম চিন্তায় তৃপ্ত নয়। কারণ, প্রথম চিন্তায় মনের মধ্যে থাকে আবেগের প্রাবল্য। ভাব বা বিষয় তখনও দানা বেঁধে ওঠে না। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস এবং আকুলতা অধিকাংশ সময়ই প্রাথমিক চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য পায়।

২। দ্বিতীয় চিন্তায় আবেগের ওপরে শিল্পবুদ্ধি এসে যোগ দেয়। শিল্পিমন অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসকে কাটিয়ে সংযতভাবে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা ছন্দ-ভাব-ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশের পথে অগ্রসর হয়।

৩। বহুক্ষেত্রে তৃতীয় চিন্তায় বিদ্রোহও হয় অনুসৃত। শিল্পিমন ভাঙা-গড়ার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার সমস্ত ক্রমপরিণতিকে হয়তো অস্বীকার ক'রে নূতন সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। পূর্ববর্তী কোনো ভাব-ভাষা-ছন্দ-রূপাঙ্গিকের সঙ্গে এ সৃষ্টির হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

সৃষ্টিশীল শিল্পিমানসে আপন রচনা সম্পর্কে এইরূপ নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। মোট কথা, শিল্পিমন যতক্ষণ না তৃপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ অদল-বদলের কাজ চলে। শুধু তাই নয়—মুদ্রিত রচনার ওপরেও অনেক সময় নির্মম কলমের দাগ বসে। বহু বিখ্যাত 'অংশ' বাহুল্যবোধে বাদ যায়—বহু বিখ্যাত রচনায় নূতন চিন্তার ছাপ পড়ে। সেই সঙ্গে নূতন ভঙ্গি ও অলংকারের আমদানি হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের সাহিত্যসাধনা থেকে শেষ বয়সের রচনা পর্যন্ত—দীর্ঘ সৃষ্টি-সম্ভারের মধ্যে এই প্রবণতা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই 'শিল্পগত অস্থিরতা'ই শিল্পীকে পরিপূর্ণ সিদ্ধির ক্ষেত্রে রসের এবং রূপের বিচিত্র আস্বাদনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'পাঠান্তর' আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই শিল্পিমনের বিচিত্র চিন্তার ক্রমপরিণতিটিকে পাঠকের এবং রসিকের সামনে উপস্থাপিত করার একটা সাধারণ প্রয়াস মাত্র।

সাধারণ কবির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের তুলনা সম্ভবপর নয়। তিনি শুধু বাণীশিল্পী নন, সুরশিল্পী এবং চিত্রশিল্পীও বটে; সুতরাং তাঁর শিল্পসাধনার রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য একটু স্বতন্ত্র হবেই—তাছাড়া বাইরের দিক থেকে তাঁর সমগ্র জীবনটির দিকে একবার চোখ বুলোলেই দেখা যায় তিনি মস্তবড় একজন জীবনশিল্পীও বটে। আজীবন বিভিন্ন শিল্পের সাধনা ক'রে শেষজীবনে চিত্রশিল্পের সাধনায়ও মগ্ন হয়েছিলেন। তাই মনে হয়, প্রথম জীবনের বাণীশিল্পে কোনো একটি ভাবকে আবেগের সঙ্গে রূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ছিল শেষজীবনে ঠিক তা নয়। শিল্পীরা একই রঙ, রেখা, তুলি নিয়ে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, কল্পনায় যত রকমের বৈচিত্র্য আনা সম্ভব সবকিছুর যখন মূর্তি নির্মাণ হয়ে যায় তখন আর তাতে তাঁরা তৃপ্তি পান না, নূতন কিছু আবিষ্কারের দিকে ঝোঁকেন যাতে একঘেয়েমি নেই—আছে সৃষ্টির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথও ভাব-ভাষা-ছন্দ

নিয়ে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে এত অভ্যস্ত হয়ে যান যে, অধিকাংশ ভাবই তাঁর ভাষা-ছন্দ-চিত্রে এসে আপনি ধরা দিয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। উচ্চাঙ্গের তুরীয় কল্পনার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর লেখনীতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধরা পড়েছে। মানুষের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব বা অনুভূতির স্পন্দন থেকে শুরু করে বিরাট বস্তুবিশ্বের কোনো রূপমূর্তি বা ভাবমূর্তিই তাঁর অনধিগম্য নয়—তাঁর এই পরিপূর্ণ সিদ্ধিই তাঁর বৈচিত্র্যপিয়াসী মনকে অস্থির করে তুলেছে নূতন নূতন রসনির্মিতির পথ অনুসন্ধানের জন্য। শেষবয়সে আঙ্গিকের দিক থেকে 'গদ্যছন্দ'কে বিশেষ মূল্যদানের চেষ্টা এই প্রবণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। 'পূরবী'র যুগ থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে 'পাঠান্তর-বাহুল্য দেখা গেলেও একথা স্মরণ রাখতে হবে পাঠান্তর চিরকালই ছিল—বেশি-কম কোন্ সময়ে বলা খুবই মুশকিল। কারণ রচনা যত পুরাতন তত তার পদচিহ্ন মুছে গেছে, বহু 'পাণ্ডুলিপি' (খসড়া / পরিণত রূপ) হারিয়ে গেছে। তবু প্রথম যুগের রচনাতেও পাঠান্তর খুব অল্প নয়।

'পূরবী'র যুগ (১৩৩২ শ্রাবণ, ১৯২৫ খ্রীঃ) থেকে তিনি চিত্রসাধনাতেও আত্মনিয়োগ করেন। ভাবকে রূপ দিতে হলে ভঙ্গির প্রয়োজন—কিন্তু নূতন নূতন ভঙ্গিও যে ভাবকে জন্ম দেয়—এ যেন তাঁর চিত্ররচনার সূত্র থেকেই তিনি আবিষ্কার ক'রলেন। মনে হয় 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র রচনাগুলির পরে চিত্রসাধনার বিশেষ প্রভাব অলক্ষ্যে গভীরভাবে কাজ ক'রে গেছে। এর আগে ভাব তাঁর বাণীশিল্পে ছন্দে-ভাষায়-চিত্রকল্পে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে আপনিই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে—কবির সচেতন শিল্পিমন কিছু তুলি বুলিয়েছে মাত্র। কিন্তু শেষের দিকে লক্ষ্য করা যায় রচনার বিভিন্ন রূপসজ্জার মধ্যে আত্মপ্রকাশ কতখানি বৈচিত্র্যধর্মী হয় সেদিকে একটা কৌতূহল গোপনে কাজ ক'রে গেছে, অথচ সহজ মূর্তির মধ্যে দু'চারটে রেখার আঁচড়ে তাদের সত্য ক'রে তুলতে চান—শিল্পিমনের এই রূপনির্মিতির খেয়াল দেখে মনে হয় বাণীশিল্পীর উপর চিত্রশিল্পী প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। এ সম্পর্কে শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে—

"…ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন world of gesture, যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে world of meaning সামান্য। তাঁর শেষজীবনের রচনা 'রক্তকরবী' থেকে শুরু করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা এই world of gesture-কে অনুসরণ করে চলেছে।…রবীন্দ্রনাথের মনের গতি যে অর্থের চেয়ে ভঙ্গির দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে স্থিতির দিকে ঝুঁকেছিল

তার পরিচয় আরও পাওয়া যায় তাঁর পুরাতন নাটকের সংশোধিত সংস্করণ পড়লে"।[১]

শেষের দিকের কাব্যের উপর চিত্রশিল্পীর এই প্রভাব খুবই ইঙ্গিতধর্মী। এই প্রভাবের ফলে কাব্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র ধর্ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা শেষপর্যায়ের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কোথাও বর্ণনা চিত্রধর্মকেই মুখ্য ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে—কোথাও ভাষা এবং ভঙ্গি কঠিন ইমারতের গঠনশৈলীর মতো নিরেট গাঁথুনি দিয়ে ভাবকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরতে চাইছে—কোথাও বা হাল্কা তুলির আঁচড়ে বস্তু বা ভাব তার সমস্ত রূপসজ্জা ত্যাগ ক'রে চারপাশের চোখ-মেলে-দেখা সাধারণ ছবিটিকে আরও একটু বিশেষভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। এ যেন আমাদের অতি চেনা—একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকা ছবি –নিত্যকালেব সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে শিল্পীর কাছে ক্ষণকালের জন্য তার সত্য রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে।

শিল্পিমনের এই বিভিন্ন রূপসৃষ্টির খেয়ালই তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি একটি চরম সিদ্ধির মধ্যে। তা যদি হোত—সিদ্ধি তার বহু আগেই করতলগত হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মজিজ্ঞাসার যেমন শেষ হয়নি—তার রহস্য যেমন ভেদ হয়নি—তেমনি রূপসৃষ্টি বা রসব্যঞ্জনার দিক থেকেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনোদিন সমাপ্তি হয়নি। 'পাঠান্তরে'র প্রবণতা এই বৈচিত্র্যপিয়াসী মন থেকেই জন্ম নিয়েছে। তাই তো আমরা শিল্পিমানসের অন্তর্লোকের রহস্যকে এর মধ্যে দিয়ে কিছুটা আঁচ করে নিতে পারি—যা আমাদের রসের খোরাক যোগায়। "রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে কেবলমাত্র আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলারূপেও তার বিচার করেন ; সেইজন্য তাঁহার কাছে কাব্যপ্রসাধন কাব্যসাধনারই সমতুল্য"।[২] 'পাঠান্তরে' সেই প্রসাধনকলারই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ।

বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রসদনে' রক্ষিত "পাণ্ডুলিপি" সংগ্রহ থেকে জানতে পারা যায় একই রচনার এক বা একাধিক 'পাঠান্তর' বহু ক্ষেত্রেই বর্তমান। এত বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের 'খসড়া'রও যে কত বিপুল আয়তন তা সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তার মধ্যে বহু অপ্রকাশিত অর্থাৎ কবি কর্তৃক গৃহীত নয় এমন পাঠ আছে, কিছুবা পূর্বে কোনো পত্রপত্রিকায় এককালে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে প্রচলিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ হিসেবে মূল্য পায়নি—এই সমস্ত 'বর্জিত পাঠ' দীর্ঘকাল 'পাণ্ডুলিপি' সংগ্রহের মধ্যেই

১। শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—"বিশ্বভারতী পত্রিকা"—[৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৫৬-১৩৫৭]—"রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ"—রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য—[পৃঃ ৫৩ ; ৫৭]

২। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ : ১৩৬৩ শ্রাবণ পৃঃ ১৭২]

কাল কাটিয়েছে। 'রবীন্দ্রসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি গবেষক'দের কৃপায় কিছুকাল যাবৎ প্রচলিত বা মুদ্রিত পাঠের 'খস্‌ড়া' চেহারা হিসেবে তারা কিঞ্চিৎ মর্যাদা পেয়ে 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর শেষে 'গ্রন্থপরিচয়' নাম নিয়ে, 'সঞ্চয়িতা'র শেষাংশে 'গ্রন্থপরিচয়ে', প্রচলিত পুস্তকের শেষে 'গ্রন্থপরিচয়' পর্যায়ে অথবা দু'একখানি পত্রপত্রিকায় 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়' নাম নিয়ে পাঠক সমাজের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই রকম 'খসড়া' রূপকে বা 'পাঠান্তর'কে গৃহীত রচনার পাশাপাশি পেয়ে আমাদের কবির মানসিকতা সম্পর্কে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক এবং শিল্পবিচারে ও রসবিচারে এদের একটা তুলনামূলক আলোচনায়ও আগ্রহী ক'রে তোলে। উপযুক্ত ঐ ক'টি সূত্র থেকে প্রাপ্ত যে সমস্ত 'পাঠান্তর' এ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে 'শেষপর্যায়ের কাব্য'গুলির অন্তর্গত অর্থাৎ 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতার যে সমস্ত 'পাঠান্তর' পাওয়া যায় সেগুলিই কেবল আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত। 'প্রথম পর্যায়ে'র 'কল্পনা', 'উৎসর্গ', 'পূরবী', 'বনবাণী', 'মহুয়া', 'পরিশেষ'—প্রভৃতি বহু কাব্যেরই পাঠান্তর পাওয়া গেছে কিছু কিছু—কিন্তু 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র অন্তর্গত না হওয়ায় এ সমস্ত কাব্যের পাঠান্তরকে আলোচনার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি। গানের মধ্যেও যে সমস্ত গান থেকে রূপান্তরিত হয়ে এই পর্যায়ের কবিতার জন্ম হয়েছে বা কবিতা থেকে গানের জন্ম হয়েছে কেবল তাদেরই এখানে গ্রাহ্য করা হয়েছে।

নানা জাতের যে সমস্ত 'পাঠান্তর' এ পর্যন্ত হাতে এসেছে তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে তাদের ভাগ করা হয়েছে। (প্রত্যেকটিরই 'গৃহীত' রূপ বিভিন্ন কবিতাগ্রন্থে সংকলিত। 'আদিরূপ', 'খসড়া' বা 'পাঠান্তর' বিচিত্রধর্মী রচনারূপে নানা আকারে দেখতে পাওয়া যায়।)

(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতায় রূপান্তর।

(২) নাটক থেকে কবিতায় রূপান্তর।

(৩) কবিতা থেকে কবিতায় রূপান্তর। কিন্তু এর মধ্যে নানা ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সেই অনুসারে এদের পুনরায় 'চারটি' ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

- (ক) সমান্তরাল পাঠান্তর।
- (খ) ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর।
- (গ) আংশিক পরিবর্তিত, পরিবর্জিত বা পরিবর্ধিত পাঠান্তর।
- (ঘ) সংগঠনমূলক পাঠান্তর।

(৪) গান থেকে কবিতা বা কবিতা থেকে গানে রূপান্তর।

(১) চিঠিপত্র থেকে কবিতায় রূপান্তর :

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র কিছু কিছু কবিতার 'পাঠান্তর' পাওয়া যায় পত্রপত্রিকার মধ্যে। চিঠি লেখা অনেক সময়ই, বিশেষতঃ শেষের দিকে, কবির উপলক্ষ্য মাত্র—কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য ক'রে কবি আপন মনে কোনো ব্যক্তিগত চিন্তা—ভাবনা—ভাব বা কল্পনাকে রূপ দিয়ে গেছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে। বলাই বাহুল্য, কবির শিল্প-সচেতন বাক্‌নৈপুণ্যে এবং আত্মগত মননধর্মিতায় এ সমস্ত চিঠি প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করে সর্বসাধারণের আনন্দদানে সমর্থ হয়েছে, সে কেবল তার রসনিষ্পত্তির জন্যই। এ সমস্ত কাব্যধর্মী গদ্যরচনাকেই কবি পরবর্তীকালে 'গদ্যকবিতা'য় 'ভাবচ্ছন্দে'র বাহনে পরিবেশন করেছেন। চিঠির সঙ্গে কবিতাকে মিলিয়ে প'ড়লে দেখা যায়, ভাব তো বটেই, ভাষা, বাচনভঙ্গি, এমন কি ধ্বনিটি পর্যন্ত অনেক স্থানে যথাযথ রেখে কবি একে কবিতা করে তুলেছেন। লিরিকধর্মী গদ্যকে যে 'ভাবচ্ছন্দে' রূপ দেওয়া যায়—'লিপিকা'র মধ্যে কবি তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে এই সমস্ত চিঠিকে 'গদ্যকবিতায়' রূপদানের চেষ্টা দেখে সেই ইচ্ছাকেই মূল্য দিয়েছেন ব'লে মনে হয়।

'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাসা', 'সুন্দর', 'বিচ্ছেদ', 'ফাঁক', 'নাটক', 'পত্র' ('গ্রন্থপরিচয়'—'পুনশ্চ' প্রঃ ভাদ্র ১৩৬৩ পৃঃ ১৯৯—২০৪) প্রভৃতি কবিতা এবং 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'পনেরো' (১, ২, ৩ সংখ্যক), 'ষোলো', 'সতেরো', 'আঠারো', 'বিয়াল্লিশ', 'তেতাল্লিশ', 'চুয়াল্লিশ' সংখ্যক কবিতার পূর্বপাঠ পাওয়া যায় চিঠির মধ্যে।

পুনশ্চের 'বাসা' (৩ ভাদ্র ১৩৩৯) কবিতাটির সঙ্গে বার্লিন থেকে কবির পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে লেখা ('চিঠিপত্র' ৩য় খণ্ড, '১৮ আগস্ট ১৯৩০, ৩৬ সংখ্যক) কিয়দংশ তুলনীয়—

> 'থেকে-থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে ; তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর ,……অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো।'—

এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিল আছে। চিঠি এবং কবিতার তারিখ মেলালে দেখা যায় চিঠি লেখার দুই বছর পরে লেখা এই কবিতা। চিঠিতে যে 'স্টুডিয়ো'র কথা বলা হয়েছে—কবি ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে যে স্টুডিয়ো-ঘর নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন—তার একটা নিখুঁত ছবিও এঁকেছেন কল্পনায়। চিঠির এই বর্ণনাকে তো কাব্য বলতে বাধে না আমাদের। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে মায়াময় পরিবেশে একখানা ঘর রচনার স্বপ্ন কবি বার্লিনে বসে দেখেছেন—বছর দুয়েক পরে গদ্য কবিতায় সেই স্বপ্নচ্ছবিকে আর

একবার চিত্রিত ক'রলেন। কবি চিঠির ঐ কাব্যিক অংশটুকুকে কবিতায় যথাযথই রেখেছেন কিন্তু 'বাসা' ('পুনশ্চ' দ্রষ্টব্য) যে হোল কবিতা—তাই দু'একটি রেখার আঁচড়ে না-বলা-বাণীর অনেকখানি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন পাঠকের মর্মে। প্রথম সূচনাতে কবিতায় একটি উপমা টেনে আনলেন—

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়। ['বাসা'—'পুনশ্চ']

এ উপমা তো কবির কাব্যে নতুন শোনাচ্ছে। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারের বর্ণনা তারপর ঘনিয়ে উঠেছে গাঢ় হয়ে। সব কথা জানার আগে পর্যন্ত কবির 'বাসা' সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করে নিই। হঠাৎ দেখি কবি হতাশ সুরে ঘোষণা ক'রেছেন—

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোনোদিন। ['বাসা'—'পুনশ্চ']

আর মনেও হয় তাঁর—

আমার মন বসবে না আর কোথাও। ['বাসা'—'পুনশ্চ']

একদিকে বর্ণনার চাতুর্যে স্বপ্নকেই সত্য ক'রে তোলা, অপরদিকে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বেদনাটির স্পর্শ—দুই-ই সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে দু'একটি রেখার আঁচড়ে।

'সুন্দর' (৭ ভাদ্র ১৩৩৯—'পুনশ্চ') কবিতাটি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠির ('পথে ও পথের প্রান্তে'—৩৬ সংখ্যক পত্র, ৩২ আষাঢ় ১৩৩৬) সঙ্গে অনেকাংশেই এক। চিঠির তিন বছর পরে কবিতাটি লেখা কিন্তু চিঠি ও কবিতার প্রথম লাইনটি একেবারে এক—

'প্লাটিনামের আংটির মাঝখানে যেন হীরে······'

পরে ভাবের ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা কিন্তু শব্দ ও বাচনভঙ্গি অধিকাংশ জায়গায়ই একেবারে মিলে যাচ্ছে। চিঠির অনেকখানি ভাবকে কবিতায় কয়েকটি লাইনের মধ্যে কেমন সুন্দরভাবে ধরে ফেলেছেন। 'কাদম্বরী'কে কবি যে অর্থে কাব্য বলে ঘোষণা ক'রেছেন—নিজের গদ্যরচনাকে কাব্যে দাঁড় করিয়ে সে ঘোষণাকে সার্থক বলে প্রতিপন্ন করে গেছেন। শুধু গদ্যে যেটা ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করে সোজাভাবে মানুষের মনে পৌঁছে দেবার চেষ্টা এখানে তাকেই সংযত-সংহত রূপের বাঁধনে পরিবেশন করেছেন। কবিতা তো সব ব্যাখ্যা করে না—আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের মনের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায় তার অলক্ষ্য বাণীটুকু—যা গোপনে গুণগুণ ক'রতে থাকে মনের পরতে পরতে—

'অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন' ['সুন্দর'—'পুনশ্চ']

কবিমনে 'সুন্দর-'এর যে অব্যক্ত মাধুরীকে বয়ে আনে—তা তো ঠিক বোঝানোর জিনিস নয়—এর সৌন্দর্য কবি কতকটা সূক্ষ্ম তুলির স্পর্শে এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

'বিচ্ছেদ' (৭ ভাদ্র ১৩৩৯—'পুনশ্চ') কবিতার সঙ্গে আছে তেমনি 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের 'আটত্রিশ' সংখ্যক পত্রের (শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা, ৮ শ্রাবণ ১৩৩৬) মিল। এ ক্ষেত্রেও পত্রখানির তিন বছর পরে লেখা এ কবিতা। 'বিচ্ছেদ' ('পুনশ্চ') কবিতায় বাদলার দিনকে আশ্রয় করে কবি চলে যান 'যক্ষবধূর' বিরহের কথায়। চিঠির সঙ্গে এ কবিতার ভাবের অঙ্গাঙ্গী মিল রয়েছে। তবে এও ঠিক, —এ চিঠি চিঠি নয়, ব্যক্তি লক্ষ্য—উপলক্ষ্য কবির বাদলার দিনের একটা বর্ণনা। বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে অপূর্ণের পূর্ণের অভিমুখে চলার যে আবেগ এবং চঞ্চলতা—তাই নিয়ে কবির তাত্ত্বিক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই গদ্যরচনাকে গদ্য-কবিতায় রূপ দেবার মধ্যে একটা নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম চরণে—"আজ এই"— ('বিচ্ছেদ'-'পুনশ্চ') এইটুকু বলার পরই কবি কিন্তু পত্রের প্রথমাংশের অন্য কথাকে কবিতায় আনেননি। পত্রের শেষাংশকেই প্রথম স্তবকে নিয়ে এসেছেন এবং ভাব-ভাষা প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। কবিতাব পক্ষে যেটুকু সংহতি দরকার তার মাপমত রেখে একটু অদলবদল করা হয়েছে মাত্র। যেমন, পত্রের শেষাংশ—

> ......"বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়—এ যে অচলতার দিন—মেঘ চলছে না,—হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মত দিনের মুখ আবৃত করেছে প্রহর চলছে না, বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে চারদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ।"......

এই ভাবই কবিতার প্রথম স্তবকে রূপ নিয়ে এল—

আজ এই বাদলার দিন
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
সময়ে যেন স্রোত নেই,
চারদিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর। ['বিচ্ছেদ'—'পুনশ্চ']

মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় প্রায় সব ভাব এবং ভাষাই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কেবল 'গদ্য' রচনাকে 'গদ্যছন্দে' আনতে হলে বিশেষ ব্যাখ্যা এবং বিস্তৃতির বন্ধন থেকে উদ্ধার করে দু'একটি ইঙ্গিত এবং রেখার আঁচড়ে কেমন করে তাকে রসগ্রাহী করে তোলা যায়—এ যেন তারই একটা কৌতুকাবহ প্রচেষ্টা।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র 'উনচল্লিশ' সংখ্যক (২২শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) পত্রের সঙ্গে 'পুনশ্চে'র 'নাটক' (৯ ভাদ্র ১৩৩৯) কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পত্রে 'নাটকে'র কোনো বিষয়বস্তুর উল্লেখ নেই— কবিতায় আছে। কবিতার শেষের দিকে কবি 'গদ্যছন্দ' ও 'পদ্যছন্দে'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। পত্ররচনার তিন বৎসর পর 'পুনশ্চে'র গদ্যকবিতার যুগে 'নাটক' কবিতার জন্ম ; সুতরাং 'গদ্যছন্দ' কবির মানসিকতায় তখন যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই ছাপই র'য়ে গেছে এ কবিতায়। চিঠির শেষে কবি বলেছেন—

> "মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।"

এই বাঁধা ছন্দকে কাটিয়ে কবি যে 'ভাবচ্ছন্দে'র জন্ম দিলেন তারই বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধ'রেছেন এ কবিতায়।

'ফাঁক' ('পুনশ্চ') কবিতার 'পাঠান্তর'টিকে পাওয়া যায় "দেশ" পত্রিকার (তুলনীয় : 'পত্রাবলী'—নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—"দেশ" পত্রিকা ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮, ২৭ চৈত্র ১৩৩৭ তারিখ) ১৮৪ সংখ্যক পত্রে। পত্র রচনার দেড় বছর পর কবি এ কবিতায় পত্রের ভাবটিকে 'ভাবচ্ছন্দে' ফুটিয়ে তুললেন। চিঠিতে কবি বলেছেন—'আমার অন্যমনস্ক হবার বয়স হয়েছে'—অনেককিছুই তিনি ভুলছেন—অনেক দরকারী কাজকর্ম—অনেক-কিছুই হয়তো করতে হতো কিন্তু তা হচ্ছে না—এইভাবে একটা দিন একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক এবং মানসিক অবস্থার কথা বলতে বলতে কবি শেষে বলেছেন—"যাক্ এ হোলো কবিত্ব"। কিন্তু সেই কবিত্বটুকুকেই কাব্যিক মর্যাদা দিলেন এ কবিতায়। 'ফাঁক' শব্দটি বিশেষ একটা ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে এসে কবির রোমান্টিক মনে সূত্র বিছিয়ে দিল নানা ভাবনার। কবি বলতে চেয়েছেন—নানা ঘটনার মাঝে মাঝে জীবনে 'ফাঁক' বিছিয়ে দিতে হয় যেখান থেকে নববসন্তের হাওয়া প্রবেশ করে। গদ্যের এক-একটি চরণকে কবি কবিতায় অপূর্ব বাণীভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে আছে—

> "আর কোকিল এমন করুণ ক্লান্তভাবে ডাকচে যে মনে হচ্ছে যে, ডেকে কিছুই বলা হচ্ছে না অথচ আশা ছাড়তেও পারছে না",—

এই এলিয়ে-পড়া ভাবটিকে কবিতার মধ্যে কি অপূর্ব সংহতি দান করলেন তুলির দু'এক আঁচড়ে—

কোকিল ডেকে ডেকে সারা ;
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে ;
মনে রাখার মানহানি কোরো না।
তাকে দুঃসহ করে। ['ফাঁক'—'পুনশ্চ']

এ তো শুধু কোকিলকে বুঝিয়ে বলা নয়—বুঝিয়ে বলা সমস্ত মানুষকে—এমন কি নিজের মনকেও। তাই চিঠির মধ্যে যেখানে বললেন—"যাক এ হোলো কবিত্ব"—কাব্যে সেই সুরের রেশকে টেনে বললেন—

মনে আনবার অনেক দিনক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে ;

* * *

আবার একটুখানি নিঃশ্বাসও পড়ে। ['ফাঁক'—'পুনশ্চ']

কবির ব্যক্তিগত জীবনের তাপ অনুতাপ—এর মধ্যে দিয়ে আমাদেরও উন্মনা করে তোলে। মনে রাখার অনেক দিনক্ষণ অনেক দুঃখবেদনা কার জীবনেই বা নেই। কিন্তু তাকে এমন করে প্রকাশ করা! চিঠির ভাবটুকুকে আশ্রয় করে এ কবিতা আপন সার্থকতায় একেবারে অনবদ্য।

"পত্র" (১০ ভাদ্র ১৩৩৯—'পুনশ্চ') কবিতাটি তুলনীয় শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রের কিয়দংশের সঙ্গে। ("দেশ" পত্রিকা—পত্রাবলী' ২রা বৈশাখ ১৩৬৮, 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী'—পত্রসংখ্যা ১২১)। সময়ের হিসেবে দেখা যায়—কবি চিঠিটির তিন বছর পরে 'পত্র' (পুনশ্চ) কবিতায় 'ভাবচ্ছন্দে'র মধ্যে দিয়ে তার একটি ভিন্ন রূপ দেন। চিঠিতে প্রথম গানের প্রসঙ্গ আছে, কবিতায় কবিতার—

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা,
এক-বই-ভরা কবিতা। ['পত্র'—'পুনশ্চ']

তারপর চিঠি এবং কবিতার সমস্ত ভাবই প্রায় এক আছে—এমনকি ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিও অনেক স্থানে এক। কবিতার শেষে অতিরিক্ত ক'টি পঙক্তি দেখতে পাওয়া যায়। চিঠির—"জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনো না"—এই ছত্রের প্রকাশভঙ্গি কবিতায় এইরূপ—

চোখ বুজে কান পেতে শোনো না :
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস। ['পত্র'—'পুনশ্চ']

এখানে 'চোখ বুজে' কথাটা যুক্ত হয়েছে—আর 'শোনা হলে'র পর থেকে সবটুকুরই নূতন আগমন। চিঠির যেখানে শেষ—কবিতায় সেই পর্যন্ত এসে ভাব যেন পরিসমাপ্ত হয়নি বলে মনে হয়েছে ; তাই দু'টি বাড়তি পঙক্তির মধ্যে দুই যুগের কবির সঙ্গে তুলনা করে —এই জটলা পাকানোর যুগে কবি এবং কাব্যের পরিণতি সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বক্তব্য রেখেছেন।

চিঠি ও কবিতার তুলনা করলে আর একটা জিনিস স্বভাবতঃই চোখে পড়ে,—চিঠিতে কবি বর্তমান যুগের কবি বা কাব্য সম্পর্কে 'পত্রলেখিকা'কে ওয়াকিবহাল করেছেন মাত্র ; 'পত্র' কবিতার মধ্যে তাঁকে 'আধুনিক মালবিকা'র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে অভিযুক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত স্পর্শে এ কৌতুক আরও দানা বেঁধে উঠেছে। চিঠির ঐ রূপটি যে এমন আস্বাদনীয় হয়ে পরিবেশিত হতে পারে তা এ কবিতা না হাতে এলে বোঝা যেত না। যে-কোনো ভাবকেই যে কবি রসসিক্ত করতে নিপুণ তা এ সব নমুনা দেখলেই বোঝা যায়।

'পুনশ্চে'র পর 'শেষসপ্তক' কাব্যের কতকগুলি কবিতায় চিঠিপত্রের 'গদ্যছন্দে' পরিবর্তিত রূপকে দেখতে পাওয়া যায়। 'শেষসপ্তক' কাব্যের ১৫ সংখ্যক (১, ২, ৩) কবিতার পূর্বরূপ পাওয়া যায়, শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লেখা 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ২৬ ও ২৭ সংখ্যক পত্রের মধ্যে। ১৫ (১) সংখ্যক (শেষসপ্তক) তুলনীয় ২৬ সংখ্যক পত্র এবং ১৫ (২, ৩) সংখ্যক (শেষসপ্তক) তুলনীয় ২৭ সংখ্যক পত্র ('পথে ও পথের প্রান্তে'—দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড, প্রকাশ ১৩৫১ শ্রাবণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬১ চৈত্র, গ্রন্থপরিচয়—'শেষসপ্তক'—পৃঃ ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯)।

'শেষসপ্তক' কাব্যের কবিতাগুলির কোনো জন্মতারিখ নেই। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ২৬ সংখ্যক পত্রটি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ও ২৭ সংখ্যক পত্র ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

সালে লেখা। 'শেষসপ্তক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৫ বৈশাখ ১৩৪২ সাল। সুতরাং এই হিসাব অনুসারে দেখা যাচ্ছে চিঠির অনেক পরে কবিতার জন্ম।

'শেষসপ্তকে'র ১৫ সংখ্যক কবিতার 'এক নম্বরের' সঙ্গে 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ২৬ সংখ্যক পত্রের মিল। আর ১৫ সংখ্যকের 'দ্বিতীয়' ও 'তৃতীয়' সংখ্যকের সঙ্গে ২৭ সংখ্যক পত্রের মিল। দু'খানি চিঠিতেই কবি সাধারণ বক্তব্য দিয়েই চিঠি শুরু করেছেন—কিন্তু তারপর দূর, নিকট, সুন্দর প্রভৃতি এবং তাঁর লেখা, ছবি আঁকা—এ সমস্ত সম্পর্কে নানা ধ্যান ধারণা ভাবনা কল্পনার মালা গেঁথে চলেছেন। কবিতার মধ্যে তাই বলছেন—

যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাক পিওনগিরি করে না সে।

[১৫।২ সংখ্যক—'শেষসপ্তক']

চিঠির ('পথে ও পথের প্রান্তে'—২৭ সংখ্যক পত্র পৃঃ ৮২৭)* একস্থানে আছে—

"অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করেছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন।"

গদ্যকবিতায় এই ভাবকেই এঁকে চললেন—

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।

[১৫।৩ 'শেষসপ্তক']

কবি এই 'অন্তহীন ইঙ্গিত'কে এতদিন ধরেছেন ছন্দধ্বনির দ্বারা বাক্যের বন্ধনে—

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে
আজকাল আছে সে চোখ মেলে;

[১৫।২ সংখ্যক 'শেষসপ্তক']

জগৎকে দেখছে সে—

রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে

[২৭ সংখ্যক পত্র—'পথে ও পথের প্রান্তে']

* দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী—১০ম খঃ প্রবন্ধ—[জন্ম শতবার্ষিক সং]

তাই আজ বলছেন—

সমস্ত বিশ্বজুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

[১৫।৩ সংখ্যক 'শেষসপ্তক']

এছাড়া 'শেষসপ্তক' কাব্যের আরও কয়েকটি কবিতার পূর্বপাঠ চিঠির মধ্যে পাওয়া যায় বলে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন। 'শেষসপ্তক' কাব্যের ১৬ সংখ্যক কবিতার পূর্বরূপ পাওয়া যায় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা পত্রের মধ্যে, ১৭ সংখ্যক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের মধ্যে, ১৮ সংখ্যক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্রের মধ্যে, ৪২ সংখ্যক শ্রীচারুচন্দ্র দত্তকে লেখা পত্রের মধ্যে, ৪৩ সংখ্যক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে এবং ৪৫ সংখ্যক শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখা পত্রের মধ্যে। ['রবীন্দ্রজীবনী'—৪র্থ খণ্ড]*

কিন্তু 'গ্রন্থপরিচয়ে' একমাত্র ১৫ সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর শ্রীমতী 'নির্মলকুমারী মহলানবিশ'কে লেখা পত্র ছাড়া আর কিছুর আবিষ্কৃত রূপ এখনও হাতে আসেনি। কেবল বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রসদনে' রক্ষিত "অপ্রকাশিত পত্রাবলী"র মধ্যে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা (১৬ সংখ্যক ১ নং—শেষসপ্তক) একটি চিঠির মধ্যে শেষসপ্তক কাব্যের ১৬ সংখ্যক কবিতার 'খসড়া' রূপটি মেলে।—

"অনেকদিন কাটিয়েছি একান্তভাবে কথার সাধনায়, এখন পড়েছি রেখার মায়ায় জড়িয়ে। কথার দাবী বেশি, কেননা, সে ধনীঘরের পাত্রীর মতো অর্থ সঙ্গে করেই আনে, সেই মুখরার মন রাখতে অনেক চিন্তা করতে হয়। রেখা অপ্রগল্‌ভা এবং অর্থহীনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ লীলা সম্পূর্ণ অনর্থক ব্যবহার। গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো সে এক ব্যাপার, আর গাছের তলায় আলো-ছায়ার নাট বসানো সে আর-এক কাণ্ড—সেইখানেই ঝিল্লি ডাকে, প্রজাপতি ওড়ে, রাতের বেলা জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করে বনের আসরে,······ দায়িত্ববোধহীন বালকটা লুকিয়ে আছে, তার সাহস বেড়ে গিয়েছে।"
[শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৬ই কার্তিক, ১৩৩৫]

* শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ : ১৩৬৩ শ্রাবণ 'শেষসপ্তক'—[পৃঃ ১১' 'পাদটীকা' দ্রষ্টব্য]

চিঠির এই অংশের সঙ্গে 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'ষোলো-১'—সংখ্যক কবিতার আশ্চর্য মিল দেখা যায়—

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর এক কাণ্ড। [৭ এপ্রিল ১৯৩৪]

এইভাবে চিঠিকে আগে রূপ দিয়ে—পরে তাকে গদ্যকবিতার ভাবে আর একটি ভিন্ন রূপে মর্যাদা দিয়েছেন। গদ্য থেকে গদ্যকবিতার পার্থক্যটি এখানে সহজেই অনুমেয়।

কবিতার 'পাঠান্তর' হিসেবে এই ক'খানি চিঠিপত্রকেই পাওয়া গেছে। চিঠিকে কবিতার আকারে রূপ দেওয়া কিংবা চিঠির ভাবকে কবিতায় তুলে ধরা অথবা কবিতার ভাবকে চিঠির মাধ্যমে অভিব্যক্ত করা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 'পাঠান্তর' তো তাকে বলা যাবে না, এ হচ্ছে একটি 'পূর্বতন পাঠ' বা 'খসড়া' রূপ, যাকে শুধু ভঙ্গি বদলে আর একরূপে পরিবেশন করা হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 'পুনশ্চ' এবং 'শেষসপ্তকে'র যুগেই কবিতার 'পাঠান্তর'কে আমরা চিঠির মধ্যে পাচ্ছি। এর পরও 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' 'ষোলখানি' কাব্য জন্ম নিয়েছে—তার মধ্যে দু'খানি গদ্যকবিতাগ্রন্থও আছে। তবে ঠিক এই সময়েই কবিতার পাঠান্তর হিসেবে আমরা চিঠিকে পেলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব—কবির তৎকালীন কবিমানসের অন্তর্লোকের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে হয়তো মিলতে পারে। মনে হয় 'দুটি' মানসিকতা এর মধ্যে কাজ করেছে।

প্রথমত, কাব্যিক গদ্য যে রসের দিক থেকে কবিতা বলে গ্রাহ্য হতে পারে তার একটা পরীক্ষা চালানো—যা 'লিপিকা'র মধ্যে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শুধু ভীরুতার জন্যই তাকে পঙ্‌ক্তি বিভাগ করে সাজাননি। কাব্যিক গদ্য যে কবিত

হবার যোগ্য তা 'গদ্যকবিতা' রচনার প্রাথমিক যুগে হয়তো চিঠির 'খসড়া' রূপকে কবিতায় দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়ত, অন্য একটি কারণও মনের মধ্যে উঁকি দেয়—গদ্যকবিতার বিষয়টা ঠিক কি ধরনের হবে—কোন্ ধরনের ভাবকে কেমন ভাষায় সাজালে তার একটা 'কাব্যমূর্তি' দাঁড়াবে—তা তখনও পর্যন্ত কবির কাছে যেন ঠিক পূর্ণাকারে আসেনি—কেবল মনের মধ্যে তাকে নিয়ে একটা তোলপাড় চলেছে মাত্র। অথচ 'কাব্যিক গদ্যরচনায়' কবি সিদ্ধহস্ত; কবির এই সমস্ত চিঠিপত্র যে ব্যক্তি এবং বিষয়কে অতিক্রম করে সর্বসাধারণের চিত্তে রসাবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ তা তার অনেক আগেই পরীক্ষিত। তাই সেই 'পূর্বতন খসড়া রূপকে' হয়তো গদ্যকবিতার মাধ্যমে প্রথম যুগের প্রচেষ্টায় রূপ দিয়ে একবার এর যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। অবশ্য এ সবই অনুমানসাপেক্ষ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এককভাবে কোনো কবিতার শিল্পোৎকর্ষ বিচার 'পাঠান্তর' আলোচনার উদ্দেশ্য নয়—তুলনামূলক বিচারে তাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার এবং বিশেষভাবে কবির কোন্ মানসিকতা এর পিছনে কাজ করেছে সে সম্পর্কে একটা রসগ্রাহী সমালোচনাই 'পাঠান্তর' আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

(২) নাটক থেকে কবিতায় রূপান্তর :

নাটককে কবিতার 'পূর্বপাঠ' হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শিশুতীর্থ' এবং 'শাপমোচন' কবিতায়।

'শিশুতীর্থ' (পুনশ্চ) সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মূল রচনা হয়েছিল ইংরেজিতে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির 'মিউনিক' শহরে থাকতে খ্রীষ্ট জীবনের অপরূপ নাট্যরূপ দেখে কবি প্রেরণা পান। বিখ্যাত 'উকা কোম্পানি' কবিকে নাটকের উপযোগী একটা কিছু লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন—এটাও অন্যতম প্রত্যক্ষ হেতু বলে মনে হয়। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ২৪শে জুলাই ১৯৩০ তারিখের একখানি চিঠিতে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নূতন রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন—ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা।"[১]

এই নূতন রকম টেকনিক হচ্ছে 'গদ্যছন্দ'। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের "The Child" নামে প্রথম নাটকের আকারে 'গদ্যকবিতা' রূপে জন্ম নিল। পরে বাংলায় একে অনুবাদ করেন (শ্রাবণ ১৩৩৮)। ১৩৩৮সালের ২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র এবং

১। প্রবাসী —[১৩৩৭ কার্ত্তিক, পৃঃ ৯৮]

১লা আশ্বিন কবির পরিকল্পনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কলকাতায় সর্বসাধারণ সমক্ষে নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠান হয়।

প্রথম 'গদ্যকবিতা'র জন্ম-ইতিহাস এই 'অনুবাদ' এবং 'পাঠান্তরে'র মধ্যেই। "The Child" থেকে "শিশুতীর্থ" ('পুনশ্চ') ভাবানুবাদ তো বটেই, উচ্চাঙ্গের ভাবকল্পনার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদাক্ত ঘটনারও একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে এর পরিকল্পনায়;—ভাষাও তদনুরূপ সর্বগ্রাসী ভাবকল্পনার বাহন। অনুবাদে মূল পাঠের সমস্ত ছত্রই প্রায় ঠিক ঠিক আছে। "The Child" এর সূচনায় আছে—

What of the night ? They ask.
No answer comes.

"শিশুতীর্থে" হয়েছে—

রাত কত হ'ল ?
উত্তর মেলে না।

"শিশুতীর্থে"র যেখানে সমাপ্তি, "The Child" এর মূল পাঠে তারপরেও আছে—

The Old man from the East murmurs
to himself : "I have seen "

দেখা যাচ্ছে—"The Child"-কে মূল পাঠ ধরলে পাঠান্তরের অতিরিক্ত ব্যাখ্যাটুকুকে কবিতায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। "They ask" বা "The old man…seen"-এর অনুবাদ নেই।

"শিশুতীর্থে"র সূচনা এবং সমাপ্তি অনেক বেশি চমকপ্রদ—

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।

* * *

উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে : জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চির জীবিতের।

"শাপমোচন" নৃত্যনাটিকাটির জন্ম হয় "রাজা" [১৩১৭ পৌষ) নাটকের কথাবস্তুকে অবলম্বন করে। ১৩৩৮ সালের পৌষের ১৫ ও ১৬ তারিখ নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই সংক্ষিপ্ত নৃত্যনাট্যটির অভিনয় হয়। 'শাপমোচন' (পুনশ্চ) কবিতাটির ঐ নাটক থেকেই রূপান্তর হোল (পৌষ ১৩৩৮)। পূর্বপাঠ 'নাটক' থেকে এ কবিতার কিছুই তারতম্য ঘটেনি—শুধু পঙক্তি বিভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। 'শাপমোচন' কবিতার কাঠামোয় অভিনয় নয়। প্রথম অভিনয়কালে রচনা অভিন্নপ্রায়।

যেমন "সোনার তরী"র 'ঝুলন' আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় হয়। কবিতা নূতন হোল না, তার প্রয়োগ মাত্র নূতন। নাটকের শেষে একটু বাড়্তি অংশ দেখতে পাওয়া যায়—

"কখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহ-বেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে"।

কবিতায় বাহুল্য বিবেচনায় এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে। এর যা বক্তব্য তা তো ইঙ্গিতেই পাঠক-মনে পৌঁছে গেছে অলক্ষ্য সুরের জাদুস্পর্শে সুতরাং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) কবিতা থেকে কবিতায় রূপান্তর :

এই তৃতীয় শ্রেণীর 'পাঠান্তরে'র মধ্যে আমরা 'পাঠান্তরে'র আসল রূপটিকে লক্ষ্য করতে পারি। আর অধিকাংশ কবিতার 'পূর্বপাঠ' বা 'পাঠান্তর' এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটি কবিতার 'পূবতন রূপ' বা 'খসড়া পাঠ' কবিতাতেই হওয়া সম্ভব। কবি, মনের কোনো বিশেষ ভাবকে বা একটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে চেয়েছেন ভাবে-ভাষায়-ছন্দে মণিহার করে; সেই বিশেষ মুহূর্তের প্রকাশের মধ্যে অনেক সময় আবেগবশে বা অসতর্কতা বশে শিল্পের একটি পরিশীলিত আত্মপ্রকাশ নাও ঘটতে পারে—তাই পরে কবি আপন ভাবপ্রবণ কল্পনাকে স্বীয় অভিজ্ঞতার ছাঁক্‌নিতে বেশ করে ছেঁকে নিয়ে পাঠক সমাজকে দান করেন। সুতরাং ভাবের এই প্রাথমিক রূপ এবং ছেঁকে নেওয়া পরিশীলিত রূপ দুয়ের মধ্যে সাধারণতঃ তফাত থাকে, সেটাকেই 'পূর্বতন' রূপ বা 'খসড়া' বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ ছাড়াও সজ্ঞানে একই কবিতাকে অর্থাৎ ভাবকে বিভিন্নভাবে রূপ দেবার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই 'কবিতা থেকে কবিতার' পাঠান্তরও নানা ধরনের। একই ভাবমূর্তির এই যে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ এটাই 'পাঠান্তর' আলোচনার কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণ।

কবিতার 'পাঠান্তর' কবিতা হলেও বিচিত্র ধর্ম অনুসারে এদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

(ক) সমান্তরাল শ্রেণীর পাঠান্তর :

এই শ্রেণীর পাঠান্তরে দেখা যায় একটি কবিতার গৃহীত পাঠের সঙ্গে বর্জিত পাঠ বা 'পাঠান্তর' শিল্পের উৎকর্ষের দিক থেকে সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য। দুটি রূপকে পাশাপাশি আলোচনা করলে দেখা যায় কোনোটি এক কারণে সার্থক—অপরটি অন্য কারণে। দুটি রূপ পাশাপাশি যেমন পদ্য কবিতার আছে, তেমনি একটি গদ্যছন্দে

অপরটি পত্মছন্দেও আছে ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটিই চূড়ান্ত রূপের মর্যাদা পাবার যোগ্য ; কিন্তু কবি একটির ললাটে জয়তিলক এঁকে ভোজসভার পঙক্তিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংকলিত গ্রন্থে তাকে গৃহীত পাঠের মর্যাদা দিয়েছেন—অপরটিকে 'বর্জনচিহ্ন এঁকে 'পাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ' করেছেন'। কখনো বা গৃহীত রূপের মধ্যে একই ভাবের বিভিন্ন রূপাঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর সমান মূল্য পাওয়ার যোগ্য। এই সমমর্যাদা-সম্পন্ন বিভিন্ন রূপনির্মিতির খেয়াল কোন্ মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে, তা সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। এ সম্পর্কে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

"পূর্ণাঙ্গ কবিতায় কবিচিত্তের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, খসড়ায় তাঁহার প্রতিভা ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রকাশিত ;···কোন কবিতার হয়তো তিনটি পাঠ আছে, তাহাদের সৃষ্টির মূলে বিবর্তনের নিয়ম সক্রিয় নয় ;—একটির চেয়ে আর একটি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে যে উন্নততর এমন নয়,···ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরের আলোচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য—কারণ ক্রমবিকাশের একটা লক্ষ্য আছে—এবং চূড়ান্তরূপে সে লক্ষ্যটিকে আমরা পাইতেছি। কিন্তু সমান্তরাল-শ্রেণীর আলোচনা তেমন অনায়াসসাধ্য নয়—এখানে কবির লক্ষ্য কি আমরা স্পষ্ট জানিতে পাই না,···কেন তিনি পাঁচটি অল্পবিস্তর সমানরূপ সৃষ্টি করিতে গেলেন, কেনই বা সেগুলিকে চূড়ান্ত মর্যাদা না দিয়া পাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ করিলেন, সম্মুখের দিকে হস্ত প্রসারিত না করিয়া, কেন তিনি পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মরিতেছিলেন—এ সব রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়।"[১]

কবিমনের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদ হয়তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—কিন্তু চেষ্টা করা চলতে পারে। অনেকের মনেই প্রশ্ন কবি অল্পবিস্তর পাচটি সমান রূপ সৃষ্টি করতে গেলেন কেন ? বিষয়বস্তুর অভাবে কি ? না কি, কোনো মানসিক অস্থিরতা ?

এ সম্পর্কে মনে করা যেতে পারে কবির উদ্দেশ্য ঠিক তা নয়। একই ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা শিল্পে রূপ দিলে কেমন লাগে এ যেন তারই একটা পরীক্ষা এবং খেয়ালী মনের বিভিন্ন রূপসৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ। এই বৈচিত্র্যপিয়াসী মন সম্পর্কে কবির নিজেরই বক্তব্য—

"আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম।···ভাবকে রূপ দেওয়া আমার কাজ—আমার সেই সৃষ্টিতে আমার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয়, ভাব আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিজেকে বাইরে থেকে মেলায় না—নিজের রূপ-দেহ

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্র-বিচিত্রা"—[সং—২রা আষাঢ়, ১৩৬৪]
"রবীন্দ্রকাব্যে পাঠান্তর"—[পৃঃ ৩, ১০—১১]

সে নিজেই সৃষ্টি করে—আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ করে নতুন রূপের মধ্যে প্রকাশ খোঁজে।"[১]

আবার—

"...কিন্তু কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড় জিনিস নয়, এমন কি খুব বড় অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিস হচ্ছে সৃষ্টি—অর্থাৎ রূপভাবন।......আমি কর্মীও বটে—কিন্তু যার অন্তরদৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্মের কর্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি হাসাই, একান্তে কোনো একটা মাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে।[২]"

এই আত্মসমালোচনা থেকেই কবির মানসিকতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় আসা যায় এবং উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবও পাওয়া যায়। তিনি 'কারুকর্মের' কর্মী—রূপসৃষ্টিই তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা; তাই পাঠান্তরের ক্ষেত্রেও একই ভাবকে বিচিত্র রূপসজ্জায় দেখার আকাঙ্ক্ষা সেই মানসিকতার স্বভাবধর্ম।

'সমান্তরাল পাঠান্তরে'র নিদর্শন স্বরূপ 'শেষসপ্তক' কাব্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থোক্ত 'দশটি' কবিতার পাঠান্তর 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'সংযোজন' অংশে পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে নয়টি কবিতার সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নামকরণ ও তারিখ পাওয়া যায়। 'শেষসপ্তক' কাব্যের—

'দুই'	সংখ্যক	কবিতা	তুলনীয়	'সংযোজন'	অংশের	'স্মৃতিপাথেয়'
'তিন'	"	"	"	"	"	'বাতাবির চারা'
'চার'	"	"	"	"	"	'শেষপর্ব'
'ছাব্বিশ'	"	"	"	"	"	'মর্মবাণী'
'সাতাশ'	"	"	"	"	"	'ঘটভরা' এবং গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত স্বতন্ত্র একটি পাঠ
'পঁয়ত্রিশ'	"	"	"	"	"	'প্রশ্ন'
'ছত্রিশ'	"	"	"	"	"	'আমি'
'সাইত্রিশ'	"	"	"	"	"	'আষাঢ়'
'আটত্রিশ'	"	"	"	"	"	'যক্ষ'

কবিতার সঙ্গে। এর মধ্যে পাঁচটি কবিতার মাত্র জন্মতারিখ পাওয়া যায়। অবশ্য

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র (৯ম খণ্ড) শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র সংখ্যা—৫, ২৩ এপ্রিল ১৯৩১ [প্রকাশ: বিশ্বভারতী ১৯৬৪]

২। ঐ ঐ পত্র সং ৮, ২শে ১৯৩১ ঐ [পৃ: ২০, ২১—২২]

সেই কবিতা সংযোজন অংশের। শেষসপ্তক কাব্যের 'এক' সংখ্যক কবিতায় তারিখ দেওয়া আছে (শান্তিনিকেতন ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল), আর গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪২ সাল ২৫শে বৈশাখ। এই তারিখ অনুসারে মোটামুটি হিসাবে কবিতাগুলি প্রায় আড়াই বছরের সংকলন।

গ্রন্থোক্ত ২৩ ও ৩৪ সংখ্যক কবিতা তুলনীয় পরবর্তী কাব্য 'প্রান্তিক'-এর '১৫' ও '১৬' সংখ্যক কবিতার সঙ্গে।

'সংযোজন' অংশের সর্বশেষ সংকলনটি 'দুঃখ যেন জাল পেতেছে' (তুলনীয়-'দশ'-সংখ্যক কবিতা) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

'শেষসপ্তক' কাব্যের এই সমস্ত কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, গৃহীত পাঠের সঙ্গে 'সংযোজন' অংশে বর্জিত পাঠের কবিতাগুলিকে পাশাপাশি রাখলে, উৎকর্ষের দিক থেকে তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর সমান মর্যাদা পেতে পারে। এ-জন্যই এদের 'সমান্তরাল শ্রেণীর পাঠান্তর' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

কিন্তু তুলনীয় কবিতাগুলির মধ্যে গ্রন্থোক্ত কোনো কবিতারই তারিখ পাওয়া যায় নি, কেবল 'সংযোজন' অংশের পাঁচটি কবিতায় তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং তুলনামূলক আলোচনায় কোন্‌টি যে পূর্ববর্তী রূপ তা নিশ্চিত করে বলার কোনো প্রমাণ নেই। তবে 'রবীন্দ্র-জীবনী' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে 'শেষসপ্তকে'র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে স্মরণে আনা যায়—

"পুরাতন কবিতা ভাঙিয়া গদ্যছন্দে নূতন রূপদানের পরীক্ষা হইয়াছে কয়েকটির মধ্যে।"[১]

এই মন্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায়—'সংযোজন' অংশের পদ্যছন্দে লিখিত কবিতাগুলির থেকে গ্রন্থে সংকলিত গদ্যছন্দে লিখিত কবিতাগুলির পরে জন্ম হয়। তাছাড়া, এটাই স্বাভাবিক। পদ্যছন্দে কবি এত অভ্যস্ত এবং এই ছন্দে তাঁর মন এমন সহজে মুক্তি পায় যে, এই ছন্দে কবিতার ভাবকে প্রথম বাঁধেন, পরে সমসাময়িক কালের নূতন ভাবনায় এবং ভাষায় তাকে নূতন রূপে সাজান। কারণ,···"নূতন ভাষায় ও ছন্দে, নূতন ভঙ্গিতে, নূতন প্রকরণে নির্মীয়মাণ অভিনব আধার না পাওয়া গেলে অতি বড়ো প্রতিভারও সৃজনাবেগ এক সময় স্তব্ধ হবে না কি ? এ সংসারে নূতন বিষয় তো কিছুই নেই ; স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সামনে যে শোভা, যে মাধুরী, যে সত্য ছিল আজও তাই আছে—নূতন প্রতিভার শক্তিতে বারে বারে তার নূতন প্রকাশ হয় মাত্র।

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী" [৪র্থ খণ্ড] [প্রঃ ১৩৬৩ শ্রাবণ] পৃঃ ১১

সেই নূতনতার চমৎকার ক্ষয় হলে বা মুছে গেলে প্রকাশের প্রেরণাও ঘুচে যায়। তাই সচেতন কবি বা শিল্পী নিত্য নূতন উপায় উপকরণের সন্ধান করেন। ভাবের নূতন ভাষা চাই, ভাষার নূতন ছন্দ। রবীন্দ্র-প্রতিভারও এই ছিল সুচিরপ্রবণতা। নূতন ভাষা ও ছন্দের গুণে বারে বারে নিজেকে নূতন করে চিনেছে ও চিনিয়েছে।"[১]

'সমান্তরাল শ্রেণী'র পাঠান্তরের মধ্যে কবি-প্রতিভার সেই বিচিত্র রূপসাধনার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি সম্পর্কে এটিই সব থেকে বড় কথা যে, দুই রূপেই কবিতাগুলি পরিপূর্ণভাবে সার্থক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার পাশাপাশি তুলনা করলেই এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'দুই' সংখ্যক কবিতাটি ঐ গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের 'স্মৃতি-পাথেয়' নামক কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয়। দুটি কবিতার ভাবব্যঞ্জনা এক রাখা হয়েছে। পদ্যের সঙ্গে গদ্যের বাচনভঙ্গিতে যে তফাত সেটুকু লক্ষণীয়!

'স্মৃতিপাথেয়' [শে. স.—সংযোজন] কবিতায় আছে—

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা···

এই ভাবটুকুকেই গদ্যের সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে তুলে ধ'রলেন—

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা;

['দুই' সং—শেষসপ্তক]

গদ্যে বাচনভঙ্গি অনেক স্পষ্ট। সেই 'তুমি', যার মুখে 'অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা' ('স্মৃতিপাথেয়'—শে. স.-সংযোজন), কবি আর কোনোদিন যার দেখা পান নি; যা—

দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়। ['স্মৃতিপাথেয়'—শে. স.-সংযোজন]

১। শ্রীকানাই সামন্ত—"রবীন্দ্র-প্রতিভা"—[প্রঃ ২২ শে শ্রাবণ ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী'—[পৃঃ ১৮০-১৮১]

এই ভাবটুকুই গদ্যছন্দে রূপ নিল—

জোয়ারে তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

['দুই' সং—শেষসপ্তক]

পদ্যে 'অনির্বচনীয়' ব্যঞ্জনাকে বোঝাতে স্বল্প ভাষণটুকুই যথেষ্ট ছিল, গদ্যে তাকেই একটু বিস্তৃতি দেবার চেষ্টা ; কারণ, কবিতার অধরা মাধুরীটুকুকে ধরার চেষ্টা করেছেন এই উপমার সাহায্যে।

তারপর দু'টি ক্ষেত্রেই গোটা কবিতাটি মোটামুটি ঠিক আছে। পদ্যছন্দের (স্মৃতি-পাথেয়'—শে. স.-সংযোজন) শেষ চার পঙ্‌ক্তিকে কেবল গদ্যছন্দে ('দুই' সং—শেষসপ্তক) বর্জন করা হয়েছে। মনে হয়, এই পঙ্‌ক্তি ক'টি ব্যক্তিগত ছোঁয়াচকে অতিক্রম করে একটি তাত্ত্বিক মনোভাবকে প্রকাশ করেছে বলেই কবি হয়তো গদ্যকবিতা থেকে তাদের বাদ দিয়েছেন। যেমন—

পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে।
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

['স্মৃতিপাথেয়'—শে. স.-সংযোজন]

গদ্যকবিতা ('দুই' সং—শে. স.) থেকে এই অংশটুকু বর্জিত হলেও ভাবের অসম্পূর্ণতা কিছু ঘটেনি। দু'টি কবিতাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্থক।

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'তিন' সংখ্যক কবিতাটিও ঐ গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের 'বাতাবির চারা' নামক কবিতা থেকে জন্ম নিলেও সূচনা থেকেই স্বতন্ত্র—

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন,
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।

['তিন' সং—শেষসপ্তক]

এই সূচনাংশ 'বাতাবির চারা' ('সংযোজন'—শে. স.) কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক থেকে জন্ম নিয়েছে। 'বাতাবির চারা' কবে, কে, কোথায় রোপণ করেছে সেই বিশেষ সংবাদটি

কবি আর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাই বর্জন করলেন ঐ কবিতার সূচনাংশ—

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্ন-বর্ষণ কোন্ শ্রাবণপ্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।

['বাতাবির চারা'—শে. স. সংযোজন]

কিন্তু যে চারা কবির মনে কোনো এক অব্যক্ত স্মৃতিকে বহন করে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, সেই গোপন মধুর সংবাদটিকে তো পৌঁছে দিতে হবে সকলের মনে; তাই গৃহীত পাঠে ('তিন' সং—শে. স) এই ভাবটিকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয়;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না বলে গিয়েছ চলে।

'বাতাবির চারাটি'র সঙ্গে একটি সুমধুর স্মৃতির যোগকে কবি অনুভব করেছেন আপন অন্তরে। এই কচি কিশলয়গুলির অব্যক্ত বাণীর মধ্যে স্মৃতিবাহিকা সেই অলক্ষ্য দূতীর না-বলা বাণীর সুর গুঞ্জরিত—এটা কবি গোপনে অনুভব করেন। তাই তো এর প্রকাশভঙ্গি যাই-ই হোক না কেন, মন এর রসে আবিষ্ট হয়ে বলে ওঠে সুন্দর!

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'সাতাশ' সংখ্যক কবিতাটির দুটি 'পাঠান্তর' পাওয়া যায়। একটি ঐ গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের 'ঘটভরা' (আশ্বিন ১৩৪৩) নামে, অপরটি ঐ গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়'* অংশে। একই কবিতার পাশাপাশি তিনটি রূপের তুলনা করলে, তিনটি রূপকেই সার্থক কবিতা বলতে দ্বিধা হয় না; অথচ কবি গ্রন্থোক্ত 'সাতাশ' সংখ্যক কবিতাটিকেই চূড়ান্ত রূপ হিসেবে কাব্যে ঠাঁই দিয়েছেন। ভাবটা মোটামুটি তিনটি রূপের মধ্যে একই রেখে শুধু কিছু কিছু শব্দের হেরফের ঘটিয়ে বাচনভঙ্গির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আনা হয়েছে।

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—'শেষসপ্তক'—রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ডপৃঃ ৫৭১ [সং—১৩৫১ শ্রাবণ পুনর্মুদ্রণ ১৩৬১ চৈত্র]
'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রূপ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ [পৃঃ ১৭৭]

'শেষসপ্তকে' গৃহীত 'সাতাশ' সংখ্যক পাঠটির কোনো জন্মতারিখ পাওয়া যায়নি। ঐ গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের 'ঘটভরা' নামক যে রূপটি পাওয়া যায় বন্ধনীমধ্যে তার যে তারিখ আছে (আশ্বিন ১৩৪৩) তা নির্ভরযোগ্য নয়। আর গ্রন্থপরিচয়ে যে স্বতন্ত্র পাঠ-টি আছে প্রবাসীতে তা প্রকাশিত হয়েছিল 'অগ্রহায়ণ ১৩৪৩' সালে পৃষ্ঠা ১৭৭-এ। সেখানে এই কবিতা সম্পর্কে 'প্রবেশক বচন' হিসেবে নিম্নলিখিত ছত্র ক'টি পাওয়া যায়—

" 'শেষসপ্তকে' সাতাশ-সংখ্যক যে কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেটা মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল। তারই পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে পাঠানো হলো।"
শান্তিনিকেতন ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৩ [প্রবাসী-৮ | ১৩৪৩ | ১৭৭ পৃ:]

'প্রবাসী'র এই মন্তব্য প্রবাসী সম্পাদক বা সহসম্পাদকের নয়; ঐ মন্তব্যের উদ্ভবস্থল শান্তিনিকেতনে স্থিত সমকালীন রবীন্দ্রদপ্তর, তাং ২৪।৬।১৩৪৩।

সুতরাং এই 'প্রবেশক বচন'টিই অকাট্য যুক্তি যে, 'সাতাশ'-সংখ্যক (শেষসপ্তক) কবিতাটির পূর্বরূপ 'গ্রন্থপরিচয়ে'র ঐ মিলহীন পদ্যরূপটি। কিন্তু গৃহীত পাঠের গদ্যছন্দে লিখিত রূপটির পূর্বে মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা আর একটি রূপও লক্ষ্যগোচর হয় ('ঘটভরা' —শে. স -সংযোজন)। অথচ গদ্যছন্দে লিখিত রূপটিকেই কবি চূড়ান্ত রূপ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত টানলে বোধহয় ভুল হয় না যে, পদ্যরূপটি যা কবির অনায়াসলভ্য, তাতেই ভাবটিকে আগে রূপ দেন। প্রথম, ভাবের একটি খসড়া রূপ আঁকার পর, কবি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তখন ঐ পদ্যছন্দেরই একটু অদল-বদল করে আর একটি রূপ কবি নির্মাণ করেন। কিন্তু এরও ছন্দ-ভঙ্গি-ভাষা অত্যন্ত অভ্যস্ত; এরা ঠিক পূর্বযুগের পদ্যকবিতার ন্যায় উচ্চস্তরের ভাবকল্পনা-ছন্দ-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে উচ্চপর্যায়ের রোম্যান্টিক আবেগধর্মী কবিতার সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে পারেনি; তাই এই অভ্যস্ত ছাঁচ কবিকে যেন ঠিক তৃপ্তি দিতে পারেনি। সেজন্য কবি সেই সময়ে কাব্যের যে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, সেই নূতন ভঙ্গিতেই ঐ কবিতার একটি স্বতন্ত্র রূপ আঁকলেন। যে-কথা যেমন করে বলতে চান, এতক্ষণে সেই বাণীটিকে যেন খুঁজে পেলেন, কবি থামলেন।

তিনটি পাঠকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে মনে হয়, 'গ্রন্থপরিচয়ে' উল্লিখিত পাঠটিই প্রথম রূপ; এই খসড়া রূপই 'পাঠান্তরে'র মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বর্তমান গৃহীত রূপের আকার নিয়েছে। প্রথম, 'গ্রন্থপরিচয়ে'র (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৮শ খণ্ড 'গ্রন্থপরিচয়' —শেষসপ্তক—পৃ: ৫৭১) পাঠটির সূচনায় দেখা যায়—

'ঘটভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

আমার ঐ ছোটো কলস পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
সকালবেলায় বসে থাকি
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

তারপর 'ঘটভরা'য় (শেষসপ্তক—'সংযোজন' অংশ) এই ক' ছত্রই একটু পরিবর্তিত রূপ নিয়ে হোল—

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারাসকাল পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল-কালো পাথরটাতে।

প্রথম পাঠের প্রথম ছত্রের 'ঐ', দ্বিতীয় পাঠে 'এই,' হয়েছে। ১ম পাঠের ২য়, ৩য় ছত্র দ্বিতীয় পাঠে তিনটি ছত্রে সাজানো হয়েছে; এবং বেশ কিছু ওলোট-পালোটও হয়েছে। 'সকালবেলায় বসে থাকি'—হয়েছে 'সারাসকাল'; 'পেতে রাখি' (১ম পাঠের ১ম ছত্রের) দ্বিতীয় পাঠের 'সারাসকালে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং ১ম পাঠের ৫ম পঙ্‌ক্তি—'পা ঝুলিয়ে'—দ্বিতীয় পাঠে একেবারে বিদায় নিয়েছে। দেখা যাক্, গৃহীত পাঠে এই স্তবকটির এই ক'টি ছত্রই গদ্যছন্দের আঙ্গিকে কেমন আকার নিল—

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

['সাতাশ' সং—শেষসপ্তক]

খসড়ারূপের দু'টি পাঠ থেকেই গৃহীত পাঠের চূড়ান্ত রূপের জন্য কিছু কিছু নিয়েছেন। ১ম পাঠের ১ম ছত্রের 'কলস' শব্দটি ২য় পাঠে হয়েছিল 'কলসখানি'—এবার গৃহীত পাঠে হয়েছে 'কলসিটা'। 'কোমরে আঁচল বেঁধে' পঙ্‌ক্তিটা নতুন যোগ হয়েছে। ১ম পাঠের শেষ পঙ্‌ক্তির 'পা ঝুলিয়ে'—চূড়ান্ত রূপের মধ্যে আবার এসে ঠাঁই করে নিয়েছে।

কবিতা হিসেবে তিনটি পাঠই কিন্তু রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে না; অথচ একটি রূপের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে অপর একটি রূপ যে আকার নিয়ে সুডৌল একটি মূর্তি নির্মাণ করছে তার বৈচিত্র্য রসিকজনের আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য।

এমনিভাবে কিছু কিছু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে বর্তমান গৃহীত রূপটিকে ('সাতাশ' সং—শেষসপ্তক) আমরা পেলাম তার বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট; আমাদের চেনা-শোনা অভ্যস্ত জীবনের একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকা ঘটনা। অথচ—

বিনা কাজে উপচে-পড়া সময় খোওয়ানো, ['সাতাশ' সং—শেষসপ্তক]-র কথা তো কাউকে বোঝানোর জিনিস নয়। হিসেব-নিকেশ করা সময়ের ঠাস বুনুনির মধ্যে দিয়ে তারা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঐ ফেনিয়ে-ওঠা, উপচে-পড়া ঝরনার জলের সঙ্গে সঙ্গে। সেকথা কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।

কবিতাটির এই উচ্ছল ভাবমাধুর্যটুকু গদ্যছন্দের স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যেও আমাদের মুগ্ধ করে।

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'তেইশ'-সংখ্যক কবিতার একটি পদ্যরূপ দেখা যায় 'প্রান্তিক' কাব্যের 'পনেরো'-সংখ্যক কবিতার মধ্যে। এ কাব্যের 'চৌত্রিশ'-সংখ্যক কবিতার সঙ্গেও 'প্রান্তিক' কাব্যের 'ষোলো' সংখ্যকের মিল রয়েছে। আমরা যা-ই মনে করি না কেন, মনে রাখতে হবে, স্বয়ং কবি কেবল এই দুটি ক্ষেত্রে একই কবিতার গদ্য ও পদ্য দুই রূপকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন। অন্যত্র তা দেননি। 'শেষসপ্তক' কাব্যে 'সংযোজন' অংশে 'পাঠান্তর' হিসেবে একই কবিতার যে সমস্ত রূপকে পরবর্তীকালে গ্রহণীয় বলে মূল্য দেওয়া হয়েছে, কবির বিচারে তা বর্জনীয়।

'প্রান্তিক' কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে। কিন্তু প্রান্তিক-এর ঐ কবিতাদুটির রচনাকাল—১৫ সং কবিতা (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪), এবং ১৬ সংখ্যক কবিতা (৭ বৈশাখ ১৩৪১)। দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার ৩ বৎসর সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে 'শেষসপ্তক'-এর কবিতাগুলি রচনার সময়েই ঐ কবিতাদুটির জন্ম। কিন্তু 'শেষসপ্তকে'র যে কবিতাদুটির সঙ্গে এদের মিল আছে, তাদের কোনো জন্মতারিখ না পাওয়ায়, গদ্যরূপ দুটি আগে, না পদ্যরূপ দুটি আগে—এ রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার। কবির স্বাভাবিক প্রেরণা এবং অধিকার অনুযায়ী মনে হয় পদ্যছন্দের ('১৫', '১৬'-সং—প্রান্তিক) রূপদু'টিরই আগে জন্ম দিয়েছেন; তারপর তাদের গদ্যছন্দে স্বতন্ত্র দুটি রূপ ('তেইশ', 'চৌত্রিশ' সং—শেষসপ্তক) আঁকেন।

পদ্যকবিতার ('১৫' সং—প্রান্তিক) রূপটিকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করে পুরোপুরিই গদ্যকবিতায় ('তেইশ' সং—শেষসপ্তক) এনেছেন। তবে গদ্যরূপটির চেয়ে পদ্যরূপটির সূচনাংশে কিছুটা বাড়্তি অংশ লক্ষণীয়। 'প্রান্তিক'-এর 'পনেরো' সংখ্যকের সূচনায় আছে—

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল।......

... ...

ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

এই অংশটুকু 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'তেইশ' সংখ্যক কবিতায় বর্জন করা হয়েছে। অপরপক্ষে, 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'তেইশ' সংখ্যক কবিতার 'সূচনা' হয়েছে 'প্রান্তিক' কাব্যের 'পনেরো' সংখ্যক কবিতার 'এগারো' ছত্র থেকে—

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

['তেইশ' সং—শেষসপ্তক]

পাঠান্তরে এই ছত্র ক'টিই রূপ পেয়েছে এইভাবে—

......চন্দন তিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।

['১৫' সং—প্রান্তিক]

ভাবে, ভাষায় দু'টি কবিতাই স্বতন্ত্রভাবে সার্থক। একই ভাবের প্রকাশে যে কত বৈচিত্র্য আনা সম্ভব, তাও এই দৃষ্টান্তে প্রমাণিত। 'প্রান্তিক' কাব্যের '১৫'-সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে তৎসম শব্দের আধিক্য এবং ছন্দের সনেটীয় ভঙ্গি বিষয়ের ও ভাবের মধ্যে গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করে পদ্যছন্দের রূপটিকে নিরেট পাথরে খোদাই কারুকার্যে পরিণত করেছে।

'প্রান্তিক'-এর অন্যান্য কবিতার সঙ্গে সেজন্যই এর সঙ্গতি রক্ষিত। অপরপক্ষে, গদ্যছন্দের সহজ সাবলীলতায় 'শেষসপ্তক'-এর কবিতাটি ('তেইশ' সং) তার স্বকীয় মাধুর্যে সমৃদ্ধ। সেজন্য দুটি কবিতাই দুই রূপে সমান আস্বাদনীয়।

'প্রান্তিক' কাব্যের '১৬' সংখ্যক কবিতাটির 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'চৌত্রিশ' সংখ্যকের সঙ্গে তুলনা করলে ঠিক একই কথা বলা যায়। ভাবের দিক থেকে দুটি কবিতা সমগোত্রীয় হলেও, ভাষা-ছন্দ-প্রকাশভঙ্গিতে 'সূচনা' থেকেই তারা স্বতন্ত্র। 'প্রান্তিকে'র কবিতাটি অনেক গাম্ভীর্যমণ্ডিত—

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের;……

['১৬' সং—প্রান্তিক]

এর সঙ্গে 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'চৌত্রিশ' সংখ্যকের তুলনা করলে দেখা যায়—

পথিক আমি
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তিনিঃস্ব।

'প্রান্তিক'-এর ভাষা, ছন্দ, ভাবের মধ্যে যে গাম্ভীর্য আনতে সমর্থ হয়েছে, গদ্যছন্দের সরল ভাষা, ভঙ্গি, তাকে যেন কিঞ্চিৎ হাল্‌কা করে দিয়েছে। তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দুটি ক্ষেত্রেই কবিতাদুটি সমান উপভোগ্য। কবিও একথা জানতেন; তাই দুটি রূপকেই গৃহীত পাঠের মর্যাদা দিয়েছেন দু'খানি কাব্যে। এই বয়সেও যে-কোনো ভাবকে যে-কোনো আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা যে তাঁর কত অপরিসীম, তা একই ভাবের বিচিত্র রূপায়ণ থেকেই বোঝা যায়। 'সমান্তরাল পাঠান্তরে'র এগুলি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

'পত্রপুট' কাব্যের গদ্যছন্দে লেখা 'সতেরো'-সংখ্যক কবিতাটির সঙ্গে 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' নামক কবিতাটির মিল দেখতে পাওয়া যায়। 'পত্রপুট'-এর কবিতাটি রচিত হয় পৌষ ১৩৪৪; 'নবজাতক'-এর কবিতাটির তারিখ দেওয়া আছে ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে গদ্যকবিতাটির জন্ম নেবার এক বছর পর পদ্যকবিতাটির জন্ম। গদ্যকবিতাটি ('সতের'-সং—পত্রপুট) ভাবটিকে সহজভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, তাঁর সহজ ভাষাভঙ্গিতে, বিষয়ের মধ্যে যে হিংস্র মনোভাব, যে পৈশাচিক উন্মাদনার ইঙ্গিত রয়েছে তা ফুটিয়ে তুলতে তেমন যেন সমর্থ হয়নি। জাপানীরা যে 'শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে' এ-নিয়ে কবি যে ব্যঙ্গাত্মক

মনোভাব 'বুদ্ধভক্তি' (নবজাতক) কবিতায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন, গদ্যকবিতার সাবলীলতায় ('সতেরো' সং—পত্রপুট) তা খানিকটা গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে। অপরপক্ষে 'নবজাতক'-এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় গুরুগম্ভীর ভাষা এবং ছন্দের সমাবেশে তা অধিক তীব্র। কবির বিষয়ের স্পষ্টতা এবং বক্তব্যের তীব্রতা—এখানেই যেন যথাযোগ্য রূপ পেল। 'বুদ্ধভক্তি' (নবজাতক) কবিতায়—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।

এই ভাবই গদ্যকবিতায় অনেক মোলায়েম হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল প্রথমে—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

['সতেরো' সং—পত্রপুট]

গদ্য এবং পদ্য দুই রূপেই কিন্তু কবিতা দুটি সমান রসোত্তীর্ণ হয়ে 'সমান্তরাল পাঠান্তর' শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে।

কবির শান্তিনিকেতনের মাটির বাসা 'শ্যামলী'কে নিয়ে তিনটি কবিতা পাওয়া যাচ্ছে। এদেরও 'সমান্তরাল শ্রেণীর পাঠান্তরে'র কোঠায় ফেলা যায়। কারণ তিনটি কবিতাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্থক। একটি কবিতা পাওয়া যাচ্ছে 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'চুয়াল্লিশ' সংখ্যাকে ; একটি ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ সালে 'শ্যামলী' গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

করকে লেখা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রাপ্ত*; অপর আর-একটি পাঠান্তর 'শ্যামলী' কাব্যের শেষ কবিতা 'শ্যামলী' (৬ অগস্ট ১৯৩৬) নামে প্রাপ্ত।

ভাবের দিক থেকে কবির মাটির পৃথিবীর উপর চিরকালের যে টান সেটাই তিনটি কবিতায় অভিব্যক্ত। বাংলাদেশের শ্যামল মাটি কবিকে চিরকালই দু'হাত বাড়িয়ে কোলে টেনেছে। কবির বৈচিত্র্যপিয়াসী খেয়ালী মন শেষবয়সে বাস করতে চেয়েছে এই মাটির ঘরে; কারণ,—

ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি;

['চুয়াল্লিশ' সং—শেষসপ্তক]

মনে হয়, মাটির বাসাটিকে শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর যখন রূপ দিচ্ছিলেন, কবি তখন 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'চুয়াল্লিশ'-সংখ্যক কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির কোনো তারিখ নেই; তবুও ভাব অনুসারে এবং অন্য দুটি রূপের ভাব ও তারিখের হিসাব অনুযায়ী 'শেষসপ্তক' কাব্যের ঐ পাঠটিকেই প্রথম পাঠ ব'লে মনে হয়। ঘর যখন নির্মাণ হচ্ছে কবির মনে তখন তার সম্পর্কে নানা কল্পনা—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাবো মাটিতে
নাম দেব তার শ্যামলী।

['চুয়াল্লিশ' সং—শেষসপ্তক]

এই উক্তিতে ভবিষ্যতের কথাই বোঝাচ্ছে। এর পর গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হোল। কবি ১৩৪২ সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনে যেদিন তাতে প্রবেশ করেন, সেদিন উচ্ছ্বসিত ভাবে শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়ে মাটির ভাষাকে যিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, "একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,

* দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী—২০শ খণ্ড [প্রঃ চৈত্র ১৩৬১]; 'গ্রন্থপরিচয়'—'শ্যামলী' [পৃঃ ৪৪৯]

আমার বক্ষের স্নেহ ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।"

['প্রবাসী'—১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ; দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী—২০শ খণ্ড
গ্রন্থপরিচয়—'শ্যামলী' পৃঃ ৪৫৯]

মাটির ভাষাকে কবি এইভাবে ব্যক্ত করলেন।

'শ্যামলী' কাব্যের 'শ্যামলী' কবিতাটি এই মাটির বাসা ত্যাগ করার সময়ে লেখা। সেখানে তাই বিদায়বেলার সুর ধ্বনিত—

এই কটা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে ;
আজ কানে কানে বলছ আমায়,
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"

['শ্যামলী'—শ্যামলী]

কিন্তু যাকে এত "আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে"—('উপহার' —মানসী) গড়েছিলেন একান্ত আপন করে, তাকে ছেড়ে যাবার সময় দেখা যায় অতি সহজভাবেই কবি এ বেদনাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায় দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

['শ্যামলী'—শ্যামলী]

যাওয়া-আসার ছন্দেই যে পৃথিবীর গতি, এ মাটি যে কাউকেই স্থায়িভাবে ধরে রাখে না—কবির এই উপলব্ধিটিই মাটির বাসা 'শ্যামলী'কে নিয়ে লিখিত এই তিনটি কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

তিনটি কবিতাই ভাবকল্পনা এবং শিল্পসমৃদ্ধির দিক থেকে সার্থক। প্রত্যেকটিকে পরস্পর মিলিয়ে পড়লে কবির আনন্দ-বেদনার একখানি রসঘন চিত্র স্পষ্ট হয়।

(খ) ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর

এক বা একাধিক 'পাঠান্তরে'র বা 'খসড়া' রূপের মধ্যে দিয়ে বিবর্তন লাভ করতে করতে একটি ভাব কিভাবে একটি পরিপূর্ণ শিল্পসত্তা লাভ করে সার্থক কবিতা হয়ে উঠতে

পারে, 'ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরে'র আলোচনায় সেটা স্পষ্ট হয়। এখানে কবির প্রয়াস এবং লক্ষ্য পাঠকের অগোচর নয়। কবি-মানসিকতারও একটি সুপরিকল্পিত রূপ ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরে লক্ষ্যগোচর হয়।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র অন্তর্গত বেশ অনেকগুলি কবিতা এইরূপ পাঠান্তরের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বিবর্তন লাভ করে পূর্ণাঙ্গ শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরে'র অন্তর্গত কবিতাগুলির নামোল্লেখ করে কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার আলোচনার দ্বারা কবি-মানসিকতার বিবর্তনধারাটিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। সকল-শ্রেণীর পাঠান্তরের মধ্যে এই পর্যায়ের আলোচনাই সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, কারণ, কবিমানসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলিকে ধাপে ধাপে জানার সুযোগ এখানে বর্তমান।

যে 'পুনশ্চ' কাব্য দিয়ে 'শেষপর্যায়' শুরু, সেই 'পুনশ্চ'-এর কোনো কবিতার 'ক্রমবিকাশ-মূলক পাঠান্তর' নেই।

পরবর্তী কাব্য 'বিচিত্রিতা'র 'বেসুর' (খড়দা, ২ মাঘ ১৩৩৮), 'কুমার' (১২ মাঘ ১৩৩৮), 'ছায়াসঙ্গিনী' (মাঘ ? ১৩৩৮) এবং 'দ্বারে' (১১ মাঘ ১৩৩৮) কবিতার 'পূর্বতন' রূপ পাওয়া যায়*।

ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির দিক্ থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটায় খস্‌ড়া-রূপের মধ্যে দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের রূপ নিয়ে এই কবিতাগুলি দাঁড়ায়। ভাবের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কেবল বর্তমান 'বেসুর' (বিচিত্রিতা) কবিতা, যার পূর্বনাম ছিল 'অসংগতি' (খস্‌ড়া রূপ 'গ্রন্থপরিচয়'—বিচিত্রিতা) ভাবে-ভাষায়-ছন্দে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পাঠ থেকে বর্তমান পাঠের এত বেশি পরিবর্তন ঘটেছে যে এ কবিতাকে নূতন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ভাব ও ব্যঞ্জনার দিক্ থেকেও বর্তমান গৃহীত পাঠটি অধিকতর আকর্ষণীয়।

'শেষসপ্তক' কাব্যের একটিমাত্র কবিতা ('নয়' সং) বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান পূর্ণাঙ্গরূপে এসে দাঁড়িয়েছে। 'শেষসপ্তক'-এর 'নয়' সংখ্যক কবিতাটির অপ্রকাশিত একটি রূপ 'পাণ্ডুলিপি' থেকে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ—১ম সংখ্যা শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫ সাল) তুলে দেওয়া হয়েছে। দুটি পাঠের ভাববস্তু ও শিল্পগত তারতম্য নিয়ে ঐ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আলোচনাও করেছেন। এই 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়' থেকে জানতে পারা যায় 'নয়'-সংখ্যক (শেষসপ্তক) কবিতাটির অপ্রচলিত পাঠের নাম ছিল 'অসমাপ্ত'।

* দ্রঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী'—১৭শ খণ্ড [প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬১];
'গ্রন্থপরিচয়'—'বিচিত্রিতা' [পৃঃ ৪৩৩]

দুটি পাঠের তুলনা করলে দেখা যায়, 'সূচনা'তেই তারা ভিন্ন রূপ নিয়েছে। অপ্রকাশিত পাঠের শুরুতে আছে—

যাকে বলেছি "সব দিলেম তোমাকে"
লেশমাত্রই দেওয়া হোলো তার হাতে।
সবটার নাগাল পাবো কেমন করে ?
সত্তার বিশ্বে বহু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়, বহু গভীরে।
এই বিপুল অনাবিষ্কৃত আপনার মধ্যে পথ কোথায় ?

[অসমাপ্ত'—দ্রঃ পাণ্ডুলিপি পরিচয়
'কবি ও কবিতা'—৪র্থ বর্ষ, ১ম সং]

প্রচলিত পরিবর্তিত রূপে ('নয়' সং, শেষসপ্তক) এই ছত্র কটিই দাঁড়াল—

ভালোবেসে মন বললে,
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি।
দিতে পারবে কেন।
সবটার নাগাল পাবো কেমন করে ?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক অনতিক্রমণীয়।

['নয়' সং, শেষসপ্তক]

অপ্রকাশিত পাঠের ('অসমাপ্ত'—পা. প. 'কবি ও কবিতা', ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং) প্রথম ছত্র "যাকে বলেছি……" থেকে পরিবর্তিত গৃহীত রূপের ('নয়' সং—শে. স.) প্রথম ছত্রটি "ভালোবেসে মন বললে……" অনেক বেশি ভাববাহী। প্রথম পাঠের "সব দিলেম তোমাকে"র স্থানে গৃহীত পাঠের ('নয়' সং—শে. স.) "আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে" বলায়, দেওয়ার মধ্যে খানিকটা সীমা টানা হয়েছে। 'সব'—'সব রাজত্বে'র থেকে অনেক বেশি। কিন্তু যাকে সব দিতে চান তাকে সব দেওয়া হয় না, কারণ 'সব'টার যে নাগাল পাওয়া যায় না। 'ও যে একটা মহাদেশ, সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন'— ('নয়' সং—শে. স)।

'পাঠান্তরে'র ('অসমাপ্ত'—দ্রঃ পা. পরিচয়, 'কবি ও কবিতা'—৪র্থ বর্ষ, ১ম সং) ৪র্থ স্তবকটিকে গৃহীত পাঠের ('নয়' সং—শে. স) ৫ম স্তবকে কিছু পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়। অপ্রচলিত পূর্বপাঠের ৪র্থ স্তবকটি—

ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা ব্যক্ত হোলো কত সূচনায়
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে
সইবে না সৃষ্টির এই বিড়ম্বনা।

['অসমাপ্ত'—দ্রঃ পাণ্ডুলিপি পরিচয়, 'কবি ও কবিতা', ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং]

গৃহীত পাঠে এই স্তবকই রূপ নিল পঞ্চম স্তবকে এইভাবে—

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

['নয়' সং—শে. স.]

এই পরিবর্তিত রূপের ('নয়' সং—শেষসপ্তক) মধ্যে বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কবি। অপ্রকাশিত পাঠের "ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা" ('অসমাপ্ত'—দ্রঃ পাণ্ডুলিপি পরিঃ 'কবি ও কবিতা', ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং)—এই উক্তিকে অনেক স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বললেন—

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি— ['নয়' সং—শে. স]

যখন 'সে অসম্পূর্ণ রচনা' ('অসমাপ্ত'—পা পরি.) তখন সে 'ব্যক্ত হোলো কত সূচনায়' ('অসমাপ্ত'—পা. পরিঃ)—কিন্তু 'অপ্রকাশিত আমি' ('নয়' সং—শেষসপ্তক) যখন, সে 'নিয়ে এল কত সূচনা' ('নয়' সং—শেষসপ্তক), 'কত ব্যঞ্জনা'—'পৌঁছল না যা বাণীতে' ('নয়' সং—শেষসপ্তক), এই ভাবটি পাঠান্তরের (অপ্রকাশিত পাঠ—'অসমাপ্ত') ছত্রগুলি থেকে অনেক বেশি সুসম্পূর্ণ।

এর পরও দু'চারটি ছত্র এদিক ওদিক হয়েছে—'অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী'; ('নয়' সং—শেষসপ্তক) এই ছত্রের সঙ্গে একটি নূতন ছত্রকে উপমা হিসেবে যুক্ত করে গুণীর অপ্রকাশিত কাজকে রহস্যজনক করে তুলেছেন।—

ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে, ['নয়' সং—শে. স.]

পরে ঐ স্তবকের শেষের—

'সমস্তটা দেখতে পাওয়া নিষেধ' ['অসমাপ্ত'—পা. পরি.]

এই ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

['নয়' সং —শেষসপ্তক]

ক্রিয়াপদটিকে লাইনের পূর্বে বসিয়ে বক্তব্যের মধ্যে আরও জোর আনার চেষ্টা। গদ্য-বাচনভঙ্গির এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে একটি খস্‌ড়া রূপের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে একটি অস্পষ্ট ভাব সুসম্পূর্ণ মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'বীথিকা' কাব্যের 'ছায়াছবি' এবং 'নিমন্ত্রণ'—এই দুটি কবিতার 'পাঠান্তর' পাওয়া যায়।

'ছায়াছবি' কবিতাটির বর্তমান গৃহীত পাঠ (বীথিকা) অপেক্ষা 'পাঠান্তর'এর* সূচনায় বেশ কিছুটা অংশ বাড়্‌তি পাওয়া যায়। এই বাড়তি অংশটুকু গৃহীত পাঠে বর্জন চিহ্নাঙ্কিত।

এই বাড়তি অংশটুকু সমেত 'পাঠান্তর'টির (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বীথিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খঃ) সঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাঠের ('ছায়াছবি'—বীথিকা) তুলনা করলে দেখা যায়, কবিতার মূল ভাব এবং এলিয়ে-পড়া রচনাশৈলীকে কবি বর্তমান 'ছায়াছবি' (বীথিকা) কবিতায় অনেক বেশি সংক্ষিপ্তি দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত স্পর্শ দিয়ে কবিতার ভাবমাধুর্যে গাঢ়ত্ব এনেছেন। বর্জিত পাঠে কবিতাটির সূচনাংশে আছে—

ফিরিয়া দেখি জীবনতটে
অতীত পথপানে

* দ্রঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী'—১৯শ খণ্ড [প্রঃ ভাদ্র, ১৩৬৩] ; 'গ্রন্থপরিচয়'—'বীথিকা', পৃঃ ৫২৭

ছায়ারূপীরা দিকে বিদিকে
চলেছে পথপানে।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বীথিকা,
র র. ১৯শ খণ্ড পৃঃ ৫২৭]

এর সুর মনের মধ্যে অতীতের অনেক চেনাশোনার 'ছায়াছবি'কে বিচিত্র ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে আসছে; কবির চিত্তপটে তাদের নানা রঙের খেলা—ভূমিকা স্বতন্ত্র—গুঞ্জন বেদনাবিধুর স্মৃতিবিজড়িত। কবিমন সেই বিচিত্র স্মৃতির জালে নিজেকে জড়িয়ে অতীতের মাঝে হাত্‌ড়ে বেড়ায় অনেক জানা-অজানার ক্ষণিক আকর্ষণকে। কিন্তু এ তো ধরে রাখার জিনিস নয়—'চৈত্রশেষে মাধবীবন সৌরভের মত' ('ছায়াছবি' বর্জিত পাঠ, দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—বীথিকা, র. র. ১৯শ খঃ ভাদ্র ১৩৬৩ পৃঃ ৫২৭) তারা সব চিহ্ন নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় একসময়ে।

তুলনা করলে বেশ বোঝা যায় 'বীথিকা'র 'ছায়াছবি' (গৃহীত পাঠ) কবিতার স্পর্শ অনেক ব্যক্তিগত, সুর অনেক মধুর; স্মৃতি অনেক করুণ এবং বেদনার্ত—লেখাও 'চন্দননগরে' ৪ আষাঢ় ১৩৪২ সালে। ছোটবেলায় সেজদাদা জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ও বৌদিদি কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে চন্দননগর বাসের স্মৃতি বার্ধক্যে চন্দননগর বাসকালে স্মরণে এসেছে। দিনগুলো তখন যেন ছিল সোনার জলে 'মিনে করা।' ('ছেলেবেলা'—র. র. ১০ম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং পৃঃ ১৫৭)—সেই সুখস্মৃতিকে আর একবার সমস্ত দেহমন দিয়ে অনুভব করেছেন তাঁর কাব্যে; সেই মধুর করুণ বেদনাঘন স্মৃতির 'ছায়াছবি' এঁকে চলেছেন শেষ বয়সে। তাই এ চিত্র একটি বিশেষ দিনের ব্যক্তিগত স্মৃতির বাহক—

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।

['ছায়াছবি'—বীথিকা]

সেই দিনের অনেক সুমধুর স্মৃতির আবেশ কাটিয়ে কবিমনে স্পষ্ট জেগে উঠলো—

অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

['ছায়াছবি'—বীথিকা]

বর্জিত পাঠের সঙ্গে এর সুরে যে কত তফাত তা সহজেই অনুমেয়। এর মূল্য এবং মাধুরী অনেক স্বতন্ত্র। 'ছায়াছবি' .কবিতাটির (বর্জিত পাঠ—গ্রন্থপরিচয়—'বীথিকা', র রচনাবলী ১৯শ খণ্ড ভাদ্র ১৩৬৩ পৃঃ ৫২৭) বর্জন চিহ্নাঙ্কিত অংশটুকুকে নিয়ে একটি

স্বতন্ত্র কবিতা দাঁড়িয়ে যেতে পারতো ; কিন্তু ঐ অংশের সঙ্গে গৃহীত পাঠের ('ছায়াছবি' —বীথিকা) বর্তমান সূচনাংশকে যে যুক্ত করা যায় না, তা কবি পরবর্তীকালে ধরতে পেরেছিলেন ; সে কারণেই ঐ অংশটুকু পরিত্যক্ত।

১৩৪২ আষাঢ়ের "বিচিত্রা" (১৩৪১-৪২ ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, মাঘ-আষাঢ় সং) পত্রিকার* 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি 'বীথিকা' কাব্যের 'নিমন্ত্রণ' কবিতার প্রাক্তন রূপ বলে গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত। তারিখ আছে 'বিচিত্রা' পত্রিকার রূপটির (১৫ই জুন ১৯৩৫ চন্দননগর), 'বীথিকা' কাব্যের রূপটির (১৪ই জুন ১৯৩৫ চন্দননগর)। তারিখের বিচারে 'বীথিকা'র গৃহীত পাঠটি 'বিচিত্রা'র (বর্জিত পাঠ) পাঠটির একদিন পূর্বে লেখা। কিন্তু কবিতার বিচারে 'বিচিত্রা'র রূপটিকেই প্রাক্তন রূপ বা খসড়া রূপ বলা যায়।

বর্তমান গৃহীত রূপটির (বীথিকা) সঙ্গে বর্জিত রূপটির (গ্রন্থপরিচয়—'বীথিকা', দ্রঃ সঞ্চয়িতা, প্রঃ বিশ্বভারতী ১৯৬৩, পৃঃ ৮৬৪) তুলনায় দেখা যায়, বর্তমান গৃহীত পাঠের ২৮ পঙ্‌ক্তির পর ২৯ থেকে ৬০ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত মোটামুটি বর্জিত পাঠের সঙ্গে এক আছে ; যদিও ঐ দুই ছত্রের শুরুতে একটু তফাত এবং বর্জিত পাঠের শেষ ৮ পঙ্‌ক্তির আগের ৪ ছত্র গৃহীত পাঠে পাওয়া যায় না। যেমন—

ময়ান-মাখানো দু হাতে ময়দা ঠাসা,
তরকারী বাঁধা সিদ্ধ ক'রে বা ভেজে,
আয়োজনে তার ভালোবাসা পায় ভাষা
ভোজনবেলায় স্পর্শ অতীত সে যে।

['গ্রন্থপরিচয়'—বীথিকা—দ্রঃ 'সঞ্চয়িতা'—সং বি. ভা. ১৯৬৩ পৃঃ ৮৬৫]

বর্জিত পাঠের প্রথম ১২ পঙ্‌ক্তি একেবারে অন্যরকম, তাছাড়া বর্জিত পাঠ যেখানে শেষ হয়েছে, বর্তমান গৃহীত পাঠে ('নিমন্ত্রণ'—বীথিকা) তারপরও ৫২ পঙ্‌ক্তি বেশি আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—খসড়া রূপের থেকে বা খসড়া রূপকে আশ্রয় করে এই কবিতা অনেক বেশি নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাবের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও দু'টির ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। 'পূর্বতন' পাঠের (বর্জিত পাঠ—দ্রঃ সঞ্চয়িতা —সং বি. ভা. ১৯৬৩ পৃঃ ৮৬৪) সূচনায় আছে—

* দ্রঃ 'সঞ্চয়িতা'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [সং বিশ্বভারতী ১৯৬৩] ; 'গ্রন্থপরিচয়'—'বীথিকা' পৃঃ ৮৬৪

সংসার-কাজে ছুটি কিছু আছে হাতে
সেই ভরসায় ডাক দিনু এইখানে।
ইচ্ছাশক্তি যন্ত্রশক্তি-সাথে
মিশ্রিত কোরো রেলে বা মোটর-যানে।
আলাপ জমাব নিয়ে বহু বাজে কথা,
কাব্যগ্রন্থ আখোলা রহিবে কোলে।
গান চাও যদি গ্রামোফোনে শোনাব তা,
মাথা নেড়ে শুনো আমার রচনা হলে।

['গ্রন্থপরিচয়'—বীথিকা—দ্রঃ সঞ্চয়িতা—
সং বি. ভা. ১৯৬৩ পৃঃ ৮৬৪]

বর্জিত পাঠের এই সূচনা থেকে অনুমান করলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, ঐ সময় (১৯৩৫ এর ১৪/১৫ই জুন তারিখে) কিছুদিন 'চন্দননগর' বাসকালে কবি তাঁর কোনো সেবিকাকে (নাতনীকে) সেখানে আসবার জন্য অনুরোধ করে কৌতুকছলে একখানি 'নিমন্ত্রণ' লিপি রচনা করেছিলেন, আমন্ত্রণকারিণীকে পরিহাসছলে 'গদ্যজাতীয় ভোজ্যে'রও কিছু ফরমাস দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে চন্দননগরের সেই সুমধুর কৈশোর স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশ কবিকে অতীত দিনের অনেক ফেলে-আসা-স্মৃতির মধ্যে আন্‌মনা করে দেয়। অতীতের অনেক মধুময় স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ কবিতাটি* রোম্যান্টিক ভাবকল্পনার এক অনবদ্য শিল্পমূর্তি নিয়ে দেখা দেয়।

কবিতাটির প্রথম এবং শেষ ('নিমন্ত্রণ'—বীথিকা) অংশে স্মৃতির মালিকা গেঁথে কবি যে রোমান্টিক এবং মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, তার ফলে লৌকিক সীমাকে অতিক্রম করে এ কবিতা অ-লৌকিক মানসবিলাসের একখানি সূক্ষ্ম লিপিচিত্র হয়ে উঠেছে। অপরদিকে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক স্পর্শমধুর ক্ষণ, অনেক ছোটোখাটো ঘটনা, নায়িকার সাধারণ রূপসজ্জাকে অসাধারণ শিল্পমাধুর্যে ফুটিয়ে তোলার বর্ণনা, প্রভৃতি চিত্রের সমাবেশে কবিতাটি জীবনধর্মীও হয়ে উঠেছে। অনেক সুখস্মৃতির মধ্যে করুণ বেদনার স্পর্শটিও আমাদের সমস্ত দেহ-মনকে আবিষ্ট করে—

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;

* দ্রঃ 'নিমন্ত্রণ' কবিতা—'বীথিকা' কাব্য—রোমান্টিক ভাবকল্পনার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত হয়ে এ কবিতা অনবদ্য শিল্পগৌরব লাভ করেছে।

মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

['নিমন্ত্রণ'—বীথিকা]

জানা-অজানা, অতীত-বর্তমান, স্মৃতিতে-কল্পনায়, আনন্দে-বেদনায় মিশ্রিত হয়ে এ কবিতা ব্যক্তিগত স্পর্শে সমুজ্জ্বল হয়েও শিল্পের সেই নৈর্ব্যক্তিক মহিমা লাভ করে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবিতাটির প্রাক্তন রূপের সাধারণ পরিহাসপুষ্ট ভাবটিকে কেন্দ্র করে কবিমন নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একখানি সার্থক প্রেমগাথা রচনা করেছে এ কবিতায়।

'পত্রপুট' কাব্যের 'তিন' সংখ্যক ('পৃথিবী') কবিতাটির একটি এবং 'ষোলো'-সংখ্যক ('আফ্রিকা') কবিতাটির দুটি 'পাঠান্তর' পাওয়া গেছে।

'পৃথিবী' কবিতাটির ('তিন' সংখ্যক—পত্রপুট) একটি পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপি থেকে 'সঞ্চয়িতা'য় (৮ম সং, বৈশাখ ১৩৭৯) কবির স্বহস্তলিখিত মুদ্রিত প্রতিচিত্রে দেখানো হয়েছে। দু'টি কবিতারই তারিখ দেওয়া আছে ১৬ই অক্টোবর ১৯৩৫। একই দিনে দু'টি ভিন্ন পাঠ রচিত হয় এবং বর্জিত পাঠটি ('সঞ্চয়িতা' ৮ম সং—বৈশাখ ১৩৭৯ পৃঃ ৭০৪ থেকে ৭০৫ এর মধ্যবর্তী বাড়তি পৃষ্ঠা) যে পূর্বপাঠ তাতেও কোনো সন্দেহ থাকে না। দুটি পাঠকে পরস্পর মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গৃহীত পাঠটি বর্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুটি কবিতা ভাবের দিক থেকে মোটামুটি এক থাকলেও, মাঝে মাঝে দু' একটি ছত্র গৃহীত পাঠে ('তিন' সং—পত্রপুট) নূতন যুক্ত হয়েছে, দু'একটি ছত্র লুপ্ত হয়েছে, শব্দও বেশ কিছু অদল-বদল হয়েছে; বাহুল্যজ্ঞানে অনেক শব্দ বর্জনও করা হয়েছে। এছাড়া গৃহীত পাঠে ('তিন' সং—পত্রপুট) বর্জিত পাঠের ২৭ পঙ্‌ক্তির পর (গৃহীত পাঠের ১৫ ছত্রের পর) ২৭টি নূতন ছত্র যুক্ত হয়েছে। বর্জিত পাঠে তেমনি ১৪ ছত্রের পর ১৫ ছত্রের মধ্যে ৭টি নূতন পঙ্‌ক্তি দেখতে পাওয়া যায়—

নিমন্ত্রণের প্রাঙ্গণ থেকে
তাড়না করেছ নিঃসহায় গহনে
* * *
অবজ্ঞার ভেলায় তাকে ভাসিয়েছ অকাতরে
হতভাগ্য যে, শিথিল যার গ্রন্থি;

['পৃথিবী'—সঞ্চয়িতা—৮ম সং বৈশাখ ১৩৭৯
পৃ. ৭০৪ থেকে ৭০৫ এর মধ্যবর্তী বাড়তি পৃষ্ঠা]

এই ৭টি পঙ্‌ক্তির স্থানে মাত্র একটি চরণ ও একটুখানি টুকরো পঙ্‌ক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। গৃহীত পাঠে—

দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,

['তিন' সং—'পৃথিবী'—পত্রপুট]

বর্জিত পাঠের ৫ পঙ্‌ক্তির পর এবং গৃহীত পাঠের ৩ পঙ্‌ক্তির পর (৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে) দুটি নূতন পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় প্রাক্তন পাঠে—

তোমার সৌন্দর্যের রহস্য বেঁধেছে তার দুর্গ
দুর্গম্য পরুষতায়।

['পৃথিবী'—সঞ্চয়িতা—৮ম সং বৈশাখ ১৩৭৯]

বর্তমান গৃহীত পাঠের ৬ পঙ্‌ক্তিতে আছে 'দোলায়িত কর'—এটাই প্রাক্তন পাঠে 'করেছ' এই রূপে মেলে। বর্তমান পাঠের ৭, ৮ পঙ্‌ক্তির—

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র'-ও

কিঞ্চিত পরিবর্তিত আকারে বর্জিত পাঠে আছে—

'ডান হাত দিয়ে', 'বাম হাত দিয়ে'।

গৃহীত পাঠের চতুর্থ স্তবকের শেষ ছত্রটি—

পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য

['তিন' সং—'পৃথিবী'—পত্রপুট]

বর্জিত পাঠে ভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যায়—

আতঙ্কপাণ্ডুর তোমার মরুক্ষেত্র
মরীচিকার প্রেতনৃত্যের বিদ্রূপনাট্য।

['পৃথিবী'—সঞ্চয়িতা ৮ম সং—বৈশাখ ১৩৭৯]

এরপর আবার গৃহীত পাঠে ১২টি নূতন পঙ্‌ক্তি মেলে—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়—

সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ ;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

['পৃথিবী'—৩ সং—পত্রপুট]

বর্জিত পাঠে এই ১২টি পঙ্‌ক্তির স্থানে ৪টি ভিন্ন পঙ্‌ক্তি দেখতে পাওয়া যায়—

তোমার মেরু কারাগারে
অখণ্ড তুষারপিণ্ডের শৃঙ্খলে বন্দীকৃত
দিন ও রাত্রি আকাশ প্রদক্ষিণ করে
নিঃশব্দ নিরানন্দ নিরর্থক।

['পৃথিবী'—সঞ্চয়িতা ৮ম সং—বৈশাখ ১৩৭৯]

এর পর থেকে মোটামুটি সবই ঠিক আছে, তবে গৃহীত পাঠের ('তিন' সং—পত্রপুট) শেষ ষোল ছত্রের আগের ছত্রটি এইভাবে আছে—

তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান।

['তিন' সং—পত্রপুট]

বর্জিত পাঠে এই চরণেরই প্রকাশ অন্যভাবে—

তারি মধ্যে সব খেলা হয় শেষ,
সব কীর্তি হয় বিলুপ্ত।

('পৃথিবী'—সঞ্চয়িতা ৮ম সং—বৈশাখ ১৩৭৯)

এছাড়া কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তনও আছে। এই রকম নানা ধরনের বিবর্তন এই কবিতাটির মধ্যে চোখে পড়ে। মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে, 'খসড়া' রূপের বহু উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই বর্তমান 'তিন' সংখ্যক (পত্রপুট) কবিতাটির জন্ম। নূতন ৩৯টি পঙ্‌ক্তি যুক্ত হয়ে কবিতাটিকে ('তিন' সং—পত্রপুট) একদিকে যেমন দীর্ঘ করেছে, অপরদিকে ভাবসম্পদের মধ্যেও অনেক নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য এনেছে। ছোটোখাটো শব্দের পরিবর্তনগুলিও ছড়ানো ভাবকে সংহতি দান করে কবিতাটির মধ্যে একটি কঠিন গাম্ভীর্য এনেছে। গদ্যকবিতার এমন কঠিন, গভীর, গম্ভীর নিরেট গাঁথুনি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

'পত্রপুট' কাব্যের 'ষোলো' সংখ্যক কবিতার 'মিলহীন' পদ্যছন্দে লিখিত দুটি পূর্বপাঠ (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—পত্রপুট, সং আষাঢ় ১৩৩৪, পৃঃ ৭২ ও পৃঃ ৭৫) পাওয়া যায়। বর্তমান গৃহীত 'ষোলো'-সংখ্যক রূপটি গদ্যছন্দে লিখিত। কবিতা হিসেবে তিনটিকেই সার্থক বলে গ্রহণ করা যায়।

পূর্বতন পাঠের মধ্যে কোন্‌টি আগের কোন্‌টি পরের তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই—কারণ তারিখ নেই। 'গ্রন্থপরিচয়ে' (পত্রপুট) 'আফ্রিকা' কবিতাটির একটি পাঠ দেওয়া আছে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১ সালে প্রকাশিত রূপ (পত্রপুট —সং আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ৭২), আর একটি ১৩৪৪-এর আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপ (পত্রপুট—সং আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ৭৫)। কিন্তু বর্তমান গৃহীত পাঠটির তারিখ আছে ২৮ মাঘ ১৩৪৩। সহজেই অনুমেয়, বর্জিত পাঠ দুটি জন্ম নেবার বহু পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিনটি কবিতার মধ্যে তুলনা করলে মনে হয় ১৩৪৪ সালের আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটি ('আফ্রিকা'—পত্রপুট—সং আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ৭৫) বর্তমান গৃহীত পাঠের ('ষোলো' সংখ্যক—আফ্রিকা) পূর্ববর্তী রূপ এবং হয়তো দ্বিতীয় রূপ। কারণ, বর্তমান গৃহীত পাঠের সঙ্গে তার ভাব-ভাষা রূপাঙ্গিকে অনেক সাদৃশ্য আছে—ছন্দ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও।

'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির সূচনাংশে আছে—

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বার বার নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।

['আফ্রিকা'—গ্রন্থপরিচয়—পত্রপুট—সং আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ৭৫]

এইছত্র গুলিই বর্তমান পাঠে এইভাবে রূপ পেল—

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার বার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

['ষোলো' সং—পত্রপুট]

'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী পাঠের সঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাঠের ভাব-ভাষা-বাচনভঙ্গি সবদিক থেকেই মোটামুটি মিল আছে; শুধু পদ্য থেকে গদ্যে রূপান্তর মাত্র। একটি ছত্র নূতন পাওয়া যাচ্ছে—

তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে

এই ছত্রটি পূর্ববর্তী পাঠে নেই। সেখানে এর পরিবর্তে 'সেইদিন' কথাটা আছে কিন্তু গৃহীত পাঠে 'সেইদিন'টিকে বিশেষিত করে ঐ ছত্রটি যুক্ত হয়েছে; স্রষ্টার অসন্তোষকে আর একটু জোরালো করার জন্য।

১৩৫১ সালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির ('আফ্রিকা'—গ্রন্থপরিচয়—'পত্রপুট'—সং ১৩৭৪, পৃঃ ৭২) সূচনাংশকে এর পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়—

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা,
রেখে দিল নির্বাসনে মহা-অরণ্যের অন্ধকারে।

['আফ্রিকা'—গ্রন্থপরিচয়—পত্রপুট—সং ১৩৭৪, পৃঃ ৭২]

পূর্ববর্তী গৃহীত পাঠ ('বোলো' সং—পত্রপুট) এবং 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ অপেক্ষা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই পাঠটি একেবারেই স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী গৃহীত পাঠে 'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' এই ছত্রটির পর ৩টি ছত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেটা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির মধ্যে নেই—

স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
... ...
... ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে

['বোলো'—পত্রপুট]

এই তিনটি ছত্র কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত এইভাবে—

আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বার বার নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন

['আফ্রিকা'—গ্রন্থপরিচয়—সং ১৩৭৪, পৃঃ ৭৫]

বেশ বোঝা যায় 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটি আদিপাঠ, যেখানে 'উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগ'কে 'সেই আদিম যুগ' বলে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ করা হয়নি, আবার 'সেই আদিম যুগে'র পরিচয় দিতে গিয়ে পরবর্তীকালে স্রষ্টা-র যে অসন্তোষের কথা বলা হয়েছে তা ঐ আদিপাঠে (বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত রূপ ১৩৫১—'আফ্রিকা'—গ্রন্থপরিচয়, পত্রপুট—সং ১৩৭৪ পৃঃ ৭২) ছিল না। দ্বিতীয় পাঠে এসেছে 'সেই আদিম যুগ'কে বিশেষিত এবং নূতন ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য ('কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপ—১৩৪৪, 'আফ্রিকা' গ্রন্থপরিচয়, পত্রপুট—সং ১৩৭৪ পৃঃ ৭৫), কিন্তু গৃহীত পাঠে ('ষোলো' সং—পত্রপুট) ঐ এলিয়ে পড়া ভাবটিকেই অনেক সংযত ভাবে ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ ভাষণে প্রকাশ করেছেন।

এমনি করে আদি ভাবের পরে একটু একটু করে রঙ বুলিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। শুধু এই স্তবকটিই নয়, পূর্ববর্তী খসড়া রূপের মধ্যে গোটা কবিতাটিই ভাবের দিক্ থেকে অনেকখানি ছড়ানো-ছিটোনো। কবি আস্তে আস্তে তাকে যেন গুটিয়ে এনে হাল্‌কা রসটাকে মিছরির দানায় পরিণত করে দিয়েছেন।

'পত্রপুট' কাব্যের 'ষোলো' সংখ্যক কবিতাটিও ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আদি পাঠ দুটিও অনেক পরে পত্রিকায় প্রকাশিত, বিশেষ করে বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত রূপটি (১৩৫১ সালে)—সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, কবি এই আদি পাঠটিকে একেবারে বাদের দলে ফেলেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য অনেক অপ্রকাশিত রচনার সঙ্গে মূল্য দিয়ে একেও লোকচক্ষু গোচর করা হয়। অবশ্য এ সবই অনুমান—প্রমাণের তো কোনো পথ নেই।

'দ্বৈত', 'অকালঘুম', 'কনি'—'শ্যামলী' কাব্যের এই তিনটি কবিতার 'পাঠান্তর' (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—শ্যামলী—রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড, প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৬) পাওয়া যায়।

'দ্বৈত' (২৩ মে ১৯৩৬ বরানগর) কবিতাটির একটি পাঠান্তর আষাঢ় ১৩৪৩ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রূপটির জন্মতারিখ আছে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ বরানগর। রচনা দুটি সম্ভবতঃ একই দিনের; কিন্তু রূপ দুটি কবির বাণীশিল্পে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। বর্জিত পাঠটি অপেক্ষা গৃহীত পাঠটি যে ভাবে, ভাষায়, শিল্পচাতুর্যে গদ্যকবিতার সার্থক একটি নিদর্শন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। ভাবের ব্যঞ্জনায়, অলঙ্কারের পারিপাট্যে গৃহীত পাঠটি অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে।

দুটি পাঠকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলেই দেখা যায় গৃহীত পাঠে ভাবের এক একটি প্রকাশ কত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত। বর্জিত পাঠটির 'সূচনাংশে' আছে—

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়েছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টির আঙিনা যেখানে আরম্ভ।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—'শ্যামলী'—রবীন্দ্ররচনাবলী
২০শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২]

এই ভাবটুকুই কত সম্পূর্ণতা পেয়েছে বর্তমান গৃহীত পাঠে—

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ আঙিনার নাছদুয়ারে।

['দ্বৈত'—শ্যামলী]

এই চরণগুলিতে বক্তব্য কেমন স্পষ্ট অথচ ভাব কেমন গাঢ়ত্ব লাভ করেছে।

তেমনি বর্জিত পাঠের—

আমি তোমার চিত্রকরের শরিক ;
কথা ছিল, তোমার 'পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—শ্যামলী—রবীন্দ্ররচনাবলী—
২০শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩]

এই চরণদুটি গৃহীত পাঠে আরও কত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলবো তোমার গড়নটিকে।

['দ্বৈত'—শ্যামলী]

বর্জিত পাঠের 'তোমার' পরে মনের তুলি' বুলানো অপেক্ষা গৃহীত পাঠের 'তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি' বুলানো ভাবের দিক থেকে অনেক স্পষ্ট এবং অর্থবহ; পূর্বপাঠের 'চিত্রকরের শরিক' অপেক্ষা গৃহীত পাঠের 'কারিগরের দোসর' এই কথাটিও অনেক শ্রুতিমধুর।

এইভাবে কবি একটি খসড়া রূপ প্রথমে এঁকে নিয়ে তারপর তাকে নিপুণভাবে শ্রীমণ্ডিত করেন। এখানে দুটি কবিতাই গদ্যছন্দে লেখা, কিন্তু গৃহীত পাঠটি ('দ্বৈত'—শ্যামলী) রোম্যান্টিক ভাবকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেও গদ্যের সহজ স্পষ্টতা এবং সাবলীলতায় সার্থক গদ্যকবিতা হয়ে উঠেছে।

'অকালঘুম' (শ্যামলী) কবিতাটি বর্জিত পাঠ (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—শ্যামলী—রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড, প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৪) অপেক্ষা গৃহীত পাঠে বর্ণনায়, প্রকাশভঙ্গিতে অনেক বেশি আঁটসাট। অপ্রকাশিত পূর্বপাঠের ৪র্থ স্তবককে বর্তমান গৃহীত পাঠে ('অকালঘুম'—শ্যামলী) গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু গৃহীত পাঠের নূতন স্তবকের ভাবের মধ্যে বর্জিত পাঠের ঐ স্তবকের ভাবটিকে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্জিত পাঠের নিম্নলিখিত চরণ দুটি—

এ ছবি অনেক দিনের ছবি।
অনেক দূরের মূল্যে এ আজ অসামান্য।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—শ্যামলী—রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড
প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৫]

গৃহীত পাঠে অন্যভাবে প্রকাশিত—

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।

['অকালঘুম'—শ্যামলী]

এই রোম্যান্টিক ভাবটুকুকে কেন্দ্র করে তারপর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে কবিমানসিকতার। অতিচেনা বাস্তব পরিবেশ ও পরিচয়টুকুর মধ্যে কাব্যের মাধুরীকে বয়ে এনেছে।

'শ্যামলী' কাব্যের 'গ্রন্থপরিচয়' থেকে 'কনি' (শ্যামলী) কবিতাটি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়—"বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আলোচনা করিয়া দেখা যায় 'কনি' কবিতাটির নানা পাঠান্তরের ভিতর দিয়া একপ্রকার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী একটি পাঠে 'টেমি' কুকুরের কোনো প্রসঙ্গ নাই, পক্ষান্তরে কনির পুতুলের বিয়ে ও তদুপলক্ষে অমলের সহিত তাহার মান-অভিমানের বর্ণনা আছে। উপসংহারটুকু সম্পূর্ণ অন্যরূপ" (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—'শ্যামলী'—রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড, প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৬)।

'কনি' (শ্যামলী) কবিতার পূর্ববর্তী পাঠগুলির মধ্যে বহু স্থানে ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে। কবি গৃহীত পাঠে এর সংক্ষিপ্ত রূপ এঁকেছেন। সংলাপ এবং ঘটনার ব্যাখ্যাও অনেক সংহত হয়েছে। গদ্যছন্দে লেখা এই কবিতার মধ্যে ছোটগল্পসুলভ অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটায়, কবিতার রসগ্রহণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হতে পারে—এটা হয়তো অনুমান করেই কবি বারংবার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গৃহীত পাঠে ('কনি'—শ্যামলী) একে অনেক সংযত ও সংহত করে তুলেছেন। যেমন—

মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি,
কনির হয়ে গেছে বিয়ে।

* * * *

কতবার যাই-যাই করে মন,
ভেবে পাইনে যাবার অধিকার
এখনো আছে কি নেই।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—শ্যামলী—র. র. ২০শ খণ্ড
প্রঃ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৪৮]

বর্জিত পাঠের এই অংশে ঘটনার যে বিস্তৃত বিবরণ ব্যাখ্যাত, তার মধ্যে যথার্থতা থাকলেও বাস্তব বর্ণনার দিক্ থেকে, কবিতাটির করুণ বেদনাকে সে কিন্তু পাঠকচিত্তে তেমন করে পৌঁছে দিতে পারেনি। এদিক থেকে গৃহীত পাঠে কবি এই অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দু'চারটি তুলির টানে হৃদয়ের করুণ ট্র্যাজেডির একখানি বেদনাঘন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—পাঠকের রসবোধের জন্য এ-ই যথেষ্ট।

বর্জিত পাঠের পূর্বে উল্লিখিত প্রথম চরণটির 'মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক'—এই 'মাঝখানে' শব্দটির আগে গৃহীত পাঠে ('কনি'—শ্যামলী) 'তারপরে' শব্দটি যোগ হয়েছে, এতে আগের ঘটনার বেদনার সুরটির সঙ্গে নূতন কিছু যোগ হয়েছে ; যোগ হয়েছে—'কনি'-র পরের ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত—আর দুটি নূতন চরণে নায়কের মর্মান্তিক বেদনার আভাস—

আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।

['কনি'—শ্যামলী]

'দ্বৈত', 'অকালঘুম', 'কনি', (শ্যামলী)—এ সমস্ত কবিতার গৃহীত পাঠের সঙ্গে খস্‌ড়া রূপের তুলনা করলে দেখা যায়, কবি প্রথম প্রকাশে বা খসড়ায় নিজেকে অনেক সময় সাধারণ ভাবেই প্রকাশ করেছেন; কিন্তু পূর্বরূপের সেই ছড়ানো ভাব বা ভাষাকে পরে শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন রঙে-রেখায় সূক্ষ্ম তুলির টানে, আঁটোসাটো শব্দধ্বনির বুনুনিতে। মনে হয়, প্রতিমা নির্মাণের প্রথম ধাপে খড়ের ওপর মাটি দিয়ে মুণ্ড বসিয়ে যেন একটা মূর্তির আকার দেবার চেষ্টা; মূর্তিটির যথার্থ রূপটিকে চেনা যাচ্ছে, কিন্তু একমেটে রঙের পর কোথায় একটু তুলির টান, কোথায় একটু জরির চুমকি, কোথায় কোন্ রঙ আর একটু বেশি পড়লে মূর্তি আরও সুন্দরতর রূপ নেবে, খসড়া রূপকে সামনে রেখে মূল পাঠের সম্বন্ধে সেই রকমের একটা প্রস্তুতি যেন অলক্ষ্যে ধরা পড়েছে কবির এই সমস্ত রূপ-নির্মিতির কৌশলে।

'খাপছাড়া' গ্রন্থের ৮২-সংখ্যক কবিতার তিনটি পূর্বপাঠ (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—খাপছাড়া—রবীন্দ্ররচনাবলী-২১শ খণ্ড, প্রঃ ডিসেম্বর ১৯৫৭ পৃঃ ৪৩৩) পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি পাঠই খাপছাড়া ভাবে সার্থক। গৃহীত পাঠের সঙ্গে (৮২ সং খাপছাড়া) বর্জিত পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের মিল সামান্য। তৃতীয় পাঠটি গৃহীত পাঠের অনেকখানি কাছাকাছি এসেছে।

'খাপছাড়া'র ৯৪-সংখ্যক কবিতাটিরও দু'টি পূর্বপাঠ পাওয়া যায়। গৃহীত পাঠের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠের (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—খাপছাড়া—র. রচনাবলী ২১শ খণ্ড, প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৫৭, পৃঃ ৪৩৩) ভাবের দিক থেকে তেমন প্রভেদ নেই। প্রথম পাঠের দু'একটি ভাষার অদল বদল করে দ্বিতীয় পাঠ; দ্বিতীয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ গৃহীত পাঠ। যেমন ১ম পাঠের তৃতীয় চরণ—

বিধাতাই কন তোরে
বন্ধুর অন্তরে

[দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—খাপছাড়া—র. র. ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩]

এই চরণটিই দ্বিতীয় পাঠে হয়েছে—

বিধাতা স্বয়ং জেনো কন তোরে

[ঐ]

গৃহীত পাঠে এই ছত্রই—

বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে

['৯৪' সং—খাপছাড়া]

এইভাবে যতক্ষণ না ভাব দানা বেঁধে উঠেছে কবি একের পর এক শব্দ পরিবর্তন করে চলেছেন। তুলনায়, গৃহীত পাঠ ক্রমে ক্রমে সাজ বদল করে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

'কবি ও কবিতা' পত্রিকাতে (৪র্থ বর্ষ ৩য় সং, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৪৪২) "ছড়ার ছবি" গ্রন্থের "পাণ্ডুলিপি পরিচয়ে" শ্রীকানাই সামন্ত দেখিয়েছেন, 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের 'পদ্মায়' কবিতাটি বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠে রূপ নিয়েছে। 'পাণ্ডুলিপি'র একখানি লিপিচিত্রও এ পত্রিকার প্রথমে অঙ্কিত হয়েছে। এ কবিতার প্রাথমিক পাঠে গ্রাহ্য ছত্রসংখ্যা ৩৮, নানা পরিবর্তনের পর পরবর্তী 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি'তে (১৭৮ খ) ছত্রসংখ্যা ৩৬ এবং আরও পরের পাণ্ডুলিপিতে (১৭৮ গ) ছত্রসংখ্যা ৪০, মুদ্রিত গ্রন্থেও ঐ কবিতার ('পদ্মায়'—ছড়ার ছবি) ছত্রসংখ্যা ঐরূপ।

কবিতাটির খস্‌ড়া রূপ থেকে কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে যে এই বর্তমান গৃহীত রূপটিতে কবি দাঁড় করিয়েছেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়।

বর্তমান গৃহীত পাঠের ('পদ্মায়—ছড়ার ছবি) ৩ এবং ৪ নং ছত্র দুটি—

জানিনে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।

['পদ্মায়'—ছড়ার ছবি]

এই ছত্র দুটি পূর্বপাঠে ছিল না। এর স্থানে ভিন্ন দুটি ছত্র পাওয়া যায়—

স্ববাস থেকে প্রবাস যেত, প্রবাস থেকে দূরে
দুবার যেত ঘুরে।

[দ্রঃ 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়'—'কবি ও কবিতা'—
৪র্থ বর্ষ ৩য় সং, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৪৪২]

এই ছত্র দু'টি বর্তমান পাঠে একেবারে বর্জিত হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে বর্জিত চরণ দু'টির ভাব অপেক্ষা বর্তমান চরণ দু'টির ভাব—'হাওয়ার মন-কেমন-করা সুর, আকাশ বেয়ে দূর দেশে যাওয়ার জন্য মনকে উদাস করে' তোলা—অনেক বেশি ব্যঞ্জনাধর্মী।

তেমনি পূর্বপাঠের 'সূচনাতে'ও দেখা যায়—

যখন ছিলেম পদ্মানদীর চরে
হাঁসের পাতি দ্রুত পাখার ভরে···

[দ্রঃ 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়'—'ছড়ার ছবি'—'কবি ও কবিতা' ৪র্থ বর্ষ ৩য় সং, ২২ শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৪৪২]

ইত্যাদি চরণগুলি পরিবর্তিত রূপ নিল বর্তমান 'পদ্মায়' (ছড়ার ছবি) কবিতায়—

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে

এইভাবে প্রথম 'পদ্মানদীর চরে' থাকার বর্ণনা, তারপরে 'পদ্মানদীর পারে নৌকায়' থাকার বর্ণনা—গৃহীত পাঠে স্থান করে নিয়েছে। সেই নৌকোবাসের বিশেষকালের স্মৃতি 'ছড়ার ছবি'র 'পদ্মায়' কবিতায় ধরা পড়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

ভাষা এবং ভঙ্গির নানা হেরফের ঘটিয়ে এমনিতরো ভাবে এ কবিতাকে নূতন একটি ছাঁদে নিয়ে এসেছেন কবি। যেমন, পূর্ববর্তী পাঠের—

ওপার থেকে লাগত কানে গ্রামের কোলাহল

এই ছত্রটিই পরবর্তী পাঠে রূপ পেল এইভাবে—

তেমনি তরোই বইতো যেন গ্রামের কোলাহল

কিন্তু, দু'বার দু'রকমে প্রকাশ করেও কবি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না; ঠিক যেন পূর্ববর্তী ছত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ছত্র সুর বয়ে আনতে পারছে না। পূর্ববর্তী ছত্রে আছে—

বালির পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,

['পদ্মায়'—ছড়ার ছবি]

এর সঙ্গে উপমা দিয়ে বললেন—

তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল

['পদ্মায়'—ছড়ার ছবি]

এখন দেখা যাচ্ছে, প্রথম পাঠের—'ওপার থেকে লাগত কানে গ্রামের কোলাহল'—এ ভাবে একেবারেই বেমানান। ২য় পাঠে—'তেমনি তরোই' বলে কবি ছবিটিকে খানিকটা আঁচের মধ্যে এনেছিলেন; একটু পরেই ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল—

তেমনি বইত……গাঁয়ের কোলাহল

['পদ্মায়'—ছড়ার ছবি]

বালির পরে স্বচ্ছ নদীর জল যেমন কলকলতানে বয়ে যায়, পদ্মানদীর তীরে গাঁয়ের কোলাহলও ঠিক তেমনি ভাবেই বয়ে যায়—মানুষের জীবনধারার কলকোলাহলও তো অমনিভাবে কোনো চিহ্ন না রেখে স্বচ্ছ জলের ধারার মত অবিরত বয়ে চলেছে—ছবিটি এবার সম্পূর্ণ এবং ভাবব্যঞ্জক।

এমনিতরো ভাবে, কবি ঠিক যেটিকে হাতড়ে বেড়িয়েছেন, যতক্ষণ না তা হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে, ততক্ষণ যেন অন্ধকারের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়ার অন্ত ছিল না তাঁর। কোন্ শব্দ, কোন্ প্রতিশব্দ, কোন্ বাগ্‌ভঙ্গি, কোন্‌টা যে ঠিক ভাবটিকে ধরে ঠিক ছবিটি আঁকতে পারবে, এরই নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে শেষ পর্যন্ত। মূলের সঙ্গে গৃহীত পাঠের ('পদ্মায়'—ছড়ার ছবি) এমনি নানা পাঠভেদ যে আছে তা শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয় ঐ পত্রিকার ('কবি ও কবিতা'—৪র্থ বর্ষ, ৩য় সং, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৪৪২) 'পাঠপঞ্জী'তে দেখিয়েছেন।

'প্রান্তিক' কাব্যের 'তেরো' সংখ্যক কবিতাটি বিভিন্ন ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খসড়া রূপ থেকে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাঠ পাওয়া যায় 'জয়শ্রী' পত্রিকায় (১৩৪১ বৈশাখে), দ্বিতীয় পাঠ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ২৫০ পৃষ্ঠায় (১৩৪৩ অগ্রহায়ণে), (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—প্রান্তিক—২২শ খণ্ড, প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩-৫০৪) এবং ১৯।১২।৩৭ তারিখে লেখা পাঠটিকে 'প্রান্তিকে'র গৃহীত পাঠ হিসেবে পাওয়া যায়।

এই তিনটি রূপের মধ্যে দিয়ে কবিতাটির বিবর্তন ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১ম পাঠ থেকে শুরু করে বর্তমান গৃহীত পাঠটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়, এই বিবর্তন কবিতাটিকে কোন্ স্তর থেকে কোন্ স্তরে নিয়ে এসেছে।

১ম পাঠের সঙ্গে ২য় পাঠের তফাত প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তিতে। ১ম পাঠের শেষ ৪টি পঙ্‌ক্তিও ২য় পাঠে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ঐ প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তিরও রূপবদল হওয়ায় অর্থও বদল হয়ে গেছে। মোটের উপর, খসড়ার ভিতর দিয়ে একটি পূর্ণ পরিণত কবিতার জন্মরহস্যের ক্রমবিকাশটি এখানে লক্ষ্যগোচর হয়। কুঁড়ি থেকে একটি ফুল যেমন ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে বর্ণে-গন্ধে-রূপে পরিপূর্ণ একটি রসসজ্জা নিয়ে দেখা দেয়, তেমনি এ কবিতাও একটু একটু করে পূর্ণাঙ্গ রূপটি আয়ত্ত করেছে।

মোটামুটি হিসেবে, ১ম পাঠের আড়াই বছর পরে ২য় খসড়ার জন্ম। ১ম পাঠের সূচনায়' দেখা যায়—

জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
রূপসত্তায় এলে যবে সাজি, সূর্যতারার তুল্য।

[দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—প্রান্তিক, রবীন্দ্ররচনাবলী
২২শ খণ্ড, প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩]

এই ছত্র কটিই ২য় পাঠে বদল হয়ে রূপ নিল—

জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপ মহিমায় হলে মহীয়ান সূর্যতারার তুল্য।

[দ্রঃ গ্রন্থ পরিচয়—প্রান্তিক—র. র. ২২শ খণ্ড,
প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৪]

১ম পাঠের সঙ্গে ২য় পাঠের ভাবের অনেকখানি তফাত। ১ম পাঠে 'আজি জন্মের দিনে তোমাকে পরম মূল্য দিয়েছিল'—এখানে কেউ যে পরম মূল্য দিয়েছিল সে ইঙ্গিত আছে, সে কেউ কে, তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া 'আজি' শব্দটা বসিয়ে একটি বিশেষ দিনের কথাকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ২য় পাঠের—

'জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য'-এ, বিশেষ সেই জন্মদিনের ক্ষণটিকে বোঝাচ্ছে, যেদিন 'সূর্যতারার তুল্য রূপমহিমায় মহীয়ান' হয়ে কবি পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিলেন। এই প্রকাশকেই এক বছর পরে তৃতীয় পাঠে অর্থাৎ গৃহীত পাঠে পাওয়া যাচ্ছে ঐ একই ভাবরূপের মধ্যে ; শুধু ছন্দ-ভাষা-ভঙ্গি আলাদা হয়ে আর একটা সত্তার যেন প্রকাশ ঘটলো—

একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক।

['তেরো' সং—'প্রান্তিক']

এ ধরার বুকে কবি সেদিন আগন্তুক মাত্র, যেদিন জন্মক্ষণ তাঁকে পরম মূল্য দিয়ে পাঠিয়েছিল ; সেদিন আকাশ-বাতাস-আলোকের উৎসধারা তাঁকে দ্যুলোকের সঙ্গে সখ্যডোরে বেঁধেছে। কিন্তু শেষের দিকে এই কবিতায় ('তেরো' সং—প্রান্তিক) ১ম পাঠের শেষ চারটি পঙ্‌ক্তিকে (২য় পাঠে বর্জিত) অন্য ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। গৃহীত পাঠের শেষাংশ—

……তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পান্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী ; অফুরন্ত এ মহা বিস্ময়।

['তেরো' সং—প্রান্তিক]

১ম পাঠে এই ভাবই খসড়া রূপের মধ্যে এইভাবে ছিল—

সম্মুখে তব গেছে দুর-পানে জীবযাত্রার পান্থ,
তুমি সেথা চল, বলো কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—প্রান্তিক—র. র. ২২শ খণ্ড,
প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৩]

খসড়ার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে পরিপূর্ণ মূর্তিটি যে মেজে ঘষে কত সুন্দর হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে—'প্রান্তিকে'র এ কবিতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'প্রহাসিনী'র 'গৌড়ীরীতি' কবিতাটি শ্রীদীলিপকুমার রায়কে লেখা (বেলগ্রেড ৭ নভেম্বর বা ১৭ নভেম্বর ১৯২৫) একখানি চিঠির মধ্যে মাত্র ৮'টি ছত্রে খস্‌ড়ারূপে ছিল।* চিঠির মধ্যে কবির মনের যে ব্যথা এবং অভিযোগ ফুটে উঠেছে দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে, তাকেই তীব্র কৌতুকরসে পরিবেশন করেছেন কবি এই কবিতায়। বর্তমান গৃহীত রূপে ('গৌড়ীরীতি'—প্রহাসিনী) কবিতাটি অনেক বেশি দীর্ঘ আকার ধারণ করেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪শ খণ্ডে (দ্রঃ সং ১৩৬৫-'গ্রন্থপরিচয়'—নবজাতক, পৃঃ ৪৬৬-৬৮) 'নবজাতক' কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' (বিজয়াদশমী, ১৭ আশ্বিন ১৩৪৫) এবং 'কেন' (উদয়ন : শান্তিনিকেতন ১৮।৯।১৯৩৮) কবিতা দুটির দুটি পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপি থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' (নবজাতক) কবিতার পাঠটি 'পূর্বতন' কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। দুটিই ১৩৪৫ সালের 'বিজয়াদশমী'র দিনে লেখা। গৃহীত পাঠের তারিখ আছে ১৭ আশ্বিন; বর্জিত পাঠে তারিখ নেই; কিন্তু একই সালের 'বিজয়াদশমী'র দিন মানে, একই দিন ধরে নেওয়া যায়।

বর্জিত পাঠটি, পূর্বপাঠ বলে অনুমিত হয় এই কারণে যে, প্রথম, ভাবের একটা খস্‌ড়া রূপ এর মধ্যে যেন প্রকাশ পেয়েছে; ভাষা-ছন্দ-বাণীকৌশলে কবি পরে সেই মূর্তিটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

গৃহীত পাঠের ('প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক) 'সূচনাতে'ই অনেক বেশি সংযম অথচ সম্পূর্ণতা দেখা যায় ভাবের ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ কবিতাটির এই সংক্ষিপ্তি অথচ সংহতি লক্ষ্য করবার মত। কোথাও পূর্বতন পাঠের কোনো ছত্র যেমন গৃহীত পাঠে বাদ গিয়েছে, তেমনি কোথাও ভাবকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলতে যোগও করেছেন নূতন পঙ্‌ক্তি বা চরণ।

গৃহীত পাঠের ৩য় স্তবকের শেষের এই ছত্র ক'টি—

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—প্রহাসিনী—রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড, [প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৩৪—৫৩৫]

রক্তসিক্ত সুদৃঢ়নখর
একদিন হবে ঢিলা।

['প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক]

এবং ৬ষ্ঠ স্তবকের শেষের এই ছত্র ক'টি—

কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।

['প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক]

বর্জিত পাঠে এই ছত্রগুলির সন্ধান মেলে না। এর পরিবর্তে 'তার বেশি কিছু দিতে নাহি মন' চরণটি পূর্বপাঠে পাওয়া যায়। বর্জিত পাঠের 'বহুদিবসের পুঞ্জিত লোভ' কথাটির পরিবর্তে গৃহীত পাঠে 'স্তূপাকার লোভ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এইভাবে ভাষা এবং পঙ্‌ক্তির কিছু অদল বদল করে ভাবকে অনেক বেশি গাঢ়ত্ব দান করা হয়েছে। সব থেকে বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে 'সূচনা'য়। বর্জিত পাঠ অপেক্ষা গৃহীত পাঠের 'সূচনা' আরও মর্মস্পর্শী। বর্জিত পাঠের 'সূচনাংশ' এইরূপ—

বহু শত শত বৎসর ব্যাপি
শত শত দিনে রাতে,
দৈন্যের আর স্পর্ধার সংঘাতে
ধিকি ধিকি করে ব্যাপ্ত হয়েছে
পাপের দহন জ্বালা

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—নবজাতক—র. র.
২৪শ খণ্ড, সং ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬৬]

এই ছত্রগুলির স্থানে গৃহীত পাঠের 'সূচনাংশে পাওয়া যায়—

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে

['প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক]

বক্তব্য এখানে অনেক বেশি স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ।

'কেন' কবিতার মিলহীন বর্জিত পাঠটি *(উদয়ন শান্তিনিকেতন ১৮।৯।৩৮) লেখার ২৪ দিন পরে 'নবজাতক' কাব্যের বর্তমান 'কেন' কবিতাটির রূপটি লিখিত হয়।

দুটি কবিতার ভাব একই আছে, কিন্তু গৃহীত পাঠে ('কেন'—নবজাতক) পঙ্‌ক্তি শেষে মিল রক্ষা করে কবিতার গতির সঙ্গে সঙ্গে একটি ধ্বনিও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেটাও এর উৎকর্ষের বড় কারণ নয়, একমাত্র কারণ তো নয়ই। মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় বহুস্থানে শব্দ এবং প্রকাশভঙ্গির হেরফের ঘটেছে, যার ফলে গৃহীত পাঠের ভাবকল্পনা অনেক উচ্চস্তরের হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। প্রত্যেকটি স্তবক পাশাপাশি তুলনা করলে বর্তমান গৃহীত পাঠের উৎকর্ষ উপলব্ধি করা যায়; বিশেষতঃ 'সূচনা'য় বর্তমান গৃহীত পাঠের ভঙ্গি অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

বর্জিত পাঠের 'সূচনাংশে' আছে—

শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
তপনের আত্মদান-মহাযজ্ঞ হতে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় নৈবেদ্যের মতো
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের তলে।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—নবজাতক—র. র.
২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬৮]

গৃহীত পাঠের 'সূচনা'য় এই ছত্রগুলিই—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্র তপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে।

['কেন'—নবজাতক]

বর্জিত পাঠের প্রথম পঙ্‌ক্তি 'শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে'—এই উক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে জানার অভিজ্ঞতা বর্ণিত। একে বাদ দিয়ে—'জ্যোতিষীরা বলে'—এই নির্বিশেষ

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—'নবজাতক'—রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬৮

অভিজ্ঞতার আবেদনটিকে অনুপ্রবেশ করানোর ফলে বক্তব্যের জোর যেন অনেক বেড়ে গেছে।

বর্জিত পাঠের শেষের দিকের—

বহু যুগযুগান্তের বিশ্বনিখিলের ধ্বনিধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি আমাতে নিয়েছে আজি রূপ
নিবিড় সংহত প্রতিধ্বনি।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—নবজাতক—র. র
২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৭০]

এর স্থানে গৃহীত পাঠে—

বহু যুগযুগান্তের কোন এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথ-হারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে······কিন্তু কেন।

['কেন'—নবজাতক]

প্রকাশধর্মিতার দিক্ দিয়ে এ ছত্রগুলি অনেক বেশি সার্থক। মানুষের মনে এই 'কেন' প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে চলেছে। নিরবধি কাল ধরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাঙাগড়ার ইতিহাসে আমরা যেন 'ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ডে'র মতো তুচ্ছতার স্তূপে গড়াগড়ি যাই। এতদিনের সমস্ত অহঙ্কার কার অদৃশ্য আঘাতে মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়— কিন্তু কেন' ?

অপূর্ব এ কবিতার জীবন জিজ্ঞাসা। গৃহীত পাঠের ('কেন'—নবজাতক) 'ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের···হেন'—এই একটিমাত্র চরণ ধরে রেখেছে মানুষের অসহায় অবস্থার রূপটিকে।

ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর হিসেবে 'সানাই' কাব্যের 'চারটি' পাঠান্তরকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'বিপ্লব' (২১ জানুয়ারি, ১৯৪০) ও 'নামকরণ' কবিতাদুটির যে পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপিতে* পাওয়া গেছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত খস্ড়াকে সম্মুখে রেখে যে নূতন পাঠ জন্ম নিল, যা গৃহীত পাঠরূপে স্বীকৃত, তা আকারে প্রকারে একেবারে স্বতন্ত্র কবিতা।

অপর দুটি কবিতার মধ্যে 'বিমুখতা' (জুন—১৯৪০) ও 'কর্ণধার'

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—সানাই—রবীন্দ্ররচনাবলী [২৪শ খণ্ড প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৮১, ৪৮৭]

শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরের বিচারে।

'বিমুখতা' কবিতাটির অপর দুটি পাঠ 'পাণ্ডুলিপি'তে (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয় সানাই—র. র. ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৮৮-৪৯১) পাওয়া যায়। ২৯।৫।৪০-এ দুটিই লেখা। একই দিনে দুটি কবিতা লিখে একটির নাম দেন 'বিমুখ', একটির 'বিমুখতা'। মনে হয়, 'বিমুখ' নামের খসড়া রূপটিই প্রথম পাঠ, তারপর কিছু অদল-বদল করে দ্বিতীয় পাঠটির নাম হয় 'বিমুখতা'। পরে গৃহীত পাঠটি ('বিমুখতা'—সানাই) আরও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বর্তমান রূপে। একটি কবিতা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো, তা ঐ কবিতাটির বিভিন্ন পাঠের সূচনাংশটুকুকে নিয়ে আলোচনা করলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'বিমুখ' কবিতার 'সূচনা'য় আছে—

হঠাৎ-প্লাবনী যে মন নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা বাঁকিয়া যায়।
সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—সানাই—র. র. ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৮৮-৪৮৯].

বিমুখতা'র 'সূচনা'য় ঐ ছত্রগুলিই রূপ নিল—

যে মন হঠাৎ-প্লাবনী নদীর প্রায়
অভাবিত পথে কখন বাঁকিয়া যায়
সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় হোক-না যতই ক্ষতি।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—সানাই—র. র. ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৯০].

গৃহীত পাঠে ঐ ছত্র ক'টিই এইভাবে রূপান্তরিত হোল—

মন যে তাহার হঠাৎ-প্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়

সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।

['বিমুখতা'—সানাই]

লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি একটা 'অনির্দিষ্ট' বা 'নির্বিশেষ' 'মনে'র কথা দিয়ে কবিতাটি শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'তাহার মন' বলে একটি বিশেষ মনের গতির সঙ্গে 'প্লাবনী নদী'র তুলনা করেছেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ চরণকে ভেঙে সাজানোর ফলে ছন্দের গতির মধ্যে 'বলাকা' যুগের প্রবহমানতা এসেছে। এ-কবিতা পড়লেই 'হে বিরাট নদী'র কথা মনে আসে। সব থেকে আকর্ষণীয় হয়েছে—'বিমুখ' (১ম পাঠ) কবিতাটির এই ছত্রটি—

এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি—

একে ২য় পাঠে ('বিমুখতা'য়) একটু পরিবর্তিত করে বললেন—

এ বিমুখতায় হোক না যতই ক্ষতি

কিন্তু গৃহীত পাঠে ('বিমুখতা'—সানাই) তা আরও সুন্দরতর হয়ে প্রকাশিত হোল—

সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।

এর প্রকাশ কত সার্থক এবং ব্যঞ্জনা কত গভীর, তা বোধকরি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 'কারো ক্ষতি' বা 'যত ক্ষতি',—কি ধরনের ক্ষতি, তা ঠিক নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু 'ভরা ফসলের ক্ষতি' ('বিমুখতা'—সানাই)—এ ক্ষতি যে কি পরিমাণ, তার একটা বোধ সকলের মনের মধ্যেই আছে। একদিকে, 'প্লাবনী নদী'র গতি' 'ভরা ফসলের ক্ষতি' করে, এ চিত্র যেমন সঙ্গত এবং সার্থক, তেমনি তার মনেরও উদ্দাম গতিবেগ হয়তো জীবনের অনেক লাভের ফসলকে হেলায় নষ্ট করে, সহজ প্রাণাবেগে আপনাকে বইয়ে দিয়েছে, এ ভাবব্যঞ্জনাও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। অলঙ্কারের এবং প্রকাশধর্মিতার দিক্ থেকে এ যে কত সার্থকতম সিদ্ধি তা বলাই বাহুল্য। ঠিক এমনিভাবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত বাণীটিকে ধরতে পেরেছেন—কবির এদিকে সেদিকে হাত বাড়ানোর অন্ত ছিল না।

পাঠান্তর দুটিতে যেমন গৃহীত পাঠেও তেমনি, পরের দিকে কবিতাটি কিছুটা তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত হয়ে এই সহজ ছন্দের গতিটিকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। বর্জিত পাঠ দুটির শেষ স্তবক কবিতাটির ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছিল—

ঘাটে ফিরে এসে তবে হাঁক ছেড়ো

শান-বাঁধা তার ধারে,

[২য় পাঠ, 'বিমুখতা' দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়'—সানাই—
র. র. ২৪শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪৯১]

এ-ভাব যেন খাপছাড়া ; কবিতার মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেনি। কবি সম্ভবতঃ সে কারণেই বর্তমান গৃহীত পাঠে একে বাদ দিয়ে ভাবের গাম্ভীর্য ও সঙ্গতি রক্ষা করেছেন।

'সানাই' কাব্যের 'কর্ণধার' কবিতাটি যে আবর্তন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের রূপটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তার ইতিহাস খুবই কৌতূহলজনক। ক্রমবিবর্তনমূলক পাঠান্তরের ক্ষেত্রে খুব কম কবিতারই এমন স্থান-কাল সমেত খসড়া রূপ থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপের বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য গোচর হয়।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি থেকে জানতে পারা যায়, কবি সেখানে বলছেন—"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি। গান গেয়ে যেতে লাগলেন,—'হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্ম নদীর পার।"[১] অবসর বিনোদনের জন্য খানিকটা পরিহাসচ্ছলে ২৩।৫।৩৯ তারিখে মংপুতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর বাড়িতে বসে এ কবিতার প্রথম জন্ম হোল। সেইদিনই বিকালে রূপ পালটে হোল—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার

'তরুণী' আর প্রত্যক্ষে নেই, পরোক্ষে 'অদৃশ্য' ভাবে আছে। কেননা, 'নীল নয়নের মৌনখানি' তখনও 'দূরের আকাশবাণী'-কে বয়ে আনছে। কিন্তু পরের দিনই ২৪।৫।৩৯ তারিখে তা আবার রূপ পালটে হোল—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈব বাণী,······ইত্যাদি।

১। শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবী—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'—[প্রঃ অক্টোবর, ১৯৬৭] [তৃতীয় পর্ব] পৃঃ ১২৭

বেশ বোঝা যায় 'তরুণী' অন্তর্হিতা, ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতি এর অঙ্গ থেকে খসে গিয়ে, একে বিশেষ ভাব থেকে নির্বিশেষ ভাবের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

প্রায় পাঁচ মাস পরে ১৪।১০।৩৯ তারিখের আর একটি রূপে, এ কবিতার আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।

এরও কিছুদিন পরে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪০ সালে লিখিত যে পাঠটি পাওয়া যাচ্ছে, সেটিই পূর্ণাঙ্গ কবিতার সম্মান পেয়ে গৃহীত পাঠ হিসেবে গণ্য হয়েছে—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার। ['কর্ণধার'—সানাই]

'ছুটির কর্ণধার' হয়ে যে ব্যক্তি-বিশেষ প্রথম মৌলিক প্রেরণায় দেখা দিয়েছিল, ধীরে ধীরে সে কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কবির মৌলিক প্রেরণা বিশেষ থেকে নির্বিশেষ ভাবের মধ্যে উর্ধ্বগতি লাভ করে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা বয়ে এনেছে এ কবিতায়। 'ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার' বলে কবি একেবারে বিশেষ পরিহাসের জগৎ থেকে অধ্যাত্ম জগতে চলে এলেন—এ 'কর্ণধার তাঁর প্রাণের ঠাকুর'।

এইভাবে একটা বিশেষ মুহূর্তে সামান্য প্রেরণার মধ্যে যে ভাবের জন্ম তা যে কত আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে, ভাব-ভাষা-প্রেরণা সমস্ত দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে কত নূতনত্ব লাভ করতে পারে—এ কবিতা তার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

'আরোগ্য' কাব্যের 'তিন' নম্বর (উদয়ন ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১/দুপুর) কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার ৮ম বর্ষ, নবম সংস্করণে (১৭ পৌষ ১৩৪৭) 'দূরস্মৃতি' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল*। উক্ত কবিতার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৮ ছত্র, রচনার স্থান ও কাল মুদ্রিত হয়েছিল ২৭।১২।৪০ উদয়ন।

এই কবিতার খসড়া রূপ হিসেবে 'দেশ' পত্রিকায় যে পাঠটিকে পাওয়া যায়, তার শেষাংশের সঙ্গে বর্তমান পাঠের শেষাংশের পার্থক্য খুবই বেশি। বর্তমান পাঠের ভাবসাধনায়,—কবি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেলায় একবার সকরুণ দৃষ্টি মেলে অতীতে ফেলে আসা পদ্মাচরের দিনগুলিকে স্মরণ করেছেন। পদ্মার সহজ চঞ্চল

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—আরোগ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী ২৫শ খণ্ড [সং ১৩৬৫] পৃঃ ৪১৮

জীবনধারার সঙ্গে কবির উচ্ছল জীবনের কত নিবিড় যোগ ছিল এবং পদ্মাপাড়ের মাঠ, ঘাট, বালুর চর কবিমনের উপর কেমন বিষাদমধুর স্পর্শ ফেলেছিল, সেই ছবিটি সুন্দর ভাবে বর্ণময় রূপে চিত্রিত—

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়। ['৩'-সং—'আরোগ্য']

এই বর্ণনাই খসড়া রূপেব মধ্যে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বর্ণহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—আরোগ্য—র. র.
২৫শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৪১৮]

মাত্র এই চার ছত্রের তুলনা করলেই দেখা যায়, বর্জিত পাঠের 'বর্ণহীনে'র থেকে গৃহীত পাঠের 'কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাত' অনেক ইঙ্গিতবাহী। যে প্রভাত কবির 'উদাস চিন্তা' নদীর স্রোতের ফেনায় ফেনায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত সে তো 'বর্ণহীন' প্রভাত নয়, 'কর্মহীন' প্রভাত ; সুতরাং এ পরিবর্তন অতি সার্থক। বর্জিত পাঠের—

আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে—

এই বক্তব্যের মধ্যে তেমন যেন স্পষ্টতা নেই। 'চিত্তের ধারা' কথাটি তেমন ব্যঞ্জনাধর্মী নয়, নয় আবেগধর্মীও ; এর পরিবর্তে গৃহীত পাঠে জন্ম নিল—

আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া ফেনায় ফেনায়।

['৩'-সং—আরোগ্য]

'চিত্তের ধারা'কে ভেসে যেতে দিলেও তার মধ্যে যেন একটা স্থিতিস্থাপকতা আছে, কিন্তু 'উদাস চিন্তা'—সে ফেনায় ফেনায় ভেসে বেড়ায় বৈকি। যে চিন্তা উদাস সে কোনো চিহ্ন না রেখে ফেনার মত হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়।

'পাঠান্তর' বিচারে তাই দেখা যায় 'বর্জিত পাঠ' অপেক্ষা গৃহীত পাঠ ('তিন' সং—আরোগ্য) অনেক বেশি ভাববাহী, চিত্রধর্মী।

(গ) আংশিক পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিত পাঠান্তর

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে গোটা কবিতাটির কোনো পাঠান্তর নেই ; কিন্তু খসড়া রূপের সঙ্গে বর্তমান গৃহীত পাঠের কোনো কোনো অংশের হয়তো অমিল। কারণ, কবি গৃহীত পাঠে হয়তো কোনো কোনো স্থানে স্তবক, চরণ বা কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পূর্বপাঠ অপেক্ষা। কোথাও এমনিতরো 'আংশিক পরিবর্তন' ঘটেছে, কোথাও বা নূতন অংশ গৃহীত পাঠে 'সংযোজিত' হয়েছে, কোথাও হয়তো পূর্বপাঠের কোনো অংশ বা চরণ বর্জিত হয়েছে বর্তমান পাঠে।

এই শ্রেণীর পাঠান্তর আলোচনায় কোনো কৌতূহলজনক আকর্ষণ হয়তো নেই, কেন-না কবিমানসিকতার বিশেষ কোনো বিবর্তনধারার সন্ধান এই শ্রেণীর পাঠান্তরের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলে না। কিন্তু এই 'আংশিক পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিত পাঠান্তরগুলিও কবির শিল্পপ্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন। কোনো সৃষ্টিই যে স্বয়ম্ভু নয়, কবিমনের ভাঙাগড়ার যে খেয়াল, পূর্ণ অপূর্ণের যে সুমিতিবোধ, তার থেকেই এই মানসিকতার জন্ম। কোনো ভাব বা ভাবনার প্রকাশ একবারেই পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যেহেতু, কাব্যও এক রকমের শিল্প, তাই তাকে মনোমত একটা আকার দেবার জন্য অনেক সময় বাহুল্যজ্ঞানে কোনো কোনো অংশ যেমন বর্জন করা হয়েছে, কোথাও তেমনি পূর্ণতা আনতে নূতন অংশ যোগও হয়েছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি পাঠান্তর আলোচনার মাধ্যমে, কবির এই ধরনের গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে কোন্ মানসিকতা কাজ করেছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে।

'বিচিত্রিতা' কাব্যের 'পুষ্প', 'শ্যামলা', 'পুষ্পচয়িনী' এবং 'শ্যাকরা'—এই চারটি কবিতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু আংশিক পরিবর্তন, পরিবর্জন বা রূপান্তর চোখে পড়ে।*

এছাড়া 'বীথিকা' কাব্যের 'প্রাণের ডাক', 'জয়ী' (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—বীথিকা—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৫২৯), 'ছড়ার ছবি' কাব্যের 'বুধু', 'কাশী', 'যোগীনদা' (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—'ছড়ার ছবি' রবীন্দ্ররচনাবলী ২১শ খণ্ড, প্রঃ ডিসেম্বর ১৯৫৭, পৃঃ ৪৩৫), 'সেঁজুতি' কাব্যের 'পলায়নী', 'তীর্থযাত্রিণী', 'জন্মদিন' (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—'সেঁজুতি' —র. র. ২২শ খণ্ড, প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৫), 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'সংযোজন' অংশের 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—প্রহাসিনী—র. র. ২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৩৬), 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'শ্যামা', 'জানা-অজানা', 'সময়হারা' (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—'আকাশ-প্রদীপ'—র. র. ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪০), ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর পাঠান্তরের কোঠায় পড়ে।

---

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বিচিত্রিতা—রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭শ খণ্ড [প্রঃ ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ৪৩৬-৩৭]

'বিচিত্রিতা' কাব্যের 'পুষ্প' কবিতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জন চিহ্নাঙ্কিত দ্বিতীয় স্তবক এইরূপ—

সুর তার গন্ধপথে তব চিত্ত করিছে সন্ধান,
শুনেছে কি কান।
তোমার চোখের পানে চেয়ে
নীরবে উঠেছে ফুল গেয়ে
কবির মতন স্তবগান।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বিচিত্রিতা—র. র. ১৭শ খণ্ড,
প্রঃ ভাদ্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৩৬]

'পুষ্প' (বিচিত্রিতা) কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ফুল কেবল নারীর চিত্তের সন্ধান করে ফেরেনি বা কবির মত স্তবগান করেনি। নারীর সঙ্গে তার চিরন্তন মিলের সত্যটিকে আবিষ্কার করেছে। 'পাঠান্তরে' ব্যবহৃত বর্জন চিহ্নাঙ্কিত এই দ্বিতীয় স্তবক তাই অর্থের দিক থেকে ঠিক মানানসই নয়। হয়তো এই কথা ভেবেই কবি একে বর্জন করেছেন।

বর্তমান পাঠের ('পুষ্প'—বিচিত্রিতা) ষষ্ঠ স্তবকের প্রথম চরণের স্থানে বর্জিত পাঠে

'দেখেছি তোমার দেহে সে আদিম ছন্দ অনাবিল'

এই চরণই গৃহীত পাঠে ('পুষ্প'—বিচিত্রিতা) রূপ পেল এইভাবে—

'তোমার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল',।

এখানেও নারীর সঙ্গে পুষ্পের মিল বোঝাতে বর্তমান গৃহীত চরণটিই সাহায্য করেছে। বর্জিত চরণে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা হোল—ফুল দূর থেকে শুধু নারীর দেহে আদিম ছন্দ দেখে মন্ত্রমুগ্ধ!

'স্যাকরা' (বিচিত্রিতা) কবিতার পূর্বপাঠে সর্বশেষ এই দুইটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি ছিল—

দেবতা যখন প্রসন্ন হন পূজার ফুলে
সে ফুল তখন বিশ্বের জন নিক না তুলে।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বিচিত্রিতা—র. র.
১৭শ খণ্ড, প্রঃ ভাদ্র ১৩৬১, পৃঃ ৪৩৭]

'প্রিয়া' কথাটিকে কেন্দ্র করে 'স্যাকরা' কবিতায় যে ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে

সর্বশেষ এই বর্জিত অতিরিক্ত ছত্র দু'টি অবাস্তর শুধু নয়, অসঙ্গত। প্রিয়াকে যদি লোকোত্তর বলেও কল্পনা করা হয়, তবুও বর্তমান পাঠের—

স্যাক্‌রা বলে
তারে দিলেই
পায় সকলে

('স্যাক্‌রা'—বিচিত্রিতা)

এই ভাবের মধ্যে সে ইঙ্গিত আরও অভিব্যক্ত। তাছাড়া শেষ বর্জিত ছত্র দু'টি যুক্ত হলে কবিতাটিতে ব্যক্তিগত ভাবের স্পর্শ অপেক্ষা তাত্ত্বিক দিক্‌টিই প্রকটিত হয়, হয়তো এ-কারণেই বর্জন করা হয়েছে।

'বীথিকা' কাব্যের 'জয়ী' কবিতাটির প্রথম স্তবকের যে পূর্বপাঠ (দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—বীথিকা—র. র. ১৯শ খণ্ড, প্রঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৫২৯) পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, কবি প্রথম চরণে 'স্তব্ধমরু' শব্দটির স্থানে 'চিরস্তব্ধ' শব্দটি বসিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় চরণটিকে—

তৃষ্ণাতরবারি হাতে আসন মৃত্যুর

[দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—বীথিকা—র. র. ১৯শ খণ্ড,
প্রঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৫২৯]

পরিবর্তিত করে—

মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে
আসন মৃত্যুর

['জয়ী'—বীথিকা]

এই ছত্রটি যুক্ত করেছেন। মরুভূমির চিরস্তব্ধ রুক্ষতাকে বোঝাতে এ চরণটি অনেকবেশি ভাববাহী। অনুপ্রাসে গাঁথা হয়ে এ চরণ যে নিবিড় ধ্বনিস্পন্দের সৃষ্টি করেছে, তা পূর্বপাঠে ছিল না।

'প্রাণের ডাক' (বীথিকা) কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে এবং 'প্রবাসী' (১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ) পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির প্রথম স্তবকরূপে যে স্তবকটিকে পাওয়া যায়, যা কবি 'বীথিকা'র (প্রাণের ডাক) কবিতা সংকলনের সময় বাদ দেন, সেই স্তবকটির মধ্যে ব্যক্তিগত আবেদনই মুখ্য—

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,
ওঠো তবু ওঠো,

[দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—বীথিকা—র. র. ১৯শ খণ্ড,
প্রঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৫২৮]

একথা মনে হয় কবি নিজের অবসাদগ্রস্ত প্রাণকেই ডাক দিয়ে বলেছেন। এই ভাবনাই বর্তমান গৃহীত পাঠের তৃতীয় স্তবকের প্রথম চরণে এইভাবে প্রকাশিত—

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে
*　　*　　*
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

['প্রাণের ডাক'—বীথিকা]

কিন্তু একথা ঠিক, কবিতাটির ব্যক্তিগত আবেদন শিথিল হয়ে পড়েছে।

'বীথিকা'র বর্তমান পাঠে (প্রাণের ডাক) এই কবিতার যে সূচনা, সেখানে কবি মানবলোক ও প্রকৃতিলোকে প্রাণের যে স্বতঃস্ফূর্ত চঞ্চলতা, তাকে বোঝাতেই 'প্রাণের ডাক' কথাটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং প্রথম স্তবক স্খলিত করার পিছনে, কবিমনে গোপনে এই ভাবটি হয়তো কাজ করেছে; না হলে বর্জিত স্তবকটিও কম সুন্দর নয়।

'সেঁজুতি'র তীর্থযাত্রিণী' কবিতাটির উপসংহারে 'প্রবাসী' (১৩৪৪, অগ্রহায়ণ) পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠটিতে (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—সেঁজুতি—র. র. ২২শ খণ্ড, প্রঃ আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৫০৫) দুটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত হয়েছিল—

সংসারের মরিচিকারে বিশ্বাস করিয়াছিল ও যে,
সংসার বাহির-তীরে পুন ফিরে তারি ব্যর্থ খোঁজে।

[দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—সেঁজুতি—র. র. ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৫]

শেষ এই বাড়্‌তি চরণ দু'টিতে (বর্জিত) কবি যেন ব্যাখ্যা করে সবই বলে দিয়েছেন। না-বলা-বাণীর ইঙ্গিত যে অলক্ষ্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে—এই ব্যাখ্যার মধ্যে তা পাওয়া যায় না। অথচ এর ভাবের মধ্যে 'সংসারের মরীচিকারে' সে যে বিশ্বাস করেছে, সংসারের বাইরের দুর্মূল্য কিছুও যে মরীচিকারই মত, তাকে যে কোনোদিন পাওয়া যাবে না—এই ভাবটুকু গৃহীত পাঠের শেষ চরণগুলির মধ্যে আছে—

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।　　['তীর্থযাত্রিণী'—সেঁজুতি]

বর্জিত পঙ্‌ক্তি দু'টির ভাববস্তু এই ছত্রগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুতরাং কবি হয়তো মনে করেছেন—অতিরিক্ত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

'পাণ্ডুলিপি'তে (দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—আকাশপ্রদীপ—র. র. ২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪০) 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'শ্যামা' কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্‌ক্তির আদিপাঠ পাওয়া যায়—

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,
বারো ছিল বয়স আমার।

এই আদিপাঠের পরিবর্তে বর্তমান পাঠে ('শ্যামা'—আকাশপ্রদীপ) আছে—

ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার

পরিবর্তিত এই বর্তমান ছত্রে কবি ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন এই 'শ্যামা' কে, কিন্তু আদি পাঠে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, তাতে 'জীবনস্মৃতি'র ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই এই 'শ্যামা' কে, তা অনুমান করে নেওয়া যায়। বর্তমান পাঠেও যায়, তবে নানা ইঙ্গিতের সাহায্যে, কবির প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তিতে নয়। কাব্যের এই ইঙ্গিতময়তা, রহস্যময়তা ও রোমান্টিকতার বাহন হয়েছে।

'জানা-অজানা' (আকাশপ্রদীপ) কবিতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে (দ্রঃ গ্রন্থ-পরিচয়—আকাশপ্রদীপ—র. র. ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪০) সর্বশেষে দু'টি অতিরিক্ত ছত্র (গৃহীত পাঠে পরিত্যক্ত) মুদ্রিত ছিল—

তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্তগিরিশিখরের নক্ষত্রের রহস্যবারতা।

এই ছত্রদু'টি অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক ও তত্ত্ববহুল ; এজন্য পরবর্তী কালে হয়তো বর্জিত হয়েছে। কবি গৃহীত পাঠ ('জানা-অজানা'—আকাশপ্রদীপ) শেষ করেছেন এইভাবে—

যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

['জানা-অজানা'—আকাশপ্রদীপ]

এই ছত্র দু'টির মধ্যেই একটা অস্পষ্টতার ও রহস্যময়তার আভাস রয়েছে, সুতরাং বর্জিত ছত্রদু'টি বাহুল্যজ্ঞানে পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত।

'সময়হারা' (আকাশপ্রদীপ) কবিতার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠের (দ্রঃ 'গ্রন্থ-পরিচয়'—আকাশপ্রদীপ—র. র. ২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪০) সূচনায় ছিল—

ডাক্তারেতে বলে যখন 'মরেছে এই লোক'
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,

কিন্তু যখন বলে 'জীবন্মৃত'
সেটা শোনায় তিতো।
আমার ঘটল তাই,
নালিশ তবু নাই।

এই 'সূচনা'য় কৌতুক মিশ্রিত থাকলেও, ব্যক্তিগত জীবনের এই কৌতুককে বাদ দিয়ে বর্তমান গৃহীত পাঠের যে 'সূচনা'—তা আরও ইঙ্গিতবাহী। কবি হয়তো সে কারণেই একে বাদ দিয়েছেন। গৃহীত পাঠের 'সূচনা'য় আছে—

খবর এলো, সময় আমার গেছে।

['সময়হারা'—আকাশপ্রদীপ]

কিন্তু এ খবর কিসের খবর, কোথা থেকেই বা এলো—তার কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা নেই। আর 'সময় আমার গেছে'—এই বা কোন্ সময়? 'আমার কাল', 'আমার সুসময়' বা 'আমার আয়ু'—তারও বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই। কিন্তু একে কেন্দ্র করে কবি একটা কৌতুকময় জীবনচিত্র এঁকে গেছেন এখানে।

এই কবিতারই ২২ পঙ্‌ক্তির পর ৪টি পঙ্‌ক্তি পূর্বতন পাঠে ছিল না এবং নিম্নোক্ত চরণদুটি সেখানে দেখতে পাওয়া যায়—

খুদ কুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
কখন দিল ফুঁকে।

['সময়হারা'—আকাশপ্রদীপ]

এর অনুবৃত্তিস্বরূপ চারটি ভিন্ন পঙ্‌ক্তি পূর্ব পাঠে পাওয়া যায়—

শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু একমহলেই জানা।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে।

[দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—আকাশপ্রদীপ—র. র.
২৩শ খণ্ড, প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪১]

এই চরণ ক'টি কোনো বিশেষ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করছে, এজন্যই মনে হয় এদের বর্জন করেছেন কবি বর্তমান গৃহীত পাঠ থেকে। কারণ,—"১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষের

সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখি নি, ওটা যে একটা সকৌতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে" ।*

তাই মনে হয়, নিছক কৌতুক সৃষ্টির জন্য যেটুকু প্রয়োজন, গৃহীত পাঠে সেটুকুই রেখেছেন এবং বর্তমান গৃহীত পাঠে যে নূতন চারটি ছত্র সংযোজিত হয়েছে তাও বিশুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টির জন্যই। যেমন—

কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর
নেই কিছু তো দু এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।

['সময়হারা'—আকাশপ্রদীপ]

কবির চিঠির ঐ বিশেষ অংশ থেকেই বোঝা যায়, কবিতাটির বিশেষ ইঙ্গিত হয়তো কোনো কোনো মহলে আলোচনার সৃষ্টি করেছিল ; সেজন্য নিছক কৌতুক সৃষ্টির জন্যই কোনো অংশ নূতন যোগ করে, কোনো অংশ (যা অন্য অর্থের ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়েছে) বর্জন করে, কবি একে রসায়িত করে পরিবেশন করেছেন।

(ঘ) সংগঠনমূলক পাঠান্তর

কোনো কোনো কবিতার 'পাঠান্তরে'র ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কবি দু'টি কবিতাকে ভেঙে একটি কবিতায় রূপ দিয়েছেন, বা একটি কবিতাকে ভেঙে দু'টি কবিতার জন্ম দিয়েছেন। এইভাবে, ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে তারা নূতন একটি কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পূর্বপাঠ' বা 'খসড়া'র সঙ্গে এসব কবিতার মিল আছে অথচ নেই। ভাবতে অবাক লাগে কবি কোন্ মানসিকতা থেকে এদের এভাবে জন্ম দিলেন। বিভিন্ন ধরনের রূপ-নির্মিতির খেয়াল থেকেই এ মানসিকতার জন্ম বলে মনে হয়। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

'ছড়ার ছবি' কাব্যের 'রিক্ত' কবিতাটি, 'প্রহাসিনী'র 'নামকরণ', 'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল' ও 'পরিচয়' এবং 'ছড়া'র ২ ও ৫ সংখ্যক কবিতা 'সংগঠনমূলক পাঠান্তরে'র কোঠায় পড়ে।

'ছড়ার ছবি' কাব্যের 'রিক্ত' কবিতাটির 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মহালয়া ১৩৭৬) প্রকাশিত 'পাণ্ডুলিপি'র মুদ্রণ থেকে দেখা যায়, দুটি কবিতা একসঙ্গে মিলিত হয়ে 'রিক্ত' কবিতাটির জন্ম হয়েছে। এই পত্রিকাতেই '৫৯৭' পৃষ্ঠায়

* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—আকাশপ্রদীপ—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড [প্রঃ জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৫৪১]

শ্রীকানাই সামন্ত 'পাণ্ডুলিপি'র যে পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় নিম্নলিখিত (ক) এবং (খ) সংখ্যক কবিতাদুটির মিশ্রণে 'রিক্ত' কবিতার জন্ম।

পাণ্ডুলিপি {
(ক) বইচে নদী বালির মধ্যে শূন্য বিজন মাঠ
(খ) মরুর মতো ভাঙা,
চোখ-ভোলানো-রঙের-নেশা ভাঙা

এই দু'টি কবিতা একত্রিত হয়ে রিক্ত কবিতার জন্ম হলেও, দু'টি কবিতারই যে সমস্ত ছত্রগুলি কবি গ্রহণ করেছেন বা পর পর একই স্থানে বসেছে তা নয়।

'বইচে নদী বালির'… ('ক' পাণ্ডুলিপি) এই কবিতার শেষ চার ছত্র 'রিক্ত' কবিতা থেকে বর্জিত হয়ে 'সেঁজুতি' কাব্যের শেষ কবিতা ('ছুটি') হয়েছে।

'বইচে নদী বালির…' ('ক' পাণ্ডুলিপি) এই কবিতার প্রথম চার ছত্র নিয়ে 'রিক্ত' (ছড়ার ছবি) কবিতার প্রথম চার ছত্র গঠিত। তারপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র, 'মরুর মতো ভাঙা…' ('খ' পাণ্ডুলিপি) এই কবিতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র নিয়ে গঠিত। কেবল—

'শুকনো পাতা ঘুর খাচ্চে কিসের অভিশাপে'—এই ছত্রের স্থানে 'চোখ ধাঁধানো তাপে' করা হয়েছে।

'রিক্ত' (ছড়ার ছবি) কবিতার ৭, ৮, ৯, ১০ ছত্র আবার ('খ' পাণ্ডুলিপি) 'মরুর মতো ভাঙা, …'—এই কবিতার ১১, ১২, ১৩, ১৪ ছত্রকে কিছু রূপান্তরিত করে গঠিত। 'রিক্ত' কবিতার ১১ ছত্রের থেকে অবশিষ্ট অংশ পুনরায় 'বইচে নদী…' ('ক' পাণ্ডুলিপি) এই কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, অবশ্য শেষ চার ছত্র বাদ দিয়ে (কারণ, 'সেঁজুতি'র শেষ কবিতা গঠন করেছে এই ছত্র ক'টি)।

'মরুর মতো ভাঙা'…… ('খ' পাণ্ডুলিপি) এই কবিতার ৭, ৮, ৯, ১০ ছত্র একেবারেই বর্জন করা হয়েছে—'রিক্ত' কবিতায় তাদের আর ঠাঁই হয়নি।

এইভাবে দুটি কবিতাকে সংগঠিত করে কবি একটি কবিতায় দাঁড় করিয়েছেন।

মনে হয়, ধরণীর রিক্ত চেহারাটি দু'টি কবিতার মিশ্রিত রূপের মধ্যেই যেন ফুটে উঠেছে। কবি ধরাতলের এই মহাশূন্যতায় যে নিজের চেয়ে থাকা-কেও মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন, এই বিশেষ মনোভাবটুকুকে বাদ দিয়ে শুধু একখানি ছবি এঁকে গেছেন। ছড়ার ছন্দে এই ছবি আঁকা বাস্তবিক চমৎকার হয়েছে।

'প্রহাসিনী' কাব্যের 'নামকরন' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক 'গল্পসল্প' গ্রন্থের 'চণ্ডী' নামক গল্পে ব্যবহৃত কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।* ঐ কবিতাটির শেষ স্তবক গঠিত হয়েছে 'চন্দনী' (গল্পসল্প) গল্পে ব্যবহৃত কবিতার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপের দ্বারা।

* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—প্রহাসিনী—রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭ [সং-জুলাই ১৯৫৮]

'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল' কবিতার সঙ্গে 'পাণ্ডুলিপি'তে প্রাপ্ত একটি পূর্বপাঠের সামান্য কিছু অংশের মিল আছে। ছোট একটি কবিতার ভাবকে কেন্দ্র করে কবি একটি দীর্ঘ বর্ণনাবহুল কবিতার জন্ম দিয়েছেন এখানে। 'বাসাবদল' ও 'পরিচয়' উভয় কবিতার গদ্যছন্দে লিখিত একটি অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ পাওয়া গেছে।*

'ছড়া' কাব্যের ২ ও ৫ সংখ্যক কবিতা 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থের 'চলচ্চিত্র' নামক কবিতাটির কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। 'চলচ্চিত্র' কবিতাটির কিছু অংশ 'ছড়া'র '২' সংখ্যকে এবং কিছু অংশ '৫'-সংখ্যকে (ছড়া) পাওয়া গেলেও, ঐ দু'ইটি কবিতার বাকি অংশ এবং অনেকাংশই নূতন সৃষ্টি। এমনিভাবে একটি কবিতা থেকে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতার জন্ম হয়েছে।

'ছড়া'র '২'-সংখ্যক কবিতায় 'কদমা'র কথা বলতে বলতে ১৩ ছত্র থেকে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি 'চলচ্চিত্র' (চিত্রবিচিত্র) কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে—

মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
 খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে
মোটা মোটা..................

রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
 মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।

['২'-সং—'ছড়া']

'ছড়া'র ২-সংখ্যক কবিতার এইটুকু 'চলচ্চিত্র' (চিত্রবিচিত্র) কবিতা থেকে গৃহীত হলেও, আগে-পরে অন্য সব নূতন ছত্র যুক্ত হয়ে একটি স্বতন্ত্র কবিতার রূপ নিয়েছে।

'চলচ্চিত্র' (চিত্রবিচিত্র) কবিতার '১৩'-সংখ্যক ছত্র থেকে দেখা যায় 'ছড়া' কাব্যের '৫'-সংখ্যক কবিতাটির নবম ছত্রের মিল। কিন্তু দু' চার ছত্র পরে একটু-আধটু রদ-বদল হয়েছে। যেমন 'চলচ্চিত্রে' আছে—

গাছে চ'ড়ে রাখাল ছোঁড়া
 জোগায় কাঁচা সুপুরি,
দু'বেলা পান বাঁধা আছে,
 আরো আছে উপুরি।

['চলচ্চিত্র'—চিত্রবিচিত্র]

* দ্রঃ 'গ্রন্থপরিচয়'—সানাই—রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩ [সং ১৩৬৫]

এর স্থানে 'ছড়া'র ৫-সংখ্যকে পাওয়া যায়—

গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,
পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা সুপুরি। ['৫'-সংখ্যক—ছড়া]

'চলচ্চিত্রে'র ৪৯ ছত্রের—

লাখা চলে ছাতা মাথায়
···চড়ক ডাঙায় ঘর

এই ছত্রটুকুকে 'ছড়া'র '৫'-সংখ্যকের ২১ ছত্র থেকে পাওয়া যায়।

ঐ কবিতার ('চলচ্চিত্র'—চিত্রবিচিত্র) ৫৯ ছত্রের দেখা মেলে '৫'-সংখ্যকের (ছড়া) ২৭ ছত্রে। এর পর কয়েকটা ছত্র সামান্য কিছু অদল-বদল হলেও মোটামুটি এক। 'ছড়া'র '৫'-সংখ্যকে এর পর চারটি নূতন ছত্র যোগ হয় এবং তারপর—

হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,

* * *

ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে। ['৫'-সংখ্যক—ছড়া]

এই ছত্রগুলি পর্যন্ত কিছু কিছু বদল করে একই রাখা হয়েছে। এর পর 'চলচ্চিত্রে'র শেষের চার ছত্র 'ছড়া'র '৫'-সংখ্যকে অপরিবর্তিত আকারে আট ছত্রে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থের 'চলচ্চিত্র' কবিতাটির বেশির ভাগ অংশ কিছু অপরিবর্তিত আকারে, কিছু বা ভোল পালটে 'ছড়া' কাব্যের '৫'-সংখ্যকে এসেছে।

'চলচ্চিত্রে'র বিভিন্ন অংশ দুটো দীর্ঘ কবিতায় রূপান্তরিত হলে মূল কবিতা কবি বর্জন করেন। বর্জনীয় কিনা সে আলাদা প্রশ্ন।

এ সম্পর্কে একথাও উল্লেখযোগ্য, এক বা একাধিক কবিতাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে সংগঠনমূলক পাঠান্তরের যে নমুনা এখানে পাওয়া যায়, কবির প্রথম যুগের কাব্যসাধনার ইতিহাসে তার নজির বিরল নয়।*

'সংগঠনমূলক পাঠান্তরে' কবির এই ভাঙা-গড়ার খেলা। বেশ কৌতুকজনক ও রহস্যময়।

---

* দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়—'সঞ্চয়িতা'—পৃঃ ৮৪৪, ৮৫৬ [সং-বিশ্বভারতী ১৯৭২]

(৪) সংগীত থেকে কবিতা বা কবিতা থেকে সংগীত

কবিতার 'পাঠান্তর' যেমন কবিতায় বা অন্য কোন শিল্পরূপের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি সংগীতকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পাঠান্তর' বলে পাওয়া যায়।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র কিছু কিছু কবিতার 'পাঠান্তর' 'গীতবিতানে' আছে।

"প্রতিভামাত্রই নিত্যনবরূপাকাঙ্ক্ষী সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুরধিগম্য। তাঁর ভাবমনের বিচিত্রলীলা কোন শিল্পাঙ্গিককে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেয়নি। সেইজন্য তাঁর দীর্ঘায়িত শিল্পিজীবনে নবসৃজনের পাশাপাশি চলেছে প্রাক্তন রচনার রূপান্তর, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন।......নিত্যনবরূপের অন্বেষণ তিনি শিল্পের সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই করতেন। কিন্তু শিল্পরূপের এই পরিবর্তন প্রবণতা তাঁর জীবনের মধ্যভাগে বিশেষভাবে প্রবলতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনাগুলি অনেকক্ষেত্রে তাঁর প্রৌঢ়ত্বে রূপান্তর লাভ করেছে। আপাততঃ বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে তিনি পরিবর্তন প্রয়াসের অস্থিরতায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত এই কালপর্ব। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে গদ্যভঙ্গীর মধ্যে আশ্রয় দিয়ে কাব্যের মুক্তিসাধনায় রত। পাশাপাশি চলছে অন্যতর রূপান্তর। ১২৯৯ সালে লেখা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য এই সময়ে 'নৃত্যনাট্যে'র বেশ পরল। ১৩০৬ সালে লেখা 'পরিশোধ' কাব্যনাট্য ও ১৩৪০ সালে লেখা 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাটকের এই কালপর্বেই সাজবদল ঘটল। রবীন্দ্র কাব্যশিল্পের এই অন্তর্বিপ্লবেই প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা গানের আকার নিল। ···মৌল বক্তব্য এই যে, একই কবির মধ্যে বিভিন্ন যুগে উচ্ছ্বাস এবং সংযম থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। দীর্ঘ আয়ুর সৌভাগ্য তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যের উদ্বেলতা পরবর্তীকালে সচেতন প্রজ্ঞায় পরিশীলিত হয়েছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর সাহিত্যকর্মে পাঠান্তরের এমন স্বমহিম মর্যাদা।

···কবিতায় সুর দিলেই যদি সংগীতরূপ গ্রহণ সমাপ্ত হত তাহলে আলোচনার প্রশ্ন উঠত না ; কিন্তু দেখা যায়, কবিতাকে গানে পরিণত করার কালে রবীন্দ্রনাথ শব্দ, ছন্দ, এমনকি রূপকর্মেরও এমন রূপান্তর ঘটিয়েছেন যে, তা পাঠান্তরের মত রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।"[১]

'সানাই' কাব্যের একুশটি ছোটো ছোটো কবিতা 'গানরূপে' 'গীতবিতানে' প্রচলিত আছে। কোথাও বা আগে গান তার থেকে পরে কবিতা, কোথাও বা আগে কবিতা

১। রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচায

॥ প্রবন্ধ ॥ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীত পাঠান্তর'—শ্রীসুধীর চক্রবর্তী [পৃঃ ২৮৬—৮৭]

তার থেকে পরে গান। এইভাবে 'পাঠান্তর' বা 'খসড়া' হিসেবে একই ভাবের দুটি স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা দু'টি ক্ষেত্রেই একই রূপ রয়ে গেছে; কোথাও বা গান থেকে কবিতায় রূপান্তরিত হওয়ায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। "সানাই কাব্যের (উদাস হাওয়ার পথে পথে ···) কবিতাটির সংগীতরূপে এমন কতকগুলি নতুন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি গানে অনিবার্য অথচ কবিতাতে নয়। কেননা কবিতা মূলতঃ সংহত শিল্প আর গানের সুরের মধ্যে যে বিস্তার ও ভাবের প্রসার তারই অনুরোধে এই নব শব্দযোজন। সংযোজিত শব্দগুলি স্বরবর্ণের উদাসী ধ্বনিমায়ায় এমন বিচিত্র যে, গানটিতে ঐ শব্দগুলি যে নতুন বসন্তাভাস জাগাচ্ছে তার আবেদন অন্য কোনো ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

···রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানতেন না! তাঁর হৃদয়ভাব উন্মোচনে কবিতা ও গান যুগ্মবাহন। বোধহয় সেই কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন :

> 'সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা'।" ১

সংগীতের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তাকে সুর দিয়ে পূরণ করে নেওয়া হয়। কবিতার মত বুনুনি অত ঠাস হলে সুর তার কলাপ মেলে ইন্দ্রধনু-জাল বিস্তার করতে পারে না; তাই গান থেকে কবিতায় আসার সময়, বা কবিতা থেকে গানে রূপান্তরিত হবার সময় একই রূপের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

'অধরা' ('সানাই') কবিতাটির কবিতারূপ ও গীতিরূপের তুলনা করলে দেখা যায় কি ধরনের পরিবর্তন এ জাতীয় 'পাঠান্তরে' এসেছে। যেমন কবিতায় আছে—

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দ বন্ধনে।

['অধরা'—'সানাই']

গানে এই ভাবকেই সংক্ষেপে আনলেন এইভাবে—

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে

[২৩ সং—'প্রেম', 'গীতবিতান' ২য় খণ্ড]

১। রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য

॥ প্রবন্ধ ॥ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীত পাঠান্তর'—শ্রীসুধীর চক্রবর্তী [পৃঃ ২৮৭]

তারপর থেকেই দেখা যায় ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন এসেছে কবিতায়—

বলাকাপাতির পিছিয়ে পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।

['অধরা'—'সানাই']

কবিতার মধ্যে কবি এইভাবে এ পাখির বাসা এবং জাতি-কুল-মানের পরিচয় দিলেন। কিন্তু গানে এই বিস্তৃতির কোনো প্রয়োজনও নেই, অবকাশও নেই। সেখানে সংক্ষেপে তাই বললেন—

ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান।

[২৩০ সং—'প্রেম', 'গীতবিতান' ২য় খণ্ড]

এমনিভাবে একরূপ থেকে রূপান্তরে যখন এনেছেন, তখন প্রয়োজনবোধে নূতন কিছুও যোগ করেছেন। গানের শেষ চরণ ['নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে'] কবিতার সঙ্গে মেলে না। এর পরিবর্তে সেখানে আছে—

ওর দুটি পাখা চঞ্চলি উঠে তব হৃৎস্পন্দনে
ওর বাসাখানি তব কুঞ্জের নিভৃত প্রাঙ্গণে।

['অধরা'—'সানাই']

কবিতাও ছন্দের সুর-তাল-ধ্বনি মেনে চলে, গানও চলে। দুই-ই সুরের সাধনা। তবে গানে কথাকে, ভাবকে অতিক্রম করে কান এবং মন সুরের ইন্দ্রজালেই মন্ত্রমুগ্ধের মত জড়িয়ে পড়ে; অর্থের দিকে, ভাবের দিকে তার আর দৃষ্টি থাকে না। কবিতাকে ভাষা-ছন্দ-অর্থ সবকিছুর সমবায়ে এমন ভাবের সৃষ্টি করতে হয় যাতে মন তার উপলব্ধিতে রসায়িত হয়ে 'রূপসাগরে' ডুব দেয় 'অরূপরতন আশা করি'। কিন্তু এই অরূপরতনের আকর্ষণ থাকলেও রূপ-সজ্জার অর্থাৎ শব্দ-অর্থ-ধ্বনি কারও ভূমিকাই এখানে কম নয়। গানে এই সবকিছুর ফাঁককেই সুর পূরণ করে নিতে পারে; সুরই সেখানে মুখ্য আর সব গৌণ। কিন্তু "...যে-কোন কবিতাতেই সুর দিয়ে গীতরূপ দেওয়া চলে না; কবিতাটির মর্মমূলে সাংগীতিক সম্ভাবনা অন্তর্নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। তেমনই কবিতারূপ যথাযথ রক্ষা করে সংগীত রূপান্তর সম্ভব নয়। কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য; সে পরিবর্তন শব্দ, ছন্দ বা রূপকল্প যা কিছু আশ্রয় করে ঘটতে পারে। যে কেউ সংগীত রচনা করতে পারে না, কিন্তু অনেকেই সুর রচনা করতে পারেন। এখানেই সংগীত রচনার বিশিষ্ট দুরূহতা। কেননা সংগীত মূলতঃ শিল্পের পরমতম সঙ্গতি। সেখানে ভাব, আকার,

শব্দকে সুরের সঙ্গে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হয় যা খুব অনন্যসাধারণ সংগীত-বোধ ছাড়া সম্ভব নয়।"[১]

'ছায়াছবি' ('সানাই') কবিতায় দেখা যায়, প্রথমে সামান্য একটু পরিবর্তনের পর সংগীত এবং কবিতা দু'টি রূপই যথাযথ আছে। শুধু 'হায়' শব্দটি গানের ক্ষেত্রে বাড়্তি, এটা সুরের ধুয়ার জন্য। কবিতার রূপটি—

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে। ['ছায়াছবি'—'সানাই']

গানে এই রূপই হয়েছে—

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!
বৃষ্টিসজল বিষণ্ন নিশ্বাসে হায়!!
['১২৪' সং—'বর্ষা'—'গীতিবিতান' ২য় খণ্ড]

কবিতার পঞ্চম ছত্রের শেষ শব্দটি 'ভাসে' গানে সপ্তম ছত্রে হয়েছে 'আসে'। অর্থের তফাত হয়নি, কারণ 'সন্ধ্যাদীপে'র লুপ্ত আলো তার স্মরণে আসতেও যেমন পারে, ভাসতেও পারে।

'বাণীহারা' ('সানাই') কবিতা তেমনি গানের সঙ্গে মূল ভাবের সঙ্গতি রেখে একেবারে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষলেখা' কাব্যের '৬' সংখ্যক গানটিকেও আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। 'শেষলেখা' কাব্যের '৬' সংখ্যকে যে রূপে আমরা এই গানটিকে পাই সেটি পূর্ববর্তী একটি কবিতার দুইটি পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে এসে সুরারোপিত হয়ে এমন অনবদ্য রূপ নিয়ে তাঁর প্রিয়জনের সম্মুখে হাজির হয়েছিল। কিন্তু এই কবিতাটির নিরেট কঠিন গাঁথুনিতে শব্দ-ছন্দ-ধ্বনির যে দীপ্তি এবং গাম্ভীর্য তা পূর্ববর্তী মানবের জয়গানমূলক একটি কবিতার এলিয়েপড়া ভাবের মধ্যে কিভাবে আত্মগোপন করে ছিল 'বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত গুরুদেবের 'পাণ্ডুলিপি' থেকে উদ্ধৃত প্রথম খস্ড়া রূপটির মধ্যে তার পূর্বপরিচয় পাওয়া যায়—

ঐ মানব আসে, মহামানব আসে
দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগে
সারা ধরণীর ঘাসে ঘাসে।

১। রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদক দেবী ভট্টাচার্য
॥ প্রবন্ধ ॥ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীত পাঠান্তর'—শ্রীসুধীর চক্রবর্তী [পৃঃ ২৯৮]

আজিকে বাতাসে ঘোষণা উঠিল
মহাজন্মের লগ্ন
অমাবস্যার নিবিড় আঁধারে
আকাশ আজিকে মগ্ন।
দানব পক্ষী অম্বর পথে
চালনা করিছে পক্ষ
মৃত্যুর বীজে কৃষির ক্ষেত্র
ভরি দিবে ছিল লক্ষ্য।
আজি জন্মের দিন
স্বর্গলোকের বিজয় পতাকা
ঐ হলো উড্ডীন।
থরথর করি ধরণী যখন
কাঁপিয়া উঠিছে ত্রাসে
উঠিয়াছে রব মাভৈঃ মাভৈঃ
মহামানব আসে!
মন্ত্রমুগ্ধ যন্ত্রের দল
তার চরণের কাছে
পাদপীঠ রচিয়াছে।
মহামানব আসে।
তিমির ভেদিয়া বিজয় পতাকা
উড্ডীন মহাকাশে।
কোথায় বাজিল শঙ্খ,
কোথায় বাজিল ডঙ্ক,
জয় মানবের জয় মানবের
বাজে কণ্ঠে অসংখ্য।

এই দীর্ঘ কবিতাটিকেও তাঁর প্রিয় ছাত্র শান্তিদেব ঘোষের অনুরোধে সুরারোপিত করতে গিয়ে স্বভাবতঃই কাটছাঁট করলেন কবি কিছু কিছু। এইভাবে এল পরবর্তী একটি পাঠ—

ঐ মহামানব আসে আসেরে
ঐ মহামানব আসে।

দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগে
ধরণীর ঘাসে ঘাসে,
বাতাসে বাতাসে ঘোষণা উঠিল
এল মহাজন্মের লগ্ন
আকাশ আজিকে মগ্ন।
এল শুভ জন্মের দিন
দিব্যদূতের আজি জয়যাত্রার পথে
কিরণ পতাকা উড্ডীন।
উদয়শিখর পথে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
ঐ মহামানব আসে
দ্যুলোক ভূলোক আজি জ্যোতি বিভাসিত
নবজীবনের আশ্বাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক
জয় জয় মানবের, জয় মহামানবের
বেজে ওঠে কণ্ঠে অসংখ্য।

দ্বিতীয় এই পাঠটিকেও সুর দিতে বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছিল অসুস্থ কবির, তাই আরও একবার কাটছাঁট করে শেষ পর্যন্ত স্বহস্তে লিখলেন 'শেষলেখা'র '৬' সংখ্যক কবিতাটিকে (গানকে)—

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ
নব জীবনের আশ্বাসে

জয় জয় জয়রে, মানব অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ২২শে বৈশাখ পর্যন্ত এটাই ছিল কবির নিজের স্পষ্ট শেষ গান। [এরও পরে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের অনুরোধে কবি 'পূরবী' কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির কাটছাঁট করে সুরারোপিত করে দেন—'হে নূতন,/দেখা দিক আরবার,'—এটাই কবির জীবনের শেষ রচিত সংগীত।]

এইভাবেই কবিতা থেকে বহু সংগীতের জন্ম হয়েছে। কোন্ কবিতা থেকে কিভাবে কোন্ গানের জন্ম হোল এবং কিভাবে একটি খস্‌ড়া রূপকে সম্মুখে রেখে একটি স্বতন্ত্র সংগীতের রূপ নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করলো তার ইতিহাস কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়—"পয়ষট্টি বছরের নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার ধারার যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে নূতন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি গানের জনপ্রিয়তা তর্কাতীত বলা চলে। এই দুটি গান ছাড়া রবীন্দ্র জন্মোৎসব অপূর্ণ থাকে। শেষ দুটি গানের জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথই তবু, এ-কথা স্বীকার্য যে কবিগুরুর একান্ত অন্তরঙ্গ পরম স্নেহভাজন রবীন্দ্রসঙ্গীতে আবাল্য অনুরাগী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের আকুল আগ্রহ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের শেষ গান দুটির জন্ম হয়তো সম্ভব হত না, অবিস্মরণীয় এই দুটি গান এখনও হয়তো কবিগুরুর দুটি কবিতার অন্তরালেই সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেত।"[১]

এমনি করেই পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপের জন্মান্তর ঘটেছে—খস্‌ড়ার সঙ্গে হয়তো বা তার মিল সামান্যই অথবা দুটি রূপই পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে দুই রূপে স্বীকৃত।

……"পাঠান্তর আসলে শিল্পের ক্রমবিকাশের সাধনা। শিল্পী পূর্ণতার তন্নিষ্ঠসাধক। কোন রচনার রূপান্তর তিনি যখনই করেন তখনই বুঝতে হবে প্রথম পাঠে এমন কোন অপূর্ণতা আছে যার ফলে কবির মনে প্রকৃত সুরটি বাজছে না। তাঁকে তাই কেবলই পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং সচেতন সংস্কার চেষ্টায় তাঁর রচনাটি ক্রমশই অভিপ্রেত পূর্ণতার পথে চলেছে। পাঠান্তরের প্রতিটি পর্যায়ই এই পূর্ণতার সাধনাচিহ্ন। সুযোগ্য অভিনিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সংগীত-পাঠান্তর আলোচনা করলে রবীন্দ্র-মানসের চঞ্চল সৃজনবেগের পরিচয় পাবো।…

১। 'দেশ'—সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৬
॥ প্রবন্ধ ॥ রবীন্দ্রনাথের শেষ দু'টি গানের জন্ম—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব [পৃঃ ১১]

……এই প্রবন্ধের পরিণামে তাই আমরা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যে পঞ্চাশটিরও বেশি কবিতার সংগীত পাঠান্তর করেছেন তা কবিমনের লঘুলীলা নয়, বরং সুনিবিড় বোধের সচেতন স্পর্শে অভিনব। পাঠান্তরের পরেও যে মূল কাব্যরূপটি রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেননি এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর পাঠান্তর বস্তুত শিল্পের ক্রমোন্নতিসাধক সংশোধন নয়। সমান্তরালভাবে যুগল পাঠকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে তিনি প্রকারান্তরে কবিতা ও সংগীতের মর্মগত বৈষম্য এবং নিগূঢ় অন্তর্মিলনের পরমগহন রহস্য নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রকবিতার সংগীত-পাঠান্তরকে আমরা এই শিল্পের দ্বিতীয় জন্ম বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে শিল্পের এই দ্বিজত্বসাধনে প্রথম আচার্য।"[১]

এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর 'পাঠান্তর' আলোচনার মাধ্যমে কবির রূপনির্মিতির খেয়াল-প্রসূত মানসিকতার একটি চিত্র আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, যা কাব্যের বিশুদ্ধ রসাস্বাদনে সহায়তা করে।

১। রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য
॥ প্রবন্ধ ॥ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীত-পাঠান্তর'—শ্রীসুধীর চক্রবর্তী ॥ পৃঃ ২৮৯, ২৯৮

ভূমিকা

কাব্যের 'বহিরঙ্গ' আলোচনার পর 'অন্তরঙ্গ' আলোচনার দ্বারা কবিমানসিকতার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। 'অন্তরঙ্গ' আলোচনা মানেই কাব্যের বিচিত্র 'ভাব-সম্পদে'র পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বরূপ বিশ্লেষণ। এক কথায় বলতে গেলে ভাবসম্পদের দিক থেকে 'প্রথম পর্যায়ে'র সঙ্গে 'শেষ পর্যায়ে'র কাব্যের বিশেষ কোনো তারতম্য নেই—কারণ কবিমানস সাধারণতঃ কাব্যের বিষয়বস্তু আহরণ করে জগৎ ও জীবন থেকে। তাই এই জগতেরই বিরাট বিমুগ্ধ প্রকৃতিলোক এবং দুজ্ঞের্য় মনুষ্যলোক কবির মানসপটে চিরদিনই বিচিত্র বর্ণের ছবি এঁকে চলে; শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিণত জীবনের মননশীল সূক্ষ্ম জীবনদর্শন, বিচিত্র এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণক্ষমতা এবং অন্তর্দৃষ্টি। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র এই পরিণত মননশীল জীবনচেতনাই 'প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলি' থেকে তাঁকে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে।

'ভাবসম্পদে'র বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনার পূর্বে, সামগ্রিক দৃষ্টিতে কবির শিল্প-সাধনার মূল তাৎপর্যটিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়—তাঁর সমগ্র জীবনের শিল্পসৃষ্টি এবং কর্মকীর্তির মধ্যে একটি পরিপূর্ণ বা সামগ্রিক জীবনবোধকে রূপ দেবার চেষ্টা গোপনে কাজ করে চলেছে। শুধু একটি পূর্ণতর সুন্দরতর জীবনের স্বপ্নই দেখেননি তিনি; কিভাবে তাকে সত্য এবং সুন্দরের সাধনার মধ্যে দিয়ে সার্থক করে তোলা যায়, তারও চেষ্টা আজীবন করে গেছেন। "রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম আবেগ, কবিধর্ম যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছে, যেভাবে কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা চিরাচরিতের অনুসরণ বা তপস্যালব্ধ বোধির সাহায্যে নয়। তার প্রধান উপাদান ও উপজীব্য একটি অত্যাশ্চর্য অতিসূক্ষ্ম মেজাজ, 'জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে-বাঁধা মন নিয়ে' (আকাশপ্রদীপ, পৃঃ ১০)। সেই সূক্ষ্মতা সাধারণ কাব্যপাঠকের নাগালের মধ্যে কিনা সন্দেহ করার অবকাশ আছে।"[১] তাঁর জীবনবোধ ও কর্মসাধনা কারও কাছে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস—কারও কাছে মিথ্যে আদর্শের পিছনে ধাবিত হওয়া মাত্র; অর্থাৎ মানুষের জীবনে এর কোনো প্রতিফলন নেই,

১। ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ—"রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য"—[প্রথম প্রকাশ: ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৮] 'জন্মদিনে-শেষলেখা' [পৃঃ ২৩৫]

একটা মিথ্যে মায়ার পিছনে মাথা কুটে মরা। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে, তাঁর কোনো একটি খণ্ড কবিতা বা কাব্যগ্রন্থকে কিংবা কোনো একটিমাত্র রচনা বা শিল্পকর্মকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলেই তাঁর মতবাদ বা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নানা রকম মন্তব্য করা সহজ হয়। কিন্তু সমগ্র মানবের সাধনা চিরন্তন কাল ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, মানবের বিভিন্ন চেষ্টা, কর্ম ও জ্ঞানের সাধনায় যে পরিপূর্ণ জীবনবোধকে রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে—সেই সত্য সুন্দর জীবনসাধনার বাণীটিকেই কবি তাঁর কাব্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। আপন জীবন দিয়ে তার একটি বাস্তব রূপও তিনি এঁকেছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক—"Rabindranath Tagore now stands before us as the embodiment of Intellectualism and Free Thought, of Universalism which links itself up to the Eternal varieties of human life, as well as of a Supreme Feeling for Beauty and sense of the Ultimate Reality. His life and life's work in literature and in so many other spheres showed all this—it was an expression of an uncomm n type of Activity of Thoughts."[১]

মানুষের অপূর্ণ এই সংসারে দুঃখ, দৈন্য, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা—প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত এই মানব সমাজ সত্য এবং সুন্দরের স্বপ্নই তো কেবল দেখে চলেছে; কত অপূর্ণতা, কত অক্ষমতা নিয়েই না আমরা জীবনের পঙ্কিল পথে চলি। কত ইচ্ছাকেই তো আমরা রূপ দিতে পারি না, কত অতৃপ্তিকেই বক্ষে পুষে রাখি, কত অন্যায়কে স্বীকার করে নিই টিকে থাকার দুর্বার তাগিদে; কিন্তু ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে;—সুন্দরকে আমরা সকলেই ভালোবাসি, সত্যকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, কল্যাণকে আমরা প্রত্যেকেই রূপ দিতে চাই আমাদের জীবনে! কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সঙ্কুল জীবনযুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার দুরূহতায় তাকে তো রূপ দিতে পারি না। সত্যকে, শ্রেয়কে, পূর্ণতাকে মূল্য দেবার জন্য জীবনের যে কোনো আপাত ক্ষতিকে বরণ করে নিতে পারি না;—জয় হয় অপূর্ণতার, জয় হয় বিকৃতির, অমঙ্গলের। কিন্তু মানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাটি তা বলে মরে যায় না, শেষ হয়ে যায় না। যে সত্যকে, সুন্দরকে, পূর্ণতাকে আমরা আমাদের জীবনসাধনায় রূপ দিতে পারিনি, ফুটিয়ে তুলতে পারিনি, তার প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকে। আর যে সংসারের দুঃখ-গ্লানি-বাধা-বিপত্তি আমাদের পরিপূর্ণ

১। Dr. Suniti Chatterjee : "World Literature and Tagore"—[Published : May 1971] [Page 150]

মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত হতে, প্রকাশিত হতে সহায়তা করেনি তার প্রতি একটা অনিবার্য অভিযোগ আমাদের মানসিকতাকে গ্রাস করে ফেলে ; এর ফলেই আসে সংসারের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা-অভিমান, মানুষের প্রতি, এমনকি নিজেরও প্রতি একটা অবিশ্বাস, এবং নিজের ভাগ্য ও সংসারের আর পাঁচজনের প্রতি অন্যায় অভিযোগ ! কবি বা শিল্পী সমাজের এবং মানবজীবনের এই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছবি এঁকে চলেন। যে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে আমরা তার কোনো মূল্যই স্বীকার করি না, তাকেই অমূল্য করে তোলেন আপন প্রতিভার জাদুস্পর্শে অনির্বচনীয় শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে। অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছও তাঁর কাছে হয়ে ওঠে দুর্লভ প্রাণসম্পদে ভরপুর। পৃথিবীর সামান্য তৃণলতা থেকে সাধারণ মানুষের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ জীবনবোধও তাঁর ভাষায় প্রাণ পেয়ে ধন্য হয়ে ওঠে। খণ্ড, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, মরণশীল জীবনকে এইভাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় এই মর্ত্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু থেকে আরম্ভ করে আমাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনা সবকিছু মূল্যবান হয়ে ওঠে।

অনিত্য এই সংসারে ধাবমান কালের বুকে মানুষ ভেসে চলেছে কুটোর মত। ক্ষণকালীন জীব-জীবনকে যতই মূল্যবান করে তুলি না কেন—আপন স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাচীরে, মহাকালের কপোলতলে একদিন সবকিছুই মিলিয়ে যাবে। কোনোকিছুই সত্য হয়ে চিরকাল টিকে থাকবে না, তাহলে এর মধ্যে সত্য কতটুকু ? কি নিয়ে মানুষের গৌরব ? কাকে সে স্থায়িত্ব দেবে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করে ? কবিমনে সে প্রশ্ন চলে সারাজীবন ধরে। এ সংসারের ধ্রুব সত্যটি কোন্‌খানে, কবি সেই রহস্য উদ্ঘাটনেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সমগ্র জীবনের সাধনলব্ধ সত্যটিকে ভাবে-ছন্দে গেঁথে রেখেও গেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের শিল্প-সাধনায় সেই পরম সত্যটিই বাঙ্ময় বা বাণীময় হয়ে জীবন্ত মূর্তি ধারণ করেছে। সেই সত্যটি হোল, তুচ্ছ এই মানব-জন্মকে অস্বীকার করা নয়, এর রসমাধুর্যে জীবনকে কানায় কানায় ভরপুর করে জীবনের অমৃতমাধুর্যকে ভোগ করা। যেহেতু কোনো ঐশ্বর্য, সম্পদ, সম্মান, সুখ কোনো কিছুকেই একান্তভাবে ধরে রাখা যাবে না, তাই কোনকিছুর পরে অতিরিক্ত মোহ থাকা উচিত নয়। পার্থিব ভোগসুখ বা লাভালাভকে আমরা যেন অতিরিক্ত মূল্যদান না করি। এই জীবনে চলার পথে যে সব পথিক-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল তাদের ভালোবেসে, ভালোবাসা দিয়ে জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে জীবনের আনন্দ-রসটুকুকে যেন নিঙ্‌ড়ে নিতে পারি। এর জন্যে প্রয়োজন একটি নিরাসক্ত মন , জগৎ এবং জীবনকে নিরাসক্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখে তার প্রতিটি দেনাপাওনার হিসাবকে যেন আনন্দের সঙ্গে চুকিয়ে দিতে পারি। ক্ষণকালীন এই মানবজন্ম তুচ্ছ নয়, কালের ইতিহাসে মানবের একটি চিরন্তন রূপ আঁকা

হয়ে গেছে, সেখানে মানবের অপরাজেয় মহিমা স্বীকৃত। এই কালের ইতিহাসে আমি তুচ্ছ হয়েও তুচ্ছ নই, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে সবারই নিমন্ত্রণ' আছে—'আমায় নইলে মিথ্যে হোত সন্ধ্যাতারা ওঠা, মিথ্যে হোত কাননে ফুল ফোটা'—কাজেই এই 'আমি' যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হই না কেন, এ সংসারে আমারও সামান্য চেষ্টা, সামান্য কর্ম, সামান্য হাসি-কান্না-বিরহ-মিলনের মূল্য আছে। সেই মূল্যটুকুর কথা ভেবেই আমরা যেন জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি, পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল্যকে শিল্পী তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধ দিয়ে এইভাবে মূল্যবান করে তুললেন। দুঃখ-মৃত্যু-অমঙ্গল-গ্লানির মধ্যে জীবনের সত্য এবং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কবির ভাবব্যঞ্জনায় যে অনির্বচনীয় অ-লৌকিক সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধের জন্ম মানুষের চরম পরিপূর্ণ জীবনবোধে—সেই অসীমের সঙ্গে সীমিত এই জীবনধর্মকে মিলিয়ে দেবার সাধনায় মগ্ন হলেন—'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে সংসারে কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় কোথায় এ সম্পর্কে কবি সুন্দর আলোচনা করেছেন···"কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপরে ব্রহ্মলাভের কথা; সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

···মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন ও সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

······সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই, সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।"[১]

ঔপনিষদিক শিক্ষায় ও সাধনায় দীক্ষিত এই জীবন জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার

১। রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড [শতবার্ষিক সং]: "ধর্ম"—প্রবন্ধ 'ততঃ কিম্'—[পৃঃ ৮২, ৮৩]

ক'রে অপার্থিব কোনো সাধনপথের কথা বললেন না, তুচ্ছ, ক্ষণিক জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব সেই সার্থকতার ইঙ্গিতটুকুকে ধ্বনিত করে দিয়ে গেলেন আপন চেষ্টা-চিন্তা-কর্ম ও জীবনসাধনায়। তাই তিনি কবি হয়েও 'ঋষি'—'ঋষি' হয়েও 'জীবনশিল্পী'। "রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, "কবীনাং কবিতমঃ"। তাঁহার মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে দুঃখে-সুখে জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান্ জীবনভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই।"[১] আমাদের সীমিত এই জীবনবোধে তাঁর জীবনসাধনার মর্মবাণীটিকে হয়তো পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সার্থক করে তুলতে পারি না, কিন্তু সেই অমূল্য অনুভবটিকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য মাধুর্যের চরম ক্ষণটুকুকে তিনি যে তাঁর অনুভবে ধরতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অনবদ্য শিল্পসাধনায় তাকে যে সার্থক করে নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন—সে প্রকাশ চিরকাল মানুষের মনে বিস্ময় জাগাবে। মানবমনের গভীর রহস্যলোকের এই বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার 'ভাবসম্পদে'র মধ্যে সংগুপ্ত হয়ে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনায়। সামগ্রিকভাবে তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদে এই বাণীটিই লুকিয়ে আছে—'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র ভাবসম্পদে সেই বাণীই চরম পরিণতির মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ করেছে—ভাবসম্পদের বিভিন্ন রূপের ধারায় তারা হয়েছে রূপায়িত—এই যা পার্থক্য।

'ভাবসম্পদে'র দিক থেকে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' দু' একটি নূতন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—তা হোল আত্মচেতনামূলক ও অতীত স্মৃতিচেতনামূলক রচনা। দীর্ঘ কবিজীবনে জগৎ ও জীবনকে শিল্পীর দৃষ্টিতে নানাভাবে তিনি দেখেছেন; সঞ্চয় করেছেন দীর্ঘ এই জীবনের কাছ থেকে অপরিসীম বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দূর থেকে তাই যেন তার সমস্ত রসটুকুকে—মায়াটুকুকে—ছায়াটুকুকে—আজ রেখে রেখে চেখে চেখে অনুভব ক'রছেন। তাই এই জগৎ-জীবন-সৃষ্টি, প্রকৃতির রূপ-রস-মাধুর্য এবং মানবজীবনের চেষ্টা-কর্ম-জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনছন্দের দোল্, আজ তাঁর কাছে স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে। স্বীয় জীবনের অনেক সুখময় সুমধুর স্মৃতিকে তাই যেমন স্মরণ ক'রেছেন, তেমনি জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জীবনদর্শন 'আত্মচেতনা'মূলক অনেকগুলি কবিতায় রূপ পেয়েছে। 'শেষপর্যায়ে'র এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে শিল্পীর চোখ দিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমরা জীবনকে যেমন বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখি, তেমনি তার সত্য-সুন্দর-রসমাধুর্যটুকুও আমাদের অপার্থিব আনন্দের স্বাদ এনে দেয় এই জীবনের প্রতি।

১। শ্রীসুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) [৩য় সং ১৩৬৮, প্রথম পরিচ্ছেদ—ভূমিকা পৃঃ ১]

মানুষের চিরন্তন মহিমাটুকুকে তিনি যেন নিজের জীবন দিয়ে প্রকাশ করে গেলেন—প্রচার করে গেলেন—ব্যাখ্যা করে গেলেন—

"এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাইরের নিয়মকে ইচ্ছা করে—তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তাহলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

……এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো. এইজন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করেনি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে।"[১]

এইভাবে মানবমনের গভীর জীবন জিজ্ঞাসাই তাঁর 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র নানা রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। জন্ম, মৃত্যু, কর্মবাদ, সবকিছু কবিমনে দার্শনিকের ন্যায় বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছে, কবি কাব্যের আধারে সেই জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। জীবনের স্থায়ী সত্যবোধ তাঁর মনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সাময়িক ক্লান্তি বা জীবনের গ্লানি—সংঘাতময় জীবনতরঙ্গ তাঁর মনেও সাময়িকভাবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এনেছে; হতাশা, ক্লান্তি-বিষাদ-সন্দেহ প্রশ্ন তুলেছে নানাভাবে বারেবারে; সত্য সুন্দরের প্রতি কবিমনের স্থায়ী বিশ্বাস বুঝি বা টল্‌মল্ করে উঠেছে;—সমালোচকরা অনেকেই যে মানসিকতাকে কবির স্থায়ী জীবনবোধের পরিপন্থী বলে ব্যাখ্যা করতে ছাড়েন নি। কিন্তু কর্মক্লান্ত, দুঃখ-বেদনায় পীড়িত, শোকে মৃত্যুতে জর্জরিত কবিমানসের

১। রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড [জন্মশতবার্ষিক সং]: প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতন'—১৩ 'কর্মযোগ'—[পৃঃ ৩৮৫, ৩৮৭]

এই সমস্ত সাময়িক সংশয় বা জীবনজিজ্ঞাসাকে অবশ্যই তাঁর স্থায়ী জীবনবোধ ব'লে ব্যাখ্যা করা বা ঘোষণা করা চলে না; কিংবা বার্ধক্যে রোগজীর্ণ শোকসন্তপ্ত কবি নূতন বিশ্বের যে দ্রুত পরিবর্তনকে দেখেছিলেন তাতে করে তাঁর জীবনের সত্য-সুন্দরের প্রতি একান্ত নিষ্ঠায় ফাটল দেখা দিয়েছিল একথাও বললে পরে তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়। সংসারে পথ চলতে চলতে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে মানবমনে যে বিচিত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তারই একটি স্পষ্ট ছবি রয়ে গেছে তাঁর 'শেষপর্যায়ে'র বিভিন্ন রচনায়। এই সমস্ত সাধারণ মানসিকতাকে, সূক্ষ্ম জীবনবোধকে, এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে এমন করে তিনি যদি রূপ না দিতেন তাহলে মানবজীবনের যে মহান ইতিহাসকে তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন সে চেষ্টা তাঁর সম্পূর্ণ হোত না। আমরা একজন ধর্মোপদেষ্টা শুদ্ধচিত্ত মহান ঋষিকে হয়তো পেতাম, কিন্তু 'জীবনরসিক' কবি-ঋষিকে পেতাম না। দুঃখে-দৈন্যে-রোগে-শোকে-তাপে-অনুতাপে-সংশয়ে-বেদনায় পীড়িত মানবের মুক্তি কোথায়—জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা কোথায়, সেই সত্যটি কে ঘোষণা করতো?

(১) 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র 'আত্মচেতনামূলক' কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে কবিমনের আজীবন জীবনজিজ্ঞাসাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; এর মধ্যে দিয়েই জীবনের সত্য মাধুর্যরসটুকুকে যেন চিনিয়ে দিয়ে গেলেন কবি। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই জীবনবাণীর সাধক তিনি—একথা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। উপনিষদের ঋষির ন্যায় জীবন ও জগতের মর্মকেন্দ্রটি থেকে জীবনসত্যকে উদ্ঘাটিত করে চলেছেন, সেই সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন ছন্দ-ভাব-ভাষার অপূর্ব বাণীসুষমায়।

'ভাবসম্পদে'র দিক থেকে এ ছাড়া 'অধ্যাত্মচেতনা' ও 'মর্ত্যচেতনা' প্রাধান্য পেয়েছে।

(২) কবি-মন 'অধ্যাত্মলোক' সম্বন্ধে আপন মনের ধ্যান-ধারণায় অলক্ষ্য স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখে, তাকে স্বীয় জীবনবোধের মাধ্যমে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করে। কবির অধ্যাত্মবোধ কোনো বাঁধাধরা সংস্কার মেনে চলেনি। উপনিষদের শিক্ষায় এবং সাধনায় দীক্ষিত এই জীবন সমস্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আপন আত্মার আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠেছে।

(৩) এছাড়া আছে এই বিশাল বিরাট 'মর্ত্যলোক'—যা 'শেষপর্যায়ের কাব্যগুলি'র বহু কবিতার 'ভাবসম্পদ' যুগিয়েছে। এই মর্ত্য পৃথিবীর একদিকে রূপ-রসে-ভরা সৌন্দর্যে মাধুর্যে লীলামধুর প্রকৃতি, অপরদিকে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনায় ভরা মর্ত্যমানবের জীবনতরঙ্গ—দু'য়ের আকর্ষণই কবিমনে প্রবল। মানবলোকের জীবনতরঙ্গও

প্রবাহিত হচ্ছে বিচিত্র জীবনছন্দে···প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা—জন্ম-মৃত্যুর লীলা-বৈচিত্র্যে !

এই সমস্ত উপাদানের দিক থেকে 'প্রথমপর্যায়ে'র সঙ্গে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র হয়তো খুব বেশি তফাত লক্ষ্য করা যায় না, কারণ এই জগতের দিক থেকে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজ অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে ; এদের আশ্রয় করেই চিন্তারসে জারিত হয়ে কবিমনে জাগ্রত হয় বিভিন্ন জীবনবোধ ও উপলব্ধি। বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি এবং জীবনচেতনায় অনেক গাঢ়ত্ব এসেছে।···সেই হেতু শিল্পিমানসের একটি ক্রমপরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ জীবন-দর্শনের অভিজ্ঞতায় আপন চেতনায় এবং উপলব্ধিতে এর একটি ঘনীভূত রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

কাজেই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক স্থানে এক হলেও কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, মনন এবং জীবনদর্শনের গভীরতায় জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-অধ্যাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুস্পষ্ট সরল অথচ গভীর এবং ব্যাপক এবং কাব্যকে এ স্বাতন্ত্র্যও দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য—তাঁর মননশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে, তাঁর গভীরতায়, তাঁর উপলব্ধির আত্মস্থতায় এবং ব্যাপক জীবনদর্শনে—কিন্তু মূল চিন্তা বা চেতনার ক্ষেত্রে কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। আসলে "শেষ দশ বছরের রচনায় রবীন্দ্রপ্রতিভা এমন অমোঘ, এমন দুঃসাহসিক যে, কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ, আচারের বাধা, গণ্ডির বেড়া মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি ; পদ্যে এনেছেন গদ্যের ঋজুতা, গদ্যে জাগিয়েছেন পদ্যের স্পন্দন, বোধিকে করেছেন বেদনাময়, তত্ত্বকে করেছেন প্রাণস্পন্দিত। বেদ-উপনিষদের, বাইবেলের, রুমীর মস্‌নবীর, হাফিজের গজলের শ্রেষ্ঠ অংশ যেমন শুদ্ধ কবিতা হয়েও শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনার শ্রেষ্ঠ ভাগও তেমনি কবিতার চেয়ে বেশী হয়েও কবিতার চেয়ে কম নয়।"[১] শেষপর্যায়ের কবিতার বিচার বা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্যকে যথার্থ বলেই ধরে নেওয়া যায়। কবি-শিল্পীর সঙ্গে সত্যদ্রষ্টা ঋষির এমন আত্মিক যোগ এ পর্যায়ের কাব্যসম্পদকে অনেক স্থানে অত্যাশ্চর্য মহিমায় ভূষিত করেছে। 'ভাবসম্পদের' বিভিন্ন দিকের আলোচনা থেকে এই সত্যটিই উদ্‌ঘাটিত।

১। শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব—"আধুনিকতা" ও রবীন্দ্রনাথ" [সং—এপ্রিল ১৯৬৮] ॥ অন্তিমপর্বের দুটি কবিতা ১ ॥ [পৃঃ ২৩৮]

॥ ১ ॥

আত্মচেতনা

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' 'আত্মচেতনামূলক' কবিতার সংখ্যাই খুব বেশি করে চোখে পড়ে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেলায় কবির অনুভবকে নানা বর্ণের বর্ণসুষমায় ধরে রেখেছে এরা। এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে কবিকে আমরা খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি।

"পরিশেষে" কবিমনে সব ছেড়ে যাওয়ার একটি করুণ বেদনার অনুরণন ক্ষীণ তারে বেজে উঠেছিল……এ বেদনা দীর্ঘকালের মর্ত্যপ্রীতিসঞ্জাত। এতদিনের রূপে ভরা, মাধুরীতে ভরা যে পৃথিবীর লীলাবৈচিত্র্য কবিমনকে ভরিয়ে রেখেছিল—তার স্নেহে-প্রীতিতে-আদরে-সোহাগে, তাকে চিরতরে ছেড়ে যাবার বেদনা। কবির রোমান্টিক মন জীবনকে ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে জীবনের অমৃতময়-লীলারঙ্গরসকে—তার দুঃখে-সুখে হাসি-কান্নায় বিজড়িত জীবনছন্দকে। মানবিক দিক থেকে এই মর্ত্যমাধুরী কবিমনকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বহির্জগতের প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-ঘেরা সৌন্দর্যলোকও কবির শিল্পিসত্তাকে করেছে আকুল। কবি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে এ জগতের রূপ-রস-ছন্দ-ধ্বনিকে ধরার চেষ্টা করেছেন আপন জীবনবীণার বৈচিত্র্যমুখর তারের ঝঙ্কারে। আর সেই সঙ্গে আপন 'জীবনদেবতা' অর্থাৎ শিল্পিসত্তা বা স্রষ্টাকে অনুভব করেছেন তার নানা কাজে নানা প্রেরণায়। বৃহত্তর অর্থে এই 'বিশ্বপিতার' অনিবার্য ইঙ্গিতের গভীর স্পর্শকে যেমন অনুভব করেছেন আপন কর্মে, আপন চেতনায়—তেমনি এ জগতের আকাশে-বাতাসে-তারায়-আলোয়, শ্যামল মাটির ঘাসে ঘাসে। এই যে আপন চৈতন্যলোকের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সহজ স্বাভাবিক সচল জীবনছন্দকে মিলিয়ে দেখা—এর ফলে কবিমনের অনুভবের ক্ষেত্রে জেগেছে এমন একটা বিশ্বচেতনা যার ফলে 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—তার ভয়ঙ্করত্ব হারিয়ে হয়ে উঠেছে অপূর্ব এক বেদনা-বিধুর, সুন্দর অথচ একই কালে গভীর আর গম্ভীর। তাই দেখা যায় 'পূরবী'র 'শেষ রাগিণীর বীণে' যে সুর করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—'পরিশেষে' এসে তাই বেজে উঠেছে আরও উদাত্ত রাগিণীতে। 'পুনশ্চে'র কোনো কবিতার মধ্যেই পূর্ববর্তী 'পূরবী' বা 'পরিশেষে'র বিদায়লগ্নের ম্লানচ্ছায়া করুণ রাগিণীর সুরমূর্চ্ছনায় ধরা পড়েনি, বরং কবিমনের এক সদ্যোজাত জীবনীশক্তির ছাপ বয়ে এনেছে এ কাব্যের প্রাণচঞ্চল কবিতাগুলি। কিন্তু 'পুনশ্চে'র পরবর্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে এই ভাবের কবিতাগুলি।

জীবনসায়াহ্নে এসে কবি একবার দার্শনিকের, জীবনরসিকের দৃষ্টিতে জীবনকে, জগৎকে নূতন করে অনুভব করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দার্শনিক কবির সূক্ষ্ম মনন, জীবনদর্শন, গভীর আত্মোপলব্ধি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শিল্পিমানসের এই জীবনলীলারঙ্গরসের যে বিচিত্র অনুভব, সুখে-দুঃখে স্নেহে প্রেমে জড়িত এই জীবনের প্রতি যে গভীর এবং একান্ত ভালোবাসা এবং অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে ফিরে তাকানো, ফেলে-আসা জীবনের রূপ-রস-সৌন্দর্য-মাধুর্যকে যে একান্ত করে অনুভব—তার জন্যে কবিমনের যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে,—সেই কথাই এই সমস্ত 'আত্মচেতনামূলক' কবিতাগুলির 'ভাবসম্পদ' যুগিয়েছে। বর্তমানকেও কবি তাঁর রূপের-রঙের-রসের তুলিতে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু সেখানেও এক দার্শনিক শিল্পীর অনাসক্তভাবে একের পর এক ছবি আঁকার বাসনাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে কবির মন এখানে অন্তর্মুখী—আত্মমগ্নহৃদয়ের একান্ত গোপন ভাবনা-কামনার কথা বলে চলেছেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে।

"শেষসপ্তক" কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি জীবনকে গ্রহণ করেছেন সীমার কোটিতে দাঁড়িয়ে অসীমের মহা ইঙ্গিতময় ঔদার্যের মধ্যে। সৃষ্টির এই যে আবর্তন বিবর্তন—এর বুকে দাঁড়িয়ে কবি সেই পরম দেবতার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে কবির আপন মনের সহজ স্বাভাবিক গতির কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির শিল্পিমানসের চাওয়া-পাওয়া ভাল-মন্দবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-মিলনের তাপ-অনুতাপ যে আর দশজনের মতো নয় এ সম্বন্ধে কবিও সচেতন। এই চিরকিশোর রোমান্টিক মনটি 'জীবনপথে' চলে 'চিরপথিক' হয়ে, সে মন বলে—'হালকা আমার স্বভাব···গিরিনদীর মতো'। কিন্তু এই অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া····প্রাণ যার 'দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ' 'রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখ-সুখের বন্ধুর পথে'—সে মন 'ভিড়ের কলরব পেরিয়ে' শোনে 'গানের আহ্বান'—খোঁজে তার সত্য। তাই 'যৌবনের প্রান্তসীমায়' জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার যে ম্লান অবশেষ তার আবেশটুকুকে কাটিয়ে দিয়ে বলেন—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
* * *
আপনাকে মিলিয়ে নেব
* * *
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে। [শেষসপ্তক-৪ সং]

'সাত' (শেষসপ্তক) নম্বরে তাই নটরাজের নিকট প্রার্থনা করেন—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
*   *   *   *
দাও আমাকে আশ্রয়।

এই 'জীবন আর মৃত্যু' পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে 'অক্ষুব্ধ শান্তির সন্ধান'—বোধকরি এই অমৃতের সন্ধানই আজীবন তিনি করে গেছেন। নটরাজের কাছ থেকে শক্তি, বীর্য, সত্য এবং শান্তি ও ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে মোহহীন বৈরাগ্যের আদর্শে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। অথচ এই মর্ত্য পৃথিবীর এবং তুচ্ছ মানবজন্মের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-ধ্বনিও তাঁকে হাতছানি দিয়েছে…উন্মনা করেছে…কবি তার অব্যক্ত সুর, অশ্রুত ধ্বনি—অলক্ষ্য রূপসৌন্দর্যের ইঙ্গিত আপন অন্তরে অনুভব করেছেন রেখে রেখে—চেখে চেখে। "রবীন্দ্রনাথ শুষ্ক সন্ন্যাসী ছিলেন না, জীবনের ভোগ যাহা হাতের কাছে অনায়াসে পাইয়াছেন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু কখনো কোন কিছুতে লোভ করেন নাই। ত্যাগের ধৈর্যের ও সংযমের শিক্ষা তাঁহাব শিশুকাল হইতেই"।[১]

ত্যাগ এবং ভোগের এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই তাঁর কাব্যসাধনার মূল বাণী। 'শেষ সপ্তক' কাব্যের 'চার', 'পাঁচ', 'ছয়', 'সাত', 'আট', 'বার', 'উনিশ', 'বাইশ', 'ছাব্বিশ', 'চৌতিরিশ', 'পঁয়তিরিশ', প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবিমনের এই সমস্ত ভাবনা বেদনাই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে কবির এই জীবনপথের পথিক হয়ে সহজ আনন্দে মর্ত্যপৃথিবীকে 'ভালোবেসে' যাবার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। একদিন যখন 'বয়স ছিল কাঁচা' কবির কাছে—

'তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা',
আধজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ;

[উনিশ সং—শেষসপ্তক]

কিন্তু সংস্কারময় এই মনটাও সংসারের অনেক লাভ-ক্ষতি-দুঃখ-বেদনার সঙ্গে দীর্ঘ জীবনপথে নানা বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়ে। আজ জীবনশেষে কবির সংস্কারমুক্ত মন

১। শ্রীসুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [৩য় খণ্ড] [৩য় সং ১৩৬৮]
[প্রথম পরিচ্ছেদ—ভূমিকা (১১) পৃঃ ২১]

আত্মার মুক্ত স্বরূপটিকে চিনে নিতে চায় এই অহংবোধকে কাটিয়ে।—'বাইশ সংখ্যাকে' বলেন—

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
* * *
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক্ হব আমরা।

কবির জরাহীন, মৃত্যুহীন 'আমি'কে ও যেন জয় করে নিয়েছে। আজ তাকে অস্বীকার করেই কবি বলেন—

আমি আজ পৃথক্ হব।
ও থাক ঐখানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
* * *
জন্ম মরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি। ['বাইশ' সং—শেষসপ্তক]

সংস্কারমুক্ত আত্মার স্বরূপটিকে কবি আজ স্বতন্ত্র করে নিতে চান জীবনের সমস্ত অকিঞ্চনের মধ্যে থেকে। ঐ কবিতারই শেষে কবির সেই আকাঙ্ক্ষা—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
* * *
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা। [ঐ]

কাঁচা মনের 'অপরূপের রাঙা রঙটা' এমনি করে জরা-মৃত্যু-বার্ধক্যে জড়িত হিসাবী মনটাকে সরিয়ে দিয়ে মুক্তি খোঁজে আকাশের অনন্ত অবকাশের মাঝে। কিন্তু কবি-মনে মুক্তি কোথায়? সংসারের নানা ভারে পীড়িত তাঁর চিত্ত গেয়ে ওঠে—

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;

[ছাব্বিশ সং—শেষসপ্তক]

তাই 'বনস্পতি'র সম্মুখে এসে রোজ সকালে বিকেলে কবি বসেন। তার— 'শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে' চান তাঁর 'বাণী'। সেই 'বাণী' হোল—

এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে

* * *

জীবনের শেষ বাণীতে হ'ক উদ্ভাসিত—
'ভালোবাসি'। (ঐ)

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে ভালোবাসার এই শাশ্বত বাণীমন্ত্র কবি গ্রহণ করেন আপন জীবনের দীক্ষামন্ত্র হিসাবে।…আপন মনের সেই অমৃত মাধুরীকে ছড়িয়ে দেন আকাশে-বাতাসে-লোকে-লোকান্তরে—জীবনের সহজ আনন্দে-দুঃখ-সুখের ভাবচ্ছন্দময় লীলামাধুর্যে।

জীবনপথের 'পথিক' তিনি। পথ চলতে চলতে দেখেন ইতিহাসের বুকে কত দেশের কত উত্থান পতন! কালের বুকে কত কীর্তি আজ অবলুপ্ত—কত 'দর্পোদ্ধত' অহংকার আজ 'সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত'—

পথিক আমি।

* * *

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,

* * *

হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

[চৌত্রিশ সং—শেষসপ্তক]

কিন্তু 'এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে—' কবি আপন 'হৃৎস্পন্দনে' 'অনুভব' করেন অসীমের শুদ্ধতা। সুতরাং এই অনিত্যের মাঝে, সীমার মাঝে, খণ্ডরূপের মাঝে, শাশ্বত-অসীম-অখণ্ড সত্যের সন্ধানই কবি করে চলেন—

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

[পঁয়ত্রিশ' সং—শেষসপ্তক]

এই 'দেহের অতীত' সত্য শাশ্বত কথাকেই কবি খুঁজে ফেরেন অনিত্যের মধ্যে—বন্ধনের মধ্যে—তুচ্ছতার মধ্যে। কবিমনে প্রশ্ন জাগে—

ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্‌খানে ?

['পঁয়ত্রিশ' সং—শেষসপ্তক]

'পঁয়তাল্লিশে'র মধ্যে কবির এই জীবনব্যাপী প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা দেখা যায়, তাঁর ঔপনিষদিক সাধনায় পুষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধ সত্যের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে—তাঁর সমস্ত জীবনসাধনার যে স্বপ্ন হাসি-কান্না-দুঃখ-সুখের লীলাবিলাসের সঙ্গে অসীমের অমৃত সৌন্দর্যময় বাণীর সুসমন্বয় খুঁজেছে এই মর্ত্য পৃথিবীর বুকে, তা যেন এতকাল পরে সমে এসে পৌঁছেচে ভারতীয় ঋষির অকৃত্রিম জীবনসাধনার মর্মবাণীতে।

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখ-দুঃখের ঐ সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।

['পঁয়তাল্লিশ' সং—শেষসপ্তক]

এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি বলেন—

শেষ কথা ব'লে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি। [ঐ]

জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করে তাই বলেন—

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল,
তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্ করছে
* * *
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

['আট' সংখ্যক—শেষসপ্তক]

'ছয়' (শেষসপ্তক) সংখ্যকেও বলেন—

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি,
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।

এইভাবে দিনের প্রান্তে গোধূলির ঘাটে এসে কবির শিল্পিমন পিছন ফিরে জীবনের চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশকে মানবিকতার সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। এ জীবনের কত টুকরো দেখা,—কত ক্ষণিক পাওয়া, কত চঞ্চল পলাতক মুহূর্ত, কত তুচ্ছ দেওয়া-নেওয়া, কত গভীর তাৎপর্যে ভরে উঠেছে কবি-প্রাণ।

কাল কোনো কিছুকেই ধরে রাখে না; তার বুকে বর্তমানের সমস্ত ফলশস্যই মহাঅতীতের ছায়ার বুকে একদিন মিলিয়ে যায়—সেই অতীতের পালানো স্বপনের সঙ্গে কবির নিরাসক্ত চিত্ত আজ মিতালি পাতায়। 'বীথিকা' কাব্যে কবিমনের আত্মভাবনা এইরূপে নানা ভাবনার ইন্দ্রজালে সমুজ্জ্বল। খণ্ড জীবনের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ কবির কাছে আজ ছবি হয়ে ধরা দিচ্ছে। 'অতীতের ছায়া' (বীথিকা) কবিতায় 'অতীত'কে লক্ষ্য করে বলছেন—

আজ আমি তোমার দোসর,
* * *
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
* * *
ঘুচিল কর্মের দায়,
ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো।

কবি কর্মের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সংসারের তাপ-অনুতাপকে অপগত করে মনকে সর্ববন্ধনমুক্ত করে নিতে চান। অথচ এ সংসারে মানুষের অহংবোধ এত

প্রবল যে, এই মাটিকে আঁকড়ে ধরে তারা শাশ্বত সত্য বলে। এই 'মাটি'র বুকে যুগে যুগে কত যাত্রী আসে দলে দলে—আপনার কালকে পিছনে ফেলে চলে যায় তারা, সরে যায় তারা নেপথ্যে। 'মাটি' কবিতায় কবি মানুষের জীবনের এই নির্মম সত্যটিকে রূপ দিলেন সুন্দরভাবে—

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেথা কার ঘোরা ফেরা
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা
বর্তমানে।
মন জানে
এ মাটি আমারি, ['মাটি'—বীথিকা]

কিন্তু কবির আত্মচেতনা আজ 'অতীতে'র সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে এ সংসার যে কত অনিত্য তা বুঝতে পেরেছে।

ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
*　*　*　*
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি— ['মাটি'—বীথিকা]

কিন্তু এই 'মাটি'র বুকে সকলেই তো আগন্তুক। অতীতে কত যুগ-যুগান্তর ধরে কত 'আমি'ই তো লুপ্ত হয়ে গেছে কালের বুকে ;—কাল তার চিহ্নটুকুকেও ধরে রাখতে পারে নি—

এখানে তুলিছ বেড়া—উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই হবে লীন
*　*　*
'তারপরে !' এই ধূলি রবে পড়ি
আমি-শূন্য চিরকাল-তরে। [ঐ]

মানুষের ক্ষমতা, অহঙ্কার, অর্থ, যশ, সবকিছুই তো এই মাটির বুকে একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে—'আমি-শূন্য' এই 'মাটি'ই একমাত্র সত্য রূপ নিয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অনাদি অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে। এই জগতের 'আদিতম' ('বীথিকা') সত্য তাই কবির কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে

অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।

বিশ্বসংসারের সমস্ত সত্তার মধ্যে কবি এই 'আদিতমে'র বাণী শুনতে পান—

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ ; ['আদিতম'—বীথিকা]

এই ভুবনের জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে প্রাণের সেই প্রথম কম্পনকে কবি অনুভব করেন। 'অস্ত মহাসাগর তট' হতে আজ কবি 'উদয়গিরি শিখর-পানে' 'প্রণতি' পাঠান। বিশ্বসত্তার সঙ্গে আপন সত্তার একটি নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন—

প্রথম সেই প্রভাত-দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে, ['প্রণতি'—বীথিকা]

কিন্তু 'ধরার ঋণে' যতই বাঁধা পড়ুন না কেন একদিন কালের অমোঘ নিয়মে পৃথিবী থেকে সব দেনা চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে হবে। কাল যে কোনকিছুকেই ধরে রাখবে না তার বুকে সে সম্বন্ধে কবি খুবই সচেতন—

এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা

*　　*　　*　　*

একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি, [ঐ]

কিন্তু তাতে কবিমনের কোনো বেদনা নেই। কারণ সংসারের কাছ থেকে তিনি তো বেশি কিছু চান নি—

আপন মনে যে-কামনার চলেছি পিছুপিছু
নহে সে বেশি কিছু।

*　　*　　*　　*

তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল। ['অন্তরতম'—বীথিকা]

এইভাবে কবিমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অতি সাধারণ একটু বাসনার মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজে ফিরেছে। সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে কবিমন কোনো লাভ-ক্ষতি দেনা-পাওনার হিসাব করতে চায় না। সামান্যতম বাসনা তাঁর ধরণীর ধূলিকে প্রণাম

জানিয়ে—বিশ্বপ্রাণের সত্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করে নতমস্তকে শান্ত মনে আনন্দের গান গেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া।

'বীথিকা'র পরবর্তী কাব্য 'পত্রপুটে' কবির এই আত্মভাবনা, হৃদয়-পত্রপুটের শাশ্বত সত্য রূপটি গদ্যের অনির্বচনীয় বাণীসুষমায় উদ্ঘাটিত। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় কবিমনের অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হয়ে বিশেষ কোনো মুহূর্তের ভাবনা, উপলব্ধি, মননশীল জীবনচেতনা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আপন মনের বিচিত্র ভাব-ভাবনা স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপাদানের দিক থেকে পূর্ববর্তী কাব্যধারার সঙ্গে অনেক স্থানে মিল থাকলেও এ ভাবনা একের পর এক এমন অনাবিল স্বচ্ছন্দ গতিতে কবি-মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চলেছে যে, মনে হয়, বার্ধক্যের অলস বেলার নিঃসঙ্গ অবসরে কবি আপন মনের পাতায় একের পর এক রেখাঙ্কন করে চলেছেন…এ যেন আপন মনে সঙ্গোপনে ডায়েরী লেখা—অতি একান্তে নিজের সঙ্গে নিজের গোপন আলাপন। এ কবিকে তাই আমাদের অবুঝ সুদূরের পিয়াসী অতি রোমান্টিক বলে মনে হয় না; আপন অভিজ্ঞতার আলোকে চেনা-জানা পরিচিত জন বলেই মনে হয়। মোট 'আঠারো'টি কবিতার মধ্যে এমনি করে ছড়িয়ে আছে শিল্পিমনের অনাড়ম্বর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

'পত্রপুট' কাব্যের মধ্যেও 'শেষসপ্তক' কাব্যের মত কবির আত্মচেতনা ঔপনিষদিক চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে জগৎ ও জীবনের মধ্যে একটি সুসমন্বয়ের পথ খুঁজে চলেছে। লীলাবাদী জীবনরসিক কবি সৃষ্টিকর্তার দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দিকে ঝুঁকেছেন—কবি সেই পরম অচিনের মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে করেছেন অপার্থিব শান্তির সন্ধান। শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মচেতনা সর্বমানবতাবাদের সঙ্গে এই অধ্যাত্মবোধকে মিলিয়ে দিয়ে—এর সমন্বয় ঘটিয়ে করেছে সেই 'অমৃতত্বে'র সন্ধান।

'দশ' থেকে 'পনেরো' সংখ্যক পর্যন্ত কবিতাগুলি কবির হৃদয়-'পত্রপুটে'র শাশ্বত সত্য-স্বরূপেরই পরিচয় বহন করছে।

'তেরো' নম্বর কবিতাটি কাব্যগ্রন্থখানির মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। এর মধ্যে এ কাব্যের 'নামকরণে'র সার্থকতা যেমন লুকিয়ে আছে—তেমনি সমস্ত কবিতাগুলির একটি সুস্পষ্ট পরিচয়ও বহন করছে। কবি নিজেকে 'বনস্পতি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বয়সের দিক থেকে, আভিজাত্যের দিক থেকে, মহিমার বিরাটত্বের দিক থেকে,—কবির 'আমি' সত্যিই 'বনস্পতি'র সঙ্গে তুলনীয়। এ হেন 'আমি' বনস্পতির 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট'—

গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে

*   *   *

আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,

*   *   *

প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।

*   *   *

নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখদুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।

['তেরো' সং—পত্রপুট]

কবির শিল্পিসত্তা যেন দীর্ঘকাল পরে একান্ত অবসরে আত্মবিশ্লেষণের স্বাভাবিক পথটুকু খুঁজে পেয়েছে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে। [ঐ]

এইভাবে কবি আপন মনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। কবির আপন শিল্পিমানসের এই আত্মসচেতনতা—জীবনের শেষবেলাকার গোধূলির রক্তিম বেদনাস্পর্শ—আমাদের অন্তরেও ম্লান ছায়া ফেলে যায়। কিন্তু তবুও শিল্পিমন বারবার আত্মবিশ্লেষণ করে—বার বার চরিতার্থতা খোঁজে মনুষ্যজন্মের। তাঁর জানা আছে ('দশ' সংখ্যক)—

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ, ভয়ভাবনা,
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্তরূপ।

কবি তাই বাস্তবের সমস্ত খণ্ডতা-তুচ্ছতা-আবিলতা থেকে মনকে মুক্ত করে নেন।

কামনার যে আবর্জনা আত্মার মুক্ত স্বরূপকে ঢেকে রাখে তাকে সরিয়ে দিয়ে করেন আলোকের সন্ধান—

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে।

['দশ' সং—পত্রপুট]

দেহবোধের সমস্ত আবিলতা এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কবি আত্মার মুক্ত স্বরূপটিকে চিনে নিতে চান। চিরন্তন কালের মানবিকতার মহৎ সত্যসাধনার সঙ্গে আপন আন্তর সত্যের মিলন ঘটান। কবি যে 'মানুষের ধর্ম'* গ্রন্থে বলেছেন—"জীবন-দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।" এই 'জীবনদেবতা'র সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখার কথা শেষপর্যায়ের কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। 'দশ' সংখ্যাকে—

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব'।

এই সমস্ত কবিতার মধ্যে কবি একদিকে যেমন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আপন মনোভাবকে গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন—অপরদিকে তেমনি একটা পরম প্রশান্তির সন্ধানও করেছেন। শিল্পিমনের এই অলস মানসবিলাস নানা ভাবনা বয়ে আনে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার শেষক্ষণটি যত নিকটতর হয়—কবিমন তখনও তাকে নিবিড় প্রেমানুভূতিতে আঁকড়ে ধরতে চায়—কখনও বা এতদিনের ভালো-মন্দ যা কিছু তার সঞ্চয় সব দু'হাত ভরে চুকিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে তুচ্ছ ধূলির সঙ্গেই আপনাকে মিলিয়ে দিতে চায়। কবিমনের এই সকরুণ আনন্দ-বেদনার অশ্রুসজল ভাবভাবনাই এ সমস্ত

* দ্রঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'মানুষের ধর্ম': রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড [প্রঃ চৈত্র ১৩৬১
॥ পরিশিষ্ট ॥ মানবসত্য পৃঃ ৪৩১

কবিতার মৌল উপভোগ্য রসাবেদন। 'বারো' (পত্রপুট) সংখ্যকে কবির আপন কণ্ঠেই শোনা যায়—

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে।

* * *

জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।

জীবনের 'অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে'র 'শেষ ধাপের কাছটাতে' বসে বোধহয় জীবন সম্বন্ধে এমনি অনুভূতিই সকলের হয়। অনেক তুচ্ছ হিসাব-নিকাশ বিরহ-মিলনের গান আজ কবির চেতনার সাত রঙে ধরা পড়ে। অনেক না-পাওয়ার বেদনাও করুণ ক্লান্তি বয়ে এনেছিল কবিমনে···কিন্তু আজ যাবার বেলায় কবির শেষ কথা—

এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।

* * *

আজ বঞ্চিত জীবনকে বলি সার্থক, ['বারো' সং—পত্রপুট]

আজ কবির জীবন থেকে 'প্রমদা' তার মদির মায়া সরিয়ে ফেলেছে অনাদরে······ অবহেলায়। একদিন যে 'আপন হাতে' তাঁর 'চোখে বিছিয়েছিল বিহ্বলতা', রক্তে দিয়েছিল দোল, চিত্ত ভরেছিল নেশায়—কবি তাকেই আজ বলেন সেই পাত্র উজাড় করে ('এগারো' নম্বরে)—

জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধূলায়।

মনে হয়, কবির যে 'জীবনদেবতা' বা 'লীলাসঙ্গিনী' একদিন 'জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী' দান করেছিল আজ শিল্পিমনের সেই রসসম্ভোগের পর্যাপ্তিতে সৃষ্টিশক্তির সেই উন্মাদী প্রাণপ্রাচুর্যের ঘাটতিতে কবিমন ব্যথাহত—বিষণ্ণ—উদাসী। কবি তাই সেই লাস্যময়ী 'লীলাসঙ্গিনী'কে বলেন—

সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।

* * *

একদিন নিজেকে নূতন নূতন করে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালোলাগার রঙে রাঙিয়ে।

* * *

আজ আমাকে বঞ্চিত করে
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়। ['এগারো' সং—পত্রপুট]

বেশ বোঝা যায়—এ 'লীলাসঙ্গিনী' 'চিত্রা' বা 'পূরবী'র যুগের লাস্যময়ী ঐশ্বর্যবতী কবিপ্রাণে সৌন্দর্যদায়িনী প্রাণপ্রাচুর্যে চিরনবীনা কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নয়। কবি আজ—

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে। [ঐ]

তবুও কবি বার্ধক্যের এই দীনতাকে স্বীকার করে নিয়েও আশা রাখেন 'নূতন কালের সুরের সঙ্গে আপন বাঁশির চিরন্তন কালের সুর সমন্বয়ের'। 'চোদ্দ' সংখ্যাকে—

ওগো চিরন্তনী;
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এলো—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।

কবি এইভাবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আপন যুগ এবং কালকে অতিক্রম করে চিরন্তন মানবিকতার মহাবাণীর সঙ্গে আপন জীবনবীণার সুরটিকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাই 'নূতন কাল'কে তিনি চিরন্তনের গান শোনাতে চান এবং আপন অন্তরের এই সংস্কারবর্জিত সত্যসন্ধানী চিরমানবতাবাদী হৃদয়টির আন্তর সত্যটিকে উদ্ঘাটিত করেন—

* * *

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে; ['পনেরো' সং—পত্রপুট]

কবির সেই চিরন্তন কালেরই নূতন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ; মানবতাবোধের সহজ আনন্দ-মুক্তিতেই যার স্বাভাবিক স্ফূর্তি। কবির 'হৃদয়-পত্রপুটে'র এই শাশ্বত সত্য সুন্দর বাণীই 'পত্রপুটে'র প্রথম এবং শেষ বাণী। কবির আজন্মের সংস্কারমুক্ত যে মন ঔপনিষদিক দীক্ষায় নিজের আত্মাকে জ্যোতির আলোকে 'সোঽহম্' বাণীতে সার্থক করে তুলতে চেয়েছে—বলতে চেয়েছে—"আমি আছি আমার মহিমায়, যে আমি কেবল আজকের দিনের জন্যে নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে"[১]—সেই আত্মার মুক্ত স্বরূপের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এ সমস্ত কবিতায়।

মানবসত্তার এই অপরিমেয়তার উপলব্ধি 'পত্রপুটে'র পরবর্তী কাব্য 'শ্যামলী'র দু' একটি কবিতায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১। রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড [জন্মশতবার্ষিক সং]—"মানুষের ধর্ম"—পৃঃ ৬১০

এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ ক্ষুদ্র নয়—তুচ্ছ নয়—জীবজগতের মধ্যে তার আছে হৃদয়—আছে উপলব্ধি—আছে সূক্ষ্ম অনুভূতি—আছে সুরবোধ, ছন্দচেতনা ; তার আছে বাণী—তাই তো সৃষ্টি এত সুন্দর। বিধাতা প্রকৃতি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এটা সত্যি ;—কিন্তু মানুষ তার আপন সুর দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—অনুভব দিয়ে—সেই সৌন্দর্যকে মাধুর্যকে রূপের-রঙের-রসের তুলিতে ধরার চেষ্টা করেছে। তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের কাছেও সৃষ্টি একটি রহস্য—এ নিয়ে তাঁরা নানা গবেষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ রহস্যের তো কোথাও শেষ নেই, সীমা নেই। সৃষ্টিকর্তার কোনো মহিমা, কোনো শিল্পরচনা তো সেখানে সার্থক হয়ে উঠবে না। এই পাখীর গান, এই পূর্ণিমার আলো, এই নানা রঙ্-বেরঙের আলিম্পন, এই আকাশের নীলাঞ্জন রেখা—এ তো মানুষের ভালোলাগার অপেক্ষায় বসে বসে দিন গুনেছে—মানুষ একে সুন্দর করে না তুললে, সুন্দর না বললে—এর মূল্য কোথায় ? তাই মানবের চিরন্তন সত্তা 'আমি' অহঙ্কার করে বলতে পারে—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে। ['আমি'—শ্যামলী]

সত্যি, 'মানুষের অহঙ্কার-পটেই রচিত' হয়েছে 'বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প'। এই আলো, এই বাতাস, এই ফুল,—সবকিছুকেই মানুষ বলেছে 'সুন্দর'—তাই সে ধন্য ; মানুষ বলেছে 'ভালবাসি'—তাই সে সার্থক। তাই কবি অহংকার করেই বলেন—

"ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।

* * *

বিশ্ব-আমির রচনার আসরে,
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।
সে এক বাণী ধ্বনিত করে চলেছে—
'তুমি সুন্দর'
আমি 'ভালোবাসি'।

মানুষের এই অপরিমেয় সৌন্দর্যবোধ এবং মানুষের এই সুন্দরকে ভালোবাসা দিয়েই তো সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠেছে।

'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতায় এই সুরই ধ্বনিত। এ প্রসঙ্গে 'বলাকা' কাব্যের 'পাখীরে দিয়েছ গান', 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা', 'হে ভুবন আমি যতক্ষণ তোমারে না বেসেছিনু ভালো'—ইত্যাদি কবিতার কথা স্মরণ করা যায়। মানুষের অপরিমেয় সত্তার উপলব্ধি করে কবি মানুষকে এখানে মহীয়ান করে তুলেছেন।

'প্রাণের রস' কবিতাতেও কবি বিশ্বভুবনের সুর-তাল-লয়-ছন্দকে ধরার জন্য কান পেতে আছেন—মন পেতে আছেন।

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।

এইভাবে সৃষ্টির সমস্ত লীলাছন্দ থেকে কবি-প্রাণ রস আহরণ করে চলেছে—'সংসারের চারিদিকে পাকে-পাকে জড়ানো' কোনো সমস্যাজালই কবিপ্রাণকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না—

শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ—

['প্রাণের রস'—শ্যামলী]

জীবনচেতনার এই মাধুর্যময় অনুভবকে কবি কাব্যের স্বচ্ছন্দ ভাবচ্ছন্দে বইয়ে দিয়েছেন।

'চিরযাত্রী' কবিতায় দেখা যায় কোন্ অনাদিকাল থেকে মানুষ পৃথিবীর বুকে যাত্রা করেছে শুরু, বার বার ভিত পাকা করতে চেয়েছে এখানকার, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার স্থায়িত্বের বাসনা। যুগযুগান্তর ধরে মানবিকতার ইতিহাসে সে 'চিরযাত্রী' (শ্যামলী) হয়ে এক বাণী ঘোষণা করে চলেছে—

"পেরিয়ে চল, পেরিয়ে চল!"

সমস্ত বন্ধনকে—মায়া-মোহকে—ঠেলে ফেলে দিয়ে চিরপথিক হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের লগি

ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলো। কবি এই জীবনের সেই চরম সত্যের বাণীটুকুই তাকে শোনান—

ওরে চিরপথিক,
করিসনে নামের মায়া,
রাখিসনে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

['চিরযাত্রী'—শ্যামলী]

জীবনের শেষপ্রান্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কবির এই ক্লান্ত করুণ অবসাদে ক্ষীণ জীবনের চরম অভিজ্ঞতার কথাই 'আত্মচেতনা'র স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গিতে 'প্রান্তিক' কাব্যে অভিব্যক্ত।

মৃত্যু তার হিমশীতল স্পর্শে অন্ধকারের ওপার হতে কবিমনে কেবল ভয়াবহ ছায়াই ফেলেনি—কবিকে সব ছেড়ে যাবার বেদনায় ভারাক্রান্ত করেনি ;—কবিমন জীবন ও মৃত্যু, পাওয়া ও হারানোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে জীবনকে নূতন করে দেখছেন। আজ (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই সেপ্টেম্বর)* মৃত্যুর করাল মূর্তিকে তাঁর অবচেতন মনে যেন অনুভব করলেন—আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই কবি-জগৎ এবং জীবনকে আর একবার নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাইলেন। জীবন ও মৃত্যু, দুঃখ ও সুখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে' যখন 'মৃত্যুদূত চুপে চুপে' এল—তখন সে কবিজীবনের দিগন্ত আকাশ থেকে 'যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি' সব স্তরে স্তরে ধৌত করে নিল 'ব্যথার দ্রাবক রসে' এবং এইরূপে কবির চিত্তাকাশে যে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের বিভ্রম দেখা দিয়েছিল—তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কবি 'অন্তঃশীলা জ্যোতির্ধারা'র প্রবাহে অনুভব করলেন—

……নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।

*   *   *

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম

*   *   *

অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

['১' সংখ্যক—প্রান্তিক]

*বিঃ দ্রঃ—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কবি উত্তরায়ণে সন্ধ্যায় অকস্মাৎ অজ্ঞানহয়ে পড়েন। কয়েকদিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটে। এই মনোভাবের উপর 'প্রান্তিকে'র কয়েকটি কবিতা লিখিত হয়।

শুধু তাই নয়—কবি 'সে মুহূর্তে আপনার সম্মুখে অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ' দেখতে পেলেন—যে পথ 'অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে নিরাসক্ত নির্মমের পানে'—তাঁকে নিয়ে গেল। কবি সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আপন সৃষ্টি সাধনার মহা ইঙ্গিতকে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন—

বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।

['৩' সংখ্যক—প্রান্তিক]

সৃষ্টিকর্তার পরম আহ্বানকে আজ অন্তরে অনুভব করায় এ বিশ্বসংসারের সব দেনা-পাওনা হিসাব-নিকাশ আজ বড় বেশি রূঢ় বাস্তব—বড় নিষ্ঠুর রূপে প্রতিভাত। কবি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে।

['৪' সংখ্যক—প্রান্তিক]

যে সত্যের সন্ধান কবি এতকাল করে এসেছেন—কবির অকৃতার্থ অতীত, 'পশ্চাতের নিত্য সহচর' হয়ে 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপে' 'অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত ছায়ামূর্তি রূপে' এতকাল কবিকে সেই সত্য হতে বিচ্যুত রেখেছে। আজ জীবনের সমস্ত 'বেদনার ধন'—'কামনার রঙিন ব্যর্থতা' মৃত্যুকে ফিরিয়ে কবি—

*　　*　　*

দূরে—চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

['৫' সংখ্যক—প্রান্তিক]

মর্ত্য জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, লোভ-মোহকে বিসর্জন দিয়ে কবিমনের এই যে কর্মের বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে 'সত্যের সন্ধানে', 'মুক্তির সন্ধানে' যাত্রা—একেও রোমান্টিক মনের সীমা-অসীমের প্রতি মানস অভিসার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। খণ্ড সীমার মধ্যে কবিমন যখনই মুক্তির সন্ধান করেছে, পরমার্থের সন্ধান করেছে—তখনই তাঁর আকাঙ্ক্ষা জেগেছে সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে অসীমের অনন্ত ঔদার্যের মধ্যে আপন চৈতন্যকে মিলিয়ে দেবার—আবার অসীমের বিরাট ঔদার্যের মধ্যেও কোনো তল না পেয়ে কবির রসিক চিত্ত, বৈচিত্র্যপিয়াসী মন, সীমাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে ঐকান্তিক আগ্রহে। মর্ত্য পৃথিবীর এই তুচ্ছতার মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে, জীব-জীবনের পরম সার্থকতাকে মিলিয়ে দেখার একান্ত বাসনা প্রকাশ করেছে।

তাই যে মুহূর্তে কবিমন অকৃতার্থ অতীতের সব বেদনার ধন কামনার রঙিন ব্যর্থতাকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে 'ভারমুক্ত চিরপথিকের বাঁশির সুরে

সাড়া দিতে চেয়েছে'—সেই মুহূর্তেই বোধ হয় কবিমনে সংশয় জেগেছে—এর সত্যতা নিয়ে—এর নিত্যতা নিয়ে। তাই ঐ একই দিনে লেখা পরবর্তী কবিতার মধ্যে দেখা যায় পৃথিবীর এই হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনার প্রতি একান্ত টান, বাস্তবের এই জীবনকে একান্ত সত্য বলে গ্রহণ এবং এরই মধ্যে মুক্তিকে স্বীকার করা—সন্ধান করা।

['৬' সংখ্যক—প্রান্তিক]

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
• ....রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎ-লক্ষ্মীর।

['৬' সংখ্যক—প্রান্তিক]

দেহ-মন-প্রাণকে পীড়িত করে—সমস্ত ভোগ-সুখ হতে আপনাকে বঞ্চিত করে—মুক্তিসাধনায় নিমগ্ন হতে কবি রাজি নন। এখানেও সেই এক কথা ভিন্ন সুরে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

['৩০'-সং—নৈবেদ্য]

তাই মুক্তিকে আজ আবার দেখেন এই ধরণীরই আকাশে বাতাসে—শ্যামল মাটির ঘাসে ঘাসে

আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতি মাঝে, ...
... ... লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোক লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।

['৬' সংখ্যক—প্রান্তিক]

কাব্যের শেষে এসে এখানে যে সুর শোনা গেল কবিকণ্ঠে এ সুর তো অনেকদিনের চেনা-জানা। কবি সংসারের যে ধূলিলিপ্ত আবর্জনার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি চাইছিলেন, সেই সাধনলোকের কৃচ্ছ্রসাধনময় মানসিকতাকে কবি 'বঞ্চিত প্রাণের আত্ম অস্বীকার' বলে ঘোষণা করলেন। কবিমানসের এই যে জড়ত্ব থেকে—মনের অবচেতন অবস্থা থেকে—একটা সুস্থ সজীব জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে পুনঃ প্রত্যাবর্তন—এর দ্বারা তাঁর যে কেবল রোগমুক্তি ঘটে জীবনের পুনর্মুক্তি ঘটলো তাই না—আপন অন্তর-জগতেরও জাগ্রত চেতনলোকে পুনরাবির্ভাব ঘটলো। এই অবচেতনলোকের মানসিকতাকে এভাবে জীবনীশক্তির প্রাচুর্যের দ্বারা জয় করতে না পারলে বোধহয় পরবর্তীকালের এতগুলি

কাব্যকে পাওয়া অসম্ভব হোত। কবির সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা, চিরন্তন কালের আদিম বাসনা প্রকাশ পেয়েছে '৬' সংখ্যকে (প্রান্তিক)—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,

আপন অন্তরের কামনা-বাসনা সম্পর্কে তাই কবিমনে নানা প্রশ্ন জাগে—সংশয় দেখা দেয় ('৭' সংখ্যক)—

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য-প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

কবিমানসের সজীব সক্রিয়তায় যে মানসিক বিকার দেখা দিচ্ছে এই ভয় তাঁর সচেতন মনকেও পীড়িত করে তোলে। তাই জীবনের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সেই সুরচ্ছন্দকে আর একবার আপন অনুভবের সূক্ষ্ম স্পন্দনে ধরবার চেষ্টা করেন—

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে—আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখ-নাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে।

*　　　　*　　　　*

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

['৭' সং—প্রান্তিক]

এই 'নবতর বিজয়যাত্রা'র শেষে কবি সৃষ্টিকর্তার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণতম রূপের আবির্ভাব কামনা করেন—

*　　　　*　　　　*

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক। ['৯' সং—প্রান্তিক]

কিন্তু 'নিখিল জ্যোতির জ্যোতি'কে ('১০' সং—প্রান্তিক) কবি আপন অন্তরে অনুভব করে ধন্য হতে পারেননি। তাই—

বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,

* * *

তাই ফিরাইয়া দিলে।

তবুও কবি আশা রাখেন—'আসিবে আরেক দিন' যখন 'কবির বাণী' 'নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে—অনন্তের অর্ঘ্যডালি পরে'। ['১০' সং—প্রান্তিক]

এ জীবনের 'কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছেন ('১২' সংখ্যকে)—

শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি,···

* * *

সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে,
··· ··· ··· এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি,······

এবং পৃথিবীর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-গৌরব নামের মোহ চুকিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্ত চিত্তে সৃষ্টির মহাকাল যাত্রার পথে আপন আত্মাকে চিরপথিকরূপে দেখেন ('১৩' সংখ্যকে)—

······তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী,······

তাই অতি শান্ত সুরে প্রশান্ত চিত্তে সেই অনন্ত পথের মহাকাল সঙ্গীতের তানে সুর মিলিয়ে বিদায়ক্ষণটিকে চিরমধুর করে তোলেন। ধরণীর প্রতি তাঁর শেষ প্রণতি নম্রনমস্কারে জানিয়ে যান—যে তাঁকে এতকাল আতিথ্য দিয়েছে ('১৪' সংখ্যকে)—

······যাবার সময় হল বিহঙ্গের।······
······এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে কবি অতি শান্ত সৌম্য প্রশান্ত চিত্তে আপন মনকে প্রস্তুত করেন। এ কবির মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো বিস্ময়,

কোনো দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা আর বর্তমান নেই—চরম সত্য যেন ধীরে ধীরে গভীর উপলব্ধির কাছে ধরা পড়েছে ('১৫' সংখ্যকে)—

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে……
……সত্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ;… ‥

এই অনিত্য সংসারে অসীমের স্পর্শকে কবি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন—

তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে ;
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

['১৬' সংখ্যক—প্রান্তিক]

কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে, তার প্রতি কর্তব্য-চিন্তা-ভাবনা থেকেও কবি নিজেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। 'সতেরো'-'আঠারো' সংখ্যকে তাই দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার তা কবিমনকে ব্যথিত পীড়িত করে তুলেছে।

আপন কর্তব্যকর্মে কবি আজও অচঞ্চল—আজও তাঁর কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র, প্রতিবাদ। কবির বাস্তবমুখী সজীব প্রাণ আবার সদাজাগ্রত।

এইভাবে কবির 'আত্মচেতনায়' কাজ করে চলেছে যুগোপযোগী নানা প্রশ্ন,—বার্ধক্য জরা, রোগ, শোক—কোনো পার্থিব ক্লীবতাই কবিমনকে পঙ্গু করে তুলতে পারেনি। "উত্তীর্ণ-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথ ঐ বয়সের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও রোগযন্ত্রণা এবং ঐ সময়কার ঘোরতর 'সভ্যতার সংকট'-জনিত মানসিক গ্লানি সত্ত্বেও মনের গভীর তলে আদর্শনিষ্ঠা, মূল্যবোধ ও ধর্মবিশ্বাস (faith) বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ; তাঁর শেষপর্বের বাণী সর্বময় প্রত্যাখ্যানের, বিতৃষ্ণার বা বিদ্রূপের বাণী নয়।"[১] নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সংসারের সমস্ত ঘটনাকে দেখা মানে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া নয়। যেখানেই অন্যায়, অসত্য, অমঙ্গলকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন—সেখানেই তীব্র বলিষ্ঠ ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জীবনকে অস্বীকার করে আঘাত-সংঘাত থেকে দূরে সরে গিয়ে অলৌকিক জগতের কোনো সত্যকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেননি—জীবনকে সহজ এবং সুন্দরভাবে দেখতে চেয়েছেন অনাসক্ত দৃষ্টিতে। তাই তার প্রতি একটি সহজ প্রশান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আছে, তেমনি অতিরিক্ত মোহও কোনো গ্লানি আনতে পারেনি। এই উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা খুব যে সহজ তা নয়—বহুদিনের চেষ্টা এবং সাধনার

১। শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব—"আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" [সং এপ্রিল ১৯৬৮]

ফল। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বহু 'আত্মচেতনামূলক' কবিতার মধ্যে কবির এই মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। দীর্ঘ জীবনসাধনায় কবি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রশান্তিটুকু জীবনের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তাই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের দুরূহ রোগমুক্তির পর কবির মন নূতন ভাবে আবার জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করতে শুরু করলো।

'প্রান্তিক'-এর পরবর্তী কাব্য 'সেঁজুতি' বা 'আকাশপ্রদীপ' বা অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে কবিমনের এই স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। জীবনের ভার সেখানে নেই; লোভ-মোহ-ঐশ্বর্য-নামের মায়া—কোনোকিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই; যে কদিন পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবীর প্রতি নম্র নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবেন এর কাছ থেকে। 'সেঁজুতি' কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতায় কবি জগৎ ও জীবন এবং আপন কালকে, বর্তমান ও অতীতকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এ কাব্যের 'উৎসর্গ পত্রে' 'ডাক্তার সার নীলরতন সরকারকে' কবি আপন মনোভাবের কথা জানিয়ে বললেন—

অন্ধতামস গহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।

'সেঁজুতি' কাব্যের প্রাণচঞ্চল কবিতাগুলির মধ্যে এই 'নূতন চোখে' বিশ্বদেখা রূপকে দেখতে পাওয়া যায়। ১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখের এই জন্মদিনে যেন কবির নূতন জন্মলাভ হোল—

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। ['জন্মদিন'—সেঁজুতি]

মানুষের আত্মা যে জন্ম-মৃত্যু জরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আনন্দস্বরূপ চৈতন্যময় অনাদি সত্তা—এ কথা কবি নূতন করে যেন অনুভব করলেন। এই অমর আত্মার একান্ত কামনা—

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ কর ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। ['জন্মদিন'—সেঁজুতি]

কবি মানবের সেই শাশ্বত সত্তাকে আজ সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করেন এবং পৃথিবীর কোনো লোভ-মোহ-আবর্জনা-পঙ্কিলতা যে এই শাশ্বত আত্মার সত্য স্বরূপটিকে ধ্বংস করতে পারে না, সে কথা ঘোষণা করেন দৃপ্তকণ্ঠে ঐ কবিতার মধ্যেই—

*　　*　　শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,···　　['জন্মদিন'—সেঁজুতি]

মানুষের ইতিহাসে তার নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতাও কত চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কেও কবি সদা সচেতন, কিন্তু এ তো মানবাত্মার অপমান ; চিরন্তন কালের বুকে এর কোনো স্থায়ী রূপ নেই। তাই 'পত্রোত্তরে' (সেঁজুতি) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে জানান—

দুঃখ পেয়েছি। দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
　　দেখেছি কুশ্রীতারে ;
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
　　ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
　　বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি ;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
　　চিরদিবসের শান্তশিবের বাণী।

এ সংসারের মাঝে দুঃখ-দৈন্য-অশ্লীলতা-ছলনা যেমন আছে তেমনি আছে স্নেহ-প্রীতি মহত্ত্ব—মানুষের অপরিমেয় সত্তার বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এই সমস্ত বেসুরের মাঝে সুরের স্পর্শ, 'শান্ত শিবের বাণী' কবির অন্তরে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। জাগতিক সমস্ত অপূর্ণতাকে জয় করে তার চিত্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায় মানবের পরম সার্থকতার তীর্থে। তাই তৃতীয় কবিতা 'যাবার মুখে'তে কবি এই ধরণীর সমস্ত পুঞ্জিত জঞ্জালকে ফেলে রেখে সঙ্গে নেন এই ধরণীর মাধুর্যের স্মৃতিটুকুকে—

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
*　　*　　*
ওই যে শিমুল, ওই যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে—
*　　*　　*
পেয়েছি ওদের হাতে
দূরজনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।

পৃথিবীর সমস্ত গাছ-পালা-তৃণ-লতা-ফুল-পাখি সবকিছুর সঙ্গে কবি আপন প্রাণের একটি

অনাদি অনন্ত যোগ অনুভব করেন। তার বিচিত্র সুরের মাধুর্য কবিকে হাতছানি দেয়। কবি তো বৈকুণ্ঠের আশা করেন না। 'অমর্ত্য' কবিতায়—

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।

যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।

বিশ্বভুবনের সমস্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সঙ্গে কবি আপন আদিম প্রাণের লীলাকে অনুভব করেন। বস্তুগত সমস্ত রূপের আড়ালে সেই অলক্ষ্য চৈতন্যের অনুভবকে রসে-ভাবে ধরতে চান—

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি
* * *
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভবে। ['অমর্ত্য'—সেঁজুতি]

জগতের ধাবমান রূপটিকে কবি সমস্ত প্রকৃতি এবং জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করে আপনার মনের স্বাভাবিক গতিকেও সেই সহজ ছন্দে মিলিয়ে দিতে চান।—

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে। ['পলায়নী'—সেঁজুতি]

'সেঁজুতি'র অধিকাংশ 'আত্মচেতনামূলক' কবিতার মধ্যে, কবি-জীবনের এই 'নূতন চোখে বিশ্বদেখা'র পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধারণ জীবন-ছন্দের মধ্যেই মুক্তি খুঁজেছে।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যে কবি অতীত স্মৃতিচারণ করে চলেছেন; বর্তমান কালের মাপকাঠিতে কবির কাল যে গত হয়েছে তাই নিয়ে কৌতুক করে 'সময়হারা' কবিতায় বলেন—

খবর এল, সময় আমার গেছে
* * *
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধূলো।

কালের বুকে কবির সমস্ত কর্ম যে একদিন তার মূল্য হারাতে পারে, মানুষের রুচির কাছে আধুনিকতার দাবিতে কবির সৃষ্ট-কলা হয়তো আর অতীতের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না—এই সমস্ত চিন্তা বা চেতনাকে কবি বেশ কৌতুকের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন—

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

['সময়হারা'—আকাশপ্রদীপ]

বার্ধক্যের অলস বেলায় কবি-মনে দেনা-পাওনার এমনিতর একটা হিসাব-নিকাশ অহরহই চলে। একদিকে সব ছেড়ে যাবার করুণ বেদনার স্মৃতি, অপরদিকে মনকে স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের আলোকে ধৌত করে নিয়ে সম্মুখের দিকে মহাযাত্রার পথিক হয়ে আনন্দের গান গেয়ে চলে যাওয়া—এই দুই মনোভাবই থেকে থেকে কবিমনকে ব্যাকুল করেছে। 'নবজাতক' কাব্যের 'ভাগ্যরাজ্য' কবিতায় কবি যে 'সংসারের হাটে' জীবনের সব মূল্য নিঃশেষ করে 'অর্থহারা' জীর্ণ দিনগুলিকে কাটাচ্ছেন—এই করুণ বেদনাটুকু প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে ধরণীর দিকে 'শেষদৃষ্টি'র দিনে 'ফাগুনবেলার ফুলের খেলার···দানগুলি'কে চিনে নিতে চান। পৃথিবীর যা কিছু বেদনা-দুঃখ-তাপ সবকিছুকে অপগত করে চিরন্তন মাধুরীতে তাকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। জীবনের সমস্ত 'মর্মভেদিনী' বেদনাকে আত্মসাৎ করে 'বিষাদ করুণ শিল্পছন্দে' কবি 'মাধুরী চিরন্তন' রচনা করার সাধনা ক'রে গেছেন। 'এপারে ওপারে' (নবজাতক) কবিতায় রাস্তার এপারে বসে কবি জীবনের তত্ত্ব খুঁজে ফেরেন। চলমান জীবনের চলন্ত রূপচ্ছবি কবিমনে নানা প্রশ্ন তোলে—

ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।

এরই মধ্যে কবি-মন ব্যগ্র হয়ে 'সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি' আকাঙ্ক্ষা করলেও তুচ্ছতার মাঝে নেমে আসতে সমর্থ হয় না।

নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

['এপারে-ওপারে'—নবজাতক]

কবির এই 'আমি' সত্তা নিয়ে 'প্রশ্ন' জাগে—

তারপরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নামি।

* * *

অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা। ['প্রশ্ন'—নবজাতক]

পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবার আগে কবি 'শেষ হিসাব' করে নিয়ে যেতে চান। এতদিন 'হাটে-বাটে' যা কিছু পেয়েছিলেন—

মনে ছিল, যত্নের ধন
তাই রয়েছে পুঁজি। ['শেষহিসাব'—নবজাতক]

কিন্তু আজ ভাগ্যের ঝুলি খুলে বলেন—

তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি। [ঐ]

সুতরাং সংসারের এই ধূলামাটিকে পিছনে ফেলে রেখে কবি 'জয়ধ্বনি' দিয়ে যেতে চান এই বলে যে তাঁর জীবনে—

…পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বার বার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ। ['জয়ধ্বনি'—নবজাতক]

কিন্তু খণ্ড জীবনের যা কিছু তুচ্ছতা-গ্লানি-জীর্ণতা সব কিছুকে জীবনের অফুরন্ত প্রাণশক্তির জোরে তুচ্ছ করে দিয়ে এ জন্মের পরম সত্যটির সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি– সেই পরিপূর্ণ জীবনসত্যের ঘোষণাটি অনেক লোকের কাছেই কবির মানস বিলাস—রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা; জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। কবিও তাঁর বিরুদ্ধে নানাজনের এই অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়ে 'রোমান্টিক' কবিতায় তার জবাব দিয়ে যান। বস্তুবিশ্বের 'ধূলি আবরণ' খসিয়ে তিনি নিজস্ব শিল্পক্ষমতা এবং কল্পনা দিয়ে আপন কবিকৃতিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলেন, কিন্তু তা ব'লে 'শৌখিন বাস্তবতা'কেও তিনি ঘৃণা করেন। বাস্তব জীবনের সত্যকার আহ্বান যেখানে, সেখানেও কবির 'ভেরি…মাভৈঃ' রবে সাড়া দেয়। অন্যায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ত্যাগ ও দুঃখকেই স্বীকার করে তার জবাব দেন। মানুষের 'অপূর্ণ শক্তির…বিকৃতির সহস্র লক্ষণ'কে ('জয়ধ্বনি'- নবজাতক) তিনি দেখেছেন অহরহ, কিন্তু 'চিরন্তন মানব মহিমাকে' কখনো উপহাস করেন নি। কারণ—

যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
['জয়ধ্বনি'—নবজাতক]

পরবর্তী কাব্য "সানাই"-এর মধ্যেও কবি আবার সীমা-অসীমের মধ্যে একটা সমন্বয়ের সুর যোজনা ক'রে চলেছেন। রোমান্টিক কবিমন তো কল্পলোকের সৌন্দর্যাভিসারকে—অনির্বচনীয় মায়ালোককে বাস্তবে নামিয়ে আনতে চান; তাঁর মন তো সেই

স্বপ্নই দেখেছে দিবানিশি। সংসারে দুঃখ-গ্লানি-দৈন্য-তিক্ততা-হতাশা-লোভ-মোহ সবকিছুই আছে; কিন্তু সেই দৈন্য এবং কুশ্রীতার সত্যরূপটুকু—বিকৃত রূপটুকু একমাত্র বাস্তব বলে ধরে নেওয়াই কি মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে? এরই পাশে পাশে মানবের এই অপূর্ণ সংসারে কল্পলোকের সৌন্দর্যকে নামিয়ে আনাই তো মানবজীবনের—মানব-সভ্যতার চিরন্তন কালের আকাঙ্ক্ষা। জীবনেব সমস্ত তুচ্ছতাকে স্বীকার করে নিয়েই তার সুরটুকুকে ছন্দটুকুকে জীবনবাণীতে ঘোষণা করে যেতে হবে; এই পরিপূর্ণ জীবনের সাধনাই তো শিল্পীর সমস্ত জীবনের সাধনা। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে লিখিত একখানি চিঠি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

"তোর চিঠি থেকে আমার মনে পড়ল ক্ষণিকার প্রথম কবিতাটি। অর্থাৎ জীবনটাকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া। ঘটনার—ভাবনার—বাসনার প্রবাহ চলেছে, সেই চলমান স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতেই জীবনটা তৈরি হয়ে উঠছে, এক মুহূর্তের সঙ্গে আর এক মুহূর্তের সম্বন্ধসূত্রে যেটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে এসে ঠেকে তার চেয়ে বেশি দাবি করলেই তাল কেটে যায়। অভিজ্ঞতা সমস্তকেই স্পর্শ করবে, উপলব্ধি করবে, কোনো কিছুকেই ধরে রাখবে না—ধরে রাখবার ব্যগ্রতাকেই যদি মোহ বলি তবে বলতে হবে সেটা ত্যাজ্য। কিন্তু স্বাদবিহীন রসরিক্ত স্পর্শকে যদি নির্মোহ বলা হয় তবে সেটা আরও ত্যাজ্য। কেননা সেটা জীবনের ধর্ম নয়। সমস্ত উপলব্ধির সমষ্টিকেই বলে জীবনের সমগ্রতা। এই সমগ্রতাকে লাভ করতে হলে বৈরাগ্য চাই। এই বৈরাগ্যের অভাবে চলা বন্ধ হয়।

"আমি সব নিতে চাইরে"—

যদি তা চাই তাহলে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে কোনো একটা দানকে আঁকড়ে বসে থাকলে সব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যে যথার্থ কবি সে একাগ্র নয়, সে সর্বানুভূঃ; সমস্তর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার অনুভবের ধারা, কোন একটা জায়গায় আটকে যায় না। যদি যেত তবে তো সে অনুভূতির কূপমণ্ডুক হোত। মোহ নিয়ে তোর সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলুম তার মর্মটা এই—মোহই তো স্বাদ গ্রহণের শক্তি—অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয় যদি সে শক্তি না থাকে। মোহ কথাটার বদনাম হয়ে গেছে কিন্তু রস কথাটার হয়নি—ঈশ্বরকে বলে রসো বৈ সঃ—তাঁর আনন্দ বন্দী নয়, মুক্ত, সমস্তের মধ্যে পরিব্যাপ্ত"।[১]

১৯৩৯-এর ৪ঠা মে (আনুমানিক) পুরী থেকে লেখা এই চিঠিখানির মধ্যে জীবনের যে সত্যবোধ অভিব্যক্ত হয়েছে, শেষপর্বের বহু কবিতায় তা ছন্দরূপ ধারণ করে বিচিত্র রসধারায় সমুদ্ভাসিত।

১। "বিশ্বভারতী পত্রিকা"—১৩৭০ কার্তিক, পৌষ সংখ্যা [বর্ষ ২০, সং ২—পৃঃ ১০৫]

'শেষপর্যায়ে'র গদ্যছন্দে লিখিত কাব্যগুলির মধ্যে দিয়ে কবি আধুনিক যুগের দাবীকে তো স্বীকৃতি দিলেন—তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে পূর্ববর্তী কল্পনার মায়াময় যুগ থেকে দূরে সরে আসেননি—তারও জবাব দিলেন এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতায়। 'সানাই' কাব্যে, এই বার্ধক্যেও রোগজীর্ণ কবিপ্রাণের সজীবতাকে সুরে-ছন্দে-ভাবে-কল্পনায় আর একবার নূতন করে লক্ষ্য করা গেল। প্রথম কবিতা 'দূরের গানে'—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।

*　　*　　*

পথে পথে
দূরের জগতে।

তাঁর জন্মকাল থেকে তিনি 'অদৃশ্যলোকের' উদ্দেশে 'দূরের জগতে' কোন্ অলক্ষ্যটানে যে ছুটে চলেছেন—সেই অলক্ষ্য শক্তির আহ্বানকে আজও স্বীকার করেন। তাঁর মনের এই অলক্ষ্যটানের কথা 'মোহিতচন্দ্র সেনকে' লেখা একখানি চিঠির মধ্যেও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতালার ছাদে একতলায় অন্ধকার ঘরে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। আমার প্রকৃতিটা রীতিমত nomad ছিল আর কি (বাংলাভাষায় পণ্ডিতরা আজকাল যাকে "যাযাবর" বলেন)। তখন সব জায়গার জন্যেই homesickness জন্মাত। একটা কিছু অত্যাশ্চর্যের জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচত না। রোজই মনে হত আজ একটা কিছু ঘট্‌তে পারে—সেই প্রত্যাশায় এক একদিন ঘুম থেকে উঠেই হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠত। আপনি ছেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন—আমি ছিলেম একটা অনির্দিষ্ট অনাগত অপরূপের অপেক্ষায়। একটা কিছু দেখব, একটা কিছু আসবে, হঠাৎ এক জায়গায় কোথাও যাব, এই রকম ছিল আমার মনের উন্মুখ উৎসুক অবস্থা। জগতে সম্ভবপরতার চূড়ান্ত সীমানা যে একেবারে পাকাপাকি হয়ে চুকেবুকে গেছে অনেক বয়স পর্যন্ত আমার মন যেন তা মানতে চাইত না। এখন অনেকটা মানতে হয়েছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির অন্তরালে যে একটা প্রচ্ছন্ন নেপথ্য আছে এখনো তারই পর্দার পাশে আমার মন ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যে বিশ্বের অতিজগৎ রাজ্যে, মনের অতিচেতন লোকে, মানবজন্মের অতিজন্ম অবস্থায় আমি যেন আমার বাসার সন্ধান করে ফিরচি।…আমি এমন একটা সোনার কাঠির

সন্ধান করচি যাতে স্বপ্নকে জাগ্রত এবং গোপনকে গোচর করে দেয়। আমি কি সব শুনতে পাই, কিসের আভাস পাওয়া যায়—যাতে আমাকে কোনো বাঁধা মতের মধ্যে বাসা বাঁধতে দেয় না, আমাকে উদাসীন করে দেয়।"[১]

[আনুমানিক তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩১০]

'সানাই' কবিতাটির মধ্যে কবি এই সুদূরের অলক্ষ্য সুরসঙ্গীতের সঙ্গে বাস্তব জীবনের তুচ্ছতার সুসমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। 'সানাই'-এর সুর যেন সমস্ত ব্যস্ততা এবং অসংগতির মাঝ থেকে কোন্ দূর অলক্ষ্য দেশের উদ্দেশে মনকে টেনে নিয়ে যায়—তার করুণ সুরে সে যেন একটা কথা স্পষ্ট করে তোলে—এই সমস্ত তুচ্ছতাকে অসংগতিকে পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে চলো সম্মুখের দিকে। এই মধুর করুণ সুর—

অমর্ত্যলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি। ['সানাই'—সানাই]

তাই এই সুর এই 'বস্তুর অতীত' কিছু 'সত্য বাণীকে ধরণীর কানে' এনে দেয়। আর মানুষ—

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে। [ঐ]

সংসার-সীমা থেকে কবিমন মুক্তি পায় অরূপ সুরলোকে, সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের নানা অবরোধের মধ্যে থেকেও সৌন্দর্যের এই যে আকাঙ্ক্ষা—বাস্তব জীবনের সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার একটি নিগূঢ় সমন্বয়ের সন্ধান করেছে।

'সানাই' কাব্যের কবি এই সুরের সাধনা করে চলেছেন নানাভাবে। বহু কবিতা তাই সঙ্গীতের সুরের স্পর্শে রঞ্জিত। 'রূপকথায়-এর' দেশে কবিমনের আনাগোনা—

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।

কবি তাই 'মনে মনে' 'গানের সুরের ডানা মেলে' দেন। 'মানসী' কবিতাতেও 'আষাঢ়ের মেঘলা দিনে' কবিমন 'উড়ো পক্ষী' হয়ে—

বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষ্যি।

১। "বিশ্বভারতী পত্রিকা"—শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৭৭, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি : শিশু (পৃঃ ৯৩—৯৪)

শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির 'শেষসপ্তক' 'পত্রপুট' বা 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কাব্যের ভাব-গম্ভীর 'আত্মচেতনা'-সঞ্জাত কবিতাগুলির পাশাপাশি এই সমস্ত রোমান্টিকধর্মী হাল্‌কা সুরের ভাব-ভাবনা কবিমনের সহজ জীবনছন্দকেই করেছে প্রকাশিত।

আজ আয়ুশেষে যাবার দিনে কবি-মনের যে দুর্জয় আত্মশক্তির—আন্তর সৌন্দর্যের পরিচয় মিলল তা দীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল। কবি কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করে যে জীবন-মন্থন-করা ধন দান করে যান তা ঐ মহাতপস্বীর হলাহল পান করে অমৃতদানেরই মত—যে তপস্বীর কাছে কবি জীবনে বার বার দুঃখের তপস্যায় উত্তীর্ণ হবার দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কবির দৃষ্টি আজ ক্ষীণ; চেতনা ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত; শরীর দুর্বল; কিন্তু দুঃখের তপস্যায় কবি আজ জয়ী; আত্মশক্তি আজ বিজয় ঘোষণা করে। কবি মুখে মুখে আপন মনের ভাবনা-বেদনা-দর্শন-উপলব্ধির সত্যকে ছন্দে-ভাবে-ভাষায় গেঁথে রেখে যান—অন্যে লিখে নেয়।

কাব্যের নামকরণ থেকে বোঝা যায় 'রোগশয্যায়' থাকাকালীন কবিমনের যে সমস্ত ভাবনা-বেদনা তাই-ই এখানে ভাষা পেয়েছে। 'রোগশয্যায়'-এর কবিতাগুলি কবির তৎকালীন বিশেষ মানসিকতা দ্বারাই পুষ্ট। আপন অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে নূতন কিছু যোগ হয়েছে কবির জীবনে—তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে এ কাব্যের কিছু কিছু কবিতায়। জগৎ ও জীবনকে কবি যেন নূতন চোখে দেখছেন এবং আপন রোগ-যন্ত্রণা ভোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবির বিশ্ব সম্বন্ধে নূতন জীবনোপলব্ধিরও সন্ধান মিলছে। সৃষ্টিরহস্য আজ কবির কাছে এক স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। কিন্তু পূর্ববর্তী জীবনচেতনা মর্ত্যপ্রীতি বা মানবতাবোধ এবং অসীমের স্পর্শে জীবনকে ধন্য করার আকাঙ্ক্ষা এখানেও প্রবল। '২', '৩', '৫', '৯', '১২', '১৩', '২০', '২১', '২৩', '২৪', '২৫', '২৭', '২৮', '২৯', '৩০', '৩১', '৩২', '৩৪', '৩৫', '৩৬', '৩৭', '৩৮' প্রভৃতি সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে কবির এই জাতীয় 'আত্মভাবনা' প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় সংখ্যকে দেখা যায় জগতের এই কালপ্রবাহে জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানুষের আসা যাওয়া কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতেই নিরন্তর ঘটে চলেছে। এ ভাব তো 'প্রভাতসঙ্গীতেও' (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যক্ত হয়েছে। আর 'বলাকা' পর্ব (১৯১৫ খ্রীঃ) থেকেই কবির কাব্যে সার্থক হয়ে ধরা পড়েছে—শুধু ভাষায়-ছন্দে-রূপ-কল্পে যা তফাত—

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,

পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ। ['২' সংখ্যক—'রোগশয্যায়']

এই অলক্ষ্য ইঙ্গিতকে লক্ষ্য করে 'অকারণ-অবারণ-চলার' পথের যাত্রী সকলেই—কবিও। আজ এ সত্যতা কবির সমগ্র সত্তার কাছে ধরা পড়েছে।

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,
এই শুধু জানি। [ঐ]

তাই এই অনিত্যের মাঝে কবি পথিক মাত্র। 'যাতায়াতের পথের তীরে' বসে গান গাওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ। সে গানে স্বর যোজনা করেছে অনেক পথিক বন্ধু। আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় কবির স্মৃতিলোকে তারা বেদনার অনুরণন তোলে—

'যারা বিহান বেলায় গানের খেয়া' 'প্রাণের ঘাটে' বয়ে এনেছিল—

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে, ['৩' সংখ্যক—'রোগশয্যায়']

আজ আপন বেদনার রঙে রাঙিয়ে কবি বিশ্বকেও নূতন চোখে দেখেন। সৃষ্টির সুর-ছন্দ-সঙ্গতি আজ আর কবির কাছে একমাত্র সত্য নয়—এর পিছনে নিরন্তর যে ভাঙাগড়া চলেছে তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চেতনায় ('৫' সংখ্যকে)—

এই মহাবিশ্ব তলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণ যন্ত্র চলে·········

আজ তাই 'রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়' ধরা পড়ে আপন মনের কাছে (৯ সংখ্যকে)—

কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে
কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।

জগতের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে এই জাতীয় উপলব্ধি কবির এই প্রথম। রোগযন্ত্রণাভোগই যে কবিজীবনে এই নূতন অভিজ্ঞতা দান করেছে তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং আজ কবির মনে হয় 'জগতের মাঝখানে······সুতীব্র অক্ষমা'ই

সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা।

আবার জীবনশেষে দাঁড়িয়ে ধ্রুবজ্যোতির সন্ধানও কবি করে চলেন—

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার, ['২০' সংখ্যক—রোগশয্যায়]

এরই মাঝে ফুলদানে গোলাপকে দেখে—কবি এক দার্শনিক তত্ত্বপোলব্ধিতে পৌঁছান—('২১' সংখ্যকে)—

এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে

আরোগ্যের পথে পা দিয়ে তাই কবিমন প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। কবি তার অফুরন্ত দানকে স্বীকার করে বলেন—

·········এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা। ['২৩' সংখ্যক]

এবং এই নূতন চোখের 'বিশ্বদেখা' রূপই তাঁকে যে উপলব্ধিতে পৌঁছে দিল, কবি সেই সত্য বোধে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে কবি 'যে শান্তি বিশ্বের মাঝে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত' তাকে আপন অন্তরেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। জরা-ব্যাধিকে মৃত্যুঞ্জয়ের মত জয় করে নেন। মানুষের আত্মার কাছে এই যন্ত্রণার সত্যতা যেন জয়ী না হয়।—

রুগ্‌ণ যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি— ['২৪' সংখ্যক]

তাই ধীরে ধীরে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে আত্মসাৎ করে কবির অমর আত্মাই আপন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর প্রতি আজও কবির তেমনি ভালোবাসা, মানুষের স্নেহ-প্রীতির স্পর্শ আজও তাঁর কাছে চির আকাঙ্ক্ষিত। কবি অনুভব করেন—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ। ['২৫' সংখ্যক—রোগশয্যায়]

এই বিশ্বের আনন্দরূপের সঙ্গে আপন চৈতন্যসত্তার তাই অনাদি অনন্ত যোগকে অনুভব করে ধন্য হন।

যে চৈতন্য জ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়,

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
'আনন্দ-অমৃত রূপে— ['২৮' সংখ্যক—রোগশয্যায়]

কবির মুক্ত আত্মা সর্ববন্ধনের মধ্যে চৈতন্যের এক আদি জ্যোতিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেন। জন্ম-মৃত্যু-আদি-অন্ত বলে এই সত্তার কোনো স্বতন্ত্র স্বরূপ নেই, একই চৈতন্যপ্রবাহ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিরাজিত—'আনন্দ অমৃতরূপে' তার প্রকাশ। দেহ-রূপ ধারণ করে এই চৈতন্যের যে সাময়িক পার্থিব লীলা সেই ক্ষণটুকুকে মধুময় করে চলে যাবার ক্ষমতা যেন মানুষের থাকে। তাই '২৯' সংখ্যক (রোগশয্যায়) কবিতায় 'দুঃসহ দুঃখের বেড়াজাল' থেকে মানুষকে মুক্ত করে নিয়ে তার সমন্বয় ঘটান—

মানব চিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,

সুতরাং কবি আজ বুঝতে পারেন 'আপন আত্মায় যারা' তাকে 'ফলবান করে' তুলতে পারে—

তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির ; ['২৯' সংখ্যক]

তাই কবি আয়ুশেষে সেই চিরন্তন সত্যের সঙ্গে—বিশ্বের চলমান গতিছন্দের সঙ্গে—মানব জীবনের সমস্ত কর্মের ঐতিহাসিক ধারাটিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। মানুষের কর্ম, কীর্তি, স্থায়িত্বের সব বাসনা যে একান্ত মিথ্যা নিরবধি কাল যে—('৩০' সংখ্যক)

কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে

'সৃষ্টির খেলা' চালিয়ে যায় নীরবে গোপনে—সেখানে মানুষ যে সজীব খেলনা মাত্র—সে সত্য আজ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে কবিমনে—

মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়
সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়, [ঐ]

প্রকৃতির মাঝ থেকেই কবি সেই চিরজ্যোতির সন্ধান করেন—

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান, ['৩২' সংখ্যক]

এইভাবে কবি 'আলোকের প্রসন্ন পরশে' দেহ-মন প্রাণকে অভিস্নাত করে তোলেন—রোগক্লিষ্ট দেহযন্ত্রণা হতে মনকে মুক্ত করে নিয়ে আত্মার জয় ঘোষণা করেন—

তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক

সত্যনবজাগরণ দিক শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে। ['৩৫' সংখ্যকে]

এই মুক্তিস্নানের পর কবিমানসে যে নূতন প্রত্যয় দেখা দেয় তা নূতন হয়েও চিরপুরাতন। কবি 'অতীত কীর্তির পানে' আর ফিরে তাকাতে রাজি নন—

সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি।

কর্মের বন্ধন থেকে, দুঃখ-সুখের ভাসমান তরঙ্গভঙ্গ থেকে মনকে মুক্ত করে নিয়ে কবি প্রকৃতির মাঝে স্থায়ী সত্যের বা আনন্দের সন্ধান করেন—

যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।

* * *

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল। ['৩৬' সংখ্যক]

উপনিষদের এই ঋষিবাণীটিকে কবি যেন প্রত্যক্ষ করলেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের প্রাণলীলার মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় সত্তার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ, মানুষের মনের জড়ত্বের নাগপাশকে সে অহরহই শিথিল করে দিচ্ছে।

'১', '৪', '১০', '১৫', '২২', '২৬' প্রভৃতি সংখ্যক কবিতাগুলি কবির আত্মসমালোচনা। 'অসুস্থ শরীরখানা যে অবরুদ্ধ ভাষা' আজ বহন করে কবি তার দীনতায় ম্রিয়মাণ, কিন্তু প্রভাতসূর্যের হিরণ্ময় কিরণে সেই অন্তরগ্লানিকে ধৌত করে অন্তরে নূতন শক্তির উজ্জীবন ঘটাতে চান (১৫ সংখ্যকে)—

দুবল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,

অন্তরে এই 'হিরণ্ময় ঐশ্বর্য' লাভ করে কবির মুক্ত আত্মা আজ স্পষ্টভাষায় বলতে পারে—

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।

* * *

আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,

সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি। ['২৬' সংখ্যক]

সেই আদি এবং অকৃত্রিম বাসনা। সেই আজন্মের স্বপ্ন আজ সত্য হয়ে আবার কবি-মনকে সজীব করে তোলে। রোগক্লিষ্ট দেহ-মন আবার মুক্তিলাভ করে—নূতন ভালোলাগার সুরে—নূতন ভালোবাসার রঙে।...

'আরোগ্য' কাব্যে কবি 'প্রান্তিক'এর বা 'রোগশয্যায়' কাব্যের ব্যাধিগ্রস্ত মনকে কাটিয়ে উঠে শান্ত-সৌম্য-স্থির প্রশান্ত চিত্তে নূতন চোখে বিশ্বকে দেখছেন। তার রূপ-রস-রঙের স্নিগ্ধ মাধুর্যে কবিমন ডুবে যাচ্ছে—আর শিশুর মত সারল্য নিয়ে এ জীবনকে কবি আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। জরামুক্ত হয়ে কবি যেন বাইরের দিক থেকেই শুধু আরোগ্য লাভ করেন নি—অন্তরেও একটি স্থির-প্রশান্ত-ধ্রুব-সত্যে পৌঁছে গেছেন। তাই দেহের গ্লানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্লানিও কেটে কবির অন্তরাকাশে স্বচ্ছ আলোকের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। সেই আলোকে যা কিছু দেখছেন তাই-ই নূতন রূপে-রসে-মাধুরীতে অভিস্নাত হয়ে কবিমনকে প্রীতিমাধুর্যে ভরিয়ে তুলছে। তাই 'রোগের বিমিশ্র তমিস্রা' হতে মুক্ত কবির যেন নবজন্মলাভ ঘটেছে এ কাব্যে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রোগশয্যায়'এর কবিতাগুলি থেকে এ কবিতাগুলি প্রাণচেতনায় অতি স্বচ্ছ উচ্ছল প্রাণবন্ত।

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কবিমানসের এক অখণ্ড প্রত্যয় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই সুস্পষ্ট। ধরণী থেকে বিদায় নেবার আগে প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের প্রতি নূতন আকর্ষণ এবং মানবের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকে নূতন করে অনুভব। মনের একটি নিরাসক্ত স্নিগ্ধ সৌম্য প্রস্তুতিই সবকিছুকে প্রীতিস্পর্শে মধুময় করে দেখছে। কয়েকটি কবিতার মধ্যে বিশেষ ক'রে এই ভাব অতি সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। '১', '২', '৩', '৪', '৫', '৬' এবং '১০', '১৬', '১৮', '২২', '২৯' সংখ্যকের মধ্যে এই ভাব প্রত্যক্ষগোচর। 'উৎসর্গ-পত্র' হতেই কবি মনের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে

* * *

তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।

['উৎসর্গপত্র'—আরোগ্য]

কবি ওপারের খেয়ার যাত্রী হবার আগে তীরের সবকিছুকে একটি পরম প্রীতিস্পর্শে মধুর করে দেখছেন।

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি

* * *

চরিতার্থ জীবনের বাণী। ['১' সং—আরোগ্য]

বৈদিক ঋষির স্বচ্ছ-প্রশান্ত-আনন্দময় দৃষ্টিতে আজ কবি জগতের দিকে চোখ মেলে চাইছেন—সবকিছুই এর সুন্দর মধুময়। মুক্ত আত্মার এই সর্বব্যাপী দৃষ্টিই এ কাব্যের 'আত্মচেতনামূলক' কবিতাগুলির প্রাণধর্ম যুগিয়েছে। জীবন যে সবকিছু নিয়েই চরিতার্থ —এই মহামন্ত্রে কবি আজ দীক্ষিত। তাই—

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ ['২' সং—আরোগ্য]

তাকে অমৃতের স্পর্শযুক্ত ক'রে অর্থময় করে তোলে। কিন্তু অসীমের নিস্তব্ধ বন্দনার সঙ্গে কবি এ সমস্তকে যোগযুক্ত করে দেখেন—

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ। [৩ সং—আরোগ্য]

'মুক্ত বাতায়ন প্রান্তে জনশূন্য ঘরে' বসে নিস্তব্ধ প্রহরে কবি ধরণীর সত্যরূপটিকে উপলব্ধি করেন—

বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;

* * *

বলে, আমি আনন্দিত—ছন্দ যায় থামি
বলে, ধন্য আমি। ['৫' সংখ্যক]

এই আনন্দের গান গেয়ে যাওয়াই তো তাঁর একমাত্র সাধনা—এতেই তো জীবনকে ধন্য করে তোলেন। প্রকৃতির মাঝে ক্ষণকালীন যে আনন্দের উদ্বোধন—তাকেও কবি অমরত্ব দান করে যান কাব্যে। ধরে রাখতে চান আপন মানস পটে—

একথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে। ['৬' সংখ্যক]

'অলস সময়ধারা বেয়ে' এই কবিমনই 'শূন্যপানে ধায়' এবং মানবযাত্রার ইতিহাসে যে সুর একমাত্র সত্য তাকেই আপন চেতনালোকে প্রত্যক্ষ করেন ('১০' সংখ্যক)—

গুরু গুরু গর্জন গুন গুন স্বর

এবং 'দুঃখ সুখ দিবস রজনী' 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনিকে' 'মন্দ্রিত করিয়া তোলে'।

'দিন পরে যায় দিন'—কবি স্তব্ধ বসে থাকেন, এবং জীবনের দেনাপাওনার হিসাব নিকাশ করেন—কিন্তু এখানেও সেই মানুষের পরম প্রীতিরসে কবি-হৃদয় ভরপুর—

যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে। ['১৬' সংখ্যক']

শুধু মানবের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিসুধাকেই কবি যাবার দিনে মধুময় করে দেখছেন না—ধরণীর ধূলিও যে তাঁর কাছে আজ মধুময়—

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি। ['১৮' সংখ্যক]

মর্ত্যপৃথিবীর সবকিছুকেই কবি 'আজ যাবার বেলা' সুন্দর রূপে দেখেন। এই দেখার চোখ এবং মন যে তিনি পেয়েছেন—এটা 'জীবনের বিধাতার' পরম আশীর্বাদ এবং দাক্ষিণ্য। কবি কৃতজ্ঞচিত্তে একে স্মরণ করেই বলেন—

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ।
['২৯' সংখ্যক—আরোগ্য]

কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখা যায়—সৃষ্টির অমোঘ শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তার অমৃত মাধুর্যে মানসলোককে উজ্জীবিত করা এবং চরম ক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে অপেক্ষা করা। 'আজ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিল আলো, সেই তো তোমার আলো' রূপে সেই জ্যোতির্ময় স্বরূপের আবির্ভাব কবি সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। দেহের অণু-পরমাণু হতে চৈতন্যলোক পর্যন্ত এবং সৃষ্টির অণুপরমাণু হতে সূর্যলোক পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বনিখিল জুড়ে তাঁর আবির্ভাব। আজ সর্ববন্ধনমুক্ত মন, আকাশ-বাতাস হতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তরব্যাপী সর্বত্রই সেই অসীম স্বরূপের অলক্ষ্য স্পর্শ অনুভব ক'রে ধন্য হচ্ছে। যে পরম শান্তিকে, অনির্বচনীয় আনন্দকে এতদিন সন্ধান করে এসেছেন আজ তা কবির সহজ প্রত্যয়বোধের মধ্যে ধরা পড়ে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছে। কবিমন আজ তাই পরম প্রশান্তিতে মগ্ন; ধীর-স্থির-আত্মসমাহিত। '৭', '৮', '৯', '১১', '১২', '১৩', '১৭', '২৭', '২৮', '৩০', '৩১', '৩২' '৩৩' সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে সেই পরম পুরুষের আবির্ভাবে কবিমন অমৃতের স্পর্শ পেয়ে ধন্য।

তাই ('৭' সংখ্যকে) 'হিংস্র রাত্রি' যখন 'চুপে চুপে' এসে 'গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে' জীবনের গৌরবের রূপকে হরণ করতে থাকে, তখন কবি তাকে জয় করেই বলেন—

প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ দুর্গের শিখরে। ['৭' সংখ্যক]

এবং 'সংসারের প্রান্ত জানালার' ধারে বসে 'অনন্তের ভাষা' তাঁর চোখে পড়ে 'দিগন্তের নীলিমায়'—অন্তরে এ 'পূর্ণতার ইঙ্গিত জানিয়ে' দিয়ে যায় ('৮' সংখ্যক)।

এই সৃষ্টিকর্তাই কবির 'সম্মানহীন' 'সাথিহীন' দিনে দেখা দিয়ে চিত্তকে রূপে রসে ভরিয়ে দেন ('১১' সংখ্যকে)—

তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,
* * *
এবং অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার—
ঘুচাইলে অবসাদ তার ;

কবিমনের 'অকস্মাৎ দুঃখের আঘাতে'র মধ্যেও এই আনন্দময়ের স্পর্শ 'অন্তরে দিগন্ত পথে' ('১২' সংখ্যকে)—

আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো হয়ে দেখা দেয়।

সেই আলোয় তাঁর চিত্ত—

চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ। ['১২' সংখ্যক]

কবিমন বিশ্বসৃষ্টির পরম আনন্দবেদনার মধ্যে আপনাকে লীন করে দেয় ('৩১' সংখ্যক)—যখন মনে হয়—'ক্ষণে ক্ষণে যাত্রার সময় বুঝি এল'—তখন একান্ত মনে প্রার্থনা করেন—

নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ। ['৩১' সংখ্যক]

আর এই প্রসাদ লাভ করেই কবি বলতে পারেন—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
* * *
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি ['৩২' সংখ্যক]

এই 'পরম-আমি'র সঙ্গে যোগ-যুক্ত হবার বাসনাই কবির সাধনময় জীবনের প্রথম এবং শেষ কথা—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা

সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত। ['৩৩' সংখ্যক]

কবি নিজের সমস্ত অহংসত্তাকে চিরমানবের চিন্ময় সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পরম আনন্দসাগরে লীন হয়ে যেতে চেয়েছেন।

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থখানিতেও কবির 'আত্মচেতনা' বিচিত্র ভাব-ভাবনায় গ্রথিত হয়ে কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যঞ্জিত। আপনার 'জন্মদিন'কে উপলক্ষ্য ক'রে বেশ কয়েকটি কবিতা লেখেন কবি। জীবনে বার বার কবির 'জন্মদিন' উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং কবি এই মহাবিশ্বজীবনের পটভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে স্বীয় আত্মার স্বরূপ শক্তিকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। বোধ হয় মৃত্যুদিনের মুখোমুখি হয়ে এই জন্মদিনের মাহাত্ম্যকে আরও বেশি করে অনুভব করেছেন। সংসারে তাঁর এই জন্মের উদ্দেশ্য কি—সৃষ্টিকর্তার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই বা তিনি মর্ত্যভূমিতে জন্ম নিয়েছিলেন এবং সংসার তাঁকে কি দিয়েছে—তিনিই বা সংসারকে কতটুকু কি দিতে পেরেছেন—তাঁর আত্মা সেই পরম পুরুষের আশীর্বাদ ললাটে ধারণ করে যে নূতন যাত্রাপথে চলা স্বরু করেছিল এতে তাঁর জীবনের চরিতার্থতাই বা কতটুকু—এই সব কথা, আজ তাঁর অন্তরে নূতন করে ভেসে উঠছে . '১' সংখ্যকে)।—

দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

* * *

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম !

'বহু জন্মদিনে গাঁথা' তাঁর জীবনে এই কবিই ('২য়' সংখ্যকে)—

দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে—

আবার এই কবিই 'জন্মবাসরের ঘটে' 'নানা তীর্থে পুণ্য তীর্থবারি' আহরণ করে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন—

যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
সে আনে প্রাণের অপূর্বতা। ['৩' সং—জন্মদিনে]

জীবনের 'আশি বর্ষে প্রবেশিয়া' কবি অনুভব করেন এই সৃষ্টির বুকে তাঁর স্বরূপকে—

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—

আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ। ['৫' সংখ্যক]

এই নাট্যমঞ্চেই 'বুদ্ধভক্তদের বন্দনা-মন্ত্র' শুনে কবি অনুভব করেন আপন জন্মের সার্থকতা—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
* * *
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও। ['৬' সংখ্যক]

বিরাট বিশ্বের চৈতন্যলোকের মাঝে আপনাকে দাঁড় করিয়ে এইভাবে কবি আপন স্বরূপের সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাই ক্ষুদ্র শোক-দুঃখ-উৎসব-আনন্দ-জন্ম-মৃত্যু সবই মহা মহিমায় ভরে ওঠে।

বিরাট বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কবিমনের মহাবিস্ময় এবং আপন স্বরূপের উপলব্ধি—আর সেই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তিনম্র প্রণতি জ্ঞাপন—কতকগুলি কবিতায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে কবিমনের বিস্ময়বোধ আজন্মের, কিন্তু পরিণত বয়সের এই চেতনায় দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রধান হয়ে উঠেছে। '৯', '১১', '১৩', '২৩', '২৫', '২৬', '২৭', '২৮' সংখ্যক কবিতাগুলি এই ভাবধর্মী। কবির 'চেতনা' যে আদি সমুদ্রের ভাষা বহন করে কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে কোন্‌ অনির্দেশ্যলোকের উদ্দেশে অহরহ ধাবিত হচ্ছে—সেই কথাই কবি '৯' সংখ্যক কবিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। আপন 'আত্মচেতনা'র এই স্বরূপ ব্যাখ্যা বাস্তবিক অতীব সুন্দর—

মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী। ['৯' সং—জন্মদিনে]

আবার কালের প্রবল আবর্তে ('১১' সংখ্যকে)—

সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে।

এও কবির পরম বিস্ময়। এ রহস্য সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন—

বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি;
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
['১১' সং—জন্মদিনে]

তাই 'সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে' দাঁড়িয়ে কবির প্রার্থনা ('১৩' সংখ্যকে)—

করো করো অনাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।

এই ধরণীর লীলাক্ষেত্রের সঙ্গে সেই অসীমের অমৃত স্পর্শকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাও করেন—

এ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।

['১৩' সং—জন্মদিনে]

"রবীন্দ্রনাথ বিষয়কে বিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়াই ধরিতে ছুঁইতে চাহিয়াছেন। অধ্যাত্মদ্রষ্টার মত বিষয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীরীর সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মর জীব হিসাবে তিনি মর বস্তুর রস গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অথচ এই মরত্বেরই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেহকে দেহভাবে ধরিয়াই তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন আত্মিক অদেহী একটা কিছু। এই দ্বৈতের, বৈপরীত্যের সমন্বয় তাঁহার উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রুচিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহাকে আরও তীক্ষ্ণ তীব্র করিয়া ধরিয়াছেন—Pagan-এর লোকায়তদেরই মত; অথচ তাহার মধ্যে অপার্থিবের ধারা একটা নামাইয়া আনিয়াছেন।"[১] 'সীমা এবং অসীমে'র সমন্বয় এইভাবে তাঁর চেতনায় কাজ করে চলেছে অবিরত।

তাই সংসার 'জীবনের ভাঙা ছন্দে' যেখানে 'ভ্রষ্ট হয় মিল'—কবি সেখানে 'আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান'কে আহ্বান করেন—

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি, ['২৫' সংখ্যক]

আত্মার এই মহিমাকে জীবনের চরম মূল্য দিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখাই কবির সমগ্র জীবনের একমাত্র সাধনকল্পনা। তাই কোনো অবস্থাতেই এই আত্মার অবসাদকে কবি স্বীকার করে নিতে চাননি। 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্যে'র মধ্যে কবিমনের এই অন্ধ তমিস্রার ভাব কেটে গিয়ে একটি শান্ত সমাহিত প্রশান্ত নিঃসংশয় ভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'শেষলেখা' কাব্যে এই প্রশান্তি অতি স্নিগ্ধ—অতি মধুর—যেন বিদায় ক্ষণটি অনিবার্য জেনে কবি নীরবে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। এ সমস্ত কবিতাগুলিকে ঠিক কবিতা

১। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—"রবীন্দ্রনাথ" [১ম সং]—প্রবন্ধ "শিল্পী রবীন্দ্রনাথ" [পৃঃ ৪০]

বলা যায় না। কবি এখন আর কেবলমাত্র কবি নন—সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাই এই ছোট বলিষ্ঠ খণ্ড খণ্ড লেখাগুলি সেই সাধকের এতদিনের সাধনময় অনুভূতিপুঞ্জেরই টুক্‌রো টুক্‌রো রূপ। কবিতা অপেক্ষা এগুলির সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রেরই সাদৃশ্য বেশি।

অসুস্থ কবি আপন মনে জীবনের চরম অভিজ্ঞতার কথা—সত্যবোধের কথা বলে যান—অন্যে লিখে নেয়। কবির মৃত্যুর পর এ গ্রন্থ ছাপা হয়। কবি এর নামকরণও করে যেতে পারেন নি। জীবনের সেই চরম ক্ষণের জন্য কবিমন প্রস্তুত হলেও—কবির বৈচিত্র্যপিয়াসী মন যে আজও নানা ভাব-ভাবনার মধ্যে অবগাহন করে—কয়েকটি কবিতায় তার পরিচয়ও আছে। এ কাব্যের কবিতাগুলিতে তাই কবিমনের বিচিত্র 'আত্মচেতনা' মুকুলিত। '১', '২', '৭', '১০', '১৩', '১৪', '১৫'-সংখ্যক কবিতাগুলি এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে; জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবিমানসের সহজ সুন্দর আত্ম-উপলব্ধি—প্রশান্তচিত্তে শেষক্ষণটির জন্য অপেক্ষা।

প্রথম কবিতার মধ্যেই দেখা যায় কবি প্রশান্ত চিত্তে সম্মুখে মহাকালসমুদ্রকে অবলোকন করছেন—এই 'শান্তিপারাবার' জীবনের সমস্ত তাপকে দাহকে জুড়িয়ে মহাশান্তি মহাআনন্দ এনে দেবে, এ সমুদ্রে যে তরণী বায় সে যে জীবনমরণ পথের চিরসাথি—তিনিই যে অসীমের পথযাত্রায় ধ্রুবতারকার জ্যোতির্লোকের পথ দেখাবেন। তাই কবির একান্ত প্রার্থনা—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার। ['১' সং—শেষলেখা]

কবি জানেন—মানবজীবন যে সত্যের সাধনায় মগ্ন তার কোনো বিনাশ নেই। জীবনের 'অমৃত' সুধারসকে মৃত্যু কখনও হরণ করে নিতে পারে না, শুধু 'রাহুর' মতন সে ছায়া ফেলে মাত্র। কবিপ্রাণ আরও বেশি স্থির অচঞ্চল এই কারণে যে তিনি জানেন—

সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে
সেই তো কালের ধর্ম। ['২' সং—শেষলেখা]

তাই এই মহাযাত্রার পথে কোনো ক্ষোভ নেই—কোনো বেদনা নেই—কোনো প্রশ্ন নেই—কোনো বিস্ময় নেই, আছে শুধু চরম প্রস্তুতি একান্ত আগ্রহে। তাই জীবনও আজ তাঁর কাছে মহামহিমময় অর্থে ভরা—

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ। ['৭' সংখ্যক—শেষলেখা]

কিন্তু এ তো উদাসীন চিত্রকরের খেলা মাত্র। এক একটি জীবনকে নিয়ে তিনি সমস্ত জীবন ধরে ছবি এঁকে চলেন—

তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ; ['৭' সং—শেষলেখা]

কিন্তু মহৎ কীর্তি হয়তো বা ধরণীর বুকে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যায়। কবিপ্রাণ সেই কথাই ভাবে—

কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি ;
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা। [ঐ]

পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে কবিমনে এমনিতর একটা হিসাব নিকাশ অহরহই চলতে থাকে। জীবনের সত্য স্বরূপটিকে কবি যাবার আগে ভালো করেই চিনে নিতে চান। এ পারের সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে কবি বন্ধুজনের 'হাতের পরশে' 'মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসকে' সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। আজ 'শূন্য ঝুলি' উজাড় করে দিয়ে বলেন—

প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই ['১০' সংখ্যক]

কবি যাবার বেলা কিছুই সঙ্গে নেবেন না—শুধু 'কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা'—পৃথিবীর এই শেষ দানটুকুকে সঙ্গে নেবেন। কারণ, এ' জীবনকে কোনো বোঝাই দান করে না—ভরিয়ে দেয় অনির্বচনীয় মাধুর্যে কানায় কানায় ; তাই যাবার বেলা এটুকু সঙ্গে নেবেন। কিন্তু সংসারের এই 'রূপনারাণের কূলে জেগে' উঠে কবি দেখলেন 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়'—রূপময়—এই বিশ্বজগৎ স্বপ্ন নয়—মিথ্যে নয়—ছলনা নয়—

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়। ['১১' সংখ্যক]

বাস্তব জগতের সমস্ত দেনা-পাওনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে কবি তার মূল্য শোধ করে দিয়ে যান 'বেদনায় বেদনায়' —'আঘাতে আঘাতে' তাকে চিনতে পারেন—কিন্তু পরম যে 'সত্যে'র সন্ধানে এই জীবন আঘাত-সংঘাতের মাঝে পথ কেটে কেটে চলেছে সে—

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা। ['১১' সং—শেষলেখা]

এই কঠিন সত্যের সাধনাই কবির সমগ্র জীবনের সাধনা। বুকের রক্ত নিঙ্‌ড়ে দিয়ে, 'দুঃখের তপস্যায়' সিদ্ধিলাভ করে এ জীবনে সেই সত্যকে কবি লাভ করেছেন—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কঠিন মূল্যে জীবনের সেই দেনা কবি শোধ করে দিয়ে যাবেন—

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে। [ঐ]

চরম সত্য সম্বন্ধে কবিমনের এই প্রশ্নোত্তর—বা জগতের সত্যতা-অনিত্যতা নিয়ে কবিমনে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা নানা প্রশ্ন তোলে—নানা উত্তর খুঁজে পায়—সবই কবির উপলব্ধির কাছে ধরা পড়ে সত্য হয়ে ওঠে। সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মাঝে জন্মলগ্নে যে 'সত্তা' রূপে কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, সমস্ত জীবন ধরে তার রহস্য সম্বন্ধে কবিমনে নানা বিস্ময় জেগেছে। কবি আপন উপলব্ধিজাত সত্যবোধ দিয়ে সেই রহস্যকে—বিস্ময়কে ভেদ করার চেষ্টা করেছেন এই মাত্র। কিন্তু মানবের জীবনে সেই চরম প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন কি মিলেছে, না মিলবে—কবিমনে সে সম্বন্ধে আজও প্রশ্ন জাগে। তাই বিস্ময়ে আপন মনেই বলেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর। ['১৩' সং—শেষলেখা]

কবির জন্মলগ্ন থেকে 'আত্মার সত্যরূপ' সম্পর্কে—'সত্তার নূতন আবির্ভাব' সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে বার বার—কে এই 'প্রাণ'—কোথা থেকে এর আবির্ভাব—কোথায় এর অবস্থিতি ;—কবি তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন—কিন্তু 'মেলেনি উত্তর'। আজ জীবনশেষে দাঁড়িয়ে মহাবিস্ময়ে সেই 'সত্তার' সমস্ত লীলাকে প্রত্যক্ষ করার পর একই প্রশ্ন রাখলেন—

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর। ['১৩' সং—শেষলেখা]

মানুষের মন খণ্ড জীবনবোধ নিয়ে সৃষ্টির অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকেই তো ভেদ করতে চায়—নিজের বুদ্ধি এবং জ্ঞান মত তার উত্তরও দেবার চেষ্টা করে—"সৃষ্টির আদি রহস্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান জিজ্ঞাসা,…। পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবকে তিনি কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন এবং তার রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন।… কোথা থেকে এই প্রাণের আবির্ভাব—এই প্রশ্ন তাঁকে নিত্য আন্দোলিত করেছে—'কেন প্রাণ। প্রথম দৈপ্রতিযুক্ত';—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? তাঁর কাছে এটিই বিশ্বরূপ দর্শনের মূল প্রশ্ন।"[১]—এই প্রশ্ন তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত সমস্ত পর্বের কাব্যেই একটি মূল স্বর যোজনা করেছে।

শুধু সত্তার আবির্ভাব সম্পর্কেই প্রশ্ন বা বিস্ময় নয়—মানব জীবনে এই 'সত্তা'র যে বিচিত্র লীলা—সেই 'লীলাময়ী', 'ছলনাময়ী', 'কৌতুকময়ী' জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সত্য স্বরূপ কি—এ নিয়েও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবিমনে প্রশ্ন জেগেছে। জীবন তার দুঃখ-কষ্ট-বেদনার বিকৃত রূপ নিয়ে মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, কিন্তু মানবসত্তার অপরাজেয় রূপটি এই দুঃখ বিপদকে অনায়াসে অবহেলায় পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে—'আত্মার' বা 'সত্তার' সেই অপরাজেয় রূপটির মধ্যেই মানুষের শেষ মহিমা লুক্কায়িত, আবার প্রকাশিতও। জীবনের শেষ দুটি রচনার মধ্যে এই চিরন্তন জীবনজিজ্ঞাসাই সংক্ষেপে রক্তাক্ষরে লিখিত। কবি জানেন—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার। ['১৪' সংখ্যক—শেষলেখা]

জীবন বার বার এই দুঃখের দুঃসহ রূপ নিয়ে কবির কাছে এসেছে, অন্ধকারে ছলনাও করেছে তাঁকে। কিন্তু—

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়। ['১৪' সং—শেষলেখা]

এই 'ভয়ের মুখোশকে' বিশ্বাস করলেই যে 'অনর্থ পরাজয়'—তাও কবি জানেন। মানুষের আত্মা জীবনের সমস্ত দুঃখের পরীক্ষাকে কাটিয়ে কাটিয়ে জীবনের সত্য স্বরূপটিকে দুঃখের

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা—মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭: প্রবন্ধ—"কবি ও কাব্য—রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ"
[১৩৭৬ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুক্রম—পৃঃ ২৮৮] শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মধ্যে দিয়েই চিনে নিতে চেয়েছে। জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে 'ছলনাময়ী' রূপে মানবজীবনে আবিভূর্তা তাও কবি জানেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী। ['১৫' সং—শেষলেখা]

জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর সৃষ্টির পথকে বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করে রেখেছেন—তাই তিনি 'ছলনাময়ী'। "জীবনের কৌতুক এবং ছলনা তো আর কিছু নয়, জীবনের বহুবিধ পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের যাচাই।······মমতায় আর নির্মমতায় মিশিয়ে এই জীবন। এ জন্যে ছলনাময়ী আখ্যাটিই এর যথার্থ পরিচয়।"[১] এই 'ছলনাময়ী'—

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে নিপুণ হাতে
সরল জীবনে। [ঐ]

এই দুঃখের ছলনাকে যে চিনতে পেরেছে—জীবনের এই প্রবঞ্চনাকে সহ্য করে নিয়ে যে মানুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে—সেই তো আত্মার মহত্ত্বকে করেছে ঘোষিত। কবির এই চিন্তার সূত্র পরিণত—প্রমাণিত—তত্ত্বকথা নয়। ছলনা আর কিছু নয়—সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আবরণ। যিনি ভগবতী, তিনিই মিথ্যার মায়ার মুখোশ পরেছেন। নিত্য সব সময় আছেন অনিত্যের আড়ালে—সে অনিত্য সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সুশ্রী-বিশ্রী, প্রেম-হিংসা, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি অনন্ত দ্বন্দ্বময়। 'ছলনাময়ী'র ছলনা-জাল ভিতরে আর বাইরে। যিনি জীবনদেবতা—তিনিই বিশ্বদেবতা। যিনি সত্যময়ী (সতী) তিনিই মিথ্যাময়ী সেজেছেন। তার সেই প্রতারণায় ভোলেন নি, ভুলবেন না, এই ঘোষণাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতায়। এই দুঃখের তপস্যার মধ্যে দিয়ে জীবন তাঁকে যে সত্য পথের সন্ধান দেয়—

সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ।

* * *

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। ['১৫' সং—শেষলেখা]

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা [মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ :] প্রবন্ধ—"কবি ও কাব্য—রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ" [পৃঃ ৩০৮—]
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অনায়াসে যে জীবনের এই ছলনাকে জয় করে সত্যের সন্ধান করে নিতে পেরেছে আপন অন্তরে—

সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার। ['১৫' সং—শেষলেখা]

জীবনের প্রথম আবির্ভাব থেকে কবিমনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার উদয় হ'য়েছিল, সমস্ত জীবনের কর্ম-চেষ্টা-চিন্তা দিয়ে যে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন কবি নানা ভাবে—বারে বারে, সেই জীবন-জিজ্ঞাসাই অখণ্ড মহিমা লাভ ক'রে মাত্র কয়েকটি পঙক্তিতে জীবনের শেষকথায়—'শেষলেখা'য় উদ্গীত হয়েছে জীবনের মূলমন্ত্র রূপে। তাঁর 'আত্মসচেতনা'মূলক জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তিম ঘোষণা এই 'শেষলেখা'য়—'শেষ কবিতায়'।

২

অধ্যাত্মচেতনা

কবিমন আপন ধ্যান ধারণায় যে অলক্ষ্য স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখে, তাকে কাব্যে নানা ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা ধর্মবোধ সংস্কারের মতই অধিকাংশ লোকের মনে কাজ করে এবং ধর্ম অর্থেও প্রচলিত কতকগুলি নীতি-নিদেশ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক—সকলেই মেনে নেয় আপন জীবনে। তাই ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস বা প্রশ্ন সকলের মনেই গোপনে কাজ করতে থাকে—শিল্পিমনে এই প্রশ্ন নানাভাবে উঁকি মারে—আর তিনি তাঁর উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তোলেন আপন শিল্পকর্মে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের চিন্তায় চেষ্টায় কর্মসাধনায় এই অধ্যাত্মচেতনা কিভাবে কাজ করেছে—এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে তাঁর বহু কবিতাই অনেকাংশে দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। "রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কাব্য-সাধনা ও ধর্মসাধনাকে ভিন্ন করে দেখা যায় না, এ দুই একই অলৌকিক বেদনাজাত। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় তাই কবির ধর্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ অনিবার্য রূপে মনে পড়ে।"[১]

মধ্যপর্বের কাব্যে—'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্যে'র যুগে এই অধ্যাত্ম-চেতনা যতখানি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ কবিজীবনে, শেষপর্যায়ের কাব্যে সে তুলনায়

১। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রসমীক্ষা" [১ম সং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮—পৃঃ ৭৫]

মোটেই স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষগোচর নয়। "আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস এ যুগে কবির কাম্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে তিনি জন্ম-জন্মান্তরের একটি মিষ্টিক রহস্য লাভ করেছিলেন। আর এ যুগে আত্মার আবরণ উন্মোচন করে মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশরূপে তার দিব্যমূর্তি দর্শনের অভিলাষী হয়েছেন।"[১] এ কারণে কোনো কোনো সমালোচকের মতে কবি তাঁর পুরানো ঈশ্বরবিশ্বাস বা নির্ভরতা থেকে দূরে সরে এসেছেন অর্থাৎ আধুনিক যুগের সমাজ এবং সভ্যতা ঈশ্বরের মহিমাকে অস্বীকার ক'রে মানবের যে জয়যাত্রার রথ চালনা করেছে—কবিমানসিকতায় তার একটা প্রভাব হয়তো ভিন্ন প্রতিক্রিয়া এনেছে। অনেকেই এই প্রসঙ্গে 'পরিশেষ' কাব্যের 'প্রশ্ন' কবিতাটিকে উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন—

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

কবিমনে প্রশ্ন জেগেছে—এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ অত্যাচার, হিংসা, নারকীয় হত্যার লীলা চালিয়ে যাচ্ছে—তাদের কি কোনো শাস্তি কখনও হবে না ? বিধাতা কি তাদের ক্ষমা করবেন ? কবিমনে এই প্রশ্ন জাগা তো খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু এই 'প্রশ্ন' বিধাতা সম্পর্কে জাগা মানেই কি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস আসা ? বিশ্বাসবিমুগ্ধ চিত্তে মানবমনে সৃষ্টির অদৃশ্য লীলা সম্পর্কে তো নানা প্রশ্নই মাঝে মাঝে জাগে—কিন্তু মূল বিশ্বাস বা প্রত্যয়বোধে তারা কি আঘাত হানতে পারে ? অত সহজে কবি-মানসিকতার বিচার বা সমালোচনা চলে না। একটি কবিতার মধ্যে 'দয়াময়' বিশ্ববিধাতার বিধান সম্পর্কে যে প্রশ্ন জেগেছে সেই মনোভাবের আলোকে কবির একটি স্থায়ী প্রত্যয়বোধের বিচার হবে অথচ শত শত কবিতার মধ্যে তাঁর স্থায়ী চিন্তা বা চেতনার যে সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে সেগুলি কি তাঁর স্থায়ী জীবনবোধের সাক্ষ্য বহন করছে না ? আসলে কোনো একটি যুগের বিশেষ কোনো একটি কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ অথবা অন্য কোনো লেখার একক সমালোচনার দ্বারা কবিমানসিকতার স্থায়ী বিচার বিশ্লেষণ চলে না। কবি তাঁর 'অধ্যাত্মচেতনা' সম্বন্ধে কবিতা ছাড়াও বহু প্রবন্ধে, নাটকে, সমালোচনায় নানা ব্যাখ্যা নানা অভিমত রেখে গেছেন। 'শেষপর্যায়ে'র কাব্যগুলি যে তিরিশের দশক থেকে ধরা হয়েছে—ঐ যুগেই লেখা "মানুষের ধর্ম" (Religion of Man) বা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে তো তাঁর "অধ্যাত্ম" জীবনবোধের ব্যাখ্যা খুব স্বচ্ছভাবে স্পষ্ট ভাষায় মুদ্রিত।

১। শ্রীঅমিয়কুমার সেন—"প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ" [বিশ্বভারতী ১৯৬১]
"প্রান্তিক-সেঁজুতি-আকাশপ্রদীপ"—[পৃঃ ১৯৪]

"আত্মপরিচয়ে"র একস্থানে কবি বলেছেন—"...আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্‌ঘাটিত করে স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব. কিন্তু আসল শান্তি ও সৌন্দর্য রসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, একথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ।

...আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধির ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শান্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"[১] কবিকে বোঝার জন্য তাই সমালোচনা পাঠের বা অনুমানের উপর ভিত্তি করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর আত্মচিন্তা বা আত্মস্বরূপের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই তো করে গেছেন। "...আমার যা কিছু পরিচয় তা নিঃশেষ হয়েছে আমার লেখায়। তার চেয়ে বেশি কিছু খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা।"[২] এর জন্যে সমালোচকের দ্বারস্থ হতে হয় না। শুধু সেই জীবনবোধের ক্রমবিকাশটিকে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা—তাঁকে চিনে নেবার সহজ এবং সত্য উপায়।

কবি-ঋষির আধ্যাত্মজীবনচেতনায় প্রথমাবধিই কয়েকটি জিনিস কাজ করে গেছে—তা হোল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক শিক্ষা এবং সাধনা; যা কবি-জীবনকে ছোটবেলা থেকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। এগারো বছর বয়সে উপনয়নের পর থেকে 'গায়ত্রী মন্ত্র' তাঁর মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কোনোকিছু না বুঝেই চোখ দিয়ে জল পড়তো; একথা কবি 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের পরিবার ছিল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। এই ধর্মকে তাঁরা আর পাঁচজনের মত সংস্কাররূপে গ্রহণ

১। "আত্মপরিচয়"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [সং ১ বৈশাখ ১৩৫০] [পৃঃ ৭৪, ৭৮]

২। "সাহিত্যপত্র"—বসন্ত সংখ্যা [মাঘ-চৈত্র ১৩৬০]

রবীন্দ্রনাথের প্রত্রাবলী—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত, [৩০শে বৈশাখ ১৩৪০, দার্জিলিং।]

করেননি ; পিতা মহর্ষির জীবনে এই 'ব্রহ্মবোধ' প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। 'উপনিষদে' বা 'বেদ'-এ এই ব্রহ্মের যে স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে কবি তার সেই প্রত্যেকটি মন্ত্রকে আপন উপলব্ধিতে ধরার চেষ্টা করেন এবং তার একটি বাস্তব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও করেন। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে আপন কর্মসাধনায় সেই 'ব্রহ্মবোধ'কে একটি প্রত্যক্ষ রূপ দেবার, আকার দেবার চেষ্টাও দেখা গেছে তাঁর জীবনে। মাঝে মাঝে সংশয়, বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে—প্রশ্ন জেগেছে মনে নানাভাবে, কিন্তু সাধনপথে চলার প্রতিটি পদক্ষেপে এরা পরীক্ষার এক একটি ধাপ মাত্র। যে সৃষ্টিরহস্যের লীলামাধুর্যের মানুষ তল পায় না—তাকে নিয়ে ভয়-অবিশ্বাস-বিস্ময়-বিভ্রান্তি সবকিছুই জাগা সম্ভব এই খণ্ড 'আমিত্ববোধে'র জীবনে, ধীরে ধীরে সেই সমস্ত মানসিকতাকে জয় করে—একের পর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিভাবে জীবনশিল্পী আপন কর্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করলেন—বিধাতার কোন্ উদ্দেশ্যকে আপনার মহতী চেষ্টার মধ্যে সার্থক ক'রে তুললেন—সেটাই হবে তাঁর কবি-মানসিকতার সত্যকার স্বরূপ ব্যাখ্যা।

"শেষপর্বের কাব্যে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়—মনে একটি দুঃখের দাহ বর্তমান, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে মোহভঙ্গের দুঃখ। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মানুষের অবমাননা, শক্তির আস্ফালন, পশুশক্তির জয়, মানবিক ধর্মের ক্ষয় আজন্ম-লালিত বিশ্বাসের ভিত বেশ খানিকটা নেড়ে দিয়েছে। বারংবার বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাব না, কিন্তু সে বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছিল : এটিই দুঃখের প্রধান কারণ। আবার মানুষের উপরে যেমন বিশ্বাস, বিধাতার উপরেও তেমনি আজন্ম বিশ্বাস। বহুকাল মনে এই আশ্বাস পোষণ করে এসেছিলেন যে মানুষের শুভবুদ্ধিই তাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে ; মঙ্গলময় বিধাতার প্রতি আস্থা সে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিল। সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে—'ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস'—এটা হতাশার কথা নয়, বেদনার কথা। মানুষ সম্বন্ধে কোনকালেই পুরোপুরি হাল ছাড়েন নি। অপরপক্ষে বিধাতা সম্পর্কে উচ্চবাচ্য ক্রমেই কমে এসেছে। মধ্যপর্বের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম বলতে হবে। তাই বলে বিধাতার প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই।"[১]

অকৃত্রিম ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে তাঁর মনে 'ব্রহ্মবাদ' যে আসন করে নিয়েছিল তার ফলস্বরূপ প্রচলিত ঈশ্বরবিশ্বাস বা সংস্কারকে কাটিয়ে তিনি একটি স্থায়ী প্রত্যয়বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাত্মচেতনা বা অধ্যাত্মজীবনবোধের একটি স্বতন্ত্র ধর্ম

১। "বিশ্বভারতী পত্রিকা"—কবি ও কাব্য"—রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—শ্রী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। [মাঘ-চৈত্র-১৩৭৭ পৃঃ ২৯২-২৯৩]

হচ্ছে বিশ্বনিখিলের প্রাণরঙ্গভূমির লীলাবিলাসের মধ্যে সেই পরমপুরুষের আবির্ভাবকে অনুভব করা; আর মানবলোকে এর অভিব্যক্তি হোল—

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন্
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে— ['১০৭' সং—গীতাঞ্জলি]

তাই সেই পরমপুরুষের লীলাবিলাসের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ এই আকাশ, এই বাতাস, এই গাছ-পালা-নদী-প্রান্তর এমন কি ছোট্ট ঘাসটি পর্যন্ত যেমন তাঁর বাসভূমিস্বরূপ প্রাণচঞ্চল রূপে অনুভূত, তেমনি মানুষের এই চলমান জীবনছন্দে দেশ কাল উত্তীর্ণ হয়ে সমস্ত মানুষই তার চরম সত্য নিয়ে সেই প্রাণপুরুষেরই আদি এবং অকৃত্রিম লীলারূপে কবির চেতনায়-উপলব্ধিতে মূল্যায়িত।

বিশ্বপিতার শ্রেষ্ঠ সাধনা রূপে এই নিখিল মানব অনন্ত জীবনযাত্রায় সদা প্রাণচঞ্চল। তাই তার ভয়, তার ক্ষুদ্রতা, তার দীনতা সত্য নয়, তার সত্তাতার পরিচয় চিরন্তন সৃষ্টির সাধনায়—তার মহৎ কর্মে, শিল্পে, বীর্যে, ত্যাগে। এই চিরন্তন কালের মানবতার জয়গানই কবির আজন্মের শিল্পসাধনায় ব্যঞ্জিত। কবির ব্যক্তিগত ধর্মবোধ বা অধ্যাত্মবোধ প্রথম জীবনের কাব্যে বা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের যুগে যেমন 'তুমি'-'আমি'র লীলায় স্বতন্ত্র ছিল—ক্রমশঃ অনুভূতির গভীরতার দ্বারা আপন চেতনায় তা একটি নৈর্ব্যক্তিক মহিমা লাভ করে।

বিশ্বসৃষ্টি এবং মানবসত্তার সঙ্গে কবি আপন চেতনাকে এমনভাবে মিলিয়ে দেন যে সঙ্কীর্ণ আমিত্বের স্খলন হয়ে আত্মার এক চিরন্তন স্বরূপ তাঁর চৈতন্যবোধে জাগ্রত হয়। "রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে 'আনন্দস্বরূপ' ("রসো বৈ সঃ") বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি এবস্ট্র্যাকট্ তত্ত্ব মাত্র নহে, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম আপন 'স্বাভাবিকজ্ঞান-বল-ক্রিয়া' ও আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দরস-সমুদ্রে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃতির অফুরন্ত রস-সমুদ্র ও আনন্দ মহাপ্লাবনের সঞ্জীবনী ধারায় অবগাহন করিয়া আপন কবিপ্রকৃতিকে চির সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন; তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ব্রহ্মানন্দের উৎসার স্বরূপ।

......তিনি এই জগতের প্রত্যেক পদার্থকে, ইহার অনন্ত বৈচিত্র্যকে, ইহার আপাত বিরোধ ও বৈষম্যকে মানিয়া লইয়াছিলেন; কেননা; প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই তিনি পরম সত্য, আনন্দস্বরূপ, বিশ্বের একমাত্র নিধানভূত ব্রহ্মেরই লীলা অনুভব করিতেন। সীমার সহিত অসীমের, কর্মের সহিত মুক্তির, ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের কোন বিরোধ তাঁহার

দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই—সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে মধুময়, কেননা, সমস্তই ব্রহ্মের ছায়া 'যস্ত ছায়া অমৃতং যস্ত মৃত্যুঃ'—অমৃতও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া। অতএব ব্রহ্মের মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয়, কেননা ব্রহ্ম অখণ্ড, অদ্বিতীয়।

……বিশ্ববোধের উদ্বোধনেই উপনিষদের মন্ত্ররাজির তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধও তাই উদার গম্ভীর মন্ত্রের মধ্যে আপন অনুভূতির সমর্থন লাভ করিয়া সকল বাধাকে নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল।"[১]

উপনিষদের মন্ত্রগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বা তত্ত্বজ্ঞানে নিজেকে মগ্ন রেখে কবি আপনাকে বিশ্ব থেকে দূরে নিয়ে যাননি। "জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিজের অনুভূতি ও মননের সঙ্গে তিনি উপনিষদের বাণীর 'সায়' পাইয়াছেন।…ইহা ছাড়া ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার আজীবন গভীর শ্রদ্ধা"![২] তাই বিশ্বের বিচিত্র লীলাকে অনুভব করতে চেয়েছেন জীবনের বিচিত্র ভোগসুখের আধারে। তাঁর এই ভোগসুখ যাতে কেবল ইন্দ্রিয়ভোগে পর্যবসিত না হয় সেদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল তাঁর! 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'র যুগে সেই চরম আত্মসমর্পণের মনোভাবের মধ্যেও তাই শুনতে পাওয়া যায় সেই কামনার কথা—

সেই তো আমি চাই—
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই॥
ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই।
এমনি করে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা! ['১৯১' সংখ্যক—পূজা]

প্রতি মুহূর্তে জীবনকে বিচিত্র ভোগসুখের মধ্যে দিয়ে উপভোগ করতে করতে কবি জীবন সাধনার পথে এগিয়ে চলতে চান। জীবনকে অস্বীকার করে কোনো রকম আত্মমুক্তির সন্ধান তাঁর জীবন-সাধনার মর্মকথা নয়। তাই বলেন—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
["৩০' সংখ্যক—নৈবেদ্য]

১। 'রবীন্দ্রনাথ'—সম্পাদক—শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য—[প্রঃ বৈশাখ, ১৩৬৮ মে ১৯৬১]
প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র'—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য [পৃঃ ২১৫, ২১৮]

২। শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত—"উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস"
[১ম সং, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮—॥ ১ ॥ পৃঃ ১১]

দেবতাকে পেতে চান তাঁরই বিচিত্র লীলামাধুর্যের মধ্যে, সেখানে আনন্দের শত শত ধারায় তিনি বিরাজিত মুখরিত; মানুষের মহৎ স্বরূপের মধ্যে তাঁর প্রকাশ চরম উৎকর্ষ লাভে সার্থক।—এই সব কিছুকেই কবি আপন অনুভবে পেতে চান। তাঁর 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার মধ্যে এ সংসারে মানবের ধর্ম কি সে সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা রেখে গেছেন। 'ব্রহ্মমন্ত্র' প্রবন্ধে মানবের এই সংসার ধর্ম সম্পর্কে যে কর্মের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা তো তাঁর অধ্যাত্মজীবনবোধের সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সুন্দর সুসমন্বয়—

"ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারে কর্তব্য কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না; তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহ ও ভাল, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গল কর্মসাধনেই আমাদের স্বার্থপ্রবৃত্তিসকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ, আমাদের হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—

...ইহাই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন।

...ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা, তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থসাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।...সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশ আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।"[১]

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং—১২শ খণ্ড) প্রবন্ধ "ব্রহ্মমন্ত্র" পৃঃ ৬২০-৬২১

শ্রীঅমল হোমকে লেখা একখানি চিঠিতেও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"ধর্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গ ড় তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই 'অচলায়তনে'র আহ্বান।

অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই স্বীকার করি নি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি।"[১]

এইরূপ কবির বিভিন্ন লেখা থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে তাঁর জীবনে অধ্যাত্মবোধ কিভাবে অনুশীলিত। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—জীবনে সত্য কর্ম, কল্যাণ কর্ম সাধনই তাঁর কাছে বড় ধর্ম, অর্থাৎ 'গীতা'র সেই 'ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মে'র নির্দেশকেই তিনি মানবজীবনে সবাপেক্ষা গ্রহণীয় শ্রেয় ধর্ম রূপে স্বীকার করেন। সংসারের সমস্ত দুঃখ, বেদনা, জটিলতা থেকে মুক্তি নিয়ে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতাকে তিনি আত্মমুক্তি বলে তো মনে করেনই না—পরন্তু একে 'আধ্যাত্মিক বিলাসিতা' বলে ঘোষণা করেছেন।

এই তো জীবনরসিক কবির কথা। জীবনের হাসি-কান্না-দুঃখ-বেদনাকে, চলমান জীবনছন্দকে মূল্য না দিলে তাঁকে আজ কবি-ঋষি বলা হোত না। 'কর্মযোগে'র এই মর্ম ব্যাখ্যা কেবল তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠামাত্র নয়। নিজের জীবন দিয়ে এই কর্মযোগের সাধনাকেই তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন বলে মনে করতেন। এরই ফলে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষ একটি সর্বজনীন মানবতাবোধ তাঁর জীবনে রূপ পেয়ে পেয়ে ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত মানুষকে ভালোবেসে মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছেন তিনি, তা বলে সকলেই যে তাঁর ভাবধারাকে বুঝেছে বা প্রশংসা করেছে বা কর্মে সহায়তা করেছে তা নয়—নিন্দা-গ্লানি-বাধা তাঁকেও যথেষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে হতাশা-ক্ষোভ-ক্লান্তি বাসা বেঁধেছে মনে; কিন্তু জীবনপথের এই সমস্ত কাঁটা মাড়িয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চেয়েছেন তিনি। এইভাবে নিজের লক্ষ্যকে স্থির রেখে, অনেকের কাছ থেকে আঘাত এবং অবিশ্বাস পেয়েও, অবিচলিত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যে কর্তব্যপথে এগিয়ে যেতে হবে—এটাই যে দৈনন্দিন জীবনের কর্মসাধনা নির্লিপ্তভাবে—তা শুধু নিজে নিজের

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা—চতুর্দশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক পৌষ ১৮৭৯ শক
শ্রীঅমল হোমকে লিখিত পত্রাবলী—(পত্র সং ৩) ৭ই অগ্রহায়ণ—১৩১৮ শান্তিনিকেতন।

জীবনে পালন করেছেন তাই না—আপন স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবারবর্গকেও পালন ক'রতে নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে লেখা দু'একখানি পত্র থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে সংসারের কঠিন কর্তব্যপথে পথ চলার নির্দেশ কিভাবে তিনি দিয়েছেন—

…"কিন্তু সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোন কালে আসেই, ধৈর্যের সাধনা, সন্তোষের অভ্যাস কাজে লাগেই। তখন মনে হয় প্রতিদিনের যে সকল ছোটখাট ক্ষতি ও বিঘ্ন, সামান্য আঘাত ও বেদনা নিয়ে আমরা মনকে নিয়তই ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত করে রেখেছি সে সব কিছুই নয়। ভালবাসব এবং ভাল করব—এবং পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সুমিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন করব—এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক। জীবনও বেশি দিনের নয় এবং সুখ-দুঃখ নিত্য পরিবর্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা—এসব জিনিসকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে অশান্তিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সংঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই—তাহলে জীবন একেবারেই ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম—এই হল জীবনের সফলতা।"[১]

আবার অন্য একটি চিঠিতে বলেছেন—"আমাদের শোকদুঃখ, বিরাগ-অনুরাগ, ভাললাগা-না লাগা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সংসারের কাজকর্ম, সমস্তই আমাদের বাইরে;—আমাদের যথার্থ "আমি" এর মধ্যে নেই—এই বাইরের জিনিসকে বাইরের মত করে দেখতে পারলে তবেই আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়—সে খুব শক্ত বটে কিন্তু পদে পদে সেইটে মনে রেখে দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া যায়, তখনি আপনাকে আপনার অমরত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই।

…ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোনমতেই নষ্ট হতে দিলে চলবে না—কারণ, এমন লোকসান আর কিছুই নেই—এ যেন দু' পয়সার জন্যে লাখটাকা খোয়ানো।"[২]

তাঁর এই সমস্ত চিঠিপত্র থেকে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে কর্তব্য পথে কত সাবধানে দৃঢ়মনে এগিয়ে যেতেন তা বোঝা যায়। মানুষের অমর আত্মা সব কিছুর ঊর্ধ্বে—তাকে

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" (১ম খণ্ড)—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত। পত্রসংখ্যা—১৬ সং-কার্তিক, ১৩৫১, পৃঃ ২৮-২৯

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" (১ম খণ্ড)—শ্রীমৃণালিনী দেবীকে লিখিত। পত্রসংখ্যা—১৭ পৃঃ ৩২-৩৩, কলকাতা—২৯ আগষ্ট, ১৮৯৯

কোনো অবস্থাতেই ছোটো করা চলবে না। শেষ জীবনে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রেও কবির এই অধ্যাত্মচেতনা বা ধর্মবোধের একটি পরিপূর্ণ ছবি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে —

"মনে জেনো, ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব—যেমন আগুনের ধর্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতাকে কোন এক অংশে বিশেষভাবে খণ্ডিত করে তাকে ধর্ম নাম দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বকে আঘাত করি।

...মানুষের পরিপূর্ণতার যে ধর্ম তার মধ্যে ত্যাগ আছে, ভোগ আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, কর্ম আছে, চিন্তা আছে, সৌন্দর্য আছে, কঠোরতা আছে—এই সমস্ত কিছুর শ্রেয়স্করতা হচ্ছে তার সর্বজনীনতায়, তার নিত্যতায়—অর্থাৎ এই সকলের মধ্য দিয়ে আমরা মহামানবের শাশ্বত অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে সার্থক করি। আমার সার্থকতা যদি সকল মানুষের সার্থকতা না হয় তবে সে ধর্মের ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে, বিষয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়।"[১]

কবির অধ্যাত্মচেতনা বা ধর্মবোধের স্পষ্ট একটি ছবি এই সমস্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত প্রচলিত নীতি-নিয়মকে কাটিয়ে যে বিশেষ জীবনদর্শনকে ভাবধারাকে আপনার উপলব্ধিজাত সত্যবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কবি—সেই উপলব্ধিজাত সত্যবোধকে জীবন দিয়ে স্বীকৃতিও দিয়ে গেছেন। কবি বা শিল্পী হিসাবে এই জীবনসাধনাই তাঁকে পরিপূর্ণ মহান মানবের মর্যাদা এনে দিয়েছে। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের সাধনাই তাঁর সমগ্র জীবনের অধ্যাত্মসাধনা।

ভারতীয়ের বা বাঙালীর ধর্মচেতনায় তাই যে সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা আছে, কবির তাদের সম্পর্কে কোনো রকম আগ্রহই ছিল না। অবশ্য ব্রাহ্মধর্মের নিয়মানুসারে তাঁদের পরিবার পৌত্তলিকতার বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউ কেউ নিজেকে সমাজের আশপাশের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি; কিন্তু কবি কোনো অবস্থাতেই স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হননি। এ সম্পর্কে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন—

পুরীর মন্দিরে "আরতি শেষে শত সহস্র বৎসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাব-ভরিত সেই গগনতলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির-দ্বারে আজকের সহস্র সহস্র ভক্তদের ভক্তি-তরঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে আমরাও উদ্দেশে প্রণত হলুম।

এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র— ৯ম খণ্ড—শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত (প্রকাশ: বিশ্বভারতী ১৯৬৪) পত্রসংখ্যা— ৫৩, পৃঃ ১০৬-১০৭, দার্জিলিং, ২৬ অক্টোবর ১৯৩১

প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন —"তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি ? মিথ্যাচার করলি ?"

হায় ! ৬ নং যোড়াসাঁকোর বাঁধা অবিশ্বাসের পথ থেকে সরে অনেক ছেলেমেয়ে বউই যে যুক্তির অবলম্বনেই পুরোন বিশ্বাসের valley-তে চলে এসেছেন সে বিষয়ে ক্রমেই যত পরিচয় পেতে থাকলেন ততই রবিমামা ক্ষুণ্ণ হতে থাকলেন।"১

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় প্রচলিত পারিবারিক ধর্মবোধকে তিনি কেবল সংস্কারের মত গ্রহণ করেননি—সমগ্র চৈতন্য দিয়ে সেই 'ব্রহ্মবোধ'কে অনুভব করেছিলেন, এবং সমগ্র জীবন দিয়ে তার একটি বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টাও করেছিলেন।

সরস্বতী বা লক্ষ্মী কখনো কখনো তাঁর রচনার মধ্যে ঠাই পেলেও মনে হয় কাব্যের উপাদান হিসেবেই তারা মূল্য পেয়েছে—তার বেশি কিছু নয়। একমাত্র দেবতাদের মধ্যে সন্ন্যাসী বৈরাগী মহাদেব তার কল্পনামণ্ডিত হয়ে বহুবার কাব্য-প্রবন্ধে-গানে মূর্তি পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন আমাদের চোখের সামনে। দেবাদিদেব মহাদেব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর ডমরু বাজিয়ে চলেছেন তিনি। শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্ রূপে শান্তি-কল্যাণ-মঙ্গল-ত্যাগ ও বীর্যের সাধক তিনি। বাহিরে সর্বত্যাগী—অন্তরের ঐশ্বর্যে সবজ্ঞানী তপস্বী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নটরাজের এই ছবিই কবির বাণীসুষমায় বিচিত্র রূপে এবং ভাবে ব্যাখ্যাত। মনে হয় ব্রহ্ম বলতে যে পরমপুরুষ বা জ্যোতির্ময় সত্তার কল্পনা কবি করতেন 'নটরাজে'র এই মূর্তির সঙ্গে তার ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন কবি। তাই জীবনে বহুবার এই নটরাজের কাছে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে বল-বীর্য প্রার্থনা করেছেন। বাইরের কর্মজীবনের স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে নটরাজের ত্যাগের দীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্তরে করতে চেয়েছেন মহাজ্ঞান তপস্বীর আন্তর ঐশ্বর্যের সাধনা।

শেষ জীবনের কাব্যেও এই সন্ন্যাসীর কাছে বহুবার দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন—প্রার্থনা করেছেন শক্তি-বল-বৈরাগ্যের। নিজের মধ্যে 'শিব'কে তিনি অনুভব করতেন শেষ বয়সে, এ কথাও শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর কাছে শোনা গিয়েছে। ওই কথা বর্তমান লেখিকার কাছে সম্প্রতি এক চিঠিতেও তিনি সমর্থন করেন :

"কোন্ কথা প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল, তা আমার মনে নেই। বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আমার মধ্যে আমি শিবের ভাব অনুভব করি। 'শিব' বলতে যে ভাবটি, যে ছবিটি মনে উদয় হয়, আমি আমার মধ্যে সেটিকে অনুভব করি।' কথাটা বলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, 'তুমি যেন কারো কাছে একথা বোলো না।' আবার

১। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী—"জীবনের ঝরাপাতা" (প্রকাশ : ১৯৫৮) ॥ দশ ॥ 'উৎসব'—পৃঃ ৭০

এক প্রশ্নের উত্তরে আরেকদিন বলেছিলেন, তাঁর উপাস্য দেবতাকে তিনি নিজের আত্মার মধ্যেই উপলব্ধি করেন। নিজের বাইরে তাঁকে দেখেন না।"…(৩ মাঘ, ১৩৭৮, পুরী)

'শেষসপ্তক'-কাব্যের 'সাত' সংখ্যক কবিতায় সমস্ত সৃষ্টির বুকে এই কালের অধীশ্বরকে দাঁড় করিয়ে বলেছেন—

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি

*   *   *   *

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির সমস্ত উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু, আসা-যাওয়ার পটভূমিকায় মনের অবিচলিত শান্তিকে রক্ষা করতে হলে ঐ নির্মম মহাকাল সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই জীবনে দীক্ষা নিতে হবে। এক হাতে ধ্বংস, অপর হাতে সৃষ্টির লীলাখেলা করে চলেছেন যিনি—কালের সেই অধীশ্বরের কাছে আশ্রয় চাচ্ছেন কবি। জীবনকে, সৃষ্টিকে কঠিন বৈরাগ্যে দেখবার দৃষ্টিকে প্রার্থনা করছেন।

এই নটরাজের পূজা চলেছে যে সমস্ত সৃষ্টির উন্মত্ততার মধ্যে, দুর্দমতার মধ্যে, সেই কথা ঘোষণা করেছেন কবি 'বীথিকা' কাব্যের 'সন্ন্যাসী' কবিতায়। স্তব্ধতার মধ্যে বসে শান্তির ধ্যান করলেও তিনি যে ভীষণ, প্রলয়ংকর; অসত্যকে অমঙ্গলকে সংহার করেন—তা 'বীথিকা'র 'নমস্কার' কবিতার মধ্যে দিয়ে বলেছেন—

প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা;

*   *   *   *

ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি;

সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

কবি যেন এই সৃষ্টির দেবতার লীলাখেলা পর্যবেক্ষণ করছেন জীবনের শেষপর্বে দাঁড়িয়ে। মহাকালের বুকে সৃষ্টির এক নিষ্ঠুর লীলা চলেছে। 'আনন্দ' আছে এই সৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু 'মমত্ব' নেই; 'ভাঙায় গড়ায়' তার সমান উৎসাহ। কবির কাছে তাই মহাকালের এই স্পষ্ট ছবি আজ ফুটে ওঠে—

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জান
নিত্যকালের কবি— ['নমস্কার'—বীথিকা]

এই মহাকাল সন্ন্যাসীও কবি, শিল্পী,—তিনি বিশ্বসৃষ্টিকর্তা; সৃষ্টির বুকে যুগে যুগে কত নিত্যনূতন ছবি এঁকে চলেছেন—কিন্তু অসত্যকে, অপূর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। দুঃখ, লজ্জা, ভয়কে জয় করে যে এই কঠিনের সাধনার দ্বারা মহা বেদনার মূল্যে জীবনের অমৃতকে লাভ করতে পারবে তাকেই এই রুদ্রদেব তাঁর প্রসাদকণায় সম্মানিত করবেন। সমস্ত সৃষ্টির বুকে সেই মহাপুরুষই অমৃতের পুত্র হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বলে সম্মানিত যিনি জীবনের কঠিন মূল্যে সেই অমৃতকে ক্রয় ক'রে নিতে সমর্থ। কবি মনে করেন, এই প্রলয়ের ক্ষেত্রে মহাকাল সন্ন্যাসীর যে রূপ, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেও কখনো কখনো তাঁর সেই রূপের প্রকাশ আছে; কিন্তু কবি তো শান্তম্ শিবম্ সুন্দরমের পূজারী। তাই—

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়;

['১২' সং—পত্রপুট]

কিন্তু এই 'শ্মশানচারী ভৈরবে'র রুদ্র মূর্তির 'পরিচয়-জ্যোতি' তাঁর কাছে ম্লান হয়ে থাকলেও কবির তাতে খুব বেদনা নেই। কারণ—

চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নিচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।

['অমর্ত্য'—সেঁজুতি]

'নৃত্যপাগল নটরাজে'র মত জীবনের চলমান ছন্দটুকু থেকেই কবি আনন্দ খুঁজে নিতে চান। 'বস্তুবাঁধন ডোর'কে কাটিয়ে দেহের অতীত কোন্ এক দেহকে তিনি যেন

'কেবল রস-সুরে'-অনুভবে ধরার চেষ্টা করেন। 'গভীর হতে বিচ্ছুরিত' 'আনন্দময়' এই 'দ্যুতি'ই কবির জীবনে 'অমর্ত্যে'র (সেঁজুতি) সন্ধান দেয়। চলমান জীবনের বিশেষ আনন্দপূর্ণ মুহূর্তটুকুই তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ সত্য বয়ে আনতে সমর্থ—ওটাই তাঁর কাছে 'অমর্ত্য'। তাই বলতে পারেন—

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।— ['অমর্ত্য'—সেঁজুতি]

কিন্তু সৃষ্টির এই ভাঙন-গড়নের খেলা সম্বন্ধে কবিমনের যে রহস্যবোধ তা আজন্মের। এই 'কেন' (নবজাতক) আজও কোনো উত্তর খুঁজে পায় না—

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন। ['কেন'—নবজাতক]

এই বিশ্বরহস্য সম্পর্কে বিস্ময়বোধকে চিরজাগ্রত রেখে কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে চাইছেন জীবনের শেষলগ্নেও—

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়,

['১'-সং,—রোগশয্যায়]

মহাকাল 'মানুষের চিত্ত' নিয়ে সারাবেলা 'দ্যূত খেলা' করে চলেছেন—এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অহঙ্কার এখানে চূর্ণ; সে এই খেলার পুতুল মাত্র। তাই মানুষেরই সমস্ত জীবনের অর্জিত কীর্তি, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ নিয়ে কোনো মোহ না থাকাই শ্রেয়। আপনার অর্জিত যা কিছু সবায় যেন নিরাসক্ত মনে সেই 'মহেন্দ্রের পদতলে' রেখে কবি প্রশান্ত মনে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন পৃথিবী থেকে, এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'নটরাজ' তো সমস্ত ধ্বংস ও সৃষ্টির বুকে এমনি নির্বাক্, নিস্তব্ধ, নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যুগ-যুগান্তর ধরে; কবি আপন অনুভবে আজ সেটা দেখতে পান।—

দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী। ['৯' সং—আরোগ্য]

মহাকালের উত্থান-পতনের বুকে 'নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী' দাঁড়িয়ে আছেন স্তব্ধ হয়ে।

মানুষও তো এই মহাকালের বুকে কঠিন কর্তব্যপথে একা যাত্রী,—স্তব্ধভাবে নিষ্ঠুর নির্মমতার সঙ্গে পথ কেটে কেটে সম্মুখের দিকে কেবল এগিয়ে চলেছে। বাধা, ক্লান্তি, অবসাদ মুহূর্তের জন্য বিচলিত করতে পারে তাকে, কিন্তু থামতে দেবে না কোথাও।

মহাকাল তপস্বীর কাছ থেকে জীবনে এই বৈরাগ্যের দীক্ষা গ্রহণ করে কবি নিরাসক্তভাবে কল্যাণ-কর্ম-সাধনকেই জীবনে সব থেকে বড় 'ধর্ম' বলে স্বীকার করে নিলেন। তাই মানুষের প্রতি সব সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে চাইলেন—সবমানবের প্রেমের মধ্যেই যে ভগবান বিরাজ করেন এ-কথা যেন তার জীবনের প্রথম এবং শেষ কথা হয়ে রইলো। 'সুন্দর ভুবনে' তিনি 'মরিতে চাহেন না—

মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

['কবির মন্তব্য'— কড়ি ও কোমল]

এ-কথা তাঁর কাব্যের মর্মকথা।

তাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে মানুষ হিসেবেই মূল্য দেবার কথা বার বার করে বলে গেলেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"বয়স সত্তর হলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই।...এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। এই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।"[১]

মানুষকে এই কবি মূল্য দিলেন সবার উপরে। তাই তাঁর ধর্ম আর কিছুই নয়—এই মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মূল্যবোধই জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই এই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অপমান, অশিক্ষাকে দূর করার চেষ্টাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম তথা কর্ম হয়ে রইল। ধর্মের নামে আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের যে পুঞ্জিত ঘৃণা এবং অবমাননা তা কবি-হৃদয়ে গভীর ব্যথা এবং আত্মধিক্কারের রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রবন্ধ বা অন্যান্য গদ্য রচনাকে অতিক্রম করে কাব্যেও এই বেদনাবোধের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অস্পৃশ্যতা-বর্জন' প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর

১। "অনামী" ২য় সং—আশ্বিন, ১৩৬৫ ("আনন্দবাজার পত্রিকা"—৩রা ফাল্গুন ১৩৩৯, ১৫ই মে ১৯৩৩) পৃঃ ৩৩৯-৩৪০

যে আন্দোলন সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি মানুষের প্রকৃত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

"মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নতমস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে,"[১] ....(শান্তিনিকেতন, ৫ আশ্বিন ১৩৩৯)।

এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই 'অস্পৃশ্যতাবর্জন' আন্দোলনকে সমর্থন করে কবি 'পুনশ্চ' কাব্যের 'মুক্তি' (১৪ই মাঘ ১৩৩৯), 'প্রেমের সোনা' (মাঘ ১৩৩৯), ও 'স্নান সমাপন' (১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৯) নামে তিনটি কবিতা লেখেন। এছাড়া 'শুচি', 'রঙ্‌রেজিনী', 'প্রথমপূজা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও দেবতার বাস যে মানবহৃদয়ে এবং সমমানবের প্রতি প্রেমেই যে তাঁর পূজা এই কথা ঘোষণা করলেন। 'পুনশ্চে'র 'শুচি' কবিতায় কবির সেই মনোভাবই ফুটে উঠেছে—

গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি'।
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে!
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,

'স্নান সমাপান'-এ (পুনশ্চ) তাই গুরু রামানন্দ 'ভাজন মুচি'-কে বুকে তুলে নিলেন; তাঁর এতদিনের দেবতাকে খুঁজে পেলেন মানুষের মাঝে—যে মানুষের জাতি নেই, সমাজ নেই, ধর্ম নেই, অর্থ নেই, শিক্ষা নেই—আগে কেবল একটিমাত্র পরিচয় যে, সে 'মানুষ'।

'পত্রপুট' কাব্যের 'পনেরো' সংখ্যকে কবি তাই বলেছেন—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্র-বর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী (একাদশ খণ্ড: প্রবন্ধ); জন্মশতবার্ষিক "মহাত্মাজির পুণ্যব্রত" —পৃঃ ৪৫৯.

কবি নিজেকে ওদের মাঝখানে নামিয়ে এনে বলেন—

কবি আমি ওদের দলে—
[আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।]

['পনেরো' সং—পত্রপুট]

মানুষের সেবাকেই তিনি দেবতার সেবা বলে মনে করলেন—

আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে। [ঐ]

'বীথিকা' কাব্যে 'দেবতা'র (বীথিকা) স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কবি তাই বলেন—

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্যলীলায়।

* * *

মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

'জন্মদিনে' কাব্যেও—

আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী [২৮ সং—জন্মদিনে]

এই কথা বলে কবি আপন পরিচয়কে পুনর্বার ঘোষণা করে গেলেন।

দেবতার নামে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারকে কটাক্ষ করে কবি তাই 'চীনে'র প্রতি অত্যাচারী 'জাপানী'দের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

['নবজাতক' : বুদ্ধভক্তি' কবিতার অবতারণা প্রসঙ্গে]

['নবজাতক' কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় ঐ তথাকথিত ধার্মিক ভক্তদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষবাণ বিঘোষিত হয়ে উঠেছে—

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।

একদিকে অত্যাচারী ও অপরদিকে অত্যাচারিত মানুষের ছবি কবির কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দেবতার নামে অত্যাচারী মানুষের বিশ্বময় এই নির্মমতার একদিন শেষ

আছে—নিপীড়িত শক্তিই একদিন তার জবাব দেবে, এ বিশ্বাস কবির শেষ জীবনেও অটুট—

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির [‘প্রায়শ্চিত্ত’—নবজাতক]

মানুষের এই অপরাজেয় শক্তির প্রতি কবির আজন্মের বিশ্বাস এবং এই শক্তিকে জাগ্রত করার কথা কবি ‘মানুষের ধর্ম’ গ্রন্থে বলে গেছেন।…“আত্মার পরাজয় নাই, ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, মৃত্যু নাই—ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার এই মহান বাণীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি জগতের যত অন্যায়, অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ ক্লীবের নির্বিরোধ ভাববিলাস নয়,—সংগ্রামবিমুখ পলায়নপরতা নয়,—তা’ বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনদর্শন।

“……কিন্তু তবুও অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা এক এক সময় অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিষ্ফল ক্রন্দনের মত শুনাইয়াছে যাহাতে সত্য সত্যই মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি আঘাত পায়।

“আসলে কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী মানসিক প্রবণতার অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকাল তাঁহার মধ্যে চলিয়াছিল। একদিকে তাঁহার যুক্তি ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা এবং বাস্তবতাবোধ, অপরদিকে তাঁহার অধ্যাত্মবাদ ও মরমীয়া লীলাবাদ;—একদিকে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতা, অপরদিকে সংগ্রাম বিমুখতা ও শান্তিরস নিমগ্নতা;—একদিকে বাস্তব গঠনমূলক কর্মপ্রবণতা, অপরদিকে রোমান্টিক ভাবালুতা।”[১]

রবীন্দ্র-মানসিকতার বহুমুখী ভাবপ্রবণতাকে সমালোচক খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এখানে। এই বিচিত্রধর্মী প্রবণতা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে; যার ফলে ‘শেষপর্যায়ের’ কাব্যে রবীন্দ্র মানসিকতার আলোচনায় অনেক বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে ‘শেষপর্যায়ের কাব্যে’ কবি-মানসিকতায়, কবির বিশেষ উপলব্ধিজাত অধ্যাত্মবোধ বা জীবনদর্শন ‘তুমি’ ‘আমি’র লীলায় কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিশ্বময় গিয়েছে তাহা ছড়ায়ে। উপনিষদের মন্ত্ররাজির উদাত্ততার মধ্যে সৃষ্টিশক্তির যে সর্বানুভব চৈতন্যসত্তার কথা বর্ণিত আছে—কবি সেই সত্তার সঙ্গে আত্ম-

১। শ্রীনেপাল মজুমদার—“ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ”, ৩য় খণ্ড (প্রকাশ: ফাল্গুন, ১৩৭৪) পৃঃ ৩৭৯, পৃঃ ৪৮২

সত্তার এমন একাত্মসাধন করেছিলেন যে, এই বিশ্বনিখিলে অবস্থিত চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র থেকে গাছপালা-মাটি জল সবকিছুর সঙ্গেই আপনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করতেন। বৈদিক "ঋষিবাণীগুলি যেন তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন-সংগীতের কয়েকটি ধ্রুবপদের মত বারংবার আবর্তিত হইয়া ফিরিয়াছে। এইগুলিই যেন তাঁহার জীবনসাধনার সর্বপ্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"...কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ও যে দৃষ্টিতে উপনিষদের মন্ত্ররাজিকে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতার রূপ আছে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তি, সৌন্দর্যসম্ভোগ, বিশ্ববোধ মানবমনের যতকিছু বহুমুখী বিচিত্র বৃত্তি, সমস্তই উপনিষদের মন্ত্রের অক্ষয় উৎস হইতে আপন আপন চরিতার্থতা লাভের উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে।"[১] —এবং কবির ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল।

বিশ্বরূপ এবং বিশ্বসৌন্দর্যসত্তার মধ্যে কবি সেই আদিম প্রাণের সূত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন। সূর্য তার তেজঃরসধারায় পুষ্ট করে চলেছে, প্রাণ-দান করে চলেছে সমস্ত বিশ্ব-জগতকে। জগতের সমস্ত খণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা, জড়তা ও তমসার আড়ালে অবস্থিত সেই জ্যোতিষ্মান তেজোরাশিকে কবি আদিম প্রাণের উৎসরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মানবসত্তা যেন সেই আলোকের দূতরূপে প্রাণরঙ্গভূমিতে বাঁশি বাজাতে এসেছে। বিশ্বসৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্ট এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোলায়িত এই সমগ্র মানবজীবনের উত্থান-পতনকে কবি যেন মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে দার্শনিকের দৃষ্টিতে, জীবনরসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন এবং সমগ্র জীবনের অনুভব দিয়ে তার বিচিত্র ব্যাখ্যাও দেবার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যায়ের কাব্যে কবির বিচিত্র জীবন-দর্শন আপন উপলব্ধিজাত সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মচেতনামূলক কবিতাগুলির ভাবসম্পদ যুগিয়ে গেছে। কবির অধ্যাত্মচেতনা বা ধর্মবোধ স্বতন্ত্র কিছু নয়—আপন প্রজ্ঞার আলোকে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে জীবন ও জগৎকে অনুভব। "শেষবয়সের কবিতাগুলির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা এবং তৎসঙ্গে উপনিষদের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কবি-অনুভূতির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইলেও এখানে একটা সচেতনতাকে অস্বীকার করা যায় না।"[২] এই সচেতন অনুভব কিন্তু সার্থক হয়ে উঠেছে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রসিক শিল্পীর আনন্দরস উপভোগের একাগ্রতায়। যত বেশি বিশ্বমহাজীবনের রহস্যমূর্তি তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে, স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে—তত বেশি

১। 'রবীন্দ্রনাথ'—সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য (প্রকাশ; বৈশাখ ১৩৬৮) প্রবন্ধ—"রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র"—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য পৃঃ ২১০, ২০৯-২১০

২। শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত—"উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস" (১ম সং; অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) ॥৪॥ পৃঃ ৩৫

জীবনকে ভালোবেসে আনন্দে-মাধুর্যে তাকে কানায় কানায় ভরিয়ে যেতে চেয়েছেন। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায়, 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'অহংবোধ', 'ব্রহ্ম', 'কর্মসাধনা' প্রভৃতি তত্ত্বের যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, সেই আলোকে শেষের দিকের কবিতাগুলির মধ্যে দিয়েও বহুস্থানে জীবনের তত্ত্ব ও তাৎপর্য এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা করে চলেছেন। 'শেষ-সপ্তক' কাব্যের 'চার' সংখ্যক কবিতায়—

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।

* * *

আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে;

* * *

এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে।

কত সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করার বাসনা। সমস্ত জটিলতা, সমস্ত বন্ধন, সমস্ত পরিচয়হীন, অহংকারহীন একটি মুক্ত আত্মার সহজ জীবন-সাধনা। ঔপনিষদিক ভাবধারায় পুষ্ট বিশেষ অধ্যাত্ম-জীবনদর্শনই কবির এইরূপ চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু জীবনের বহুমুখী জটিলতা কবির রহস্যবোধকে তথাপি নাড়া দেয়—

বহুবিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে?
তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে;
বলেছে ... ...

* * *

"এস প্রকাশ, এস।" ['৫' সং—শেষসপ্তক]

জীবনের রহস্যকে কবি ব্যাকুলভাবে অনুভব করেছেন—ভেদ করতে চাইছেন তার দুর্গমতাকে ; কিন্তু আজও বেদনা থেকে যায়—

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে।

['পাঁচ' সং—শেষসপ্তক]

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'নয়' সংখ্যকেও দেখা যায় আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে কবিমনে সেই একই কৌতূহল ; আপন উপলব্ধির দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা—

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, অচেনা ;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না।

আজন্মের সাধনা দিয়েও কবি যে সৃষ্টির এবং জীবনের রহস্যকে ভেদ করতে সমর্থ হননি সেই বেদনাও অনুরণিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে।—

……ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে

* * *

এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক। ['৯' সং—প্রান্তিক]

কিন্তু এই 'প্রকাশ' তো তাঁর কোনো বাস্তব রূপ নিয়ে কবির কাছে ধরা দিতে চান না। 'রূপ-বিরূপ'-এর (নবজাতক) নৃত্য নিত্যকাল ধরে চলেছে কালের বুকে; কবি তার সত্য স্বরূপকে অনুভব করেন আপন চেতনায়। 'অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত' যে 'সত্যের মহিমা' ('২৫' সং—রোগশয্যায়) কবি তাকে অনুভব করেন আপন জীবনে। সৃষ্টি ও জীবনের অখণ্ড সত্যকে 'জীবনের দুঃখে-শোকে-তাপে' একান্তভাবে অনুভব করেন। 'মানবচিত্তের সাধনায়' যে সত্যের রূপ নিহিত হ'য়ে আছে—তা যে 'সুখ দুঃখ সবের অতীত' ('২৯' সং—রোগশয্যায়) তা আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে তাঁর অনুভবে। এই সত্যকে অনুভব করতে পারেন বলেই কবি বলতে পারেন—

শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল। ('৩৬' সং—রোগশয্যায়)

'প্রকাশে'র এই আনন্দে মাধুর্যে জীবনকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে পৃথিবীকে আরও বেশি করে ভালোবেসে যেতে চাইলেন। আপন সত্তার আনন্দ-রূপটির প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন এবং পৃথিবীরও সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে তার আনন্দময় প্রকাশটুকুকে সত্য বলে গ্রহণ করতে চাইলেন সমস্ত জীবন দিয়ে, চৈতন্য দিয়ে। তাই সেই কবি-ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি— ['১' সং—আরোগ্য]

পৃথিবীর এই মধুময় রূপটিকে সত্য বলে উপলব্ধি করা মাত্র তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
['১' সং—আরোগ্য]

তাই এই পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর কাছে আজ সেই সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ রূপে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিশ্বদেবতার প্রতিও প্রণতি রেখে যান 'সকৃতজ্ঞ মনে'—

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে। ['২৯' সং—আরোগ্য]

'এ জন্মের অধিদেবতারে' ('১৪' সং—প্রান্তিক) প্রণাম জানিয়ে কবি সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে চান শান্ত নিরাসক্ত মনে। বিশ্বে শুধু 'সুন্দরে'র 'প্রকাশ'কেই দেখেন নি তিনি—

যাহা রুগ্ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার। ['জয়ধ্বনি'—নবজাতক]

জীবনের অপূর্ণতার দিক, বিকৃতির দিককে কবি অস্বীকার করেন না কিন্তু এও তিনি স্বীকার করেছেন—

যতকিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি [জয়ধ্বনি'—নবজাতক]

এই অখণ্ডবোধের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার ফলে জীবনের সত্য স্বরূপটি তাঁর কাছে এক মহামহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য-গ্লানি-লাঞ্ছনা, সমস্ত অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই খণ্ড অনিত্য রূপের মাঝে 'নিত্যের জ্যোতি'কে ('১' সং—আরোগ্য) ধ্রুবতারা ক'রে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় 'ধর্ম'। এ 'অধ্যাত্মচেতনা' খণ্ড নয়—বিচ্ছিন্ন নয়; পরিপূর্ণতার গভীরতম ও কঠিনতম উপলব্ধি—'অপরাজেয়-আত্মা'কে চিনে নেওয়া বুকের রক্ত দিয়ে।

॥ ৩ ॥

মর্ত্যচেতনা

ভূমিকা

ভাবসম্পদের দিক থেকে কবিমনের 'আত্মচেতনা' ও 'অধ্যাত্মচেতনা'কে বাদ দিলে বাকি থাকে 'মর্ত্যচেতনা'। এই মর্ত্য পৃথিবীর একদিকে রূপে ভরা, রসে ভরা, সৌন্দর্যে প্রাণবান নিত্য সজীব প্রকৃতিলোক ; আর একদিকে সুখে-দুঃখে-হাসি-কান্নায় বিজড়িত, দোলায়িত, এই মানবলোক। কবিজীবনের প্রথম পর্ব থেকেই এই মর্ত্যপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র ধারায়। মাটির পৃথিবীকে কবি ভালোবেসেছেন তার সবটুকু পূর্ণতা এবং অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই। কবিমনে একটি বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যবোধ প্রথমাবধিই জাগ্রত ছিল। এ সৌন্দর্যের বাসভূমি রোমান্টিক কবিমন। নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত অনির্বচনীয় অসীম সৌন্দর্যের কল্পনায় এই রোমান্টিক কবিমন সমৃদ্ধ। এর থেকেই জন্ম নিয়েছে অসীমের প্রতি, অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকের প্রতি কবিমনের মানস অভিসার এবং সীমার মধ্যে, জীবনের খণ্ড রূপের মধ্যে এই সৌন্দর্যের অনিঃশেষ সন্ধান। কিন্তু এ সৌন্দর্যের অবস্থিতি বোধ করি মর্ত্য পৃথিবীর এই সীমিত জীবনবোধের মধ্যে নয়—তাই কবিমনে আসে তীব্র ব্যাকুলতা, বিধুরতা, ক্লান্তি। কবিচিত্ত ব্যথিত হয়, পীড়িত হয়। তথাপি মর্ত্যপ্রেমিক জীবনরসিক কবি সীমার মধ্যে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনাকেও দুহাত দিয়ে ছুঁয়ে নিতে চান। আপন জীবনের সার্থকতাকে মিলিয়ে দিতে চান এই তুচ্ছতার মধ্যে। 'শুধু দিন যাপনের' প্রাণ ধারণের গ্লানিও তাঁর কাছে ভয়াবহ। সীমা অসীমের খেলা চলে তাঁর মনে আজন্মকাল। এই একই অনুভূতির পরিচয় শেষজীবনের কাব্যেও পাওয়া যায়।

মর্ত্যপৃথিবীর জল-স্থল-আকাশ জুড়ে আছে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত লীলা। সেই মূক-বোবা প্রকৃতি তার রূপ-রস-মাধুর্যের সম্ভার নিয়ে জীবনের প্রথম লগ্নেই কবির হৃদয়দ্বারে এসে আঘাত করেছে। তাঁর কাব্যজীবনসাধনার ক্ষেত্রে এই 'প্রকৃতিচেতনা' তাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

॥ ক ॥

প্রকৃতিচেতনা

সৌন্দর্যের এবং বিশ্বাত্মার লীলাভূমি এই প্রকৃতিজগৎ স্বভাবতঃই কবির জীবনে এবং কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি মায়াবিনী তাঁকে নানাভাবে কাজ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে আঙিনায়, বাতায়ন-পথে, বিশ্বজগতের বিচিত্র লীলারঙ্গভূমিতে। ঋতুতে ঋতুতে তার নিত্য নূতন স্বাদ, নিত্য নূতন রূপবদল, কবিকে মুগ্ধ করেছে। 'প্রকৃতি' তাঁর জীবনে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রকৃতিকে কখনও তিনি জড় নির্জীব রূপে কল্পনা করেন নি; অনুভব করেছেন তার মধ্যে একটি সচল প্রাণের গতিকে। ঋতুতে ঋতুতে রসের ডালি পূর্ণ করে নিয়ে মানুষের দ্বারে তার যে/আবির্ভাব, তা যেন ব্যর্থ না যায় মানবজীবনে। যে দাক্ষিণ্যে সে ভরিয়ে দিয়েছে আমাদের হৃদয়কে কানায় কানায়, তার সেই কারুণ্য, সেই মাধুরী, সেই অযাচিত দানকে যেন সমস্ত দেহ-মন দিয়ে টেনে নিতে পারি আপন চৈতন্যে—সত্তার গভীরে। প্রকৃতি যে তার জীর্ণতাকে ঝরিয়ে খসিয়ে দিয়ে প্রতিক্ষণে জীবনের নব নব জয়যাত্রার পথ মুক্ত করে দিচ্ছে—এই গতিপ্রাণতা থেকে কবি আপন জীবনেরও একটি চলচ্ছন্দকেই আবিষ্কার করলেন যেন। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঠ গ্রহণ করতে পারে বলে কবি মনে করেন। এই অসীম আকাশের উদার বৈরাগ্য এবং মহাসমুদ্রের প্রশান্ত উদারতা, আমাদের প্রতিদিনের তাপিত চিত্তকে স্নিগ্ধ ক'রে দিচ্ছে—সরস করে দিচ্ছে—নবীন করে দিচ্ছে।

জীবনের প্রথম থেকেই এই প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্যময়তার সন্ধান কবি পেয়েছিলেন, সেই দুর্নিবার রহস্যবোধ কোনোদিনই তাঁর মন থেকে ঘুচে যায়নি। যে বিস্ময় এবং রূপমুগ্ধতা নিয়ে একদিন 'ঠাকুরবাড়ির' ছোট্ট একটি বালক দ্বার জানালার ফাঁক-ফুকর দিয়ে প্রকৃতির অসীম রহস্যের আবরণকে উন্মোচিত করতে চেয়েছিল তার সেই গণ্ডি একদিন ঘুচে গিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের জল-স্থল-আকাশ-গাছপালা-ফুল-পাখি-প্রান্তর-পাহাড় সবই তাঁর গম্যস্থান হয়ে উঠেছে, কিন্তু রোমান্টিক মনের সেই রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাকুলতা কোনোদিন নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সমান বিস্ময় এবং কৌতূহল নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির এই রূপরসের মাধুর্যকে উপভোগ করেছেন; জীবনের তাপকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন প্রকৃতির উদার বৈরাগ্যের মধ্যে।

প্রকৃতির প্রতি কবির এই গভীর প্রেম সম্ভব হয়েছিল একদিকে তার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য এবং সৌন্দর্য-মাধুর্যের লীলায়িত আবেদনের জন্য; অপরদিকে বিশ্বস্রষ্টিকর্তার বিচিত্র লীলাবিলাসকে লক্ষ্য ক'রেছিলেন প্রকৃতির বিচিত্র জীবনছন্দে।

"......সৃষ্টির মূল উৎস হলেন বিশ্বদেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর উপলব্ধি। প্রকৃতি এবং মানুষ তাঁরই প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বদেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে একাত্মতার গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আসে নি। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য তিনি উপলব্ধি করেছেন সত্যি, কিন্তু সে উপলব্ধিতে আত্মবিলুপ্তির পরিচয় নেই। বিশ্বদেবতার প্রকাশ স্বরূপ-প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যে কিন্তু তাঁর আত্মবিলোপের সাধনা আছে। ভগবদ্‌ভক্তি তাঁর কাব্যের সাধনা কিন্তু প্রকৃতি তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।"[১]

প্রকৃতি তাঁর কাব্যে বা সাহিত্যে যে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে তার কারণ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সেই রহস্যময় সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র স্বরূপকে কবি প্রথমাবধিই অনুভব করেছিলেন। শুধু তাই না, সৃষ্টির সেই আদিম যুগে কবি যেন গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে, ফুল হয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে মিশে ছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাই একটি আদিম প্রাণের যোগ কবি যেন আজও অনুভব করেন।

রোমান্টিক গীতিকবিদের বিচিত্র প্রকৃতিচেতনার স্বাদ কবি ছোটবেলা থেকেই 'ওয়ার্ডসোয়ার্থ', 'শেলী', 'কীটস্‌', 'বায়রন' প্রভৃতি বিদেশী কবিদের কাব্য থেকে কিছু পরিমাণে পেয়েছিলেন। আর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কবি বা সাহিত্যিকরা প্রকৃতির মধ্যে যে সজীব সত্তার কল্পনা করেছিলেন তার প্রভাবও ছোটবেলা থেকেই কবিমনের উপর পড়েছিল। প্রকৃতির কবি হিসাবে কালিদাসকে তিনি কেবল শ্রদ্ধা করতেন না, কবির কাব্যে-সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাবকে বেশ সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পারিবারিক জীবনের শিক্ষায় এবং পরিবেশে দেশী বিদেশী সমস্ত রকমের কাব্য, সাহিত্য, শিল্পচর্চা চল্‌তো। এই অনুকূল পরিবেশ তাঁর মনের খোরাক সেই শিশুবয়সেই জুগিয়েছিল। বাল্যকাল থেকে এই প্রকৃতি যে রহস্যময়ী দূতীরূপে আড়াল-আবডাল দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিতালি পাতানোর জন্য উন্মুখ ছিল তা তো কবির কিশোর বয়সের স্মৃতিকথা থেকেই পাওয়া যায়।—

"বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল, সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত

১। শ্রীঅমিয় সেন—"প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ" (সং—বিশ্বভারতী ১৯৬১): রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম [পৃঃ ৩৩]

হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

"……তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।"[১]

শিশুকবির কাছে প্রকৃতি এইভাবে রহস্যময়ী রূপ নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। কবি তাঁর অনুপম ভাষায় একেই সুন্দর করে প্রকাশ করে বলেছেন—

"বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত,……সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।"[২]

'জীবনস্মৃতি' কবির অনেক পরিণত বয়সের রচনা, কবির বয়স তখন একান্ন বছর। ঐ পরিণত জীবনে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, এমন কি সমস্ত বিশ্বের বহু দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করে কবি প্রকৃতির রূপ-রসের অজস্র দানকে দুচোখ ভরে সম্ভোগ করেছেন। চেতনার মধ্যে দিয়ে তার অমিত মাধুর্যকে ছেঁকে নিয়েছেন; কিন্তু 'দূর এখনো দূরেই, বাহির এখনো বাহিরেই'। আপন অনুভবে কতটুকুই বা ধরতে পেরেছেন বা ভাষায় রূপ দিতে পেরেছেন কবি। এই আনন্দময় বেদনাই রোমান্টিক কবিমনের স্বভাব ও স্বধর্ম।

'জীবনস্মৃতি'র সেই ছোট্ট কবি-বালকটির খড়ির গণ্ডি একদিন ঘুচে গিয়েছিল। উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে প্রথম সুপ্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অবাধ মিলন ঘটলো। তারপর এলেন পূব্‌-বাংলার শস্যশ্যামল ছায়াবীথিঘেরা পল্লীজীবনের প্রাণকেন্দ্রে—পদ্মা আর তার শাখা-উপশাখার বুকে। বাংলার মাঠ-ঘাট নদী-নালা, শ্যামল প্রান্তর, উদার আকাশ, কবির জীবনকে সেদিন কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল। সে যুগের কাব্য 'সোনার তরী' (১৮৯৪ খ্রীঃ), 'চিত্রা' (১৮৯৬ খ্রীঃ), 'চৈতালি' (১৮৯৬, ১৯১২ খ্রীঃ) এবং গদ্য রচনা 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতির বুকে সেই পরিপূর্ণ প্রকৃতি উপভোগের অনুভূতিটুকু

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'জীবনস্মৃতি' [জন্মশতবার্ষিক সং] রবীন্দ্রবচনাবলী—১০ম খণ্ড—'ঘর ও বাহির' [পৃঃ ১৩-১৪]

২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১১

ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালের অজস্র গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ ছোটগল্প-চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে সেই অজস্র দানকে কবি আপন ছন্দে-ভাবে-রসে পরিপ্লাবিত করে রেখে গেলেন সাহিত্যের মণিকোঠায়'। প্রকৃতির সঙ্গে সেদিনের সেই নবীন কবির কী গভীর. কী নিবিড় একাত্মতা! 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায় তার উজ্জ্বল ছবি রয়ে গেছে—

"ওই-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।"[১]

অথবা—

"আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।"[২]

পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তার সঙ্গে একটি জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ির যোগকে অনুভব করেছেন কবি। তাঁর সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার মধ্যেও এই অনুভূতি রূপ পেয়েছে। প্রকৃতিকে তিনি তাঁর সাহিত্যে মানবচেতনার বা অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন যে, একদিকে প্রকৃতিও যেমন প্রাণবান সত্তা লাভ করেছে, অপরদিকে মানবও তার দুঃখ-সুখের তাপ-অনুতাপকে প্রকৃতির শ্যামলচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ করে দিতে চেয়েছে। এমনকি কবির আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনার যুগেও অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালির' পর্বেও প্রকৃতি-জগতের নানা রূপের অনির্বচনীয় মহিমার বুকে সেই বিশ্বদেবতাকে স্থাপন করে তিনি তাঁর যথার্থ স্বরূপটিকে চিনে নিতে চেয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার কবিতার গতিটা প্রকৃতির ধাপ হইতে মানুষের ধাপে উঠিয়াছে এবং সেই গতি বিশ্বপ্রবাহের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"[৩]

তথাপি প্রথম পর্যায়ের কাব্যে কবির রোমান্টিক কল্পনা এমন ঊর্ধ্বগামী এবং সুদূরপ্রসারী যে, বস্তুজগতের সমস্ত তুচ্ছতাকে দূরে ফেলে সে যেন কল্পলোকের উদ্দেশ্যে ডানা মেলে চলেছে। কি প্রকৃতি, কি মানুষ, কি বিশ্বদেবতা—কবি যার কথাই যখন বলতে চেয়েছেন, তাঁর অনির্বচনীয় ভাষা ছন্দে ব্যঞ্জিত হয়ে তা অলৌকিক শিল্পসুষমায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়—

১। 'ছিন্নপত্রাবলী' [পত্র সং ১৩, পৃঃ ২২] 'রবীন্দ্ররচনাবলী [জন্মশতবার্ষিক সং]—একাদশ খণ্ড—প্রবন্ধ
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী [জন্মশতবার্ষিক সং] —[১১ শ খণ্ড] "ছিন্নপত্র"
৩। শ্রীশচীন সেন—"রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়" [৪র্থ সং—১৩৬৯] "রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহ" [পৃঃ ২৩]

············বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে ;

অথবা, 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) কবিতায়—

················নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ?

'পুরস্কার' (সোনার তরী) কবিতায় তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা—

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত-কায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

প্রকৃতির সৌন্দর্যসত্তার সঙ্গে কবির এই একাত্মতা এ-যুগের মানসিকতার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির অব্যক্ত প্রাণের সঙ্গে এখানে কবি আপন প্রাণের যোগ ঘটিয়েছেন, অলক্ষ্য সুরধ্বনির সঙ্গে আপন কণ্ঠের সুরকে দিয়েছেন মিলিয়ে। 'চিত্রা' কাব্যে এই সৌন্দর্যসত্তার উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠেছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী। ['চিত্রা'—চিত্রা]

কবি জগতের এই বিচিত্র সৌন্দর্যরূপকে সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন। আপন অণু-পরমাণুর মধ্যে তার মাধুর্যরসকে টেনে নিতে চাইছেন—

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ['সুখ'—চিত্রা]

প্রকৃতির মনোরম স্পর্শ টুকুকে কবি আপনার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে সত্তার গভীরে টেনে নিতে চান। প্রকৃতির কোনো 'রুদ্র' বা 'বিরূপ' রূপ এই পর্যায়ের কাব্যে তেমনভাবে চোখে পড়ে না। তার স্নিগ্ধ মাধুর্যটুকুই কবিকে দেহে-মনে গ্রাস করে রেখেছিল। সেই সুখস্মৃতির আভাসটুকু কাব্যে উৎসারিত।

'কল্পনা' কাব্যে এসে এই কবিই একদিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপের সাধনা করেছেন, অপরদিকে কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির যে সজীব রূপটি ফুটে উঠেছিল তাকে একালের ভাষায় নবজন্ম দান করে সার্থক করে তুলেছেন।

মধ্যপর্বে অধ্যাত্মজীবনবোধের পরম লগ্নেও প্রকৃতিই সেই স্রষ্টিকর্তার লীলামাধুর্য উপভোগের পটভূমি রচনা করেছে। ভিন্ন কথায়—প্রকৃতির বিচিত্র লীলাবিলাসের মাঝে কবি সেই পরম দেবতার সৃষ্টি-মাহাত্ম্যকে রূপে-রসে-ভাবে অনুভব করে ধন্য হয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে তিনি একইকালে প্রকৃতিনাথ ও জীবননাথকে দেখেছেন। মধ্যপর্বের কিছু কিছু কবিতার ভিতর কবির এই মনোভাবের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট—

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরবে ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। ['১৮' সং—গীতাঞ্জলি]

অথবা,

এসো হে এসো, সজল ঘন,
বাদল বরিষণে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে। ['৩৫' সং—গীতাঞ্জলি]

অথবা,

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে। ['৬৫' সং—গীতাঞ্জলি]

কবি তাঁর দেবতাকে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে দেখেছেন। অধিকাংশ স্থানে প্রকৃতির অলক্ষ্য ইঙ্গিতের মধ্যে তাঁরই ইঙ্গিতকে অনুভব করেছেন। প্রকৃতি যেন তার স্নিগ্ধ-শ্যামল বুকের পরে দেবতার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। তার বর্ণে গন্ধে তাঁরই গোপন নামের রেখা, অলক্ষ্য ছন্দ।

'বলাকা'র যুগে আবার বিশ্বপ্রাণের চলমান গতিপ্রাণতাকে কবি লক্ষ্য করেছেন—জলে-স্থলে-গ্রহে-নক্ষত্রে-পৃথিবীর শ্যামল ঘাসে ঘাসে—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

* * *

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মতো। ['৮' সং—বলাকা]

অথবা,

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা ['৩৬' সং—বলাকা]

প্রকৃতির নিশ্চল বস্তুপিণ্ডের মধ্যে এখানে কবি 'বেগের আবেগ'কে লক্ষ্য করেছেন। 'বিশ্বতালে দিয়ে তাল' সমস্ত অব্যক্ত জগৎ কোন্ নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যেন নিরন্তর ছুটে চলেছে। তার এই 'অকারণ অবারণ চলা' কবিকে অভিভূত করে তুলেছে। কবি যেন সমস্ত প্রকৃতিলোকের ছন্দে ছন্দে তালে তালে কার অলক্ষ্য পদধ্বনিকে শুনতে পাচ্ছেন।

'বনবাণী'তে মূক বৃক্ষজীবনের কথা কবি-প্রশস্তি লাভ করেছে। জীব-জগতের আদি ভাষার সঙ্গে কবির যেন একটা নাড়ির টান আছে, শুধু কেবল 'সে ভাষা হারিয়ে গেছে'।

গদ্য বাচনভঙ্গি এবং আটপৌরে চলন প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে 'পুনশ্চ' কাব্য থেকে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাইরের দিক থেকে এই রূপ বদল তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এর মধ্যে যে কিছু নূতনত্ব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে, এর অতিবাস্তব পরিবেশনায়। ভঙ্গি ভাষা বদলে গেছে, আমাদের গায়ে গায়ে লেগে থাকা সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি বা কবির রূপকল্পনায় এতদিনের অনাদৃত গাছ-পালা-ফুল-পাখি-মানুষ সকলেই যেন আজ তাদের স্বমহিমায় কবির কাছে সমান রহস্যময়, সমান মূল্যবান। কবি একটি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এযুগের কাব্যগুলিতে প্রকৃতির একটি স্পষ্ট নিরলংকার রূপ আঁকতে চেয়েছেন। 'পূরবী'র যুগ থেকে কবি 'ছবি' আঁকার কাজে আপনাকে নিয়োজিত করেন। মনে হয় সেই ছবি আঁকার স্পষ্ট স্বচ্ছ রেখা-রঙের টান্ থেকেই কাব্যের ক্ষেত্রে যে চিত্র যোজনা করেছেন তা এত স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে। মায়া দিয়ে, মোহ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে ঘিরে এই প্রকৃতিকে এযুগে কেবলমাত্র অলৌকিক মায়াপুরীর সামগ্রী করে রাখেননি। তাছাড়া "সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বহু বিচিত্র শক্তির সংমিশ্রণ এবং সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের যে পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল, তাতে সাধারণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নূতন করে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতিপ্রেমের বিচারেও এই নূতন দৃষ্টির প্রভাব এ যুগের কাব্যকে অনুরঞ্জিত করেছে। পূর্ববর্তী জীবনে প্রাকৃতিক যে দৃশ্যসম্পদ থেকে কবি আপনার আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছেন, সৌন্দর্য ছিল তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ যুগে যেমন সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তেমনি প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মধ্যেও কবি একটি রহস্যের সুষমা আবিষ্কার করলেন।"[১] এর মধ্যে আমাদের ঘরের পাশের পচা পুকুর, আম-জাম, বাঁখারি দেওয়া মেহেদির বেড়া যেমন আছে তেমনি পশ্চিম আকাশের নীলাঞ্জন রেখাটিও বাদ পড়েনি। এসব চিত্র বা ভাব এর আগেও তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে কিন্তু গদ্যের এই সহজ সরল অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গি এবং শব্দ-ভাব-ভাষার আটপৌরে রীতিতে তা অভিনবত্ব লাভ করেছে। কবির প্রথম জীবনের কাব্যে বাংলার শ্যামল পল্লীপ্রকৃতি এবং পদ্মার চলমান জীবনছন্দ যেমন স্নিগ্ধ কোমলতা এবং জীবনধর্মিতা বয়ে এনেছিল তাঁর প্রকৃতিচেতনার মধ্যে, তেমনি জীবনের শেষপর্বের প্রকৃতিচেতনায় বীরভূমের রুক্ষ মাটির ধূসর বৈরাগ্য একটা নির্লিপ্ততা বা মোহমুক্তির সুরকে যেন অনুরঞ্জিত ক'রে তুলেছে গোপনে গোপনে।

১। শ্রীঅমিয় সেন—"প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ"— [সং—বিশ্বভারতী, ১৯৬১] পরিশেষ—২, [পৃঃ ১৫৫-১৫৬]

'পুনশ্চ' কাব্যের 'খোয়াই', 'পুকুরধারে', 'বাসা', 'দেখা', 'সুন্দর', 'ছুটি', 'গানের-বাসা', 'পয়লা আশ্বিন', 'অস্থানে', 'শেষদান'—প্রভৃতি কবিতা কবিমনের বিশেষ কোনো মুহূর্তের রূপ-রস সম্ভোগের মাধুর্যটুকুর বা কোনো ভালোলাগা দৃশ্য বা চিত্রের রূপাঙ্কন করে চলেছে—

পশ্চিমে বাগান বন চষা-ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া ;

*　　　*　　　*

হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,

['খোয়াই'—পুনশ্চ]

পুনশ্চের 'পুকুরধারে' কবিতায় আমাদের ঘরের পাশের একটা নিখুঁত জীবন্ত চিত্র—

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসের কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌মল্ করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কল্‌মি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ কটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি,
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরীবের মতো।

'পুনশ্চ' কাব্যে মেঘের এই বর্ণনা রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে নূতন। মেঘ আজ তার সজল-ঘন রূপ নিয়ে কবির কবিকল্পনাকে বিমোহিত করেনি, একেবারে অকাব্যিক রূপ নিয়ে 'পালোয়ানে'র বেশে দেখা দিয়েছে—

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,　　　['দেখা'—পুনশ্চ]

'বন্দী-করা লতা'কে কবি এ যুগের উপমা দিয়ে ভূষিত করে বলেন—

পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর করে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে ;　　　['পঁচিশ' সং—শেষসপ্তক]

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'উনত্রিশ' সংখ্যকে আবার একটি পরিচিত মধুর ছবিকে উপস্থাপিত করে গেলেন—

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে ;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে

শেষসপ্তকের ('ছত্রিশ' সং) আর একটি ছবি—

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগনি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্যন্ত।

এ সব কবিতায় নিপুণ শিল্পী ক্যামেরার চোখ নিয়ে একের পর এক ছবি ধরে রেখেছেন। এ ছবি আমাদের অতি পরিচিত আপন ঘরের ছবি।

প্রকৃতি বিষয়ক কতকগুলি কবিতার মধ্যে কবির দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা তত্ত্বপ্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে রূপ-সম্ভোগ বা দেখার অনুভব থেকে কবিমন বিশেষ মননশীলতার মধ্যে বিচরণ করেছে। 'বীথিকা' কাব্যের 'দেবদারু' কবিতায়—

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি—
যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরু দুর্গতলে
প্রস্তর শৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগ-যুগান্তরে।

তেমনি 'বনস্পতি' (বীথিকা) কবিতায়—

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ।
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে,

প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।

কিংবা 'ভীষণ' (বীথিকা) কবিতায়—

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।

'সেঁজুতি' কাব্যেরও 'প্রাণের দান' কবিতায়—

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তারপর হতে তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায়-ফেলায়।

অথবা, 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'আমগাছ' কবিতায়—

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রাণে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে,
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।

এই সমস্ত কবিতায় প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা নেই; আবার ক্যামেরার চোখ নিয়ে একটি নিখুঁত ছবি ধরাও নেই। কবির দার্শনিক মন প্রকৃতির বহির্জগতের আশ্রয়টিকে কেন্দ্র করে ভাবনার দিক থেকে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে; জীবনের গভীরতম কোনো সত্যের সঙ্গে চলমান জগতের চিরন্তন সত্যকে কখনো বা মিলিয়ে দিতে চেয়েছে।

কবি তো 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের সাহায্যে অনেক সময় অচেতন প্রকৃতির উপর সচেতন পদার্থের ভাব অরোপ করেছেন, এ অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ আছে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে ছড়িয়ে। কিন্তু 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বহু কবিতায় এই প্রকৃতি এমন সজীব পদার্থের আচরণকে আশ্রয় করেছে যে কবির প্রকৃতিচেতনার মায়াময় সৌন্দর্যস্বপ্ন যেন একেবারেই অপগত হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করে নিতে পারেন। কবির সুন্দরকে দেখার চোখ বা মন, এবং কল্পনার জাদুকরী শক্তি বুঝি আজ হারিয়ে গেছে। সমালোচনা বা ব্যাখ্যা নানাভাবেই করা যায়। মনে হয় ছন্দের জাদুকরী স্পর্শ দূরে সরে যাওয়ায় বা ভাষাও 'গৃহস্থপাড়ার' হওয়ায়, কাব্যের ভাব, উপমান-উপমেয় বা সাধারণ

ধর্মকে কবি দৈনন্দিন জানা-শোনার জগৎ থেকেই বহুস্থানে গ্রহণ করেছেন। এর ফলেই সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে এই ধরনের প্রকৃতিচিত্র বিস্ময়ের বা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায় এ সমস্ত ছবি রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে কত নূতন—

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,

['নয়' সং—পত্রপুট]

'শ্যামলী'র 'বিদায়বরণে'—

চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায়
থমকে আছে সকাল বেলাটা,
রাত জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।

অথবা, কালরাত্রে
বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিমঝিম প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র। ['কালরাত্রে'—শ্যামলী]

আবার 'সানাই' কাব্যের 'শেষ অভিসারে'—

আকাশের ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।

কিংবা 'রোগশয্যায়' ('৮' সং) কাব্যের—

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।

রবীন্দ্রকাব্যজগতে প্রকৃতির রোমান্টিক শ্যামল কোমল রূপটিই এত বিচিত্র রূপে-রেখায় ফুটে উঠেছে যে, তার গভীরতা এবং ব্যাপ্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর খুব অল্প সাহিত্যেই বোধ করি প্রকৃতি তার এমন সূক্ষ্ম রূপ-রেখায় ধরা পড়েছে। তাই শেষ-

পর্যায়ের কাব্যের এই সমস্ত প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে যে ভীষণের এবং অসুন্দরের প্রভাব পড়েছে—তা এত বিস্ময় বয়ে এনেছে। আসলে কবি এখানে—'এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে'—('২১' সং—রোগশয্যায়) এই মনোভাবকে আশ্রয় করেছেন। এতদিন পৃথিবীকে কবি দেখেছেন শ্যামল লাবণ্যময়ী কল্যাণী রূপে, আজ 'ললিতে-কঠোরে' মিশ্রিত তার ভয়ঙ্করী হিংস্র রূপটিকে বন্দনা জানিয়েছেন—

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,

* * * *

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ-হুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে; ['তিন' সং—পত্রপুট]

কিন্তু প্রকৃতিচেতনার ক্ষেত্রে শেষপর্যায়ের কাব্যে এইটুকুই রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় নয় বা সব পরিচয় নয়। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে কবি আজও প্রকৃতি-জগতের একটি রোমান্টিক স্বপ্নময় আবেশের পরিবেষ্টন রচনা করেন—

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে,
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই
লহো করুণ করে।

* * * *

ও হাতখানি হাতে নিয়ে
বসব তোমার পাশে
ফুল-বিছানো ঘাসে,
কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা।
বউ কথা কও ডাকবে তন্দ্রাহারা।

['যাবার আগে'—সানাই]

অথবা,

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,

['ছায়াছবি'—সানাই]

কিংবা 'সানাই'-এর 'দেওয়া-নেওয়ায়'—

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান।

এই সমস্ত মধুর প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত রোমাণ্টিক স্বপ্নবিলাসী কবিমনটিকেই খুঁজে পাওয়া যায়। না; বার্ধক্য-জরা বস্তুজগতের এবং ব্যক্তিজগতের ঘাত-প্রতিঘাত আজও কবি-জীবনের গভীরতম সুরকে ছন্দকে পিষে মেরে ফেলতে পারেনি। এই সজীব নিত্য জাগ্রত প্রাণসত্তাই তাঁকে আজীবন পিছনে থেকে নূতন নূতন প্রেরণা যুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে বলেছেন—

"প্রকৃতির এমন একটি কোণও ছিল না যার গোপন রহস্য এই আশ্চর্য জাদুকরের চোখ এড়িয়ে যেত, তাঁর দৃষ্টিশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। এত পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মরমী মন তৃপ্ত হয়নি, সেই অতৃপ্তিই স্রষ্টার অন্তর্নিহিত গৌরবময় সৃষ্টিশক্তিকে পিছন থেকে প্রেরণার খোরাক জোগাত বারংবার।"[১]

তাই আজও তাঁর স্মরণে আসে—

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া। ['ধ্বনি'—আকাশপ্রদীপ]

বার্ধক্যে ও শৈশবের ফেলে-আসা স্মৃতি অম্লান হয়ে জাগে—

জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়া গাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্ত বর্ষার।

['ইস্কুলপালানে'—আকাশপ্রদীপ]

এই বয়সেও 'জন্মদিন'-এ (সেঁজুতি) তাঁর মনে পড়ে যায় আপন রোমাণ্টিক কবিমনের কত পুরোনো ভালোলাগার কথা—

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা;

১। প্রতিমা ঠাকুর—"নির্বাণ" [সং-কার্তিক, ১৩৬২ পৃঃ—৩২

কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে,
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে;
সর্ষে তিসির খেতে
দুই রঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে,
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল এই তো ভালো লাগে।

প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার স্মৃতিটুকুকে স্মরণ করতে গিয়ে এই বয়সেও গ্রাম-বাঙ্‌লার একটি মনোরম ছবি কবি এঁকে গেছেন। রোমান্টিক কবিমনের এই 'ভালোলাগা'ই ছড়িয়ে আছে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র অনেকগুলি কবিতার এখানে সেখানে। বার্ধক্যে অলসবেলায় সে মন আজও বলে—

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ঐ শিরীষবনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা। ['ছুটি'—পুনশ্চ]

প্রকৃতির ভাবরসের জগতে কবি আজও ডুব দিতে চান সংসার থেকে ছুটি নিয়ে।

'যাবার মুখে' (সেঁজুতি) আজও তাঁর কৃতজ্ঞ চিত্ত স্মরণ করে সেই সব ছবিকে—

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল, ওই যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে
কত-যে আমার পাগলামি গাওয়া দিনে!

কবিমনের মাধুরীর ডালি ভরিয়ে তুলেছিল যারা, তারা কেউই আজ 'যাবারমুখে' তাঁর কাছে নগণ্য নয়। 'শিমুল', 'সজিনা' যত অনাদৃতই হোক না কেন ফুলের জগতে, কবিমনের আঙিনায় তারা তো ঠাঁই করে নিয়েছে চিরদিনের তরে। শুধু তাই না— 'সকালবেলার প্রথম আলো' এবং 'বিকালবেলার ছায়াও' যে তাঁর—

দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে। ['যাবার মুখে'—সেঁজুতি]

কবি আজ প্রকৃতির সমস্ত সত্তার সঙ্গে আপন দেহসত্তার একাত্মতা অনুভব করে ধন্য হন। এই প্রকৃতিই তো পৃথিবীতে রূপের রসের ডালি নিয়ে সেই বিশ্বস্রষ্টকর্তার আশীর্বাদকে যুগে যুগে বয়ে এনেছে। কবি তাই তাদের ভালোবেসে এই মর্ত্যপৃথিবীতেই বার বার ফিরে আসতে চান। তাই একান্ত মনে এই পৃথিবীর ধুলিকে মধুময় বলতে পারেন।

তাঁর মনে 'অমর্ত্যে'র (সেঁজুতি) কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই—

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।

মর্ত্য পৃথিবীকে ভালোবেসে তার ধূলি-মাটি-ঘাসকে আজও আপনার বাসভূমি বলে গ্রহণ করতে চান।

শুধু তাই না—

যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন। ['স্মরণ'—সেঁজুতি]

পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার পরও পৃথিবীর এই শ্যামল রূপটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমন নিবিড় হয়ে থাকবে যে, এর শ্যামল ছায়ায়, ঘাসে ঘাসে কবির আত্মা বিচরণ করে ফিরবে। তাঁর ভালোবাসা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকবে এই শালবীথিকে। তাই 'রোগশয্যায়' বন্দী কবি প্রকৃতির আশীর্বাদের জন্য উন্মুখ হয়ে বলে ওঠেন—

খুলে দাও দ্বার ;
নীলাকাশ করো অবারিত ;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;
['২৭' সং—রোগশয্যায়]

'জন্মদিনে' কাব্যে এই রোগজীর্ণ কবিই কালিম্পঙের রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শেষ প্রশস্তি রচনা করে যান—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।

বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ। ['১৪' সং—জন্মদিনে]

জীবনের শেষলগ্নে প্রকৃতির বুক থেকে আলো-ধ্বনি ও রঙের যে আশীর্বাদটুকু পেলেন সেইটুকুকে কেমন করে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে স্পর্শ করে নিয়ে এই কবিতায় তার মাধুরীটুকু ভরিয়ে দিয়ে গেলেন, এ সম্পর্কে 'নির্বাণ' গ্রন্থে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের বর্ণনাটুকুকে স্মরণ করা যেতে পারে—

"এদিকে আবহাওয়া বদলে গেছে, বর্ষার শেষ রেশটুকুও এখন আর মেঘেতে নেই, আকাশে বাতাসে ঝলমল করছে উজ্জ্বলতা, ঘন নীলাম্বরী গুণ্ঠন খুলে পৃথিবী হালকা হাওয়ার শাড়ি পরেছে। তিব্বত থেকে বইছে শীতের পূর্বদূতী ঈষৎ শিরশিরে হাওয়া। দিনগুলো ভরে ছিল আলো-বাতাসের উৎসব। বাবামশায় আকণ্ঠ পুরে পান করছেন তার আনন্দ।

২৫ সেপ্টেম্বর। সকালে উঠে দেখলুম সমস্ত জানলা দরজা খুলে দিয়ে বসে আছেন, একটু দূরে বনমালী চায়ের আয়োজন করছে, আকাশ প্রান্তিকে উদয়াচলের খোলা দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধবল শিখরের উদার ঋজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ করে বাতায়নপথে ধ্যাননতলোচন কবির শুভ্র কেশ ও কপালের উপর এসে পড়েছে শঙ্করের প্রথম আলোক-আশিষ, আর গায়ের উপর দিয়ে বইছে নবপ্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ। নিচের বাগানে লেগেছে নানা রঙে ও গন্ধে মিলে লতাপাতার হুল্লোড়, কবির প্রাণ আর তাদের প্রাণ আজ এক হয়ে গেছে।

······তারপর চা খাওয়া শেষ করে লেখবার ঘরে গিয়ে বসলেন, লিখলেন—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে

* * * ['১৪' সং—জন্মদিনে]

এতদিন তাঁর দেহমন দিয়ে যা শোষণ করেছিলেন আজ তাঁর ছন্দে তাই দিলেন ঢেলে। আলো আর রঙের মধ্যে তিনি এ-ক'দিন সত্যিই একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ যেন কিছুদিনের নিয়ত অবসন্নতা সব ভুলে গিয়ে তাঁর মন আলোর আনন্দধারায় স্নান

১। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর—"নির্বাণ" [সং—কার্তিক ১৩৬২ পৃঃ ১১-১২]

প্রকৃতিমায়ের কোলে বসে জীবনের শেষ মুহূর্তে এই আলোর আনন্দধারায় যে শেষ স্নান করেছিলেন তারই মধুর আনন্দ রসধারাটুকুকে, ধ্বনি আর রঙটুকুকে, রূপে ছন্দে গেঁথে রেখে গেছেন কবি ঐ কবিতায়। প্রকৃতির অজস্র দানকে জীবনে পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে। তাঁর সমস্ত মন এবং চোখ দিয়ে তার শেষ মাধুর্যকণাটুকুকে যেমন নিঙড়ে নিয়েছেন, তেমনি বিচিত্র রূপ রসের তুলিতে আর ছন্দের জাদুকরী বুনুনিতে তাকে শত সহস্র ধারায় প্রকাশও করে গেছেন। প্রকৃতির কোনো মুহূর্তের কোনো দানই ব্যর্থ যায়নি তাঁর জীবনে। এই দেখা, এই অনুভবই তাঁর প্রকৃতি চেতনাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজীব ও সক্রিয় রেখেছিল।

বিজ্ঞানচেতনা

ভাবসম্পদের মধ্যে প্রকৃতিচেতনার একটি শাখা হোল বিজ্ঞানচেতনা। প্রকৃতিচেতনার ক্ষেত্রে বিশেষ রূপমুগ্ধতাই রবীন্দ্রকবিকল্পনাকে উজ্জীবিত করেনি, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ রসের মাধুর্যকে আপন ভাবে ছন্দে প্রকাশ করেনি; বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে বিরাট জ্যোতির্লোক, প্রকৃতিলোক ও জীবলোক কালের নিয়মিত ছন্দে তাল রেখে অবিরত ছুটে চলেছে, সেই বিশেষ রহস্য সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল কম ছিল না। সৃষ্টিরহস্যকে জানার কৌতূহল কবিরও আছে, বৈজ্ঞানিকেরও আছে। কবির জানা কল্পনা দিয়ে, বোঝা অনুভবে; বৈজ্ঞানিক বোঝেন যুক্তি দিয়ে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটি যুক্তিনিষ্ঠ কৌতূহলী মন ছিল; সে মন সৃষ্টি রহস্যের অনাদি লীলাকে পর্যবেক্ষণ করেছে গভীরভাবে। ছোটবেলায় পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কবি জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করেন এবং তাঁদের বাড়ির শিক্ষায় ও আবহাওয়ায় বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চাও ছিল। ডালহৌসী পাহাড়ে পিতার সঙ্গে অবস্থানের সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পাঠ গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কাঁচা হাতে একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। পরে শেষজীবনে 'বিশ্বপরিচয়' নামক সরস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও লিখেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি আজীবনের কৌতূহল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় কবি বলেছেন—"আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।" এই লোভের ফলেই বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসেছে। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাঁর বিস্ময় ও কল্পনাকে অনেকখানি যুক্তিনিষ্ঠ ও সংযমিত করেছে। কবিও 'বিশ্বপরিচয়ে'র ভূমিকায় একথা স্বীকার করে বলেছেন—…"জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশাকরি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।

…বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী। মিষ্টান্নমিতরে জনা :, আমি রস পাই মাত্র।"[১]

কবির এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, কবির যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মেজাজ এই বিশেষ জ্ঞান থেকে রস সংগ্রহ করতে চেয়েছে—আনন্দ পেতে চেয়েছে। .. "শিক্ষার্থীর কৌতূহল আর রসিকের তৃষ্ণা ছিল বলেই বিজ্ঞান তাঁর কাছে খাদ্য নয়, আনন্দ। বৈজ্ঞানিক সত্যের রসটুকু পেয়েই তিনি খুশি, তত্ত্বের ভারবাহী হতে তিনি অনিচ্ছুক।"[২]

বিজ্ঞান জগতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের প্রতি যে তাঁর বেশি ঝোঁক এ তো কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। এর কারণও সহজেই অনুমেয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে যে বিরাট সৌরমণ্ডল গঠিত তার সম্পর্কে যত বৈজ্ঞানিক তথ্যই এ পর্যন্ত আবিষ্কার হোক না কেন, আজও সেই জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়নি। আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই প্রাণের জন্ম এবং মৃত্যুর রহস্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়েও মানুষের জ্ঞানের পরিধির কাছে আজও রহস্যাবৃত। কবি-মন এই রহস্যবোধের মধ্যেই কল্পনার ডানা মেলে বিহার করতে পারে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর প্রতি বিস্ময় ঘোচে না! তাই প্রথম জীবন থেকেই তাঁর নানা রচনায় বিজ্ঞানের বিশেষ সত্যের প্রকাশকে লক্ষ্য করা যায়। জগৎ, জীবন ও সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে কবির যে সুদূরবিস্তারী কল্পনা তা বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার আশ্রয়ে একদিকে যেমন বোধগম্য হয়েছে, অপরদিকে যুক্তিনির্ভর হয়েছে। বিজ্ঞান যে সমস্ত সত্যকে নীরস কাঠিন্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে, কবি-শিল্পী তাকে ছন্দে-রূপে-রসে মণ্ডিত করে উপভোগ্য করে পরিবেশন করেন।

কবি জ্ঞানরাজ্য এবং ভাবরাজ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছেন। সমস্ত বিশ্ব যে একটা ছন্দে বাঁধা এই ছন্দটুকু অখণ্ড সত্যরূপে কবির কাছে অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। খণ্ডের মধ্যে দিয়েই এই অখণ্ড সত্যে বৈজ্ঞানিক পৌঁছান, কবিও সীমা-অসীমের, খণ্ড-অখণ্ডের অলক্ষ্য ছন্দটুকুকে আপন চৈতন্যবোধে ধরার চেষ্টা করেন। কবি-মনের এই ঐক্যবোধের ছন্দের সঙ্গে বিশ্বছন্দের মিল ঘটাতেই কবির দৃষ্টিতে একটা সর্বজনীন সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খণ্ড-অখণ্ডের মধ্যে এই যে ঐক্যবোধের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি যেন পৃথিবীতে জন্মেছিলেন; বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান তাকে সহায়তা করেছে মাত্র।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"বিশ্বপরিচয়" [৪র্থ সং—পৌষ, ১৩৪৫] শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা—[ভূমিকা পৃঃ ৵৹]

২] শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচায—"রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা"—[১ম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭২] ২য় পরিচ্ছেদ প্রবন্ধ—রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান [পৃঃ ৯]

বিজ্ঞানের সাহায্যেই কবি জানতে পারলেন গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু পর্যন্ত এমন কি জন্ম-মৃত্যু সব কিছুই এক অলক্ষ্য ছন্দে তাল মিলিয়ে চলেছে, নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নেই। "তাঁর এই মনোভাব গঠনে বিজ্ঞান সাহায্য করার আগে তিনি উপনিষদের শিক্ষাও পেয়েছিলেন, যা তাঁকে একের শিক্ষা দিয়েছিল। বিভিন্নতা একেরই বিভিন্নতা, বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়। অতএব মন বলছে এ কথা, বিজ্ঞান সমর্থন করছে এ কথা"।[১]

এই উপনিষদের শিক্ষা কবির জীবনে ছোটবেলা থেকেই গভীরভাবে ছিল; আবার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও ছিল। সুতরাং দুয়ের মধ্যে একটা মিল তিনি ছোটবেলা থেকেই খুঁজে নিতে পেরেছিলেন। আর সেই জন্যেই ভাবের জানা ও জ্ঞানের জানার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কে কবির নিজেরই উক্তি—"জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে একথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না, কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে একথা জানিয়াছিলাম"।[২]

আসলে এটাই সব থেকে বড় কথা যে তাঁর জীবন-দর্শনের ধ্রুব বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধ ঘটেনি। সেইজন্যই কাব্যে বা সাহিত্যে সেই সত্যের প্রকাশ এমন আনন্দের শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত। বৈজ্ঞানিক সত্যকে তাই কবি আপন ধ্রুব বিশ্বাস রূপে সমগ্র জীবনের কাব্যসাহিত্যে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

এই চেতনার সাদৃশ্য থেকেই শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের রহস্য নিয়ে দু'জনেই গবেষণা করে চলেছিলেন—জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা প্রমাণের দ্বারা, আর কবি—কল্পনা ও অনুভবের এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা। জানার কৌতূহল এবং বিস্ময়ের আনন্দের মধ্যে দুই মহৎ আত্মার মিলন ঘটেছিল। তাই লণ্ডনে 'রয়্যাল সোসাইটি'র বক্তৃতার উপসংহারে আচার্য জগদীশচন্দ্র যা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা পড়ার পর মন্তব্য করেছিলেন—

"ভারতবর্ষে যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সবং প্রাণ এজতি'—জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্যে আমি যেন সেই সত্যকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হোল,

১। রবীন্দ্রায়ণ [২য় খণ্ড]—শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত [প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮] প্রবন্ধ—"রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান"—শ্রীপরিমল গোস্বামী [পৃঃ ১৫৭]

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী [১৪শ খণ্ড]—জন্মশতবার্ষিক সং "পঞ্চভূত"—সৌন্দর্যের সম্বন্ধ"—[পৃঃ ৬৩৭]

তখন রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল; তিনি যেন অতি সহজেই তাঁর ঔপনিষদিক শিক্ষা ও কবি-দৃষ্টি দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সত্যটিকে অন্তরে গ্রহণ করে নিলেন। পদ্মাতীরে শিলাইদহে নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন পৃথিবীর সর্বত্র চেতনার প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন তাঁর লোকোত্তর কল্পনায় প্রায় সেই একই সময়ে কলকাতায় তাঁর গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্র এই সত্যটিকে সপ্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র—এই দু'জনের মধ্যে চেতনার সাদৃশ্যই দু'জনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রে বেঁধেছিল।"[১]

বিজ্ঞানসত্যের এই চেতনার সত্য এবং গতির সত্যই কবিকে নূতন নূতন ভাবে আনন্দ দিয়েছে—বিস্মিত করেছে। সেই বিস্ময়কে কবি খুঁজে পেতে চেয়েছেন গ্রহ-নক্ষত্র-লোকের অবিস্মরণীয় রহস্যের মধ্যে। শেষবয়সে তাঁর সাহিত্যজীবনে বাস্তব-অবাস্তব, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে এত বেশি চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল, যার থেকে কবিমন স্বভাবতঃই মুক্তি পেতে চেয়েছিল। বিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে তাঁর এই পীড়িত আত্মা পক্ষবিস্তার করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল একথা তাঁর লেখা একখানি চিঠি থেকেই প্রমাণিত হয়—

"বুদ্ধিমান বাংলার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ—আর না হলেও চলবে। পাকা বুদ্ধির ঠেলায় জাতটাকে ফুটির মতো ফাটিয়ে তুলেছে,······নিন্দার বাজার দর অত্যন্ত চড়ে গেছে। আমার মন সরে যেতে চাচ্চে সুদূরে—সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করচি। একটা উপায় সায়ান্স—নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করেছি। যে বিশ্বজালে অচিন্ত্যনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে ধরা দিয়েছি তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ—যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।'[২]

শেষপর্যায়ের কাব্যের বহু স্থানে কবিমনের এই অপরিসীম বিস্ময় এবং রহস্যলোকের দ্বারোদ্ঘাটনের চেষ্টা ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রলোকের দূরত্বের মধ্যে কবি মনের মুক্তি খুঁজতে কখনো কখনো বেরিয়ে পড়েছেন।

মানুষের মাঝে যে কবি বাঁচতে চেয়েছেন প্রতি মুহূর্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে ফিরে আসতে চেয়েছেন এই ধরণীর মাঝে, সেই কবিমন সাময়িকভাবে হলেও দেশের লোকের

১। শ্রীমণি বাগচি—"রবির আলো" [প্রঃ ১৩৬৭ পৃঃ ৬০]

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা পত্রাবলী চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড [বিশ্বভারতী, আষাঢ়, ১৩৮১] [পত্রসংখ্যা—৯২, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৮]

আচারে ব্যবহারে এত ব্যথা পেয়েছেন যে, মনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন—কখনো কখনো সুদূরে—'নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা' করেছেন। এ কিন্তু পলায়নী মনোভাব নয়—রোমান্টিক কবি মনের সীমা-অসীমের প্রতি সমান আকাঙ্ক্ষা।

'পুনশ্চ' কাব্য থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কাব্যের মধ্যেই কোনো না কোনো ভাবে কবির এই বৈজ্ঞানিক সত্যবোধ রূপ পেয়েছে কাব্যের আধারে। কখনো বা উপমা-রূপক নানা অলঙ্কারে কখনো বা নানা ব্যাখ্যায়। কখনো বা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কবিতার রূপে, কখনো বা কোন কবিতার বিশেষ অংশে। কবির কল্পনার-জানাকে সত্যমণ্ডিত করে আমাদের কাছে এ সমস্ত অংশগুলি বিস্ময় ও আনন্দ বয়ে এনেছে।

'শেষসপ্তক' (১৩৪২ সাল), 'পত্রপুট' (১৩৪৩ সাল), 'শ্যামলী' (১৩৪৩ সাল) প্রভৃতি কাব্যের সমসাময়িককালে 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪) নামক সরস বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ লেখা হয়। সুতরাং কবির সেইকালের মানসিকতায় বিজ্ঞানের অনেক সত্যবোধ কাজ করছিল। তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সেই যুগের এবং পরবর্তী যুগের কাব্যে।

'পুনশ্চ' কাব্যেই বিরাট বিশ্ব এবং সূর্যলোক সম্বন্ধে কবির বিস্ময় দেখা যায় দু'একটি কবিতার কয়েকটি চরণে। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিশ্বশোক' কবিতায়—

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি,
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে ;

অথবা, 'মৃত্যু' (পুনশ্চ) কবিতায়—

যত গ্রহ নক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকাল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,

বিরাট বিশ্বসৃষ্টি এবং তার অলক্ষ্যশক্তি, আরও সুদূরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রের জগৎ কবি-মনে একটি অজানার রহস্যজাল বিস্তার করে রেখেছে। সমস্ত জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই রহস্যকে তিনি ভেদ করতে পারেননি—তাই তার সম্পর্কে বিস্ময় ও কৌতূহলের যেন অন্ত নেই। এর পরিচয় কিছু বা জানা, কিছু না-জানা দিয়ে ঘেরা।

মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাছে কতটুকুই বা জানা! 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কীটের সংসার' কবিতায় কবির সেই না-জানার বেদনা কেমন করুণ সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,

বিজ্ঞানের সহায়তায় কবি দূর গ্রহনক্ষত্রলোকের কিছু রহস্যকে জানতে পেরেছেন কিন্তু তাঁর অতি নিকটে বাস করছে যে 'কীটের সংসার' তার জগৎ তো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজানা রয়ে গেল। এর থেকেই বোঝা যায় জগতের বৃহৎ বা মহৎকে জানার তাঁর যেমন আগ্রহ, ক্ষুদ্রকে জানার আগ্রহও ততোধিক। কবির নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির কাছে সকলেই যে সমান!

পৃথিবীর জন্মরহস্য নিয়ে 'শেষসপ্তক' কাব্যে ('সাত' সং) সুন্দর একটি কবিতা আছে—

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল;

বাষ্পের আবরণ ভেদ করে একটু একটু করে পৃথিবীর জন্ম এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রাণের জন্ম সূচনা।

এই পৃথিবীরই শ্যামল-কোমল রূপের আড়ালে অবস্থিত একটি ললিতে-কঠোরে মিশ্রিত চিরন্তন রূপকে কবি দেখলেন 'পত্রপুট' কাব্যের 'তিন' সংখ্যক কবিতায়—

* * *

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,

* * *

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যূষে,

* * *

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে

সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর পরিক্রমা এবং তারও পূর্বে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের আকারে সূর্যের সঙ্গে তার যে সংযোগ এই সব বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত কবি কয়েকটি চরণের মধ্যে দিয়ে রেখে গেছেন। জন্ম ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে পৃথিবীও একটি গোলাকার

অগ্নিপিণ্ড রূপে ঘুরছিল 'অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে'—সেই পৃথিবী হয়েছে স্নিগ্ধ, নবীন কিন্তু সেই পুরাতনী পৃথিবী হিংস্রও বটে, কেননা কালের প্রবল আবর্তে সে কোনো কিছুকেই স্থায়িভাবে তার বক্ষে ধরে রাখে না।

'শেষসপ্তক' কাব্যের 'একুশ' সংখ্যক কবিতা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মরহস্য নিয়ে কবির বিস্ময়বোধে সমুজ্জল, বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জল একটি বর্ণনা—

নূতন কল্পে
স্থষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড় ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাঝে
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা
গণনায় শেষ করা যায় না।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলতে আমরা যা বুঝি সেই সৌরজগৎ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র যা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে বা জ্ঞানের আঙিনায় ধরা দেয়—তার থেকে অনেক বড়ো তার পরিমণ্ডল। কত যে কোটি কোটি যোজন দূরে তারা অবস্থিত—আর কত যে সংখ্যায় তারা বা কত বিরাট তাদের আকৃতি, তা মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এখনও ধরা পড়েনি। সূর্যের আলো পৃথিবীর উপর পড়ে দিন-রাত্রির স্থষ্টি করে চলেছে। সুতরাং 'কালের সীমানা' আঁকা হয়েছে 'আলোর বেড়া দিয়ে', সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক আবর্তন এবং আপন কক্ষের উপর পৃথিবীর যে ঘোরা এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কবি কাব্যিক রূপ দিলেন এইভাবে। অর্থাৎ দিন-রাত্রি-মাস-বৎসর ঋতুচক্র সবই তো এই আলোর দান। সুতরাং 'কালের সীমানা' আলোর বেড়া দিয়েই স্থষ্টি।

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন প্রভাতের 'শুকতারা'ই নাম পালটিয়ে সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যাতারা' হয়ে আসে। এই সত্যটিকে কবি কবিতায় গেঁথে রূপ দিলেন এইভাবে—

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে
এই কথা বলে জ্যোতিষী। ['আটাশ' সং—শেষসপ্তক]

'পত্রপুটে'র 'এগারো' সংখ্যাকে আবার তেমনি 'চাঁদের' জন্মরহস্য নিয়ে কবিকল্পনা বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে শিল্পচেতনাকে মিলিয়ে দিয়েছে—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।

জগতের জন্মরহস্যের অন্তরালে অণু-পরমাণুর যে লীলা এবং বিশ্বসংসার যে নিয়মের রাজত্ব, কোথাও একটুও ত্রুটি-বিচ্যুতি সয় না—এ নিয়ে কবি কৌতুক করে আবার ছড়া গাঁথলেন 'ছড়ারছবি'র 'খেলা'তে—

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ গদ ভায বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।

'প্রহাসিনী'র 'মিলের কাব্যে'—।

প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।

* * *

সৃষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্তকাল ধূয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।

'নবজাতক' কাব্যের 'কেন' কবিতায় গ্রহ-নক্ষত্রের সূর্য-চন্দ্রের আলোকের বন্যা ও বিশ্বসৃষ্টিরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন। তারই পাশে পাশে এ সম্পর্কে কবির রোমান্টিক মনের জীবনজিজ্ঞাসাও সূক্ষ্মভাবে বর্তমান।

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,

অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।

সূর্যের থেকে যে অপরিমেয় আলোকধারা প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয় তার অল্প অংশই পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছায়—অধিকাংশ আলোকধারাই পথের মাঝে হারিয়ে যায়—জ্যোতির্বীরা এই যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূর্যের আলো সম্পর্কে—কবি এই সত্যটিরই একটি শৈল্পিক ব্যাখ্যা দেন।

'পত্রপুট' কাব্যের 'দশ' সংখ্যক কবিতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি যে এই আলোকের উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে এবং প্রতিমুহূর্তে আপন জীবনীশক্তিকে সঞ্চয় করে নিচ্ছে আপন দেহ-মনে, কবির নিজেরও যে আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে এই আলোকধারার সঙ্গে—এই চরম বৈজ্ঞানিক সত্যকে কবি ছন্দে গেঁথে বলে গেছেন এইভাবে—

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।

* * *

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু,

* * *

আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন,

এ তো কবির কেবল অনুভূত সত্যবোধ বা একাত্মতার সত্যবোধ নয়। প্রাণসৃষ্টির প্রথম প্রভাতে সে তো বিরাটের ঐ তেজোময় অগ্নিকণায় একদিন বিলীন হয়েই ছিল—এ তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত সত্য। কবিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের সত্য এবং আপন অনুভূতির সত্য কেমন সুসমন্বয় লাভ করে সার্থক হয়ে উঠেছে।

আবার প্রাণের সেই 'আদিতম' রূপটির প্রকাশ যে গাছে-ফুলে-পাখির গানে-মানুষের ভালোবাসায়—এই সার্থক অনুভবটিও কী অনির্বচনীয় বাণীসুষমায় ব্যঞ্জিত। 'বীথিকা' কাব্যের 'আদিতমে'—

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন,

অথবা 'বীথিকা' কাব্যের 'ভীষণ' কবিতায়—

একদিন এসেছিলে আদি বনভূমে ;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে,
তখনো মেলেনি চোখ,
দেখেনি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।

প্রাণের প্রথম প্রকাশিত মাধুর্যময় রূপটি যে প্রথম বৃক্ষলতায় মঞ্জুরিত হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল, ধরার কঙ্কালকে এই বনভূমিই যে শ্যামল অঞ্চলে ঢেকে রেখেছে—এ তো বৈজ্ঞানিক সত্য। কবি কাব্যসত্যে তাকে ভূষিত করেছেন মাত্র। এই অনুভবগম্য বৈজ্ঞানিক সত্যটিকেই 'বনবাণী' গ্রন্থে কবি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে উঠে।"[১]

মানবজীবনও সৃষ্টির এই গূঢ়তম রহস্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রহস্যময় সত্য। তার সম্পর্কে জীবনজিজ্ঞাসা তো কবির আজন্মের। জীবনের শেষ পর্বে দাঁড়িয়েও তার সম্পর্কে প্রশ্ন বা বিস্ময় কবিমনে কিছুমাত্র কম নেই। 'শেষলেখার '৭' সংখ্যকে—

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"বনবাণী" [সং—পুনর্মুদ্রণ : আগষ্ট, ১৯৫৭) "ভূমিকা"]

পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।
প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা।

জীবন এবং সৃষ্টির জন্মরহস্য বা স্বরূপ যতই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে সাধারণের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসুক না কেন, তার 'অভাব্য স্বরূপ' আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল। তার সম্পর্কে বিস্ময় বা কৌতূহল আজও সমান তীব্র। এই বিস্ময় এবং রহস্যবোধের মধ্যেই কবিকল্পনার জন্ম—রোমান্টিক মনের স্বপ্নসঞ্চরণ! তাই আজও অনেক জানা-না-জানার আবরণে সকলের কাছে সমান বিস্ময়ের অনির্বচনীয় আনন্দের এবং অপরিমেয় রসের। কবিমন এই আনন্দরসের বন্যাতেই সকলকে ডুব দিতে সাহায্য করে। এই রোম্যান্টিক কল্পনা 'truth and reality'র সমন্বয়েই গঠিত।

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার করতে বসে শ্রীশুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক কবিকল্পনার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করে বলেন— "...রবীন্দ্রকাব্যকে যাঁরা বাস্তববিরোধী, কল্পলোকনিমগ্ন বলেন তাঁরা রোমান্টিক কাব্যের এই অন্তরের কথাটি বিস্মৃত হন। তাঁরা ভুলে যান দ্যুলোক-ভূলোক সমন্বিত করেই, অন্তর্লোক ও বহির্লোক পর্যটন করেই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য সার্থক হয়। দ্যুলোক ও অন্তর্লোক যদি কবির প্রথম জীবনে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তবে জীবনবোধের 'truth and reality'র অবশ্যস্বীকার্য অঙ্গ বলেই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন প্রাধান্য পেয়েছে উত্তরকাব্যে 'পলাতকা'য়, 'পুনশ্চ'-এ 'নবজাতক'-এ রূঢ় বাস্তব চেতনা।"[১]

সত্য ও কল্পনার আশ্রয়ে গঠিত সেই অনন্যসাধারণ কবিকল্পনাই আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। প্রকৃতিচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার ক্ষেত্রে এই সত্য ও কল্পনার একটি সুসমন্বিত মিশ্রণ রবীন্দ্রসাহিত্যে ঘটেছে। কবিকল্পনা 'দ্যুলোক' এবং 'অন্তর্লোক'কে মন্থন করেই তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদ যুগিয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত কবিকল্পনার সেই 'দ্যুলোক' ও 'অন্তর্লোকে'র আলোচনার দ্বারা দেখা গেল কী সুদূরবিস্তারী তার স্বরূপ—'মানবচেতনা'র ক্ষেত্রটিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাওয়া যাবে কত রূঢ় বাস্তব-চেতনার পরিপুষ্টিতে সেই সমগ্র জীবনসাধনা সার্থক ও সম্পূর্ণ।

১। শ্রীশুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার" [প্রঃ ২৫শে বৈশাখ-১৩৬৯ 'শেষ মন্তব্য'—পৃঃ ২৭৯]

॥ খ ॥

মানবচেতনা

মর্ত্য পৃথিবীর একদিকে আছে রূপসৌন্দর্যে প্রাণস্পন্দী প্রকৃতির অপরিমেয় প্রাণচাঞ্চল্য—আর একদিকে আছে দুঃখসুখের নীড়ে বাঁধা 'কান্নাহাসির দোল দোলানো' বিচিত্র ঘাতে-প্রতিঘাতে-বিস্ময়ে-কলরবে মুখরিত এই মানবসমাজ। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী কবি হয়েও, রোমান্টিক প্রকৃতিবিলাসী কবি হয়েও, উপনিষদের মন্ত্রপূত সাধনময় মুক্ত আত্মার স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়েও—জীবনরসিক কবি। তাঁর যা কিছু চিন্তা-চেষ্টা-কল্পনা-সাধনা সব তো এই রোগে শোকে দারিদ্র্যে সংঘাতে বঞ্চিত পীড়িত মানবের জন্য। কিন্তু তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে অধিকাংশ লোকই এমন মোহগ্রস্ত যে খণ্ড খণ্ড ভাবে সেই বিরাট মানুষটির সর্বাত্মক চেষ্টার কিছু কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন; কিংবা খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমালোচনার মধ্যে দিয়ে কবির ক্ষমতার কোনো একটি বিশেষ দিককে আমাদের কাছে উদঘাটিত করেছেন। সমগ্র এবং সম্পূর্ণ মানুষটির আসল পরিচয়টি যেন অনেকের অগোচরেই রয়ে গেল। "একথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন তুলনাহীন, তেমনি তুলনাহীন তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের যথাযথ অনুশীলন এদেশে এখনও হয়নি। লোকোত্তর প্রতিভা শিল্পের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে চমকিত করেছে যে, তার অন্তরালের মানুষটিকে সন্ধান করার কথা আজও ভালো করে মনে এলোনা। তাই নানা ভ্রান্ত ধারণার তরল কাহিনীর শেষ নেই আজও। শুধু চরিত্র নয়, তাঁর বিপুল বিরাট কর্মপ্রচেষ্টাও চাপা পড়ে গেছে আমাদের চোখে। ...সাধনার কঠিন ইতিহাসকে ভুলে যখন সাধনার ফসলগুলির হিসেব নিই তখন নিজের নির্বুদ্ধিতাবশেই মনে করি শুধু কল্পনা থেকে ফসল ফলে। যে বিরাট ব্যাপক মন দেশের প্রত্যেকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে কোন শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বুদ্ধি ও বিচারের পথ খননের প্রচেষ্টা করেছে তা আমাদের অগোচরেই রয়ে গেল"।[১]

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই এটা আক্ষেপের এবং বেদনার কথা। সম্পূর্ণ মানুষটির জীবনসাধনার মূল বাণীটিকে আমরা যেন অনেকেই ধরতে পারিনি; আর পারলেও অনুভবের দিক থেকে সে চেষ্টা যথেষ্ট নয়। এখনকার বহু সমালোচনার মধ্যেই তাই তাঁকে 'আধুনিক' বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা চলেছে।

১। "সমকালীন পত্রিকা" [৯ম বর্ষ, আশ্বিন—১৩৬৮] প্রবন্ধ "রবীন্দ্রচিন্তা"—শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু [পৃঃ ৪১১-৪১২]

রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' কিনা—এ কিছু বড় প্রশ্ন নয়। সর্বকালের মানুষের জন্যে তিনি কি বাণী রেখে গেলেন—তাঁর কোন্ চেষ্টা, কোন্ কর্ম, কোন্ সাধনা আমাদের এ যুগের শুধু নয়, সর্বযুগের সর্বমানুষের কর্মে প্রেরণা দেবে, শোকে শান্তি দেবে, জীবনে আনন্দ দেবে, জীবনের গূঢ় গম্ভীর জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে, সমস্ত বিশ্বের জন্য সর্বদেশের সর্বকালের সর্বজাতের মানুষের জন্য ভালোবাসার কথা শোনাবে—একজন মানুষ হিসেবে মানবের ইতিহাসে তাঁর যে এই দান—এই তো একটি জীবনের চরম পরিপূর্ণতা, পরম সার্থকতা। এর থেকে চরম প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে আর কি থাকতে পারে? নিজেকে তিনি খণ্ড দেশকালের, ধর্মের, সংস্কারের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন। মানুষের আত্মা যে এই সমস্ত খণ্ড সীমার ঊর্ধ্বে; তাই মানবের চেষ্টা এবং চিন্তা, সাধনা এবং সার্থকতা যেন চিরন্তন মানবের চরিতার্থতার সন্ধান করে ফেরে—এটাই কবির মূল বাণী। তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে একেই বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা।

কথাটা কেমন যেন অলৌকিক, অবাস্তব ঠেকছে। তাহলে মানুষ কি সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব কর্মকাণ্ডকে, জীবন-মৃত্যুকে, রোগ-শোককে, দারিদ্র্য-বঞ্চনাকে অস্বীকার ক'রে অদৃশ্য কোন্ স্বপ্নলোকে বিহার করবে, না কি তুরীয় মার্গে মোক্ষলাভ করবে? কবি কি বলতে চান? কঠোর বাস্তব সত্য সম্পর্কে 'দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি' সম্পর্কে কবির ধারণা কেমন? নির্দেশ কি? জীবনকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না প্রতি মুহূর্তে তার অজস্র দাবী নিয়ে সে আমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে দিচ্ছে—জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েই তার মূল্য তাকে শোধ করে দিতে হবে। জীবনের এই দাবীকে কবি কি জানেন না? মানেন না? হাঁ, জানেন—জীবনটা যে কী এবং কত মূল্য দিয়েই যে তার দেনা শোধ করতে হয়—তা তিনি না জানলে আর কেই বা জানে? কিন্তু এও তিনি জানেন—"পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে।"[১] তাই তিনি বলেন—"নিজের মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ-দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্যন্ত চলে এসেছি—কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি। জীবনটা যদি নিতান্ত ছায়ায় লালিত, পেলব এবং শৌখিন হত তাহলে তার কোন মূল্য থাকত না। যদি তুমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর তবে একদিন এই প্রাণ পরিপূর্ণ পৃথিবীর রৌদ্রালোকিত কলধ্বনিমুখর প্রভাতে জেগে উঠে দেখবে তুমি যে অবসাদে আবিষ্ট হয়েছিলে সে দুঃস্বপ্ন মাত্র, তার

[১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড [বিশ্বভারতী—আষাঢ়, ১৩৮১] [পত্র সং—৪, ২০ আগষ্ট ১৯১৭, ৪ঠা ভাদ্র ১৩২৪]

মধ্যে সত্য নেই। জীবনে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত উদ্যোগ, কত সৃষ্টি—জীবনের সেই বিচিত্ররূপী সত্যের দুর্লভ উপলব্ধি থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। বাঁচবার জন্য যাত্রা কর কোমর বেঁধে—দুর্জয় তেজে, অসীম আশায়, অটল বিশ্বাসে—অশ্রদ্ধা কোরো না নিজেকে, এবং এই বিপুল সংসারকে এই অপরিসীম রহস্যময় জীবলীলাকে।”[১]

তাঁর এই ব্যক্তিগত চিঠিটির মধ্যে জীবন সম্পর্কে তাঁর মূল বাণীটি সুপরিস্ফুট। অবশ্য বহু কাব্য-কবিতা-সঙ্গীত-প্রবন্ধ-নাটক অনেককিছুর মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টিকে বিচিত্র শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করে গেছেন তিনি। এই একখানি চিঠিতেই জীবনের সম্পর্কে তাঁর সত্য দৃষ্টিভঙ্গিটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। সে দৃষ্টিভঙ্গিটি কি? জগৎ এবং জীবনকে তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা। জীবনকে আমরা যতই ভালোবাসি না কেন এবং মান-সম্মান-অর্থসম্পদ-ভালোবাসার পাত্র যা কিছুর জন্য ছুটে মরি না কেন—কাল একদিন সবকিছুকেই গ্রাস করে নেবে। কোনো দুঃখ বেদনার তাপ অনুতাপ স্থায়িভাবে মানুষের বুকে আসন গেড়ে বসে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মেই সবকিছুর ভিতর পরিবর্তন আসবে—সে পরিবর্তন যেভাবে যেদিক থেকেই আসুক না কেন; আর মানুষ তাকে স্বীকার করুক বা নাই করুক। কথাটা দার্শনিক ব্যাখ্যানের মতো শোনালেও কবিদার্শনিকের জীবনবোধে এই সত্যটি একটি মূলীভূত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে উপায়? জীবনের কাছ থেকে কি মানুষ পালিয়ে বাঁচবে? না;—নিজেকে এবং বিশ্বসংসারকে অশ্রদ্ধা না করে ‘দুর্জয় তেজে’, ‘অসীম আশায়’, অটল বিশ্বাসে বিপুল সংসারকে স্বীকার করে নিতে বলেছেন কবি। তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব চুকিয়ে দিতে বলেছেন, আর সেটা দায়সারা করে নয়—মাধুর্যে-প্রেমে-রূপে-রসে জীবনপাত্রকে কানায় কানায় উচ্ছলিত করে নিজেকে দান করে চলে যেতে বলেছেন কবি। যে অপরিমেয় শক্তি এবং সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে—তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে। এখানেই মানুষের সার্থকতা—এখানেই মানুষের মহত্ত্ব। কিন্তু এই ‘কর্মবাদ’ বা মানুষের ধর্ম, মনুষ্যত্ববোধে—অর্থাৎ বিচিত্র কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মার নিত্য এগিয়ে চলার যে সাধনা তাকে কবি প্রাচীন ভারতের চারটি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। একদিকে জীবনকে এবং মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন; অপরদিকে আসক্তিবিহীন-ভাবে এই জীবনকে ভোগ করতেও বলেছেন—যাতে অতিরিক্ত মায়া বা মোহ আচ্ছন্ন না করে ফেলে।

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড বিশ্বভারতী—প্রকাশ: আষাঢ়—১৩৮১
[পত্র সংখ্যা—৫। ১৪ই কার্তিক, ১৩২৪]

যে কবি জীবনকে এইভাবে ভালোবাসার কথা বলেন, কর্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেন, তিনি তো মানবপ্রেমিক কবি। মানুষকে না ভালবাসলে এই কর্ম কার জন্য? অথচ সেই মানুষটিকে শেষজীবনে 'কৈফিয়ৎ' দিতে বসতে হয়েছে তিনি 'রোমান্টিক' 'কল্পনাবিলাসী' কিনা—তিনি জীবনকে তার দুঃখ-দৈন্যে-অভাবে-অনটনে-বঞ্চনায়-নির্যাতনে দেখেছেন কিনা। অর্থাৎ তিনি বাস্তববাদী এই মাটির পৃথিবীর কবি কিনা। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনাবোধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কিনা—তাদের মুখের ভাষা, মনের কথা তাঁর কাব্যে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে কি না।

যে কবি মানুষকে ভালোবেসে, দেশকে ভালোবেসে আজন্মকাল তাদের জন্য লেখনী ধারণ করলেন, শুধু তাই না—সেই মানুষের অপমান-লাঞ্ছনা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা ঘোচাতে সমস্ত অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় করলেন, সারাজীবন দেশবাসীর কাছ থেকে নিন্দা গ্লানি-বাধা পেয়ে সেই ক্লান্ত, বৃদ্ধ কবির শেষ জীবনের 'কৈফিয়ৎ' যেমন বেদনাদায়ক তেমনি মর্মান্তিক।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' কবির এই বাস্তব জীবনসচেতনতা, আপন মনের বেদনা, বর্তমান মানবসমাজের ও যান্ত্রিক জীবনযন্ত্রণার প্রতি তাঁর মনোভাব—এই সবকিছু নিয়ে গঠিত বহুমুখী জীবনজিজ্ঞাসা আর তার উত্তর দেবার প্রয়াসকে লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার চিঠিপত্রে এবং কোনো কোনো প্রবন্ধেও তাঁর এই মনোভাব অভিব্যক্ত।

"আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়—এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন—আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্মসম্মত।"[১] (৫ জুলাই ১৯৩৪)

অথবা—

……"আমি কেবল এইটুকু বুঝে নিয়েছি অন্তরতরভাবে তোমরা আমাকে আপন করে নিতে পারো না। আমার গুণের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ব্যক্তির প্রতি মমতা নেই। তাই নিন্দার শরবিদ্ধ হয়ে আজ ৩৪ বৎসর দেশের জন্যেই নিজেকে প্রায় দেউলে করে দিয়ে দেশের কাজ একলা করেছি—অহৈতুক বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে নিঃসহায় চলতে হয়েচে। দেশের বড়ো ছোটো অনেকেই তাঁদের নিজের কাজের প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে সাহায্য আদায় করতে কুণ্ঠিত হন নি কিন্তু একদিনের জন্যেও

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" [৯ম খণ্ড] সং-বিশ্বভারতী—১৯৬৪ শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রসংখ্যা [১৪৩, পৃঃ ২৩৯]

মনে করেন নি আমারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে, সাহায্যের না হোক্ অনুকম্পারও দাবী করতে পারি। কঠোর সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করে নিতে একান্ত ইচ্ছা করি, এক এক সময়ে বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অসহিষ্ণুতার জন্যে লজ্জিত হই।"[১] (৭ আগষ্ট ১৯৩৪)

এই সমস্ত উক্তির মধ্যে কবির বেদনাহত অভিমান বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। কিন্তু, একথাও তো ঠিক, বেদনা পাওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল। বৃদ্ধ কবিকে সেদিন যে দেশের কোনো কোনো মহল ক্ষমা করেনি তা তো কবির উক্তি থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত। আর এর জবাব দিতে গিয়ে কবি নানারকম করে নিজের মানসিকতাকে, কর্মপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলেন; আর সেই আত্মসমালোচনার ফসল ফলে রইলো শেষপর্যায়ের বহু কবিতায়। কবির বেদনা সেদিন যত মর্মভেদীই হোক না কেন একটা বিষয়ে আজ আমরা লাভবান যে, ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ আঘাতের যে অপর্যাপ্ত বেদনা তিনি পেয়েছিলেন মানসিক দিক থেকে তাঁর শক্তিকে এবং অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে তারা খুবই গভীরতা এনে দিয়েছিল—বিচিত্র শিল্প সাধনায় যার তুলনাহীন অভিব্যক্তি। বাইরের দিক থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে যেভাবে শরবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, তার জবাব দিতে গিয়ে শেষ পর্যায়ের কাব্যে অনেক দুর্লভ কবিতার জন্ম হোল; যা না পেলে কবির সর্বকালের সর্বাঙ্গীণ রূপটি আমাদের কাছে চাপা পড়েই থাকতো।

আশি বৎসর বয়সের একটি অনুভূতিশীল জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার এবং মানবের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। বাইরের দিক থেকেও যান্ত্রিক জীবনের প্রভাব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শান্ত-স্তিমিত-সুস্থ জীবন-বোধের অনেক পরিবর্তন এসেছে বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু "আজন্ম যে সব আদর্শকে লালন করে এসেছেন, যে মূল্যবোধের উপরে তাঁর জীবনদর্শন গঠিত, যে সব বিশ্বাসকে জীবনের প্রধান আশ্বাস বলে জেনেছেন আজ যে তা অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। মনে ক্লেশ পেয়েছেন, মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে, নানা সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। কাব্যে সে সংশয়ের ছায়া পড়েছে কিন্তু সে ছায়া মাত্র, কায়া লাভ করেনি। তাঁর জীবনদর্শনে বড় রকমের কোনো ভাঙচুর ঘটেনি। জীবনে অসংগতি আছে, অপূর্ণতা আছে, নানা রকমের বিকৃতি আছে; কিন্তু ঐ সমস্ত নিয়েই জীবনের পূর্ণ পরিচয় নয়। ...উদ্বেলিত জীবন প্রবাহের তলায় যে প্রশান্তি বিরাজমান কবির মন তার সন্ধান রাখে।"[২]

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র" [৯ম খণ্ড] শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত।
[সং—বিশ্বভারতী : ১৯৬৪] পত্র সংখ্যা [১৪৬, পৃঃ ২৪৭]

২। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'—মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ প্রবন্ধ—'কবি ও কাব্য'-'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ'-শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
[বিশ্বভারতী প্রত্রিকা—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুক্রম—পৃঃ ২৯২]

তবুও শেষপর্যায়ের কাব্যের বেশ কতকগুলি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি বর্তমান যুগের পটভূমিকার উপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে যেন কিছু কিছু কৈফিয়ৎ দিয়ে গেলেন এবং বার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আত্মসমালোচনাও করলেন।

'নবজাতক' কাব্যের 'রোম্যান্টিক' কবিতার মধ্যে কবি তাঁর বিরুদ্ধে 'রোম্যান্টিক', 'কল্পনাবিলাসী'—এই অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েই বললেন—'

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
*　　*　　*
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক',
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক'।

কবি স্বীকার করেই নিলেন তাঁর মন কল্পনাবিলাসী এবং একথাও সত্যি যে, তাঁর রচনাশিল্পের মধ্যে অনেকখানি 'মায়া' আছে, 'ছায়া'ও আছে। কিন্তু এও কবি সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন 'বাস্তবতা' কাকে বলে। সে জীবনটাকে তিনি পাশ কাটিয়ে চলেন না। 'শৌখিন বাস্তব'কে তিনি স্বীকার করেন না। জীবনের পূর্ণ মূল্য সমস্ত জীবনের কর্মে-ত্যাগে-বীর্যে তিনি দিয়ে এসেছেন। তাই আজ জোরের সঙ্গেই বলতে পারেন—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।

['রোম্যান্টিক'—নবজাতক]

দৈন্য ব্যাধি কুশ্রীতাকে কবি অস্বীকার করেন না এবং সেখানে 'উত্তরী' ফেলে কবি 'বর্ম' ধারণ করেন। জীবনে ত্যাগের এবং দুঃখের আহ্বানে বীরের ন্যায় এগিয়ে চলেন; সেখানে কবির উক্তি—

শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

['রোম্যান্টিক'—নবজাতক]

বাস্তব জগতে দৈন্য যেখানে, যেখানে কুশ্রীতা, যেখানে অন্যায়, যেখানে পাপ—কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। কিন্তু সেই কবির বিরুদ্ধেই যখন অভিযোগ ওঠে তিনি সাধারণের কবি নন, সাধারণ জনজীবনের দুঃখ-লাঞ্ছনার প্রতি তাঁর কোনো যোগ নেই—সহানুভূতি নেই—কবি যেন মাথা পেতে সেই নিন্দা-গ্লানিকে, বেদনাকে আপন মহত্ত্ব দিয়ে, ঔদার্য দিয়ে স্বীকার করে নেন। 'জন্মদিনে' কাব্যের 'দশ' সংখ্যক কবিতায় সেই বেদনাময় স্বীকৃতি অমর কাব্যকলায় গাঁথা হয়ে রয়েছে—

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

* * *

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,

কিন্তু জীবনশেষে আজ যেন বেদনার সঙ্গে অনুভব করেন—

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।

* * *

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। ['১০' সং—জন্মদিনে]

"বিচিত্র সম্পদপূর্ণ কীর্তিও তাঁর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না, 'নির্বাক মনের' 'অখ্যাত জন'-সাধারণের জন্য প্রাণ রইল তাঁর ফাঁকা। সাধারণ মানুষের পার্থিব সুখ-দুঃখময় জীবনযাত্রার মধ্যে না-পৌঁছতে পারার সংশয় তাঁকে কেবলি পীড়া দিয়েছে। তাঁর অতৃপ্ত মনের বেদনা তাকিয়ে রইল ভাবীকালের প্রতীক্ষায়। তাঁর যুগপ্রান্তিক থেকে যে-গুণীর আবির্ভাব হবে তুলে নিতে তাঁর কণ্ঠের "না-বলা-বাণী"র সুর, সেই সূত্রধারের উদ্দেশ্যে তিনি রেখে গেলেন তাঁর এই শেষ প্রশস্তি।"[১]

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।

* * *

মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,

১। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর—'নির্বাণ' [সং-কার্তিক ১৩৬২—পৃঃ ৩২]

ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

['১০' সং—জন্মদিনে, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১ সকাল]

তাঁর বিরাট শিল্পভাণ্ডারে মানুষের জন্য যে দরদ এবং অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দন দিয়ে যে ডালি সাজানো আছে, তাঁর সমস্ত জীবনের গঠনমূলক কাজে মানুষের জন্যে যে প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের নিদর্শন আছে, একটি মানুষের একটি জন্মের পক্ষে তা যে কত বেশী এবং কত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল; এই দেখার চোখ—এই অনুভবের মন—এই কর্মের শক্তি-বীর্যকে লাভ করা যে কত সৌভাগ্য, তা তো সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তবুও সেই কবিমনের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নেই—সব জানা হোল না বলে বেদনার অন্ত নেই। ভাবীযুগের গণকবির উদ্দেশ্যে নম্র নমস্কার জানিয়ে কবি তাঁর প্রতীক্ষা-পথ চেয়ে বসে থাকেন। সমস্ত জীবনের কীর্তির গৌরবকে পিছনে ফেলে রেখে জীবনের শেষ-লগ্নে (২১ জানুয়ারি ১৯৪১, সকাল) আত্মসমালোচনার এই প্রশান্ত সুন্দর অভিব্যক্তি কবিকে যেন আরও মহৎ আরও গৌরবান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু ভাবাযুগের কবিদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেও তিনি ছাড়েননি। 'শৌখিন বাস্তবতা' দিয়ে বা শুধু 'ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলালে' চলবে না—সেভাবে সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করা মহাপাপ।

জীবনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্মসমালোচনা করে কবি তাই বলেন—

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে

* * *

জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে

* * *

গান যে মানুষ গায় দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে;
যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলে নি তার।

* * *

বাজল ভেরি,
তবু জাগল না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে;
ব্যূহ ভেদ করে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম সহকারিতায়।

*　　*　　*

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;

['বারো' সং—পত্রপুট, ১লা বৈশাখ ১৩৪৩]

সমস্ত জীবনের কর্মের হিসাব করতে বসে কবি দেখলেন জীবনের শান্ত সুন্দর দিকটিকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এবং বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণকে তুচ্ছ করে যে সব মানুষ 'মর্ত্যের অমরাবতী'কে সৃষ্টি করেছেন—কবি তাঁদের দলে নন। রুদ্রের শান্ত রূপটিরই তিনি পূজারী—ভৈরবের তাণ্ডবরূপের পরিচয় তাঁর কাছে গোপন রয়েই গেল।

কিন্তু এই সৃষ্টিতে তো 'রূপ-বিরূপে'র (নবজাতক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪০) খেলা নিত্যকাল চলেছে। আজ বুঝি এতদিন পরে ললিতে-কঠোরে মিশ্রিত সেই রূপ তাঁর হৃদয়দ্বারে এসে আঘাত করছে—

আজ দেখি, অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করেনি সঞ্চয়

*　　*　　*

ছন্দোভঙ্গ হল তাই,

*　　*　　*

সৃষ্টি রঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,

*　　*　　*

তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—

*　　*　　*

বাণী বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভৎর্সনা তোমার।

কল্যাণের কবি, সৌন্দর্যের কবি, শান্তম্-শিবম্-সুন্দরমের কবি রবীন্দ্রনাথ—মানুষের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে যা কিছু সুন্দর তাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন তিনি, তাঁর শিল্পে, তাঁর সাধনায়। অসঙ্গতিকে অমঙ্গলকে তিনি যে জানেন না তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটি আশাবাদের ছবি ফুটে ওঠে তাঁর রচনায়। এই রচনার ভাষাও আবার

সুললিত, মাধুর্যময়। সুতরাং বাস্তবের কলুষ কালিমা নগ্নতা আবিলতা তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না সকলের চোখে। 'রূপ'-কে ছাড়িয়ে 'সত্যে' পৌছাতে হলে যে মন, যে অনুভব দরকার তা সকলের আয়ত্তে নয়—তাই না তাঁর বিরুদ্ধে এত নিন্দা গ্লানি। কবিও জানেন তিনি সুন্দরের পূজারী। ভৈরবের রুদ্র মূর্তির মধ্যে সংহার মূর্তি অপেক্ষা কল্যাণের মূর্তিই তিনি দেখেছেন—সেই মূর্তিরই পূজারী তিনি। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই রুদ্র রূপের—সেই 'রূপের' সঙ্গে 'বিরূপের' সাধনা করেন। তাই আপনার মধ্যে আজ 'বিপ্লব' (সানাই) ঘটে গেল বলে অনুভব করেছেন। জীবনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী আজ আর সুললিত কণ্ঠে তাঁকে 'আহ্বান' জানাচ্ছেন না—আজ তাঁর 'কঙ্কণঝঙ্কারে', তাঁর কটাক্ষে কবি রৌদ্রী রাগিণীর' সুরই শুনতে পান—

তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি

* * *

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কনে।

['বিপ্লব'—সানাই, ২১ জানুয়ারি ১৯৪০]

কবির এই সমস্ত আত্মসমালোচনা খুবই প্রশংসনীয়। সমস্ত মানুষের জন্য আত্মজীবন দান করেছেন যে সমস্ত প্রাণ, কবি তাঁদের ত্যাগ ও শৌর্য-বীর্যকে স্মরণ করে প্রণাম জানিয়েছেন।—

যারা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,

* * *

অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে—
তাঁদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি

* * *

তাঁহাদের করি নমস্কার। ['১৭' সং—জন্মদিনে]

কিন্তু কবির যে বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে, কবি তার মধ্যে দিয়ে যেভাবে আত্মসমালোচনা করে গেছেন—এই সমস্ত বেদনা বা আত্মসমালোচনাকে আমরা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো? মানুষের জন্যে 'প্রাণ' দেওয়ার মধ্যেই কি সব থেকে বীর্যের পরিচয় রয়েছে? প্রাণ তো উত্তেজনার বশে অনেকেই দিতে পারে। আবার কবি মহৎপ্রাণের যে আত্মত্যাগের কথা বলেছেন, অর্থাৎ 'বুদ্ধ', 'খৃষ্ট' প্রভৃতি চরিত্র যে আত্মত্যাগে ব্রতী হয়েছেন—সে সমস্ত আত্মত্যাগও মানবসমাজে অতিশয় দুর্লভ সন্দেহ নেই। কিন্তু কবি তো এইভাবে জীবন উৎসর্গ করতে চাননি। সংসারের দুঃখ সুখের ঢেউ-এর মধ্যে থেকে সর্বমানুষের জন্য কতটুকু কি দেওয়া যায়, কি করা যায়, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো তিনি রেখে গেছেন তাঁর জীবন-সাধনায়। তিনি তো বারবার ঘোষণা করেছেন—তিনি বিচিত্রের দূত। প্রাণরঙ্গভূমিতে এসেছেন বাঁশি বাজাতে। যা তিনি দিতে পেরেছেন দেশের জন্য, দশের জন্য, সর্বকালের মানুষের জন্য তাই তো অপরিসীম; প্রাণটা দেবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই কি খুব বেশি কিছু দেওয়া হোত? সুতরাং এই ব্যথা বেদনা সাময়িক; সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক জীবনের আঘাত থেকেই আত্মসমালোচনার মূর্তিতে অভিব্যক্ত —তার থেকে বেশি মূল্য দিয়ে এ সমস্ত কবিতাকে দেখা যায় না। তাঁর সূক্ষ্ম হৃদয়ের কাছে বাইরের জগতের সমস্ত ঘটনা বা মতামতই প্রতিধ্বনি তুলতো এবং মনের পক্ষে এটা যে স্বাস্থ্যকর তাও তিনি জানতেন—

…"বাতাসের চলাচলের মত চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধমত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু একে যত বড় নামই দাও না, এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভাল।

…আমার জীবনে নিরন্তর আমার মন নিজের ও চারদিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে চলেছে, কোন একটা অন্ধকূপের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নি।"[১]

আপন মনের এই সচল শক্তি দিয়েই তিনি সেদিনের সমস্ত যুগযন্ত্রণাকে এবং নানা অভিমতকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। মনের সেই বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই কাব্যের আধারে নানা রূপাঙ্গিকে ধরা পড়েছে। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে যে দুঃখ আছে,—দুঃখ বেদনা না পেলে যে হৃদয়বীণা বাজে না; তাই এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে আরও বিচিত্রধর্মী ক'রে সজীব গতিমান ক'রে তুললো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বার্ধক্য-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিঠিপত্র' ম (৯ খণ্ড) শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত [সং—বিশ্বভারতী, ১৯৬৪—পত্র সং—৩৫, পৃঃ ৮২-৮৩, ২১ আগষ্ট ১৯৩১]

জরা-অসুস্থতা-ক্লান্তি সবকিছুকে জয় করে সেই বেদনা নূতন নূতন শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপন আত্মার বিজয় ঘোষণা করলো।

যে কোনো মানসিক আঘাত বা অস্থিরতাকে সাময়িকভাবে প্রকাশ করলেও মনের দিক থেকে একটা মানসিক স্থৈর্য, প্রশান্তি এবং পরিপূর্ণতা তাঁর ছিল। কারণ নিরাসক্ত দার্শনিকের দৃষ্টিতে কবি জীবনকে দেখেছিলেন। সেই আসক্তিবিহীন প্রজ্ঞার দৃষ্টিই তাঁকে জীবনের আবিলতা থেকে মুক্ত করেছিল। খণ্ডকালের যুগযন্ত্রণা তাঁকে নাড়া দিতে পারলেও আবিষ্ট করতে পারেনি। তাই মানুষকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে ভালোবেসে তার জন্য আপন অন্তরের শ্রেষ্ঠ দানকে রেখে যেতে পেরেছেন।

যে মানুষকে ভালোবাসাই জীবনরসিক কবির মূল জীবনসাধনা, সেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর হৃদয়ের বিচিত্র উপলব্ধিকে রসায়িত করে নানাভাবে প্রকাশিত—কাব্যে, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিত্রশিল্পে—জীবনের নানা গঠনমূলক কর্মে।

(১) সেই বিচিত্র ভালোবাসার একটি প্রত্যক্ষ রূপ—'জাতীয়তা' এবং 'আন্ত-র্জাতিকতা'র বোধে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দেশ-কাল-মুক্ত ভালোবাসাকে এবং সকলের জন্য আপন মনের সমস্ত আকুলতাকে একটা বাস্তব রূপদানের প্রচেষ্টাকে এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

(২) ব্যক্তিগত ভালোবাসা যখন একটি বিশেষ মানুষকে কেন্দ্র করে পুষ্ট হয়ে হৃদয়-পদ্মের শতদল পাপড়িগুলিকে বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে-রূপে-রসে মেলে ধরে—সেটাই সাহিত্যে কবির 'প্রেমচেতনা' নামক কবিতাগুলির ভাবসম্পদ যুগিয়েছে।

(৩) আর জগৎ ও জীবনকে আজন্ম সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসলেন যে কবি, সেই ভালোবাসা দিয়ে সবকিছুকে আঁকড়ে ধরতেই তো চাইবে তাঁর আত্মা; কিন্তু কালের নিয়মে মানুষ যাকে যত ভালোই বাসুক না কেন একদিন না একদিন তাকে হারাতে হয়। কোনো ভালোবাসা দিয়েই মানুষ 'মৃত্যু'র হাত থেকে তার প্রিয়জনকে রক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং এই মৃত্যু সম্পর্কেও কবিমনের জীবনজিজ্ঞাসা সাহিত্যে একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। 'মৃত্যুচেতনা' নাম দিয়ে 'ভাবসম্পদে'র এই সম্পদটির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই যে বিচিত্র জীবনবোধ, কবির আপন অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি দিয়ে হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভবের, রসবোধের, বেদনাবোধের যে ছবি এঁকেছেন তিনি—সবই মানবকে আশ্রয় করে। মানবজীবনকে না ভালোবাসলে তার এত গভীর বিচিত্র রসরূপায়ণ সম্ভব নয়।

পরবর্তী আলোচনায় কবিকে সেই বিচিত্র অনুভবের ক্ষেত্রে ভালো করে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

॥ ১ ॥

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা

জগৎকে এবং জীবনকে ভালোবাসার সঙ্গে মানুষকে ভালোবাসা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর মানুষকে ভালোবাসা থেকেই দেশকে বা বিশ্বকে ভালোবাসার কথা এসে পড়ে।

তবুও জ্ঞান হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাড়িতেই 'জাতীয়তাবোধে'র একটি বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইংরেজ তখন এদেশে শুধু রক্ষক নয়—ভক্ষকও। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছে। ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা সবকিছু নিয়েই একটা আলোড়ন-আন্দোলন চলেছে। রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ বছর বয়সের সময়ই তিনি বাড়ির বড়োদের সঙ্গে 'হিন্দুমেলা'য় (১৮৭৪ খ্রীঃ) যান এবং 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক' কবিতা পড়েন। ছোটবেলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য এবং চরিত্রও তাঁর মনে স্বদেশপ্রেম জাগাতে সাহায্য করেছিল। পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কালের কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিক বা মনীষী কবির এই 'জাতীয়' ভাব-ভাবনার খোরাক যুগিয়েছিলেন। এরপর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে কবি তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত রচনার মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে—কবির এই 'জাতীয়তাবাদ' বা 'বোধ' একটি বিশেষ সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই সত্যবোধ হোল 'আত্মশক্তিকে জাগ্রত করা'। ১৩১১ সালে "স্বদেশী সমাজ" নামক প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কবির রাজনৈতিক মত বা জাতীয়তাবোধের স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। কবির মতে বাইরের দিক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জাতিকে মুক্তি এনে দিতে পারবে না। সমস্ত জাতি আত্মশক্তিতে দুর্বল। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মমোহ—এই সবকিছুকে কাটিয়ে সমস্ত মানুষ যদি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শেখে তাহলে স্বাধীনতা, মুক্তি আপনিই আসবে। দেশের সাধারণ মানুষকে তাই সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে, দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। এর জন্য সমাজের সেই আদিস্তর থেকে, গ্রামকেন্দ্র থেকে গঠনমূলক কাজ চাই।

মানুষকে ভালোবেসে, নিজের দেশকে জাতিকে ভালোবেসে কবি সেদিন যে সত্যবোধে পৌঁছেছিলেন, সেই উপলব্ধি দিয়েই তাঁর জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর চিত্ত চিরদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বেষ বা দলাদলি, পরজাতি বিদ্বেষ—এ সমস্ত চিন্তাধারাকে তিনি কোনো-দিনই প্রশ্রয় দিতে পারেননি। তাই তাঁর জাতীয়তাবোধকে তিনি রূপ দিলেন, ভাষা দিলেন একান্তভাবেই আপন সত্যাদর্শের উপর—যে 'বোধ' বা 'মতবাদ' ক্রমশঃই

রাজনৈতিক নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলো না এবং কবিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

এই প্রবন্ধ লেখার আগে ২৫।২৬ বছর বয়স থেকেই কবি জমিদারীর কাজে পূর্ব-বাংলার 'শিলাইদহ' অঞ্চলে বেশ কিছুকাল বাস করেন। সেই সময়ে পূর্ব বাংলার নদ-নদী, খাল-বিল, প্রশান্ত আকাশ, উদার প্রান্তর যেমন তাঁর দেহ-প্রাণ-মনকে অপর্যাপ্ত রূপ-সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছিল—যে সম্পদ তাঁর সমস্ত জীবনের একটি পরম প্রাপ্তি, ঠিক তেমনিতরো ভাবে গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ কি—এবং সেই দুর্গতি, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা যে কি ভয়াবহ, তবুও মানুষ কত অসহায়ভাবে, নিশ্চেষ্টভাবে, নির্বিকার-ভাবে ঐ অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে চলেছে—তাও তাঁর অনুভূতিশীল দৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে। এই করুণ, মর্মান্তিক ছবি কবিকে যে কত ব্যথাহত করেছিল তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায়—

"ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! সকল রকম শান্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।"[১]

দুঃখে-দারিদ্র্যে-রোগে-শোকে পীড়িত গ্রামবাংলার একখানি বাস্তব ছবি। এ তো কাব্য নয়—সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব না করলে এমন ছবি আঁকা যায় না। শুধু তাই নয়—এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কোনখানে সে সন্ধানও কবি রাখেন। রোমান্টিক ভাববাদী কবির জীবনে দেশের সাধারণ মানুষের মর্মবেদনা তীব্র হয়েই বেজেছিল সেদিন। ৩০ বৎসরের যুবক চিত্তকে সেদিন এই সমস্ত ভাবনা এমন গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল যে, তার মূল যে কোথায় তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় তখনি যখন দেখা যায় ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই কবিপ্রাণটিই সেই ভাবনা-চিন্তা এবং সহানুভূতি নিয়ে, কত বাধা-বিপদ, কত অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে 'শান্তিনিকেতন' ও 'শ্রীনিকেতন' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেই গ্রামবাংলাকেই শিক্ষিত, বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল, গ্রামকেন্দ্রিক এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম রূপে গড়ে তোলার জন্য; এবং জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও কবি এর জন্য ব্যয় করে গেছেন।

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'পত্রধারা' [প্রথম—তৃতীয় খণ্ড, ছিন্নপত্র, পৃঃ ২৯৬]—দিঘাপতিয়া জলপথে, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

পল্লীবাংলার যেমন একটি জীবন্ত বাস্তব ছবি কবি সেদিন আপন জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন, সেই গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টাকেই জাতীয় জীবনের একমাত্র কাজ বলে সেদিন থেকে তিনি গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর কাব্যে কবিতায় নানা রচনায় এই মানুষের শক্তিকে জাগ্রত করার কথাই বার বার করে বলে গেছেন। 'সংকল্প' ও 'স্বদেশ' কাব্য-সংকলনে এই যুগের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার সংগ্রহকে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলেই কবি মানসিকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ছিন্নপত্রে'র ঐ চিঠিখানি লেখার বছরখানেক আগে লেখা 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি বলেছেন—

…কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

'সম্মুখে যে কষ্টের সংসার' এবং সে সংসারের চেহারাও যে কেমন—তা কবির জানা আছে—

…কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়?…
……ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—

*　　　*　　　*

শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।… … …
… … …এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা…

*   *   *

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে ;

*   *   *

পথ-কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;

*   *   *

মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

['এবার ফিরাও মোরে'—চিত্রা]

সমগ্র জাতির প্রতি এই দরদ, তার দোষ-ত্রুটির প্রতি তীব্র সমালোচনা এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাবার শক্তি তেজ এবং বাণী নিয়েই কবি সেদিন এগিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সমগ্র অসহায় অবহেলিত অত্যাচারিত মূক জাতির মাঝে।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' আমরা রবীন্দ্রনাথের বাস্তব সচেতনতা দেখে মুগ্ধ হই ; তাঁর উপর আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব কাজ করেছে বলে সমালোচনা করা হয় ; কিন্তু এ পর্যায়েও কাব্যের বিষয়ে বা কবির স্থায়ী জীবনবোধের মধ্যে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি—কেবল ভঙ্গি-ভাষা-ছন্দের কিছু কিছু রূপ বদল হয়েছে। বলা যেতে পারে, ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি 'আধুনিকে'র পোশাকে।

'নৈবেদ্য' কাব্যের '৪৭' সংখ্যকে—

আঘাত সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে।···

*   *   *

করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায় ;

*   *   *

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

দেখা যাচ্ছে 'নবজাতক' কাব্যের 'রূপ-বিরূপ' বা 'সানাই' কাব্যের 'বিপ্লব' (পূর্বে আলোচিত) কবিতার সঙ্গে এর বিষয়ে বা ভাবে কোনো বিশেষ তারতম্য নেই—আছে ভাষায়, রূপাঙ্গিকে, চলনে হেরফের।

"...যে দিব্যকল্পনা একদিন তাঁহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নন্দনলোকে উর্বশীর সমীপে লইয়া গিয়াছিল, সেই কল্পনাই তাঁহাকে শত দুঃখে জীর্ণ সংসারের মধ্যে, একেবারে সংসারের আত্মার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। ইহাই কবির কর্মপ্রয়াণ।...

কবি জমিদারি পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাইলেন, সে জীবন কত অভাবের দ্বারা ক্ষীণ, এবং বৃথা অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ পরিধিতে আরামে থাকা যায়, কিন্তু তাহা তো নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, সত্যভাবে নিজেকে জানিতে হইলে বৃহত্তর জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধটি জানা আবশ্যক।"[১]

এই বৃহত্তর জীবনের মধ্যেই তিনি ক্রমশঃ নেমে এলেন আপনার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে। মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সেই ভালোবাসা সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল—এমন কি নিজের কালকে অতিক্রম করে কবি দূর অতীতে বা অদূর ভবিষ্যতের মধ্যেও আপনার অস্তিত্বকে অনুভব করলেন—এমন কি মর্ত্য পৃথিবীর সংকীর্ণ সীমানাকে অতিক্রম করে গ্রহ-নক্ষত্রলোকের সঙ্গেও আপন সত্তার যোগসূত্রকে কল্পনা করে নিলেন। তাই চিন্তার দিক থেকে সেই কবি-কল্পনার যেমন দ্যুলোকে-ভূলোকে ব্যাপ্তি, তেমনি কর্মের দিক থেকেও জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত বন্ধন থেকে, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর আত্মা নিখিল মানবের মুক্তি ঘোষণা করলো—আর তারই বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রাম।

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে কবি সভাসমিতি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, আলাপ-আলোচনা—এ সমস্তের মাধ্যমে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে আগস্ট 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিবাদে টাউন হলে বিরাট সভা হয়—কবি সেই সভায় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সময় সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে কবি স্বয়ং দেশবাসীকে নিয়ে 'রাখিবন্ধন' উৎসব করেছিলেন। সেই উৎসাহ ও উত্তেজনা একটি বিরাট রূপ নিয়েছিল এবং কবি স্বয়ং তাতে অনেকখানি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় আন্দোলনে কবি আর বেশীদিন যুক্ত ছিলেন না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা জাতীয় আন্দোলন যে সংকীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলতে চাইছিল, কবি ছিলেন তার বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন 'শিক্ষা সংস্কার' এবং 'গ্রামীণ উন্নতি'। ১৯০৭ সালে "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ" [১ম খণ্ড সং আশ্বিন, ১৩৬৮, পৃঃ ৯২-৯৩]

"দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না।

······যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে।······তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা করো।"[১]

এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় তাঁর মতানুসারে দেশের কাজের স্বরূপটা কেমন হবে। আর সেই কাজ যে একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে তাও কবি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন যে, একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন—"দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গতি গ্রামবাসীদের এই ঘোর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তারা কুকুর বিড়ালের মতো না খেয়ে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে একফোঁটা পানীয় জলও তাদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে ওঠে। যদি এই গ্রামবাসীদেরই বাঁচান না গেল, তবে আর দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা বলে লাভ কি?"[২]

কবি যে এই সমস্ত কথা বলে বা লিখে নিষ্ক্রিয়ভাবে ছিলেন তা নয়। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর "রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে" নামক গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, কবি তাঁদের মত কিশোরদের নিয়ে ১৯০৭ কি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শিলাইদহের জমিদারিতে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রাম সংগঠনের কাজে নেমেছিলেন। লেখক আরও বলেছেন—তাঁদের কর্মধারা ছিল প্রধানত তিনটি—(১) হাতে কলমে কৃষিশিক্ষা, (২) আদর্শ গ্রাম তৈরী, (৩) ব্রতী বালকদল গঠন। এর থেকেই বোঝা যায়, কবি-কল্পনা নিয়ে দেশগঠনের আদর্শ তাঁর স্বপ্ন হয়েই ছিল না। তাকে বাস্তব রূপদানও কবি করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের সুনজরে পড়ে তা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী কবির এই সময়কার জীবনধারা সম্পর্কে আরও

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী [১২শ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সং] প্রবন্ধ—"আত্মশক্তি ও সমূহ" [পৃঃ ৯১২]

২। প্রফুল্লকুমার সরকার—"জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ—৬ 'গঠনমূলক স্বদেশসেবা' [৩য় সং—শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ৯৪]

যে মন্তব্য করেছেন তাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধ এবং মানবপ্রীতির সূক্ষ্ম সমীক্ষা বলে ধরে নেওয়া যায়।—"(শিলাইদহে) সেই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসে বসে তাঁর হৃদয়ের গোপন মর্মবাণীটি শুনবার সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন……তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর সহজ সরল অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারী।……এই সব পল্লীবাসী নরনারীর কাছ থেকে বিন্দু বিন্দু আহরণ করে কবি অমর জীবনের অধিকারী হয়েছেন।………পল্লীর এই সমস্ত অখ্যাত বৈষ্ণব, বাউল, কবিয়াল, চাষী, গৃহস্থ, শিক্ষক—এদের নিভৃত সাহচর্য নব নব সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার অজস্র সৃষ্টি ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দর্শনলাভ হতে পারে না।"[১]

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত জীবন থেকেই কবি পরবর্তী কালে 'মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু, ছেঁড়া ছাতি মাথায়' (কোপাই—'পুনশ্চ'), 'একজন লোক', (পুনশ্চ), 'সাধারণ মেয়ে', 'জসীম' ('রঙ্‌রেজিনী'—পুনশ্চ), 'মাধব' (প্রথমপূজা—পুনশ্চ) 'ভাজনমুচি' ('স্নান সমাপন'—পুনশ্চ) প্রভৃতি 'পুনশ্চ' কাব্যের চরিত্রগুলিকে সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেদিন অমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না গড়ে উঠলে এ-সব চরিত্রের চিত্র বা বেদনা এমন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। শুধু তাই না—'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া'র অনেক চিত্র বা চরিত্রও কবির মনে যেন বহুকাল আগে থাকতেই সংগ্রহ করা। 'ছড়ার ছবি' সম্পর্কে শ্রীনেপাল মজুমদারের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক—

'ছড়ার ছবি'-র সারা বইটি জুড়িয়া ঐ সব নাম-না-জানা গরিব পাড়ার লোকগুলি ভিড় করিয়া আছে। যাহারা মোটে সভ্য নয়, যাহারা লেখাপড়া-না-করিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,—যাহারা খুবই গরিব, গায়ে যাহাদের মোটে কাপড় জোটে না—খালি গায়ে যাহারা আধখানা 'টেনা' পরিয়া সারাটা বছর রোদ-জল-ঝড়-বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া মাঠে চাষ করে, কথায় কথায় জমিদার মহাজন যাহাদের জুতোপেটা করে,……'ছড়ার ছবি'তে এই মানুষের সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা।"[১]

এদেরই উদ্দেশ্যে 'পত্রপুট' কাব্যের 'পনেরো' সংখ্যকে কবি বলেন—

১। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী—"রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে" [প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬] প্রবন্ধ—"অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী" [পৃঃ ৩০]

১। শ্রীনেপাল মজুমদার—"ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"—৪র্থ খণ্ড 'ছড়ার ছবি' [পৃঃ ১৯৭-১৯৮—প্রঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১]

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্র বর্জিত।

*   *   *

কবি আমি ওদের দলে—

কবি জানেন শত শত সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়ার মধ্যে একমাত্র সত্য হয়ে বিরাজ করবে এই সাধারণ মানুষের চলমান জীবনছন্দ। 'সেঁজুতি' কাব্যের 'নতুন কাল' কবিতায় কবি তাই বলেন—

যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা
বইবে নদীর ধারা—
জেলে ডিঙি চিরকালের নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।

ঐ কাব্যেরই 'চলতি ছবি'তে কবি এই সমস্ত সাধারণ মানুষদের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস যে কালের বুকে কোনো চিহ্ন রাখবে না, মানুষের মনের কত তোলপাড় ধ্বনি যে অতি কাছে থেকেও ধরা যায় না—সে যে স্তব্ধ হয়ে আছে নীরবে, গোপনে কবি সেটা অনুভব করেন—

কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই-যে লক্ষ-কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।

['চলতি ছবি'—সেঁজুতি]

কিন্তু কবি জানেন, ইতিহাস এই কথাই বলে—'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে' ওরাই চিরদিন কাজ করে যাবে। যে যত শক্তির আস্ফালন নিয়েই পৃথিবীতে আসুক না কেন, কাল তাকে হরণ করবে। কিন্তু মানবের এই চলমান জীবনছন্দটুকু অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। 'আরোগ্য' কাব্যের 'দশ' সংখ্যক কবিতায় কবি সেই নাম-না-জানা সাধারণ লোকেদের জয়যাত্রা ঘোষণা করে গেলেন। আপন অন্তরের পরিপূর্ণ দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের ধন্য করে দিয়ে গেলেন। কবি অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন—

কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

কিন্তু কবি ইতিহাসের দূর কাল থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দেখলেন—সমস্ত শক্তিই একদিন কালের অনিবার্য নিয়মে অবলুপ্ত হবে ; সত্য হয়ে থাকবে শুধু—

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

*   *   *

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে। ['১০' সং—আরোগ্য]

এ তো কবিকল্পনা নয়, এই-ই বাস্তব—এটাই ঐতিহাসিক সত্য। কবি তাই সেই সাধারণ মানুষের উন্নতিকেই 'জাতীয়' কাজ বলে মনে করলেন। প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাই তাঁর মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্লাটফর্মে উঠে দেশোদ্ধারের বড় বড় বুলি আওড়ানোর পর যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থোদ্ধার করে বেড়ান, দরিদ্রকে আরও শুষে নিঃশেষ করে দেন—সেই সমস্ত প্রচলিত রাজনৈতিক নেতাদের মতবাদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই রফা করতে পারলেন না।

সেই কারণেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে তাঁকে একদিন সরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু দেশগঠনের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়' এবং 'শ্রীনিকেতন কৃষিবিদ্যালয়ে'র মাধ্যমে বীরভূমের গ্রামে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টাও জীবনেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে যান। সেই কারণেই 'রাশিয়া' ভ্রমণ করে সেখানকার গ্রামকেন্দ্রিক সংগঠনমূলক দেশের কাজ দেখে কবি অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু একথাও ঠিক যে, রাজনীতির কলুষ থেকে সরে এলেও তিনি দেশের এবং বিদেশের সমস্ত উত্থান পতনের সংবাদ রাখতেন। যখনই যেখানে অন্যায় দেখেছেন, অপমান বোধ করেছেন, জাতীয় মর্যাদা তথা মানবের সম্মান রক্ষার্থে বজ্রগর্জনে প্রতিবাদ

জানাতে দ্বিধা করেন নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো এবং 'স্যার' উপাধি ত্যাগ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'হিজলী জেলে রাজবন্দীদের হত্যার' প্রতিবাদ, মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ আন্দোলনে'র প্রতিবাদ, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা টাউন হলে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র প্রতিবাদ এবং সর্বশেষে 'ইংলণ্ডের মিস্ র‍্যাথবোনে'র (১৯৪১ খ্রীঃ) চিঠির জবাব—এই সমস্ত সঙ্কট মুহূর্তে তিনি কিন্তু নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি।

জাতীয়তাবাদের এই বলিষ্ঠ চেতনা এবং মানবকল্যাণের সত্য আদর্শকে আশ্রয় করেই আন্তর্জাতিক সমস্যাকে তিনি সেদিন দেখেছিলেন। যেখানে যে জাতির অন্যায়, অবিচার, সভ্যতার নামে নৃশংস দানবীয় অত্যাচারকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইংরেজ সভ্যতার উপর একদিন তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।"

['কালান্তর'—সং ১৯৬১, পৃঃ ২১]

যান্ত্রিক সভ্যতা নানাভাবে মানুষের জীবনে বস্তুজগতের দিক থেকে অগ্রগতিকে বহে এনেছে। বৈজ্ঞানিক যুগে যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী মানুষের নিকটে এসেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প, মানুষের চিন্তাধারার আদানপ্রদান সহজতর হয়ে মানব-সভ্যতা একটি চরম সার্থকতার তীর্থে পৌঁছাবে—এটাই কবি প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দিকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, ধ্বংস, নারকীয় হত্যার লীলাখেলা দেখে কবি এই সভ্যতার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। মানুষের প্রতি মানুষের নির্মমতা যে কত ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, তা কবি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন নিজের দেশে ইংরেজ জাতির অত্যাচার; আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা একাধিকবার বিশ্বভ্রমণের মাধ্যমে একজাতির অপর জাতির উপর বিদ্বেষ বা অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনা। সুতরাং সভ্যনামধারী মানুষের বর্বরতা যে পশুকেও ছাড়িয়ে যায়—তা কবির অভিজ্ঞতা দিয়েই বিশ্বময় দেখতে পেয়েছিলেন এবং এ সমস্ত ঘটনা তাকে খুবই বিচলিত করেছিল। মানুষের শুভবুদ্ধি, কল্যাণী শক্তির 'পরে তাঁর অবিচলিত আস্থা, সুতরাং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক চিন্তায় সেই মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল, এমনকি বহু সময় তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তিকেও রীতিমত ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এই মানসিক যন্ত্রণার কিছু কিছু ইতিহাস বা সাক্ষ্য বহন করছে শেষপর্যায়ের কাব্যের কিছু কিছু কবিতা।

'পত্রপুট' কাব্যের 'ষোলো' (২৮ মাঘ, ১৩৪৩ শান্তিনিকেতন) সংখ্যক কবিতায় কবি

'আফ্রিকা' মহাদেশের কথা বলতে গিয়ে ঔপনিবেশিক সভ্যতার বর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী 'আফ্রিকা' সম্বন্ধে কবিকে একটি কবিতা লিখে দিতে বলেন। কবি তার উত্তরে এই কবিতাটি লেখেন। কিন্তু "স্মরণ রাখা দরকার, দক্ষিণ-আফ্রিকার 'ম্যাটাবিলি যুদ্ধ' এবং পরবর্তীকালে 'বুয়র যুদ্ধে'র সময় তিনি আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন'-এ তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের জাত্যাভিমানিতা বর্ণ-বিদ্বেষ পরদেশ-লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যলালসার বিরুদ্ধে তাঁহার অবিরাম সংগ্রাম শুরু হয়। তাই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁহার বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ পায় এই 'আফ্রিকা' কবিতার মধ্যে।"[১]

আবার জাপানের কোনো কাগজে কবি পড়েছেন যে জাপানি সৈনিক চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিল; দেবতাকে সাক্ষী রেখে এই হত্যাকাণ্ডের লীলা চালানোর ঘটনা কবির কাছে খুবই মর্মান্তিক এবং কৌতুকাবহ। কবি বেশ সুন্দর করেই বলেছেন—"ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণ বুদ্ধকে" ('বুদ্ধভক্তি'—নবজাতক)। 'পত্রপুট' কাব্যের 'সতেরো' সংখ্যক কবিতায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত গদ্যছন্দের একটি রূপকে লক্ষ্য করা যায়—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে।

১। শ্রীনেপাল মজুমদার—"ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"—৪র্থ খণ্ড [প্রঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১—পৃঃ ১৪২-১৪৩]

'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় তার পত্যছন্দের রূপ—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট দর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ
হিংসায় উষ্মায় দারুণ অধীর

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের এই পৈশাচিক মনোভাব, হিংস্র রূপ খুবই ভয়াবহ—কিন্তু সত্যিও। কবি মানুষের অত্যাচারী পাশবিক রূপটিকে সুন্দর তুলে ধরেছেন।

"ম্যুনিক প্যাক্ট হইবার চারদিন পরে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি লেখেন (১৯৩৮, অক্টোবর ৪)। (য়ুরোপের, চীনের, ইথিওপিয়ার ঘটনাবলীর আলোকে কবিতাটি পঠনীয়।" ('রবীন্দ্রজীবনী'—৪র্থ খণ্ড, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রকাশ: ১৩৬৩ শ্রাবণ, পৃঃ ১৪৪)

ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

* * *

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নর মাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী। ['প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক]

পৃথিবীর এই নির্মম হিংস্র রূপ কবি আজ দেখছেন। পাপের যে কত শক্তি, সভ্যনামধারী মানবের যে কত বর্বরতা, নৃশংসতা, সবই কবি প্রত্যক্ষ করলেন; কিন্তু আশাবাদী কবি তবুও উচ্চারণ করতে ভোলেননি ঐ কবিতারই শেষে—

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির।

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে। ['প্রায়শ্চিত্ত'—নবজাতক]

সংসারে অন্যায়ই যে একমাত্র সত্য নয়, আপাতদৃষ্টিতে তার শক্তি যত প্রবলই হোক না কেন, তার যে পরাজয় একদিন হবেই—সে বিশ্বাসকে কবি একেবারে হারিয়ে ফেলেননি।

'কানাডা'র প্রতিও কবি তাই 'আহ্বান' (নবজাতক) জানালেন—

বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।

কিন্তু সভ্যতার এই ধ্বংসলীলার পরে নূতন সভ্যতার জন্ম দেবে তরুণরা, মুক্তি আনবে ধরাতলে—এ বিশ্বাসে ভর করে কবি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকেন—

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তি রণ ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু। ['আহ্বান'—নবজাতক]

"রবীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও স্থানিক ঘটনা ও অপঘটনা তাঁহার স্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে—বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখরূপে বরণ করেন। দেশের মধ্যে পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান তো আছেই; বিদেশে কোথাও শান্তি নাই, সুখ নাই। কোথায় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে—এ সবের জন্য বাঙালি কবির কী বেদনা!

সাতই পৌষ উৎসবের দিন (১৩৪৪) কবির মনে এই বিশ্বব্যাপী দুঃখের কথাই উদিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, 'চীনের প্রতি [জাপানের] নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে, আমরা কী করতে পারি? ...এই দুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি; এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু মন আছে; আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু একথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি এ-কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—একথা মনে রেখে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান

নেই। কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।' ('প্রলয়ের সৃষ্টি'—৭ই পৌষ ১৩৪৪, প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ, পৃঃ ৫৬-৫৭) এই আদর্শ ই ভারত গ্রহণ করিয়াছে; এই সর্বজীব মঙ্গল চিন্তার জন্য ভারত আজ সর্বজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

এই ভাষণের সঙ্গে পঠনীয় খ্রীষ্টমাস দিনে (১৯৩৭, ডিসেম্বর ২৫) লিখিত 'প্রান্তিকে'র দুটি কবিতা (১৭ ও ১৮ সংখ্যক)।"[১]

…দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ,

* * *

রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্র সভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে।…… ['১৭' সং—প্রান্তিক]

কবি তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততাকে ধিক্কার দিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের টিপে টিপে মৃত্যুচাল দেওয়ার ঘটনাকেও কবি কশাঘাত করেছেন। 'দানবপক্ষী' বলে যন্ত্রযুগের যুদ্ধরথকে ব্যঙ্গ করেছেন—

এরা ঝাঁকে ঝাঁকে 'নরমাংসক্ষুধিত শকুনি'র
মত 'আকাশেরে করিল অশুচি।' ['১৭' সং—প্রান্তিক]

কিন্তু কবি এই তীব্র লজ্জা এবং ধিক্কারের মধ্যেও, ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যেও, সেই পরম শক্তিমানের কাছেই শক্তি প্রার্থনা করেছেন—

…মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
['১৭' সং—প্রান্তিক ২৫।১২।৩৭]

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ: ১৩৬৩ শ্রাবণ—পৃঃ ১০৫-১০৬]

বিশ্বজোড়া এই ক্ষুব্ধ ইতিহাসের বুকে মানুষের বড় সহায় আর সান্ত্বনা কোথায় ? মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারকই যেন এর বিচার করেন—কিন্তু সেই বিচারকের কাছে কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধিক্কার হানবার শক্তিও প্রার্থনা করেছেন।

ঐ একই দিনে লেখা 'প্রান্তিকে'র '১৮' সংখ্যক কবিতায় কবি 'খ্রীষ্ট জন্মদিনে' পশু-শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য সকলকে ডাক দিলেন—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

অনেকেই, এই কবিতাটির মধ্যে কবি 'শান্তির ললিতবাণী' শোনাতে চাননি বলে, তাঁর মনে অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল—এই রকম মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তো কবি কোনোদিনই করেননি। সেখানে তো তাঁর প্রার্থনা—

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন। ['৪৭' সং—নৈবেদ্য]

প্রয়োজনে অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে হবে কিন্তু সেই পথ হিংস্রতার, নিষ্ঠুরতার পথ নয়। তেজে-বীর্যে-আত্মশক্তিতে বলীয়ান না হলে মানুষের মুক্তি নেই—স্বাধীনতা নেই; অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি তার আসে না। এই কবিই তো একদিন প্রার্থনা করে চেয়ে নিয়েছিলেন—

…ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।

* * *

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। ['৭০' সং—নৈবেদ্য]

এই অন্যায়ের প্রতিবাদবাণীই তিনি ঐ কবিতায় ('১৮' সং—প্রান্তিক) ঘোষণা করেছেন। কবির এই আশাবাদী, সমন্বয়ধর্মী, মানুষের আত্মশক্তির উপর অতিরিক্ত

বিশ্বাসী চিত্তের সম্পর্কে সমালোচকের নিম্নলিখিত মন্তব্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া যায়—

"...ব্রহ্মধর্মের ঐতিহ্যসম্পন্ন পারিবারিক ধর্ম সাধনার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছেন। সুতরাং একদিকে তাঁহার ঈশ্বর ও ধর্মোপলব্ধি যেমন জাতীয় ও বিশ্বসমস্যার ক্ষেত্রে ক্রমশঃই তাঁহার চেতনায় একটি অখণ্ড বিশ্বঐক্যানুভূতি আনিয়া দিতেছে, অপরদিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতির মরণান্তিক দুঃখ ও সমস্যাগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের জাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতিশোষণের নিষ্ঠুর স্বরূপটি ক্রমশঃই তাঁহাকে বিশ্ব-মানবতার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। এককথায় জাতীয় সমস্যা ও বিশ্বসমস্যার সমাধানে তাঁহাকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"[১]

রবীন্দ্রমানসিকতার পক্ষে এই আশ্রয়, এই পরিণতিই স্বাভাবিক—এবং তিনি যে স্বধর্মচ্যুত হননি এটাই গৌরবের।

কিন্তু ঈশ্বরের শক্তির উপর বিশ্বাস রেখেই মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত্ করতে হবে, মেরুদণ্ডকে সোজা করে দাঁড়াতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে—শক্তিহীনতাই মানুষের অবমাননা।

তাই সেই দীপ্ত তেজহীন 'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা'কে (নবজাতক) দেখে কবি ব্যথা পেয়ে গেছেন। 'হিন্দুস্থানে' (নবজাতক) আজ—

'অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর'

এবং 'রাজপুতানা'য় (নবজাতক)—

'এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার দুর্বিষহ বোঝা'

কে দেখতে পান। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়ে মানুষ যে তাকে মানুষেরই ধ্বংসের কাজে লাগিয়েছে—এ নিয়েও কবির পরিতাপ। 'পক্ষিমানব' (নবজাতক) কবিতায় সেই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা'র ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি ছবি রেখে গেছেন। তিনি 'পৃথিবীর কবি'—যেখানে তাঁর যত ধ্বনি উঠেছে—সে ধ্বনি 'রূপে'র বা সুরেরই হোক, আর 'বিরূপে'র বা কুৎসিতেরই হোক বেসুরেরই হোক, সব কিছুতেই তাঁর কাব্য-বীণা-রবে ঝংকার তোলা তাঁর একটি প্রধান কাজ। আপন জীবনাদর্শের

১। শ্রীনেপাল মজুমদার—"ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"—১ম খণ্ড [পৃঃ ২৯০—প্রকাশ, জুলাই-১৯৬১]

কর্মসাধনাকে, যাত্রাপথের সেই যুগকে, কালকে, মানুষকে, মানুষের ইতিহাসকে, মুখর করে তোলা, রূপায়িত করে তোলা—তাঁর শিল্পসাধনার তথা জীবনসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যথা-বেদনা-ক্ষোভ যা জেগেছে মনে তা সাময়িক মানুষকে, মানুষের অপরিমেয় শক্তিকে, অনিঃশেষ প্রাণকে অতিরিক্ত ভালোবেসেছেন বলে, বিশ্বাস করেছেন বলে—শ্রদ্ধা করেছেন বলে—এই মাত্র।

এই সমস্ত হিংসা-হলাহল, কদর্যতা, অমানুষিকতা—সবই যে ক্ষণস্থায়ী, কাল যে কোনো কিছুকেই তার বুকে চিরদিন ধরে রাখবে না—তাও কবি জানেন। তাই ঐ সমস্ত কবিতারই শেষাংশে বা আশে পাশে ছড়িয়ে আছে চিরন্তন মানুষের প্রতি সেই একান্ত বিশ্বাস—সেই দুর্নিবার ভালোবাসা—না হলে পথ চলা যে হোত অসম্ভব। কবি তাই শোনান—

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ;.........
.........যে ধূলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে।

['১৬' সং—প্রান্তিক]

এই তো কবি-দার্শনিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে দেখা। সব 'চিহ্ন'ই তো একদিন 'ধূলায়' মিলিয়ে যাবে—এই তো পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র সত্যি। মানুষ তো চলমান কালের বুকে পথিক মাত্র।

'নবজাতক' কাব্যেও কবি পৃথিবীর বুকে 'শেষদৃষ্টি' (১১ জানুয়ারি ১৯৪০) দিয়ে দেখতে পান যে, আপনার আত্মার সেই চিরন্তন সুরসাধনাকেই তাঁর মন মূল্য দিয়ে এসেছে—

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
বিষাদ করুণ শিল্পছন্দে—
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন।

ঐ কাব্যের 'জয়ধ্বনি' (২৬ নভেম্বর ১৯৩৯) কবিতায় জীবনের বাস্তব দিকটিকে স্বীকার করে নিয়েই কবি বলেন—

যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।

*   *   *

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

কত তাঁর আকাঙ্ক্ষা—কত তাঁর ভালোবাসা পৃথিবীর পরে। সমগ্র জীবন দিয়ে একটি জাতির জীবনে ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় সম্পদ রেখে যাবার পরও তাঁর আত্মার ক্রন্দন—মানুষের দুঃখের কোনো প্রতিকার করা হোল না। ক্ষণজন্মা এই মানুষের দেহরূপের মধ্যে দিয়ে আর কতটুকু কি-ই বা করা সম্ভব! কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস-ভালোবাসা এখনও অটল—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

*   *   *

যতকিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি

['জয়ধ্বনি'—নবজাতক]

এই তো কবিশিল্পীর আত্মার কথা। 'সানাই' কাব্যের 'সানাই' কবিতায় সেই কবি-প্রাণই সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতির মাঝে সুর খুঁজে পায়। 'কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র' যে সে দান করে' তা কবি বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু—

মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু।

জীবনের অনেক 'অসংগতি'কে জেনেও কবি সংসারের পরে, মানুষের পরে বিশ্বাস রাখেন। আগামী দিনের 'শিশু' ধরার বুকে বহে নিয়ে আসবে সেই সুপ্রভাতকে যখন মানুষের সভ্যতা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করবে। সমস্ত পাপী-তাপী-ধনী-দরিদ্র-জ্ঞানী-ভিক্ষু সকলের যাত্রা সেই 'শিশুতীর্থে'র লাগি।

সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

['শিশুতীর্থ'—পুনশ্চ]

কবি এই 'চিরজীবিতে'র ('চিরযাত্রী'—শ্যামলী) চিরযাত্রার কথাই ঘোষণা করে যান—

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।

'নবজাতক'-এর (নবজাতক) বিজয় ঘোযনা করলেন কবি কণ্ঠে—

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।

* * *

কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।

নবীন আগন্তুকে'র আশায় কবি পথ চেয়ে বসে থাকেন—যে 'অমঙ্গলে'র সঙ্গে সংগ্রাম করে 'শান্তির বাঁধ বেঁধে' মিলনতীর্থ রচনা করবে। এ-দিন যে বদল হয়ে এক নূতন অধ্যায় শুরু হবে—সে আশা কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রেখে গেছেন—

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল

ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়
নইলে কেন এত অপব্যয়,

['১৬' সং—জন্মদিনে—৩১ মে ১৯৪০]

জীবনের শেষ মুহূর্তে লেখা 'সভ্যতার সংকট' (১লা বৈশাখ, ১৩৪৮) প্রবন্ধের শেষ দিকেও এই আশাবাদের কথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে –

"আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্য অভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ ; সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"[১]

জটিল এই সংসারে লক্ষ্য স্থির রেখে বুকে ভরসা নিয়ে মানুষের পরে বিশ্বাস রেখে পথ চলা যে খুব সোজা নয় তা কবি জানেন—

জটিল সংসার,
* * *
গম্য নহে সোজা,
* * *
পথে পথে যথা তথা
শত শত কৃত্রিম বক্রতা।

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'কালান্তর'—[সং-বিশ্বভারতী—১৯৬১] প্রবন্ধ—''সভ্যতার সঙ্কট'' [পৃঃ ৪১৫—৪১৬]

জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

['২৫' সং—জন্মদিনে, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১]

তবুও কবি ডেকে বলেন—

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যাধারা।

*   *   *

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছ জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,

['২৫' সং—জন্মদিনে]

মানব আত্মার মহিমাকে কিছুতেই জর্জরিত হতে দিলে চলবে না—অবসাদগ্রস্ত অবস্থাকে জয় করতেই হবে। বুকে আশা নিয়ে আগামীদিনের পথ চেয়ে ঘোষণা করতে হবে—

'ঐ মহামানব আসে ;' ('৬' সং—শেষ লেখা) খণ্ডকালের সমস্ত আলোড়ন আবিলতা থেকে মানবের আত্মা যে অনেক বড়—সেই সত্যকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে ভারতীয় কবি-ঋষি তাঁর শেষ বাণী রেখে গেলেন চিরন্তন কালের মানবের উদ্দেশ্যে।

কবির মর্ত্যভূমি ত্যাগের দিনটিকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমস্ত মহাদেশগুলি অনেকগুলি বছর এগিয়ে এসেছে ; ভারতবর্ষ স্বাধীনও হয়েছে—কিন্তু সেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-অশিক্ষা-অন্যায়-অত্যাচারের লাঞ্ছনা আজও ঘোচেনি। বাইরের দিক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে মানবের মুক্তি এনে দিতে পারে না—একথা আজ স্পষ্ট প্রমাণিত। এই মুক্তির জন্য যে চাই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করা সমস্ত দেশকে, সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা, দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলির উন্নতি করা—কবির সেদিনের দূরদৃষ্টিতে যে সত্য ধরা পড়েছিল, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে স্বীকৃত। ইংরেজ গিয়েছে, কিন্তু দেশের মুক্তি কোথায় ? উন্নতি কোথায় ? মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগলো কৈ ? নূতন দিগন্তে আশার আলো কৈ ? কবির মত আমরাও কি মানুষের শুভবুদ্ধির পরে আস্থা রেখে এখনও পথ চলবো ? চারদিকে এত অমঙ্গল, এত হিংসা, এত দলাদলির মধ্যে এখনও কি আশা রাখবো কল্যাণ একদিন নেমে আসবে মর্ত্যজীবনে ? হ্যাঁ, হতাশা অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আশাও মানুষকে ক্ষীণ হলেও আলো দেখায়—পথ চলতে সাহায্য করে—না হলে বাঁচা যায় না এর নামই জীবন। সেই জীবনই তার দুর্বার প্রাণশক্তির বলে এগিয়ে চলে। তাই এখনও মানুষ গান গায়, ছবি আঁকে, মানুষকে মানুষ ভালোবাসে—বিশ্বাস করে। 'জাতীয়' ও 'আন্তর্জাতিক' জীবনে কবি তাই—'চিরজীবিত'।

॥ ২ ॥

প্রেমচেতনা

মানবপ্রেমিক ও জীবনরসিক কবি জীবনকে তো ভালবাসতে চেয়েছেন তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-অপূর্ণতাকে স্বীকার করে নিয়েই—কিন্তু স্বপ্ন দেখেছেন সেই ক্ষণিক অপূর্ণ জীবনকো সত্যে, সৌন্দর্যে, কল্যাণে, মাধুর্যে, নন্দিত করে তোলবার। মানুষের সাধনাই তে মনুষ্যত্বের পূর্ণতর বিকাশের—প্রকাশের। আবার সেই প্রকাশ পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়ে ওঠে—সত্য এবং সৌন্দর্যের সাধনায়। এই ক্ষণিক জীবনটুকুতে যা কিছু পেয়েছি—যা কিছু দিয়েছি—তাকে সত্য করে তুলবো—সুন্দর করে তুলবো—রসায়িত করে তুলবো—এই তো মানুষের মত কথা। তাই জীবন-রসিক কবি সন্ধান করে ফিরেছেন জীবনের মূল 'সুরটুকু কোথায় 'ছন্দ'টুকু কোথায়—যে সুরকে, ছন্দকে আশ্রয় করে ক্ষণকালীন এই মানবজন্ম বলতে পারে—'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'। এই অলক্ষ্য সুর-ছন্দ বা মাধুর্যটুকুই হচ্ছে মর্ত্যমানবের অমর্ত্য সম্পদ 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা'।

বৃহত্তর অর্থে এই 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' যেমন ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করে পারিবারিক জীবনে—পরে 'জাতীয়' বা 'আন্তর্জাতিক' জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে ধন্য ও সার্থক হতে পারে —আনন্দিত ও রসায়িত হতে পারে; তেমনি দেশকালকে ছাড়িয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেও পারে;—আবার সমস্ত প্রকৃতিলোক থেকে—সৃষ্টির দুর্গম রহস্যলোকের সঙ্গে আপন চৈতন্য সত্তার একটি সর্বব্যাপী রূপ কল্পনা করে পরিপূর্ণ সত্যবোধে বা আনন্দবোধে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই চৈতন্যময় সত্তার বিশ্ববোধ বা সর্বানুভব সর্বতোভাবেই গ্রাহ্য। "অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের পূজারী তিনি, তাই তাঁর কাছে দেশকালের ব্যবধানও ঘুচে গিয়েছিল। তিনি স্বদেশকে ভালবাসতেন কারও চেয়ে কম নয়, কিন্তু সে দেশকে তিনি কখনও বিশ্বসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি।······অখণ্ড জগৎকেই তিনি তাঁর বাসগৃহ এবং বিশ্ববাসীকেই তিনি পরমাত্মীয় বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ······বস্তুতঃ কল্যাণময় প্রেমই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ধর্ম।[১]

কিন্তু সাহিত্যে বা কাব্যে 'প্রেম' বলতে এমন কি মানব-জীবনেও 'প্রেম' অর্থে নরনারীর দ্বৈত সত্তায় রোমাঞ্চিত, মুকুলিত প্রস্ফুটিত হৃদয় মাধুর্যটুকুকেই বোঝায়। আর 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' তাই বৃহত্তর জীবন থেকে এখানে একান্ত স্বতন্ত্রভাবে হৃদয়ের

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'—[সং—১৯৬২ নভেম্বর—পৃঃ—১৪২, ১৪৩, ১৪৪]

একটি গোপন সম্পদকেই আশ্রয় করে পুষ্ট। পার্থিব জীবনে এই একান্ত গোপন 'সুরটুকু' —'ছন্দটুকু'ই মর্ত্যের বৃহত্তম আকর্ষণ—শ্রেষ্ঠ সম্পদ—যাকে আশ্রয় করে সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত জগৎ এগিয়ে চলেছে—বর্তমানকে পিছনে ফেলে ফেলে। এ হেন যে 'সুর' বা 'ছন্দ' বা 'রহস্য'—যা মানব জীবনের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে আছে—'প্রেম' নামক সেই 'ব্যক্তি কেন্দ্রিক' একান্ত গোপন অনুভূতিকে নিয়ে জগতের কবি শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদের গাথা রচনা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি—বিশেষ ক'রে এর অভিজ্ঞতা এবং আস্বাদন যখন প্রত্যেকের জীবনেই আছে। আর সাহিত্যের এই দিক্‌টির প্রতি পাঠক বা রসিক সমাজেরও কৌতূহল যে সর্বাপেক্ষা বেশি—তার কারণও সেই অনিবার্য আকর্ষণ—কারণ, জানা এবং অজানা দিয়ে—'ছায়া' এবং 'মায়া' দিয়ে আজও ঢাকা রইল—চিরকাল ঢাকা থাকবে, মানুষের মনের এই গোপন রহস্য।

কবিমনও স্বভাবতঃই কৌতূহলী এবং অনুভূতিপ্রবণ; তাই মানবজীবনের এই একান্ত গোপন রহস্যটুকুকে—মাধুর্যটুকুকে তিনি যেন খুঁজে খুঁজে তল পান না। অনুভূতির সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম স্তরে গিয়েও তার মর্ম ভেদ করতে পারেন না এবং ভাবে-ভাষায়, রূপে-ছন্দে, তার মাধুরী, তার সৌরভ, তার সত্য, তার শক্তি—তার দ্যুতিকে, ঠিক প্রকাশ করে উঠতে পারেন না। তাই সেই অপূর্ণতার বেদনা থেকেই নূতন নূতন সৃষ্টি জন্ম নেয়। রস-রূপের, ভাব-রূপের বিচিত্র জীবন ছন্দ সাধারণ ভোগাকাঙ্ক্ষা পীড়িত মানুষের জীবনে এনে দেয় স্বর্গের অমৃত; জীবনকে ক'রে তোলে সুরভিত-স্নিগ্ধ-মধুর প্রশান্ত। 'সুর' হারিয়েও সে 'সুর' খুঁজে পায়—নূতন আনন্দে আবার পথ চলে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই 'ভালোবাসা' বা 'প্রেম' দুটি নরনারীর জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে বলে পরস্পরকে একান্তভাবে দেবারও প্রশ্ন আছে এখানে এবং দিয়েই সে ধন্য-সে সার্থক-সে সম্পূর্ণ। এই দেওয়া তো কেবল মন বা হৃদয় দেওয়া নয়—দেহগতও; সেখানে সে অস্বীকার করে না 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'। তাই এই 'প্রেমসাধনায়' দেহচেতনাকে অস্বীকার তো করাই যায় না—বরং অনেক সময়ে মুখ্য স্থানও ছেড়ে দিতে হয়।

সুতরাং জীবনরসিক কবির শিল্পি-মনে এই 'প্রেমচেতনা'র স্বরূপ কি—রূপান্তর বা ক্রমবিকাশ কোন্‌দিকে—এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কবির প্রথম জীবনের কাব্য সাহিত্য থেকে 'শেষপর্যায়ে'র কাব্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু ভাবসৌন্দর্য ও রূপসৌন্দর্যের ধারাবাহিক আলোচনা করলেই তার ভাব, ভঙ্গি, গতি, প্রকৃতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র কবি মানসিকতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যবোধ তাঁর মানসিকতা রুচি এবং জীবনবোধে প্রথমাবধি বর্তমান ছিল। সবকিছুকেই তিনি ভোগ করতে চেয়েছেন কিন্তু লোভীর মতো না—ভোগীর মতো না—রসিকের মতো।

আর এই রসিকের রুচিবোধে, শিল্প দৃষ্টিতে, থাকে সুন্দরের সামঞ্জস্য—বা একটি সংযত প্রকাশ। বিকৃতিকে এই সৌন্দর্যউপাসকচিত্ত কোনো অবস্থাতেই স্বীকার করতে চায় না বা পারে না। তাই একটি ধর্মবোধের বা কল্যাণবোধের মধ্যে জীবনের সব 'চাওয়া' এবং 'পাওয়া'কে প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে চায়—বা ভোগ করতে চায়; তাই এই 'ভোগ' বা 'জীবন দৃষ্টি' খানিকটা নিরাসক্ত। কবির নিকট তাই—"ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ—বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে—স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়,—যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"[১]

কবির এই মন্তব্যের ভিতর দিয়ে 'প্রেম' সম্পর্কে অর্থাৎ নরনারীর 'গার্হস্থ্যজীবনধর্ম' সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হচ্ছে সমাজধর্ম, প্রাচীন ভারতীয় গার্হস্থ্যধর্মবোধ এবং নারী পুরুষ উভয়েরই দৈহিক ও মানসিক সংযমকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা। শুধু তাই না—নিজেদের প্রেমকে পারিবারিক সামাজিক জীবনে ব্যাপ্ত করেও দিতে হবে; না হলে গার্হস্থ্যজীবনধর্ম যেমন সুন্দর ও সার্থক হবে না—তেমনি নরনারীর জীবনও নিজেদের প্রেমের যথার্থ কল্যাণী রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ প্রেমবোধে দেহবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠলে তা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে সুখী ও সুন্দর করে তোলে না—তেমনি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনেও শান্তি বা কল্যাণ বয়ে আনে না।

নারী-পুরুষের দ্বৈত প্রেমলীলায় এই ধর্মটুকুকে—আদর্শটুকুকে কবি স্বীকার করে নিয়েছেন—করবারই কথা। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিনি অকৃত্রিমভাবেই স্বীকার করতেন এবং আপন জীবন দিয়েই তার সর্বকল্যাণময় রূপকে প্রকটিত করতেও চাইতেন; সেই সঙ্গে সর্বমানবের স্থায়ী কল্যাণবোধকে সমাজে বা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। সুতরাং একটি শান্ত-সংযত সুন্দর শ্রীমণ্ডিত 'প্রেমচেতনা' তাঁর মানসসত্তায় জাগ্রত ছিল এ আর আশ্চর্য কথা কি? তবু এ প্রশ্ন মনে রয়েই যায় যে, কবির এই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সংযত প্রেমের কল্পনা—শুধু কল্পনাই, আদর্শগত তত্ত্ব—না

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'প্রচীন সাহিত্য'—[প্রবন্ধ—'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' সং—বিশ্বভারতী ১৯৬১—পৃঃ ৩০—৩১]

কি এর বাস্তব রূপ আছে? আর বাস্তবতা যদি থাকে তবে কবি কিভাবে সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন? 'দেহগত চাওয়া' এবং 'মনোগত পাওয়া'-কে কোন সুরে কবি মিলিয়েছেন? সত্য এর মধ্যে কতটুকু—আর কবি-কল্পনাই বা কতটুকু?

রবীন্দ্র-প্রেমচেতনা সম্পর্কে আমাদের কাছে এগুলি মস্ত বড় প্রশ্ন।

কবির 'প্রেমচেতনা'র স্বরূপকে প্রথম জীবন থেকে লক্ষ্য করলেই এর উত্তরও মেলে। বস্তুতঃ, কবিমনেও যৌবনের প্রথম অবস্থা থেকে এ নিয়ে প্রশ্ন কম ছিল না;—দেহ এবং মনের চাওয়া পাওয়ার কিভাবে সমন্বয় হতে পারে এ নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বও তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। আবার আপন জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শিল্পিজীবনের স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি ও জীবনবোধ দিয়ে তিনি এর উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন—সমন্বয়ের বাণী শুনিয়েছেন—সংসারকেই যে স্বর্গের অমৃতরসে সিঞ্চিত করা যায়—জীবনকে যে করা যায় নন্দিত—এই আশার কথা চিরকালের নরনারীর জন্য রেখে গেছেন।

না, দেহকে কবি অস্বীকাব করেন নি—তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা কবি জানেন—"এই কামনাপূর্ণ প্রেম, বাসনাপূর্ণ দেহাসক্তি রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমকে গভীরতর করিয়াছে। যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতা অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের যে মায়া আনিয়াছে, 'ললাটে অধরে উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায় বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় ঝলকে ঝলকে' যে লাবণ্য বন্দী হইয়া আছে, তাহা কবিকে কম মাতাল করে নাই। 'বাহুর নীরব আকুলতা' কবি-হৃদয়ে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে।"[১] 'কড়ি ও কোমলে'র বেশ কিছু কবিতায় কবির এই মাতাল রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় ব্যক্তিগত জীবন দিয়েই মনের এই ব্যাকুলতার কথা কবি অনুভব করেছেন—

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী

['তনু'—কড়ি ও কোমল]

কিন্তু এও সত্যি, দেহ-প্রাণ-মনকে সম্পূর্ণভাবে দিয়েও কবি অনুভব করেছেন—'ভালোবাসা' বলতে মানুষের মন যা চায়—সে ওই দেহটার মধ্যেই কেবল নেই। 'বন্দী' ('কড়ি ও কোমল') দেহ-মন তাই মুক্তিও পেতে চেয়েছে—

দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।

*　　*　　*

স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

১। শ্রীশচীন সেন—'রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়'—[১ম সং-আশ্বিন ১৩৩৩ পৃঃ ১২৩]

সেই সঙ্গে এও তিনি বুঝলেন—

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,

['মোহ'—'কড়ি ও কোমল']

তারপরই কবির শুরু হোল সেই অন্বেষণ—সেই সাধনা—সত্যকার প্রেম কোথায় ; কবির আত্মা মুক্তি নিয়ে অসীম সৌন্দর্যলোকের মধ্যে সেই মানসী-প্রিয়াকে সন্ধান করে ফিরতে থাকে। কবি ব্যক্তিগত প্রেমবোধকে বিশ্ববোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন এবং আপন প্রেয়সীকে খণ্ডকালের সীমা থেকে অনন্তকালের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে 'অনন্ত প্রেম'কে ('মানসী') অনুভব করেন—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
* * *
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।

প্রেমকে ব্যক্তিগত আসক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহৎ জীবনের এবং অনন্তকালের পটভূমিকায় স্থাপন করা মাত্র—তার অ-লৌকিক সৌন্দর্য মাধুর্য কবিমনকে মন্ত্রমুগ্ধ করলো—এবং এই প্রেমবোধ হয়তো বা অশরীরী আত্মাকে কল্পনা করে দূর লোকে সৌন্দর্যাভিসার করলো। 'সোনারতরী', 'চিত্রা,' 'কল্পনা'র যুগে রোমান্টিক প্রেমসৌন্দর্যের স্বপ্নসঞ্চরণ কবির সঙ্গে সঙ্গে শতেক যুগের নরনারীকেও 'প্রথমা প্রিয়া' বা 'প্রিয়তমে'র খোঁজে 'শিপ্রানদীতীরে' ('স্বপ্ন'—'কল্পনা') অভিসার করায়—'ব্যাকুলতর বেদনা…আকাশ-বাতাসকে নিশ্বসিত' ('মদনভস্মের পরে'—কল্পনা) ক'রে তোলে।

কিন্তু প্রেমের মধ্যে এই অতিমর্ত্য সৌন্দর্যকল্পনা রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার সব কথা নয়—শেষ কথা তো নয়ই। 'মানবী'-প্রেম-কে কিভাবে আপন জীবনের সৌন্দর্যবোধ দিয়ে, সংযম শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে, 'মানসী'-প্রেমে আস্বাদ করা যায়,—সেই সাধনাই প্রত্যেক নরনারীর প্রেমসাধনার মূল কথা ;—এটিই কবির উপলব্ধিজাত সত্যবোধ দিয়ে রসায়িত হয়ে উঠেছে সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনায়।

নর-নারীর প্রথম মিলনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব খুবই প্রবলভাবে কাজ করে। কিন্তু দেহকে হাতে পাওয়ার পর অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়—যৌবনের সেই প্রথম আনন্দবোধটুকু ধীরে ধীরে নিজেদের জীবন থেকে সরে যায়

এবং তার স্থানে আসে দিন যাপনের, প্রাণ ধারণের গ্লানি। কবি মানবজীবনের সত্য মহিমাকে—জীবনের অলক্ষ্য সুর বা ছন্দটুকুকে খুঁজতে গিয়ে অনুভব ক'রলেন এই সত্য—

'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।

['৩৬' সং—প্রেম]

অর্থাৎ ভালবাসার জনটিকে পরম শ্রদ্ধা দিয়ে প্রীতি দিয়ে, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কল্পলোকে সৃষ্টি করে নিলেই হবে না—প্রতি মুহূর্তে আপন মনের সৌন্দর্য এবং রুচিবোধ দিয়ে তাকে নূতন করে তুলতে হবে—'ভালোবাসার আনন্দে অন্তরে অন্তরে নিজের হৃদয়-পদ্মকে যেমন বিকশিত করতে হবে—তেমনিতরো ভাবে রাঙিয়ে যেতে হবে আপন আত্মার একান্ত আপন জনকে। মনের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ রুচি এবং 'পূজাভাব' বা শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে রাখতে হলে আপন অন্তরলোকেই চাই সংযম সাধনা—অর্থাৎ 'মনোদীক্ষা'—"মনোদীক্ষায় সংযতচিত্ত রতিতে সুখ পায় বিরতিতেও পায়। এতে ফলটা কি হয়; না মনটা দেহের অধীন হয় না, দেহটা মনেরই অধীন হয়। মনের ওপর যার মাস্টারি আছে, মনের মুক্তি হয় তার। মুক্ত মন সংযমশ্রীর সৌন্দর্যে স্বর্গোজ্জ্বল এইজন্য দেহ'ও তখন ত্যাগজাত ভোগের রসরুচিতে প্রসন্ন।

……বস্তুতঃ দেহকে স্বীকার করেও দুঃখসাধনায় উত্তীর্ণ এই দেহাতীত শিবপ্রেমই রবীন্দ্র-মানসের উপযোগী। আপন স্বভাব থেকেই কবি তরুণ বয়সেই এই শিবপ্রেমের মাহাত্ম্য আভাসে অনুভব করেছিলেন। রূপাশ্রিত প্রেমমোহের আতিশয্য এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে পেরিয়েই তিনি চলতে চেয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি এই: জৈবপ্রেমে তৃপ্তি কিছুটা মিললেও তা সাময়িক; এবং ধর্মের দ্বারা যদি সুন্দরায়িত তা নয়, তবে তা পাশবিক-ও বটে। মানুষ এক হিসাবে পশু বটে, কিন্তু পশুত্বটাই তার সব নয়। আরও কিছু আছে তার জীবনের অধিকারে। তার 'মনের নৃত্য কতবার জীবন মৃত্যুরে' অতিক্রম করে 'চিরসুন্দরের সুরপুরে' ('পূরবী' কঙ্কাল দ্রষ্টব্য) যেতে চায়। এ-চাওয়ার অধিকার তার আছে। এই অতিরিক্ত অধিকারটি আয়ত্তের মধ্যে আনতে হলে শুধু মাত্র জীব-জীবনের যৌনচর্যাই না, শিবচেতনার কল্পচর্যা-ও চাই। মন স্বাভাবিক ভাবেই রূপমোহে ও কামভাবনায় নামতে চায়, কিন্তু মনন শক্তির স্বভাবের আনন্দে মনকে যিনি—আত্মাভিমুখী করতে জানেন, রূপে মুগ্ধ হয়ে-ও অরূপের ধ্যানচেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব শুধু নয়, খুবই সহজ। রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সাধনা। এই সহজ সাধনার

আনন্দে রূপজাত মোহকে তিনি পরিশুদ্ধ ও তাঁর জীবনে আত্মাভিমুখী সত্ত্ব সুন্দর করে নেন। ‡ সত্ত্বপ্রেম-ই গন্তব্য—এইজন্য গতিপথের সমস্ত অভিজ্ঞতা, বিচিত্র যত রূপ মোহ ও দেহাসক্তি—দূরগত সেই গন্তব্যের আলোকেই হয় ভাবোজ্জ্বল"।[১]

দেহকে অতিক্রম করে আত্মাগত এই সৌন্দর্যধ্যানই তাঁর প্রেম সাধনাকে গতিদান করেছে—মুক্তি দিয়েছে। সেই মুক্ত প্রেম একান্ত ভোগীর মত না চেয়ে রসিকের মত জীবনকে ভোগ করতে চাইবে—এটাই তো স্বাভাবিক। এই বীর্যবান প্রেমসাধনাই মানবিক জীবনকে সুস্থ-বলিষ্ঠ-কল্যাণশ্রীযুক্ত এবং ত্যাগদীপ্ত মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমসাধনায় নারীর কল্যাণী রূপটিকে অধিকতর মূল্য দেওয়া হলেও তার যে 'মোহিনী' রূপ বা 'উর্বশী' রূপ আছে—তাকেও কবি একেবারেই অস্বীকার করেন নি। 'দুই নারী' তত্ত্বে তিনি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী' বলে ('চিত্রা'—উর্বশী দ্রষ্টব্য) নারীর এক 'ভুবন মোহিণী' রূপ কবি আঁকলেন। এই নারী-সৌন্দর্যকে কবি অস্বীকার করলেন না—তার মোহিনী মায়া—পুরুষের জীবনে যে যৌবন চাঞ্চল্য জাগায়—কামনা জাগায় তা কবি স্বীকার করেন—"কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য।······সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়।"[২] কবি নৈর্ব্যক্তিক শিল্পদৃষ্টি নিয়ে এই রূপসৌন্দর্যের যতদূর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব তাঁর রচনাচাতুর্যে, রূপকল্পনায়—তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এই 'রূপই তো 'নারী'র সব নয়—তার কল্যাণীভাবে; মাধুর্য-ভাবে, স্নেহভাবে, সেবাভাবে, সে যে অনন্যা; মর্ত্যে যে সে-ই অমরাবতী রচনা করে চলেছে, নারীর এই 'ভাবরূপ'ও কবি আবিষ্কার করেছেন—শুধু আবিষ্কার করেননি, পরিপূর্ণ মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন—

"নারীর দুইটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সী-রূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে······। এই সাধনায় সন্তানের নয়, সুসন্তানের সৃষ্টি, সেই সুসন্তান সংখ্যা পূরণ করে না; মানব সংসারে পাপকে অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সী রূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে। যে গুণের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়·····সে হচ্ছে মাধুর্য একথাও বলেছি ভারতবর্ষ এই মাধুর্যকে

১। শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'—[দ্বিতীয় অধ্যায়—'উজ্জীবন']—[প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৬৫ —পৃঃ ২২, ২৯-৩০]

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিত্রা"—[প্রকাশ : বিশ্বভারতী—১৯৬৬ 'গ্রন্থপরিচয়'—পৃঃ ১৭২]

শক্তিই বলে।"[১] নারীজীবনের এই দুই-রূপের সাধনাতেই যে তাকে মগ্ন থাকতে হবে—এবং এতেই যে তার পূর্ণশক্তির বিকাশ হতে পারে বা মর্যাদা পেয়ে সার্থকতার তীর্থে পৌঁছাতে পারে সে-কথা কবি শেষ জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়েও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছেন—

"নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্ল-পক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয়—তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে 'আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদন ধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়"।[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবি নারীর কল্যাণী রূপটিকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় এবং মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু 'প্রেয়সী' রূপেও তার যে অনির্বচনীয়তা তারও স্বীকৃতি আছে তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে এবং এই 'মায়াটুকু, 'মোহটুকু' যদিও লীলা বিলাস—তার আকর্ষণকেও কবি অস্বীকার করেননি কোনদিনই। এমনকি শেষ জীবনে একেবারে বাস্তব জগতের সাধারণ নরনারীর জীবনচিত্র আঁকতে গিয়েও মানুষের মনের বিভিন্ন প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলেখ্য রচনা করেছেন। 'রূপ' থেকে 'ভাবে' এবং 'ভাব' থেকে 'রূপে' তাঁর মন সর্বদাই যাওয়া-আসা করতো। আর 'বস্তু' থেকে 'সূক্ষ্মে' অর্থাৎ কবির ভাষায় 'সীমা' থেকে 'অসীমে' এবং 'অসীম' থেকে 'সীমা'য় তার ছিল যাতায়াত—

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।

['উপহার'-মানসী]

এই বৈচিত্র্যপিয়াসী—মুক্তিকামী মনই জীবনকে জড়ত্বের মধ্যে, স্থবিরতার মধ্যে, অপূর্ণতার মধ্যে, থেমে থাকতে দেয়নি;—সম্মুখের দিকে টেনে নিয়ে গেছে—সৃষ্টিশীল মানসিক জীবন তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেগবান থেকেছে। জরা, বার্ধক্য সবকিছুকে জয় করে এই আত্ম মুক্ত-প্রাণ মুক্ত পুরুষরূপে, নিজের সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। 'প্রেম'কে এই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার ফলে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব--

'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' ('বলাকা'—শাজাহান) সে

১। "রবীন্দ্র রচনাবলী"—[ত্রয়োদশ খণ্ড—প্রবন্ধ—ভারতবর্ষীয় বিবাহ সমাজ জন্ম শতবার্ষিক সং সং— পৃঃ ১৯]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'—['যাত্রী'] রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খ:—[প্র: ভাদ্র ১৩৬৩—পৃঃ ৪২০]

প্রেম মহৎ প্রেম নয়। সুতরাং ক্ষণিক এই মানবজন্মকে রূপে-রসে-স্নেহে-মাধুর্যে ভরিয়ে দিয়ে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এইটুকুতেই নরনারীর জীবন সার্থক, এবং এই সত্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই 'প্রেমে'র মধ্যে মুক্তি। 'দেহ' বা 'আত্মা' তখন নিত্য ব্যবহারে আর ক্লান্ত হবে না—সাংসারিক মালিন্যেও অমলিন থাকবে। এই শাশ্বত সৌন্দর্য-মণ্ডিত প্রেমকে জীবনে লাভ করতে হলে তার মধ্যে পুরুষ এবং নারী—উভয়েরই যে একটি ত্যাগের সাধনা আছে—একথা কবি নিজের জীবন দিয়েই অনুভব করেছিলেন; শুধু যে কল্পনা বা ভাব থেকেই এই শান্ত সংযত প্রেমের কথা শুনিয়েছেন তা নয়—

পুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায় সেইজন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে একহিসাবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার থেকে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি যথার্থ ভালোবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না—কিন্তু দূরে-নিকটে, সম্পদে-বিপদে, অভাবে এবং ঐশ্বর্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্, আমাদের সংসার যাত্রা আড়ম্বর শূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ…হোক…[যেন] আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসার ক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি।"[১]

উদ্ধৃত এই দীর্ঘ পত্র থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে তিনি যে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র"—প্রথম খণ্ড—শ্রীমতীমৃণালিনীদেবীকে লিখিত [সং কার্তিক—১৩২১], [পত্র সংখ্যা—১৬, পৃঃ ২৯-৩০, শিলাইদহ, জুন ১৮৯৮]

স্বর্গলোক রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যে নিছক স্বপ্ন নয়, রোমান্টিক কবিকল্পনা নয়, আপন আপন জীবনের সাধনা দিয়েই যে সেই সার্থকতার তীর্থে পৌঁছাতে হবে, এবং এতে নর-নারী কারো দায়িত্বই যে কিছু কম নয়—সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কবি প্রেমের এই মূলীভূত সৌন্দর্যবোধটুকুকে কল্যাণবোধটুকুকে স্বীকার করে নিয়েই তার মায়া-মোহ-ছলনা-রূপ-রস সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিলেন—মানুষের জীবনে। শুধু স্বীকার করে নিলেন না—প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে তা যে কত সত্য কত সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারে জীবনকে যে প্রতিমুহূর্তে দিতে দিতে ধন্য হয়ে উঠতে পারে—সেই পুষ্পিত প্রেমের স্বপ্নমদিরতাটুকুই যে জীবনের প্রাণ, ঐটুকুই যে মানব জীবনের 'সুর' বা 'ছন্দ'—'আনন্দ' বা 'মাধুর্য'—তাই কবি সারা জীবন ধরে নানা ভাবে নানা ছন্দে নানা চিত্রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এই বীর্যবান মধুর প্রেমের সাধক-সাধিকাই রসিক-রসিকা; প্রেমের যথার্থ স্বরূপকে তারাই ভোগ করতে পারে আপন জীবনে যারা এর 'সুর'টুকুকে ধরতে পেরেছে আপন জীবনে;—আর তার সাধনা করে চলেছে নিরন্তর আপন জীবনকে 'হতে হতে' 'দিতে দিতে' চলার আনন্দে। এই মুক্ত প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে না পারলে দেহের স্বত্ব-স্বামিত্ব জন্মালেও প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্যকে ভোগ করা সম্ভব নয়—এই কথাই 'মহুয়া'র কবি বললেন। সেখানে নিবেদনের ভাব যেমন আছে—তেমনি জীবনে একজনের কাছেই পৃথিবীতে যে তার চরম মূল্য—সে যে ধন্য—সে যে গোপন 'সুরে'-'ছন্দে' কানায় কানায় ভরপুর সে যে 'রূপ সাগরেই ডুব' দিয়েছে 'অরূপ রতন আশা করে'—তা চরিতার্থ। এ গোপন রহস্যের কথা—আনন্দের কথা তো ডেকে ডেকে বলার মত নয়; রেখে রেখে,—চেখে চেখে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপভোগ করার মত। রসিক শিল্পী 'দেহ'টাকে বাদ দেবেন কেন—যে অপরিমেয় মাধুরী, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে সমস্ত 'ইন্দ্রিয়' দিয়ে, ('ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার'—'৩০' সং—'নৈবেদ্য') অনুভূতি দিয়ে—সমগ্র সত্তা দিয়ে ভোগ করতে চান—সে তো শুধু-ই 'abstract' নয়—মানবের পরিপূর্ণ দেহসত্তার আধারে তার যথার্থ প্রকাশ—সার্থক লীলাবিলাস। তাই তো পৃথিবীর চরমতম সত্যকথা মানুষের জীবনে হয়ে উঠলো,—

'তুমি সুন্দর'
'আমি ভালোবাসি'।

['আমি'—শ্যামলী]

'মহুয়া' কাব্যের অনবদ্য ভাষায় কবি এই প্রেমসাধনাকেই বিচিত্র রূপে-রেখায়-

ভাবে-ব্যঞ্জনায় থরে থরে সাজালেন চিরন্তন-কালের 'প্রেমিক'-'প্রেমিকা'র জন্যে—'উপহারে' ('মহুয়া') সে নায়িকা বলে—

* * *

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠক্ষণগুলি ;

সেই 'মায়া'ময়ী ('মায়া'—মহুয়া) প্রেয়সীরই কথা—

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন কর।

'প্রেমিক-প্রেমিকার 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নিজেদের 'রচনা' করার শক্তি না থাকলে বস্তু জগতের মধ্যে 'প্রেম'কে হাতড়ে মরতে হয় অথবা ভাবজগতের মধ্যে স্বপ্ন-বিলাস দেখে—'যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—বলার সাধ্যও থাকে না। প্রেমময় জীবনে এই 'মায়া' এবং 'ভাব' দুয়েরই তাই মূল্য আছে—না হলে জীবন শুধু একঘেয়েমির দাসত্ব করেই—লালসাকে চরিতার্থ করেই নিজেকে নিঃশেষ করে দিত।

কিন্তু এই বস্তুজীবন থেকে মানুষের 'আত্মা' অনেক বড়। 'প্রেমে'র সত্যকার সৌন্দর্যবোধ, এবং উপলব্ধি তার মধ্যেই সব থেকে উৎকর্ষ লাভ করেছে। সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে মানবমনের এই অনিঃশেষ শক্তিই তাকে জীবজীবনে অমরত্ব এনে দিয়েছে—কবি বা শিল্পী সেই সুন্দরতর প্রেমের গাথাই রচনা করেন। শিল্পবোধের কাছে যে-কোনো রকমের মিলন, তা সামাজিক, আনুষ্ঠানিক বা স্বকৃত হোক না কেন—দেহের মিলনই বা মিলিত হওয়ার অধিকারই 'প্রেম' নয়। তাই কবি নরনারীর সামাজিক জীবনের, বিচিত্র রূপ-রেখা, মনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক বন্ধন-অবন্ধন, মানব-মানবীর বিচিত্র চাওয়া-

পাওয়ার নানা রকমের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সেই সব চরিত্র-চিত্রণ-মানস-বিশ্লেষণ। কোথাও বা ধর্মের বা সমাজের বাধাকে সত্যকার প্রেম আঘাত করছে,—কোথাও বা সামাজিক-ধর্মীয় মিলন পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মিলিয়ে দিল, অর্থ-সম্মান-রূপ কোনো কিছুর অভাব নেই; এক পক্ষ নিজেকে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে—অথচ লোভী অপরপক্ষ নিতে জানলো না;—অনুভব করার শক্তি পর্যন্ত নেই যে কি হারালো। আবার একদিন হয়তো দু'জন দু'জনকে দিতে পেরেছিল—কিন্তু আজ সেইদিনের মাধুরীকে আপন আপন মনে হারিয়ে ফেলে নিজেদের অপূর্ণতাকে জয় করার শক্তির অভাবে একসঙ্গে ঘরকন্না-শোওয়া-বসা চলে কিন্তু কত কাছে থেকেও কত মর্মান্তিক বিচ্ছেদ! কত ভয়াবহ, কত অসহায়! আবার কোথাও বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন ভোগের ফলে যা পেয়েছিল বিগত জীবনে, তাকে হারালো; মানুষের সমাজে দৈনন্দিন জীবনে এই দ্বৈত-মিলনের দ্বারা কত রকমের চরিত্রই না গড়ে উঠছে! যুগে যুগে সমাজের অলিতে-গলিতে মানুষের মনে নিজের অজান্তেই যে মনের গতি তাকে কোন্ দিকে পতনের অতল গভীরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—এই সব রকমের মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই শিল্পরূপ তাঁর উপন্যাসে, সাহিত্যে, কাব্যে ছড়িয়ে আছে। কবি সব রকমের চিত্রই শিল্পিমন নিয়ে আপন অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার এর কতটুকু 'সত্যি' কতটুকু 'মায়া'—কতটুকু যে 'আসল'—কতটুকু 'নকল' সব অনুধাবন করেছেন। তাঁর কাজই তো 'ছবি আঁকা'—তাই ছবি এঁকে গেছেন। কিন্তু দুটি মানব-মানবীর যে-কোনো রকম মিলনই যে 'প্রেম' নয়—তাঁর যৌবনের প্রথম দিকেই তিনি তা বুঝেছিলেন—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।

['নারীর উক্তি'—'মানসী']

এই হৃদয়-পরিপূর্ণ সংযত সুন্দর দৈহিক মিলনই 'রবীন্দ্র-প্রেমচেতনা'র প্রকৃত স্বরূপ। প্রেমের এই "মুক্তরূপ" ('মহুয়া' দ্রষ্টব্য) বলতে পারে—

*   *   *

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায়।

এই 'সবলা' (মহুয়া' কাব্য দ্রষ্টব্য) প্রেমময়ী নারীই 'স্পর্ধা' ('মহুয়া') দেখিয়ে বলে—

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালান্বিত,—প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা'

কিন্তু 'সৃষ্টিরহস্য' ('মহুয়া' দ্রষ্টব্য) যে এই,—পাবার একান্ত-শান্ত-বীর্যবান প্রত্যাশার সঙ্গে—দেবার আকুল আগ্রহও থাকে উন্মুখ হয়ে—দিন-রাত্রি তো সেই ব্যাকুলিত আকাঙ্ক্ষার লাগি সর্ব-দেহে-মনে উন্মুখ হয়ে আছে।—

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব
নিখিলের অস্তিত্ব গৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।

* * *

যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।

['সৃষ্টিরহস্য'—মহুয়া]

'দেহ' এবং 'মন', 'মোহ' এবং 'নির্মোহ', 'রূপ' এবং 'ভাব'—এর মধ্যে কবির সমন্বয়ের যে চেষ্টা; তা যেন এই কয়েকটি চরণের মধ্যে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত। বাস্তব জীবনে 'তুমি আছ'-'তুমি এলে',—এ যে কত বড় রোমাঞ্চ, কত বড় গোপন আনন্দ, তা তো বলে বোঝাবার জিনিস নয়,—সমস্ত দেহ-মন দিয়ে অনুভবের জিনিস। আবার 'সৃষ্টির পরম রহস্য' তোমার 'মুখে', 'চোখে', 'হাসিতে',—সমস্ত অঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে যে ধন্য হয়েছে—এই উপলব্ধির মধ্যে একটি নিরাসক্ত সৌন্দর্যদৃষ্টিও লুকিয়ে আছে; তাই 'প্রিয়তম' বা 'প্রিয়তমা'কে এই অনুভবের মধ্যে পাওয়া বাস্তব হয়েও 'মায়া' বা 'মোহ'। 'ব্যক্তি'র মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-সীমাকে অতিক্রম করে আরও বেশী কিছু পাওয়া। দুটি হৃদয়ের এই মুক্ত প্রেমের স্বচ্ছ-শুভ্র-স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোমাধুর্যটুকুই কবি-আকাঙ্খিত 'প্রেমচেতনা'। আত্মাগত ভাবসৌন্দর্যের স্বপ্নরোমাঞ্চ দেহের আঙিনায় ধরা দিয়েই বাস্তব। তাই এই নির্মল শুভ্র আত্মিক এবং দৈহিক মিলনকেই কবি পরিপূর্ণ প্রেমময় জীবন বলতে চেয়েছেন।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র প্রেমকবিতাগুলিও তাঁর 'প্রেমচেতনার' এই অপরূপ তত্ত্ব সৌন্দর্যময় স্বপ্ন সঞ্চরণ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি।

'মহুয়া' কাব্যে প্রেমের কবিতার সবদিক থেকেই চরম উৎকর্ষ এবং নূতনত্ব ঘটেছে। 'মহুয়ার বাসাটি যে নূতন' তা কবি স্বয়ং ঐ কাব্যের 'পাঠপরিচয়ে' উল্লেখ করেছেন।—

"অথচ যে-যুগে এ-কাব্য লেখা, সে-যুগের মন ও মনন তথাকথিত মুক্তপ্রেমের স্বপ্ন রোমাঞ্চে বিদ্রোহী। এমন অবস্থায় বৈরাগ্য প্রেমের স্পষ্ট রূপটি নিতান্ত সেকেলে বলেই মনে হতে পারে। যুগোচিত ধ্যানধারণা ধারণ করেও যুগোত্তীর্ণ শাশ্বতী বেদনাটি কীভাবে প্রকাশ করা যায়, 'মহুয়া'র আঙ্গিক রীতিতে কবিগুরু তাই পরীক্ষা করলেন। এমন কতকগুলি কবিতা লিখলেন—যা পাঠ মাত্র মনে হ'ল কবি বুঝি দায়হীন, দায়িত্বহীন মুক্ত প্রেমের প্রশ্রয়ই দিতে চাইছেন।"[১]

এ যুগের কবি-সাহিত্যিকরা 'মুক্ত' প্রেম বলতে নরনারীর যে উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশা এবং দেহভোগের কথা বোঝেন—কবি বুঝি তাঁর সেকেলে সংস্কার থেকে বা ধ্যানধারণা থেকে দূরে সরে এসে 'আধুনিক যুগে'র এই 'মুক্ত' প্রেমবোধের কথাই বলছেন। তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাসগুলির কিছু কিছু চরিত্রও আধুনিক কবি বা সাহিত্যিক সমাজে আলোড়ন জাগালো—কবিকে তারা 'আধুনিক' বলে প্রচার করেও বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু ভুলে গেলেন তাঁরা 'যথার্থ আধুনিকতাটা' কি এবং এ সম্পর্কে কবির ধ্যানধারণা বা বক্তব্যই বা কি? "আধুনিক কাব্য" ('সাহিত্যের পথে'—সং বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ১১৫-১১৬ দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধে কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই কথা—

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"

কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বাস্তবকে দেখার চোখ নিয়ে এই আধুনিক প্রেমের কবিতার তাই নূতন রূপসৃষ্টি করলেন। ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে-ছবিতে যুগোচিত সমস্যায় কণ্টকিত হয়ে এ একেবারে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। 'শেষপর্যায়ের কাব্য'গুলির বেশ কিছু প্রেমের কবিতা কবির একেবারে নূতন সৃষ্টি বলে পাঠক সমাজে আলোড়নও জাগালো। 'পলাতকা'য় এই ধরনের মুক্তবুদ্ধির সাক্ষাৎ তো আগেই পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুতঃ কবির মতে যা 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা' তা 'ব্যক্তিগত আসক্তভাবে বিশ্বকে না দেখে' 'নিরাসক্ত চিত্তে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখা,—সেই 'দেখা'রই রূপ-রস চিত্র নূতনত্বের ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে 'শেষপর্যায়ের কাব্য'গুলির বহু কবিতায়—বিশেষতঃ 'গদ্যছন্দে' লিখিত কাব্যগুলির অনেকগুলি কবিতায়। এই 'মোহমুক্ত' দেখাটাই তাঁর মতে আধুনিক এবং চিরকালের কবি

১। শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের মহুয়া' [প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৫—পৃঃ ২১৪-২১৫

শিল্পীর কাছে—রসিকের কাছে, এই 'মোহমুক্ত' দেখাটাই প্রত্যাশিত। 'যুগোচিত সমস্ত ধ্যান ধারণাকে তাই বহন করেও যুগোত্তীর্ণ শাশ্বতী বেদনাটিকে প্রকাশ করতে' সক্ষম না হলে সাময়িক কাল তার গলায় বরণমালা দিলেও চিরকালের রসিকহৃদয় তাকে বরণ করে নেবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' বা অন্যান্য কাব্য কিংবা 'বৈষ্ণব-পদাবলী'র খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতাগুলি ভাষার দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও আপন কালকে হারিয়েও আজও রসিক চিত্তের কাছে সমানভাবে আদরণীয়। সুতরাং কাব্যের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, তত্ত্বকথা কোনটাই মুখ্যভাবে গ্রাহ্য নয়—কাব্যের প্রাণ হোল মানবহৃদয়ের শাশ্বতী বেদনাকে বহন করার মধ্যে যথোচিত শিল্পরসে অভিষিক্ত হয়ে। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র প্রেমের কবিতাগুলিও কবির সেই চিরন্তনকালের প্রেমসৌন্দর্যবোধকেই প্রকাশ করেছে ভিন্ন রূপাঙ্গিকে।

'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে', 'ক্যামেলিয়া', 'ছেঁড়াকাগজের ঝুড়ি'—'শ্যামলী' কাব্যের 'কনি', 'হঠাৎ দেখা', 'অমৃত', 'দুর্বোধ', 'বঞ্চিত', 'অপরপক্ষ' এবং 'বীথিকা' কাব্যের 'মিলনযাত্রা', 'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল', 'পরিচয়' প্রভৃতি কবিতা আখ্যায়িকামূলক। অতি আধুনিককালের নরনারীর জীবনে প্রেমের যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে—পরিবেশ এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর চাওয়া-পাওয়ারও যে রকমফের ঘটেছে—কবি গদ্যকাব্যের মধ্যে সেই সমস্ত সমস্যাকেও আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অর্থের উপর মাত্রাকে নির্ভর করিয়ে—অসম পঙক্তিতে চরণগুলিকে সাজিয়ে গদ্যকবিতার রোমান্টিক সুরকে এনে নূতন কিছু পরিবেশন করলেও—এগুলি ছোটগল্পের খসড়া।

'পুনশ্চে'র 'ছেঁড়াকাগজের ঝুড়ি'তে প্রেমের ব্যর্থতা, 'ক্যামেলিয়া'য় প্রেমের করুণ পরিহাস এবং 'সাধারণ মেয়ে'র জীবনের প্রেমের করুণ ট্র্যাজেডির কথাই এ কাহিনীগুলির মূল রসাবেদন।

আসলে 'গদ্যছন্দে'র কাব্যগুলির মধ্যে 'শ্যামলী'ই প্রেমকাব্য হিসেবে গণ্য। এই কাব্যের আখ্যায়িকা মূলক কবিতাগুলির মধ্যে গল্পচ্ছলে কবি নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ের ক্ষণিক কোনো অনুভূতিকে বা জীবনের কোনো সত্য উপলব্ধিকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

'কনি' কবিতাটিতে, একটি ছোটগল্পের সুসম্পূর্ণ রেখাচিত্র। ছোটবেলার অবাধ মেলামেশা এবং ভালোবাসাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষের মনে রঙ ধরিয়েছিল হয়তো বা—কিন্তু সে কথা ওরা টের পায়নি—ছাড়াছাড়ি হয়েছে ওদের—'কনি'র বিয়ে হয়েছে অন্যত্র—কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে আসার পর গ্রামের বাড়িতে আবার দেখা 'কনি'র

সঙ্গে। 'কনি' ভাইফোঁটার দিনে পুরোনো এক ব্যর্থ দিনকে স্মরণ করে এক ঝুড়ি লিচু 'অমলে'র পায়ের কাছে রেখে বললে—

"সেই লিচু।"

অমল বললে—"ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।"

কনি বললে, "কী জানি।"

বলেই দ্রুত গেল চলে।

['কনি'—শ্যামলী]

এই যে 'কী জানি' বলে দ্রুত চলে যাওয়া—এতেই তাদের অন্তরের কোন্ গোপন বঞ্চনা রহস্যের মতো হয়ে উঠে পাঠককে অনেক 'কী জানি'র সম্মুখীন করে দেয়—যা ব্যাখ্যা করে বা স্পষ্ট করে বলা হয়নি—অথচ সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত।

"হঠাৎ দেখা"য় (শ্যামলী) দেখা গেল—একদিন যার সঙ্গে ছিল অতি নিকট সম্বন্ধ—যাকে বার বার দেখা গেছে লালরঙের শাড়িতে—

দালিম ফুলের মত রাঙা ;

তার সঙ্গে আজ ঘটেছে চিরবিচ্ছেদ—আজ সে বহুদূরের মানুষ। রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা—

থম্‌কে গেল…সমস্ত মনটা ;

চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।

['হঠাৎ দেখা'—'শ্যামলী']

কিন্তু সে তো ভুলবার নয়—অন্তরের অন্তঃস্থলে তাই যে প্রশ্ন একান্ত সত্য হয়ে গুম্‌রে মরে তাকেই জেনে নিতে চায় নায়িকা—

"আমাদের গেছে যে দিন

একেবারেই কি গেছে,

কিছুই কি নেই বাকি"।

উত্তরে শুনতে পেল—

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে"।

['হঠাৎ-দেখা'—শ্যামলী]

বাস্তবে এ ধরনের ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। জীবনের কোনো চকিত মুহূর্তের ভালো-লাগা এবং ভালোবাসা সব সময়েই তো মূল্য পেয়ে সার্থকতায় ভরে ওঠে না। সংসারের অমোঘ নিয়মে মানুষ অন্যত্র মিশে যায়—নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে এমনি করেই শত প্রশ্ন জবাব খুঁজে মরে—তারা হয়তো উত্তরও

পায় না—এবং পেলেও খট্‌কা থাকে—'কি জানি এ বানিয়ে বলা কি না'। এর থেকে পরম ট্র্যাজেডি আর কি আছে মানুষের জীবনে?

'অমৃত' (শ্যামলী) কবিতায় দেখা গেল—যে-পুরুষ নারীকে একদিন বলেছিল—'ভালোবাসাই অমৃত'—'উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ'—সেই পুরুষই উপকরণের পিছনে ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত ভালোবাসাকে হারালো—আর উপকরণকে তুচ্ছ করে দিয়ে 'অমৃতে'র সন্ধান নারীই পেল।

'দুর্বোধ' (শ্যামলী) কবিতায় প্রেমের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়ের চরিত্রই যে সময়ে সময়ে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে—সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

'বঞ্চিত' ও 'অপরপক্ষ' কবিতায় এক একটি খণ্ড চিত্রের মধ্যে দিয়ে এ-যুগের নায়ক-নায়িকাদের অভিসারের কথা বলেছেন। এখন নায়ক-নায়িকাদের সংকেত স্থান হোল স্টেশনে অপেক্ষা করা—'গাড়ী' ধরে অন্যত্র গিয়ে দেখা করা—কিন্তু অভিসারের আগে এ যুগের নায়িকাও 'মাথায় সিল্কের রুমাল জড়িয়ে নেন'—

চন্দ্রমল্লিকা গুঁজে দেন খোঁপায়—

কিন্তু প্রিয়তমের দর্শনলাভে বঞ্চিতা হয়ে ফিরে আসতে হলে—

অন্যমনস্ক হয়ে উঠে পড়েন একটা বাসে
ফেলে দেন চন্দ্রমল্লিকাটা।

বর্তমানকালের পটভূমিকায় অঙ্কিত এই সমস্ত প্রেমের কবিতাগুলি অত্যন্ত জীবনধর্মী সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রেমবেদনার একটি সুরসুষমাও এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে—যা এ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে চিরকালের।

কতকগুলি কবিতার মধ্যে কবি,—প্রেমের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি নারী-হৃদয়ে আত্মগোপন করে তাকে অনন্যা করে তোলে—আপন মনের সূক্ষ্ম রসবোধের আলোকে, অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে একান্ত দরদের সঙ্গে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল আবাল্যের; তাকে শুধু ভোগের এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কখনো দেখেননি কবি। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা'র মুখেই ব্যক্তিত্বময়ী মর্যাদাশালিনী নারীর সেই উক্তি শোনা গিয়েছিল বহু আগেই—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

['চিত্রাঙ্গদা' পৃঃ ৬০ সং—বিশ্বভারতী ১৯৬৬]

আপন কল্পনা বলে দৈনন্দিন কর্মজীবনের সঙ্গিনী হিসেবে তাকে দেখেও সংসারে তার স্নেহ-প্রেম-সেবা-সাধনার ভূমিকায় সে যে স্বর্গের দেবী—মর্ত্যের অমৃত মাধুরী রূপে দেখা দিয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ দৈন্য পীড়িত জীবনকে সৌন্দর্য মাধুর্যের অযাচিত দাক্ষিণ্যে প্রীতি সুন্দর করে তুলছে, সেই কথাই বলতে চেয়েছেন কবি বারংবার, তাঁর সমগ্র জীবনের বাণী সাধনায়।

'শ্যামলী' কাব্যের অপর কয়েকটি প্রেমকবিতায় নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাব, অনুভূতি এবং পুরুষের কাছে তার যে মাধুর্যের অনির্বচনীয় মূল্যবোধ—তাকেই গদ্যের সহজ সরলতায় আর একবার নূতন করে প্রকাশ করেছেন। 'দ্বৈত', 'শেষপহরে' 'সম্ভাষণ', 'হারানো মন', 'বাঁশিওয়ালা' প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতা। নারী এবং পুরুষ উভয়ের মনে প্রেমসম্পর্কে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি তাকেই নানা ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা।

'দ্বৈত' কবিতায় দেখা যায় নারীর যে দ্বৈত রূপ তার একটা পুরুষের অন্তরের নিজস্ব সৃষ্টি। বিধাতা তাকে এক ভাবে সৃষ্টি করেছেন—'পুরুষ'ও হয়েছে সেই স্রষ্টার দোসর। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সে তাকে রচনা করেছে—বাস্তবে আর কল্পনায়—

দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।

তাই—

* * *

আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে। ['দ্বৈত'—'শ্যামলী']

'সানাই' কাব্যের 'সম্পূর্ণ' কবিতায়ও একই ভাব—নায়ক প্রথম তার প্রিয়তমাকে দেখেছে তার 'বোনের বিয়ের বাসরে' কিন্তু সেদিন তাকে দেখেও দেখেনি। তারপর—

আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে

* * *

যেমনি দিয়েছি দেহ

আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।

তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণ বাণী
লাগে না কোনোই কাজে।

এইভাবে দেখা যায়—পুরুষের রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী মন মর্ত্যের মানবীকে তার ভাবের রঙে রাঙিয়ে করে তুলেছে রহস্যময়ী—অধরা—রোমান্টিক নায়িকা। নারীর এই 'দ্বৈত' রূপ পুরুষের নিজস্ব সৃষ্টি।

'শেষ পহরে' কবিতার মধ্যে অবহেলিত নারী হৃদয়ের মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা, নীরব প্রত্যাশা এবং ব্যর্থ বেদনার দীর্ঘশ্বাস অতি সার্থক বাস্তব চিত্রে পরিবেশিত। অবহেলিত বঞ্চিত স্ত্রী স্বামীর বিদায়কালে তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে একটু দরদের কথা—

'তবে আসি'

কিন্তু অভাগী নারীর ব্যর্থ হয়েছে এই আশা, এই প্রতীক্ষা; আজ তাই আপন অন্তরের বেদনাকে সত্য করে তুলে একটা কথা মনে হোল—

হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হল, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ব'লে।

['শেষ পহরে'—'শ্যামলী']

বাস্তবিক, বঞ্চিত নারী জীবনে এর থেকে চরম ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে। যে স্বামীর কাছে, স্ত্রী অপেক্ষা নিজের 'হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা' বেশি মূল্যবান—সে স্ত্রীর জীবনের সব রস-কস মাধুর্য একেবারেই শেষ হয়েছে বোঝা যায়। কবি বঞ্চিতা নারীর এই করুণ কাহিনীকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

'বীথিকা' কাব্যের 'দুজন' এবং 'দুঃখী' কবিতায় এই করুণ ব্যর্থতা যে নরনারী উভয়ের জীবনে যে-কোনো সময়ে ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে এবং সে জীবনের দুর্বিসহ

বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানো যে কত কঠিন, সে কথাই কবি বলেছেন। 'দুজন' (বীথিকা) কবিতায়—

একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
সে মুহূর্তে পরিপূর্ণ ;···

কিন্তু আজ—

সে মুহূর্ত ধারা
ক্রমে আজ হল হারা
সুদূরের মাঝে ··
* * *
সেথা আজ যাত্রী দুই জনে
* * *
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।

এইভাবে দু'জনের একসঙ্গে পথচলা আজ কোথায় মিলিয়ে গেল। হারিয়ে ফেলেছে তারা পুরোনো দিনের আনন্দময় মুহূর্তগুলিকে। 'দুঃখী' কবিতায় কবি তাই বলেছেন—সঙ্গীহীন যে, এ পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র 'দুঃখী' নয়—

দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।
দুইজনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।

['দুঃখী'—'বীথিকা']

সংসারে যে কোনো 'মিলিত'-জীবন মানেই প্রেমপূর্ণ সার্থক জীবন নয়—নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রচনা করে দিতে বা নিতে না জানলে ব্যর্থতা যে কবে কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে কখন প্রবেশ করবে জীবনে-তা ধরাও যায় না। কবি এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানসবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রেমের যথার্থ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নরনারীর জীবনের অলক্ষ্য 'সুর'টুকুকে, 'ছন্দ'টুকুকে বজায় রাখতে হলে যে উভয় পক্ষেরই কিছু দেবার আছে—এবং 'অধরা মাধুরী'কে যে নিজেদের মনে রচনা ক'রে নিতে হয়—সে কথা কবি এ যুগের বাস্তবজীবন সমস্যাপূর্ণ চিত্র বা চরিত্রগুলি আলোচনা ক'রতে গিয়েও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যান নি।

'সম্ভাষণ' (শ্যামলী) কবিতার মধ্যে পুরুষের উদার রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যে নারীকে অতি সাধারণ বলে মনে হয়—আধুনিক যুগের কর্মব্যস্ত অফিসের কেরানী যার কাছে জীবনটা নিত্য প্রয়োজনের টানাপোড়েনে বাঁধা ছকে পরিণত হয়েছে—তার চোখেও কোনো এক শুভ মুহূর্তে নিত্য ডাকা 'চারু' হয়ে ওঠে 'চারুপ্রভা'। এই 'সম্ভাষণ' তার যে রোমান্টিক মনের পরিচয় দিচ্ছে, সে মন বিশেষ কোনো সময়ে আবিষ্কার করে তার আটপৌরে জীবনের মাঝে সত্য হয়ে আছে যে নারী সে তো—

অল্প মজুরির দিন চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন দাম দেওয়া রূপে।

['সম্ভাষণ'—'শ্যামলী']

তাই সেই দিনমজুরীর কেরানীও আপন কল্পনা দিয়ে প্রেমের চিরন্তন সত্যকে করে উপলব্ধি—

ঠিক এমনি ক'রেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা;
ভালোলাগার অপরূপ বেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে। [ঐ]

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'নামকরণ' কবিতায়ও ঐ একই সুর—

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
চৈতালি পূর্ণিমা বলে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট করে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।

এইটিই তো কবির আজন্মের সাধন-কল্পনা। প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন যাত্রার মধ্যে 'ছন্দ' খুঁজে পাওয়া 'সুর' খুঁজে পাওয়া, সীমার বাঁধনের মধ্যে অসীমের অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের স্পর্শ জাগিয়ে তোলা। গদ্য কবিতার মধ্যে অতি সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে এই রোমান্টিক স্বপ্ন-সাধনার মাধ্যমে কবি সেই আকাঙ্ক্ষাকেই সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই রোমান্টিক স্বপ্ন-সাধনায় তাই নারীর সত্যরূপের সঙ্গে 'মায়া' মিশিয়ে,

এবং পূর্ণ প্রেমবোধের সঙ্গে 'মোহ' মিশিয়ে দুয়ের সমন্বয়েই যে সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যেও 'সুর' বা 'ছন্দ' খুঁজে পেয়ে পার্থিব জীবন যাত্রাকে স্বর্গীয় অমৃতের স্বাদে ভরে তোলা সম্ভব—এ কথাই কবি কয়েকটি কবিতায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। নারীর প্রতি পুরুষের মোহকে তিনি তাই অস্বীকার করেন না। মায়াময়ী—মোহময়ী নারী—তার দৈনন্দিন জীবনের মাঝেই 'অত্যুক্তি'কে বহন করে ('অত্যুক্তি'—'সানাই')—

তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আস।
তখন যে হাসি হাস
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো—
* * *
কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।

নারীদেহের এই 'অত্যুক্তি'ই যে 'অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া' এ কথা কবি 'তর্ক' ('আকাশপ্রদীপ') কবিতায় স্বীকার করে নিলেন—

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্ম শিল্পকারুময়ী কায়া—
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,

একে যদি স্বীকার করাকে 'মোহ' বলা যায়—তবে কবি তা অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে—

"যদি প্রেম হয় অমৃত-কলস,
মোহ তবে রসনার রস।
* * *
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্য ভরা কায়া,
তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।

['তর্ক'—'আকাশপ্রদীপ']

'পুরুষ যে ভাবের বিলাসী' তাই এই 'মোহতরী বেয়ে সুধা-সাগরের প্রান্তে' আসতে সমর্থ হয় এবং 'স্বল্প জানা ভূরি অজানা' দিয়ে সে 'অরূপের মায়া'—'অসীমের ছায়া'কে দেখতে পায়।

এ কালের রোমান্টিক পুরুষও তাই বলতে পারে যে, 'অনসূয়া'র ('সানাই') সন্ধান সে আজও পায়। 'কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ, রান্নাঘরের পাঁশ'যুক্ত দুর্গন্ধময় গলিতে বাস করেই সে বলে—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক

'অভিসার-যাত্রাপথে' সে 'মালবিকা'র সন্ধান করে ফেরে—'বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়' যেখানে 'দিন চলে যায়'—সেখানেই এ যুগের নায়ক আজও সুর খুঁজে পায়—

সমস্ত এ ছন্দ ভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।

['সানাই'-'সানাই']

সুতরাং এই রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী মন—সুন্দরের পূজারী চিত্ত, যুগের এবং পরিবেশের সমস্ত বাস্তব বঞ্চনাকে স্বীকার করে নিয়েই নারীর 'সত্যরূপ' এর ('বীথিকা') সন্ধান পায়—

অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

সে বলতে পারে—'প্রত্যর্পণ'-('বীথিকা')—

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়া বাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু,

নারী হৃদয়ের 'দানমহিমা' ('বীথিকা') তাকে মুগ্ধ করে আজও—

তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল্প
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।

'গরবিনী' ('বীথিকা') নারীকে সে সাবধান করে এই বলে, যে, নিজের চিত্তের দীনতা দিয়ে জয় করা যায় না প্রিয়তমের মন—

আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন

*　　*　　*

আমি সাধারণ।
এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।

সুতরাং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দিতে এবং নিতে না পারলে 'মুক্তি' ('বীথিকা') পাওয়া সম্ভব নয়। 'জয় করেছিল মন' এই অহঙ্কারে মগ্ন থেকে আপন অহমিকাকে চরিতার্থ করলে একদিন শেষে—

'প্রত্যাখ্যান লাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে' ('মুক্তি'-বীথিকা) থাকতে হবে।

সুতরাং দেবার মধ্যে কৃপণতা বা অহঙ্কার বা সন্দেহ কোনো কিছু থাকলেই দ্বৈত, প্রেম পূর্ণতা লাভ করতে সমর্থ হয় না।

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিইনি তাহার সাথে।
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা—
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,

['অদেয়'—সানাই]

অথচ একপক্ষ পূর্ণভাবে দিলেও যে ব্যর্থতা সমানই তাও বাস্তব নরনারীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়—'শেষ কথা'য় ('সানাই')—

রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।

*　　*　　*

প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে
সে-দীন কি পার্শ্বে তব শোভে।

*　　*　　*

আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

সুতরাং নরনারীর জীবনের দ্বৈত প্রেমসাধনায়—রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা এবং তার সঙ্গে বাস্তবের চাওয়া-পাওয়ার একান্ত সমন্বয়ের উপরই চিরকালের নরনারীর প্রেমময় জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। এই শাশ্বতী প্রেমবেদনার অলক্ষ্য 'সুর'টুকুকেই কবি তাঁর কাব্যে নানা ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; ভাব-ভাষা-ভঙ্গি তার যে রকমই হোক না কেন। সুতরাং একথা বোধ হয় সর্বতোভাবেই স্বীকার্য—"যথার্থ যা আধুনিক কবিতা, তা' চিরকালের 'অন্ততন'টি ধারণ করে বলেই আধুনিক। অতীতের ঐতিহ্যকে মানা, বর্তমানের চিন্তাভাবনাকে জানা এবং ভবিষ্যতের কল্যাণ স্বপ্নকে ভাবের মধ্যে আনা—এই ত্রিবিধ ধর্মসাধনার দিব্যশক্তির নাম চিরন্তনের আধুনিকতা।

…কালের 'হৃদয় হরণ' করে চিরকালের শাশ্বত 'আজ'টির প্রতিষ্ঠা, আর কেউ দিতে চাক বা না চাক, শিল্পীকে, কবিকে দিতেই হয়, দেয়ার সাধনা করতেই হয়। যদি নয়, তবে সে-কবি কবি নয়, ছদ্মবেশী অন্য কেউ।"[১]

"শ্যামলী" কাব্যের 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে'র জীবনের রোমান্টিক প্রেমভাবনাটুকুকে বাস্তবের পটভূমিকায় স্থাপন করেও একটি যুগোত্তীর্ণ মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে যাকে গড়তে—

সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি

* * *

রেখেছেন আধাআধি করে।

কিন্তু বাইরের দিক থেকে এ মেয়ে যত সাধারণই হোক অন্তরে সে কারও চেয়ে নগণ্য নয়—'বাঁশির সুর' তার রোমান্টিক মনে সাড়া জাগায়—আপন অন্তরে সেই সুরের সাধনা করে চলে সে। তাই তার বঞ্চিত প্রাণ আপন অন্তরের গভীর রহস্যকে উপলব্ধি করে বলে—

কঠিন করে জানিনে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

['বাঁশিওয়ালা'—'শ্যামলী']

এইভাবে কবি চিরকালের অতিসাধারণ নারী হৃদয়ের একটি আত্মনিবেদনে পূজাভাবে অভিষিক্ত হৃদয়ের মাধুর্যকে এ যুগের ভাব-ভাষা-ছন্দে নন্দিত করে তুলেছেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অতি সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে তাকে

১। শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'—[প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৫—পৃঃ ২১০—২১১]

স্থাপন করে—সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে দু'একটি রেখার রঙের আঁচড়ে তার রোমান্টিক সুরটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র প্রেমের কবিতাগুলির সব কবিতাই দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়—বা গদ্য বাচনভঙ্গিতে এ যুগের নায়ক নায়িকার জীবন দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলায় সার্থক নয়। আবার "কবির এই সময়ের সকল রচনাই জগদ্ব্যাপী মারণযজ্ঞের নিন্দা নহে, আপন ক্লান্ত মনের ক্ষোভপ্রকাশ নহে। এমন সব কবিতা আছে যাহা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল—'সানাই'-এর কবিতাগুলি তারই দৃষ্টান্ত।"[১]

'বীথিকা' ও 'সানাই' কাব্যের অনেকগুলি কবিতায়…"রোমান্টিক অথচ পরিণত রবীন্দ্রনাথের পুরাতন পরিচিত কবিমানসের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছি। এ কাব্যে কোথাও পুরানো দিনের অনুরাগের স্মৃতি, কোথাও সুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন নিয়ে প্রকৃতির ক্ষণিক মাধুর্যরস আস্বাদন"[২] কাব্য মহিমা লাভ করে অতি পরিচিত রোমান্টিক কবিকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছে।

'বীথিকা'র 'ধ্যান' কবিতায়—

* * *

তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।

বা 'ভুল' ('বীথিকা') কবিতায়—

* * *

একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎ প্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

কিংবা 'ছবি' ('বীথিকা') কবিতায়—

একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।

বা 'উদাসীন' ('বীথিকা') কবিতায়—

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী—৪র্থ খণ্ড—[প্রঃ ১৩৬৩ শ্রাবণ—পৃঃ ২১৬]
২। শ্রীক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—[গোধূলি পর্যায়—পৃঃ ৩৬০-৩৬১

বা 'ঈষৎদয়া'য় ('বীথিকা')—

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদুস্বর।

অথবা 'সানাই' কাব্যের 'আসা-যাওয়ায়'—

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিইনি আসন বসিবার।

বা 'ক্ষণিক' ('সানাই') কবিতায়—

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,

বা 'অনাবৃষ্টি' ('সানাই') কবিতায়—

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,

কিংবা 'গানের খেয়া'য় ('সানাই')—

ঐ মুখে চেয়ে দেখি,
জানি নে তুমিই সে কি
অতীত কালের মুরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে

এই সমস্ত কবিতায় কবির চিরন্তন কালের রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী মনটির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কবির মতে—…"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করারই নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। এইজন্য কবি নর-নারীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনা মনে করেন, তাহা ইহজীবনের ভোগেই পরিসমাপ্ত বা পর্যবসিত হয় না, তাহা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধন। তাই কবির কাছে নর-নারীর প্রেম নির্মল, প্রশান্ত, বিক্ষোভবিহীন";[১] এই শুভ্র-প্রশান্ত আত্মনিবেদনপরা প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে—ব্যক্তিগত সীমা থেকে মুক্ত করে তাকে দেখার মধ্যে। 'বীথিকা' এবং 'সানাই' কাব্যের

১। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবি-রশ্মি'—পশ্চিমভাগে [সংস্করণ ১৯৩৯—পৃঃ ২৯৮]

অধিকাংশ প্রেমের কবিতার মধ্যে শেষ জীবনের কবি, প্রেমচেতনার এই শান্ত-সুরোভিত সৌকুমার্যটুকুকে একান্ত সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইজন্যে সমালোচকের এই মন্তব্যকে একান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়া চলে—"কাম ও প্রেমের যে দ্বন্দ্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করিয়াছিলেন সে দ্বন্দ্ব আমাদের অন্তর বাহিরের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন পন্থায় ত্যাগধর্মকে প্রধান করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় দেন নাই—

…এইজন্য প্রেমের পরিকল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেহের লাবণ্য, নারী সঙ্গে চিত্তের শিহরণ ও নানা মাধুর্যের আপূরণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু অন্তরের প্রেমের আপ্লাবনের দ্বারা তিনি সমস্ত বন্ধনকে জয় করিয়াছেন; তিনি দেখিয়াছেন যে একটি যুগল প্রীতির উৎস কামগন্ধহীন হইয়া এমন করিয়া মহাভাবের কল্পনাতে বিহার করিতে পারে, যাহাতে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আবরণ খণ্ডিত হইয়া যায়। সেই আবরণহীন অন্তঃস্পর্শের মধ্যে নিখিল বিশ্বের হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতে পারে"।[২]

এই 'আবরণহীন অন্তঃস্পর্শের' দ্বারাই নরনারীর দ্বৈত প্রেমময় জীবন 'দেহ'কে,—তার 'মায়া' 'মোহ'কে স্বীকার করেও জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দকে অমৃত স্বাদকে ভোগ করতে পারে।

নারীর মধ্যে আছে সেই শক্তি যে শক্তির বলে সে একদিকে মনোমোহিনী রূপে পুরুষের চিত্তকে আবেশে হিল্লোলে রাঙিয়ে তুলতে পারে—নন্দিত করতে পারে; অপরদিকে বিশ্বের সেই 'পালনী শক্তি' যে শক্তির বলে প্রেমে-স্নেহে-সেবায়-মাধুর্যে ভরিয়ে দিতে পারে চিরন্তন মানবের তৃষিত আত্মাকে। এই দুই শক্তির সমন্বিত সার্থক রূপই যথার্থ নারীরূপ—'উর্বশী' এবং 'কল্যাণী'র মিলন। নারীরূপের এই স্নিগ্ধ মাধুর্যটুকুকে শক্তিটুকুকে কবি শেষজীবনে তাঁর সেবা-নিরতা বহু নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভাবমুগ্ধ কবি বিশ্বের সমস্ত নারীশক্তির মহিমা ঘোষণা করলেন এইভাবে—'আরোগ্য' কাব্যের '২৩' সংখ্যকে বললেন—

বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে-চুপে
মাধুরীর রূপে।

'সানাই' কাব্যের 'নারী' কবিতায় বিশ্বের এই রহস্য প্রতিমাটির বিজয় ঘোষণা করলেন—

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দরস

২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'রবি-দীপিতা'—[সং ৩য়—'কান্তা প্রেম-মহুয়া'—পৃঃ ১৪৯-১৫০]

রূপ ধরেছিল রমণীতে

*   *   *

সেই আদি ধ্যান মূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে

*   *   *

সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলি ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শূচি,
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্র রুচি।
পুরুষের অনন্তবেদন
মর্ত্যের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।

কালে কালে নারীমূর্তিকে এই 'ভুবনমোহিনী' রূপে সৃষ্টি করে চলেছে 'রূপকার' আপনার শুভ্র রুচির পরিচয় দিয়ে। পুরুষ শক্তির মধ্যে এই 'রূপকারে'র ধর্ম লুকিয়ে আছে, তাই 'প্রত্যহের গ্লানি'র মধ্যে সেই-ই আবিষ্কার করে নিতে পারে নারী চিত্তের এই মাধুর্যশক্তিকে ; নারীও সেবায়-ক্ষমায়-স্নেহে-প্রেমে-মাধুর্যে-লালিত্যে ভরিয়ে তুলতে পারে এই ক্ষুদ্র-ক্ষণকালীন মর্ত্যজীবনকে অমৃতস্পর্শে। দুয়ের এই সাধনময় দেহ-মনের মিলনই যথার্থ প্রেমসাধনা।

'নারী' (সানাই) কবিতাটি শ্রীমতী রাণী চন্দের হাতে দিয়ে কবি বিশ্বের 'নারীশক্তি' সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন —

"এক হিসেবে নারী হচ্ছে Universal, তোদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূলে। দয়া, সেবা, লালনপালন এতেই তোদের সত্যিকার রূপ-প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয় : সব নারী মিলিয়ে,—এক নারী। একটা জায়গায় সব মেয়েরাই এক।

······মেয়েরা হচ্ছে সৃষ্টির জাত। বাইরে থেকে মনে হয় তারা কুনো, কিন্তু আসলে তা নয়। তারা সৃষ্টির গড়ন কাজে বাইয়ে প্রকৃতিতে কতখানি জুড়ে আছে।

……তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে দেবতার মতো। যে নারী কর্তব্যকে নিজের মধ্যে নেয়—তার উপরেই পড়ে বিশ্বের সেবার ভার,—পালনের ভার। সেখানে নারীরা Universal, বিশ্বের পালনীশক্তি তোদের মধ্যেই আছে"।[১]

একথা অবশ্যই স্বীকার্য কবির সৃষ্টিশীল মন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিরন্তন সত্যবোধের প্রতি আস্থা তো হারায়নি—বরং নিত্য নূতন করে তাকে গতিবান-প্রাণবান করে তুলেছে। আপন আপন জীবনে এই রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বাস এবং সৃষ্টিশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলতে পারলে 'প্রত্যহের গ্লানি'তে মলিন না হয়ে নরনারীর পার্থিব জীবন—মিলিত জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে—ধন্য হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য উভয়েরই সৌন্দর্য ও সৌষম্যের মধ্যে দিয়ে—সংযমের মধ্যে দিয়ে—ত্যাগের সাধনা করা চাই—এই হল রবীন্দ্র-জীবনের উপলব্ধি, রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার স্বরূপ। এ কবিকল্পনা নয়—বাস্তব পৃথিবীতে মানুষেরই সৃষ্ট অতিবাস্তব অমৃতলোক। এই বীর্যবান-মুক্ত শুচি শুভময় শিবময় প্রেমের সাধনাই মানবিক প্রেমসাধনা।

॥ ৩ ॥

মৃত্যুচেতনা

জীবনকে তার রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে সুন্দর করে গড়ে তোলার সাধনাই কবির কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা। মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের ভালোবাসা পেয়ে ধন্য করে তুলতে চান এই ক্ষণিক জীবজন্মকে। অথচ কালের নিয়মে 'মৃত্যু' একদিন অনিবার্য গতিতেই—এমনকি অসময়েও, আকস্মিকভাবেও, নেমে আসে মানুষের জীবনে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জগৎকে হাসি আনন্দ গানকে—নিস্ফল ক'রে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় প্রিয়জনকে। এই চরম রহস্য এই একান্ত সত্য ঘটনাটিই 'মৃত্যু' নাম নিয়ে মানব জীবনে একটি মহা জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে অনাদি অনন্তকাল। কবিমন জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছে সমগ্র সত্তা দিয়ে—দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে প্রিয়জনকে—অথচ মৃত্যু তার করাল রূপটি নিয়ে দেখা দিয়েছে বার বার—বুঝিয়ে দিয়ে গেছে হাড়ে হাড়ে তার দাবী কত ভয়াবহ—কত নিষ্ঠুর—কত অমোঘ। আঘাতে আঘাতে বুক ভেঙে গেছে—অশ্রুবন্যা নেমে এসেছে, অন্ধকারের মধ্যে শূন্য হৃদয় হাতড়ে বেড়িয়েছে একান্ত আপন

১। শ্রীমতী রাণী চন্দ—'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'—[১ম সংস্করণ—পৃঃ ৭২-৭৩, তারিখ ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১]

জনকে। বাস্তবিক এ বড় বিস্ময়—কাল যে একান্ত সত্য ছিল আজ সে একান্ত মিথ্যা-কাল যে জগৎ সুধায় আনন্দে উচ্ছল ছিল আজ সর্বগ্রাসী শূন্যতার বেদনা সেখানে হাহাকার তুলেছে। অনুভূতিশীল কবিমনে প্রশ্ন চলে তাই সমস্ত জীবন ধরে—এই 'মৃত্যু' কি? কেমন তার লীলা? কিভাবে মানুষ একে গ্রহণ ক'রবে? 'মৃত্যুতে সব শেষ'—এই কথাকে যদি জগতে চরম সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে মানুষের জীবনে এই মিথ্যার ভার বয়ে বেড়ানো খুবই কঠিন হয়ে উঠতো—মানুষ এক পা-ও আর চলতে পারতো না। অথচ এই আলোয়-আনন্দে-গানে গন্ধে ভরা প্রাণপূর্ণ পৃথিবী তার জন্মকাল থেকে যেমন চলেছিল আজও তেমনি চলছে—কোথাও তার এতটুকু ঘাটতি নেই। সুতরাং এর মধ্যে সত্য কোথাও আছে সামঞ্জস্য কোথাও আছে;—সে সত্য এবং সামঞ্জস্যের সংগতিটুকু খুঁজে বের করাই কবি ও শিল্পীর কাজ। মানুষের ক্ষণকালীন এই জীবনে পূর্ণতার স্বাদ এনে দেওয়াই কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বাণী সাধনায় 'মৃত্যু' তাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে—আপন মনন ও দার্শনিক জীবন জিজ্ঞাসা দিয়ে, ঔপনিষদিক জীবনবোধ দিয়ে, নানা ভাবে নিজের কাছে, অন্যের কাছে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছেন। মানবের জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে, সত্তার কিরূপ স্থৈর্যে ও অপরাজেয় বীর্যে একে গ্রহণ করলে পরে জীবনের সত্যকার সামঞ্জস্যটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে, জীবন তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবিচল স্থির প্রত্যয়ে থাকতে পারবে, অর্থাৎ কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বা দুর্যোগের মধ্যে জীবনের ভারসাম্য হারাবে না—এই বাণী জীবনপ্রেমিক কবি জেনেছেন, ও জানিয়ে গেছেন, চিরকালের মানব সমাজকে।

'মৃত্যু'কে কবি খণ্ড দৃষ্টিতে বিনাশ বা ধ্বংসের রূপে দেখেন নি। সেজন্যই মৃত্যুকে জরাকে জয় করে অমৃতের গান গেয়ে চলতে চেয়েছেন তিনি জীবনপথে। মৃত্যুকে এত সহজভাবে গ্রহণ করার শক্তি তাঁর জীবনে এসেছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে। জন্ম-মৃত্যুকে খণ্ডদৃষ্টিতে দেখলেই তার মধ্যে আছে বেদনা—আছে হাহাকার আছে অপূর্ণতা। কিন্তু চিরচলিষ্ণু জগৎ ও জীবনের চলার ধর্মকে স্বীকার করে নিলেই দেখা যায় যাওয়া এবং আসা—জন্ম ও মৃত্যু—সৃষ্টি ও ধ্বংস পালাবদল মাত্র। কালের বুকে যা কিছু আছে—তা যত ভালই হোক না কেন, তা যদি চিরকাল ধরে থাকতো তবে জীর্ণতাই, স্থবিরতাই সৃষ্টির সমস্ত জীবনীশক্তিকে গ্রাস করে ফেলতো। কিন্তু গতিই জীবন—চলার ছন্দেই প্রাণের পরিচয়—যা সচল তাই সজীব প্রাণপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সব শেষ নয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবন নূতন নূতন পথে জীবনের বাঁক পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়ে চলে মাত্র। তাই মৃত্যু নবজীবনের সূচনাকেই প্রকাশ

করে চলে। কালের বুকে কোনোকিছুই স্থায়ী নয়—জীর্ণকে এবং জরাকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি পথ কেটে কেটে চলেছে—সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানবজীবনও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার সকল দেনা শেষ করে দিয়ে সতত এগিয়ে চলেছে সম্মুখে। যে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনবোধ থেকে কবি জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে এই মনোভাবে পৌঁছেছিলেন—সেই জীবনবোধকে তিনি একদিনে বা একেবারেই লাভ করেন নি। জীবনকে সৃষ্টির বুকে দাঁড় করিয়ে একটি সত্যবোধের আলোকে তাকে দেখার চেষ্টা তিনি করেছেন। তাই তিনি বল্‌তে পারেন—

…"It has become possible for men to say that existence is evil, only because in our blindness we have missed something wherein our existence is has its truth.

…Death does not hurt us, but disease does, because disease constantly reminds us of health and yet withholds it from us."[১]

সত্যদ্রষ্টা কবি মানবজীবনের অলক্ষ্যে নিহিত এই সত্যবোধের সন্ধান করে ফিরেছেন, এবং আপন উপলব্ধি দিয়ে তার একটি উত্তর দেবার চেষ্টাও করেছেন।

'মৃত্যু' সম্বন্ধে এই অখণ্ড উপলব্ধি বা সত্যবোধে কবি যে জীবনের প্রথমেই পৌঁছে গিয়েছিলেন তা নয়। আপন জীবনের কঠিন এবং করুণ অভিজ্ঞতা দিয়েই তাঁকে এই সত্যবোধের তীর্থে পৌঁছাতে হয়েছিল।

বালকবেলায় জীবন থাকে নিশ্ছিদ্র,—জীবন তার হাসি-আনন্দ-গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে এবং নিজের চারদিকের জগৎকে দেখে 'সুন্দর' ভাবে; জীবনকে ভালোবেসে—প্রিয়পরিজনকে ভালোবেসে এগিয়ে চলে তখন মাতাল হয়ে। কিন্তু মৃত্যু-বেদনায় এই জীবনের সকল ফাঁক ও ফাঁকি একান্ত রূঢ় ভাবে দেখিয়ে দেয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আশা ও আশ্বাস-ভরা দৃষ্টিভঙ্গী অকস্মাৎ হারিয়ে যায়, তার স্থানে আসে একটা বিরাগ, বিষাদ এবং অবিশ্বাস—আর আসে 'মৃত্যু' সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ভিড় করে। অবশ্য অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও গভীর না হলে কোনো দুঃখ বেদনাই খুব বেশি নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল কবির কাছে সৃষ্টির কোনো সুর-ছন্দ-শোভা-সুখ যেমন ব্যর্থ হয়নি তেমনি কোনো দুঃখ বেদনাও বিফলে ফিরে যায় না। এই দুঃখের মূল্য যে মানুষের জীবনে কত বড়—তার সমগ্র সত্তাকে জাগ্রত করার জন্য;—তার সমস্ত শক্তি ও অনুভূতিকে তীব্র-তীক্ষ্ণ করে আপন সৃষ্টিশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার জন্য এর যে কত প্রয়োজন—তা কবি নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছিলেন।—

১। Tagore—'The Religion of man'—[Spiritual Freedon—Page 188-189]
[Founth Impression—1953]

……"মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্র তেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহ-গুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা"।[১]

মৃত্যুতে প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখই বোধকরি মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখ। এই দুঃখ যে মানব জীবনকে কতখানি শূন্যতায় পর্যবসিত করে তাও কবি জানেন—কিন্তু এই দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই যে মানব আত্মার ধ্রুব লক্ষ্য ও পরিণাম-সে-ও তিনি দুরূহ জীবন সাধনার মধ্যে দিয়ে জেনেছেন, জানিয়ে গেছেন।—

"রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন নানাভাবে। কখনও তাঁর জীবনে মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন রোমান্টিক কবিসুলভ অকারণ বেদনাপ্রীতির মনোভাব নিয়ে, আবার মৃত্যুকে দেখেছেন প্রত্যক্ষ বাস্তবের মূর্তিতে যেখানে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছে; কখনও বা দেখেছেন ঋষিসুলভ নিরাসক্ত দার্শনিকের দৃষ্টিতে, আবার উত্তর সপ্ততি বয়সে অনুভব করেছেন নিজের জীবনে মৃত্যুর ধীর সঞ্চারী পদক্ষেপ। যখন যেভাবে মৃত্যুর উপলব্ধি জেগেছে, সেভাবেই তাকে প্রকাশ করেছেন। একটি বিশেষ মুহূর্তে হয়ত একটি বিশেষ অনুভবই প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দুভাবে দেখেছেন—খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে এবং অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিতে"।[১] রবীন্দ্র-চেতনায় মৃত্যুর স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্যকে যথার্থ বলেই স্বীকার করে নেওয়া যায়। কবি জীবনকে কোনো তত্ত্বের ভূমিকায় দেখেননি—বা ঋষিসুলভ বৈরাগ্যের দৃষ্টিতেও দেখে জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব থেকে, মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাননি।—জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছেন তার দুঃখে-সুখে-হাসি-আনন্দে-আঘাতে-সংঘাতে; তার পরিপূর্ণ রূপটি কেবল সুন্দরের মধ্যে সম্পূর্ণতার মধ্যে নয়, অসঙ্গতিতে, অসুন্দরও তার প্রতি পদক্ষেপে।

১। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'—ত্রয়োদশ খণ্ড [প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬১—ধর্ম-প্রবন্ধ—'দুঃখ'—পৃঃ ৪০৫]

১। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু' [প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬৬ ॥ ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৫]

এই জীবনকে ভালোবাসতে চেয়েছেন কবি তার সামগ্রিক রূপটিকে স্বীকার করে নিয়েই। সুতরাং দার্শনিক মনন ও তত্ত্বদৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লেও, ব্যক্তিগত জীবনে যখনই মৃত্যু বেদনার আঘাত এসেছে, কবি সমস্ত বুক পেতেই সেই দুঃখকে গ্রহণ করেছেন—অনুভূতিশীল শিল্পী মনের কাছে তার যে চির বিচিত্র প্রকাশ, তার যে গভীর ও ব্যাপক আবেদন—তাঁর সমগ্র জীবনের গানে-কবিতায়-প্রবন্ধে-নানা রচনায় তা নানা ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। খণ্ড দৃষ্টিতে না দেখলে বেদনার এমন প্রকাশ কখনও সম্ভবপর হোত না—আবার অখণ্ড জীবনবোধ মনের গভীরে জাগ্রত না থাকলে এই অপরিসীম দুঃখ বেদনা থেকে তাঁর মুক্তিও ঘটতো না। কবির ভাষায় দুঃখ পাওয়াটাই সেখানে ব্যর্থ হোত।

ব্যক্তিগত জীবনে এই মৃত্যু-দুঃখ-ভোগের ইতিহাস তাঁর জীবনে সুচির এবং নিদারুণ। একের পর এক পরম প্রিয়জনদের যেভাবে তিনি হারিয়েছেন—তা যেন আর কোনো মানুষের জীবনেই ঘটে না। যেখানে হৃদয় একটু আশ্রয় খুঁজেছে—শান্তি ও আনন্দের নীড় রচনা করেছে—সেখানেই অতর্কিতে এসেছে আঘাত। কি গভীর—কি মর্মান্তিক সেই সমস্ত আঘাত তাঁর জীবনে! মনে হয় জীবনে উঠে দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়—পথ-চলা অসম্ভব—কিন্তু কি অপরিসীম ধৈর্য-বীর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি সেই সমস্ত বিচ্ছেদের বিষাদের দিনগুলিকে পিছনে ফেলে ফেলে জীবনে কেবলই এগিয়ে এসেছেন। এই দুঃখ বেদনা তিল তিল করে সমস্ত বুক পেতে গ্রহণ করে—সেই বেদনার তাপে আপন আত্মশক্তিকে করেছেন জাগ্রত—আর সমস্ত মানুষের জন্য সৃষ্টি করে গেছেন অমৃতময় ফসল; কবিশিষ্য তিনি নটরাজ শিবের—জীবনে বরণ করেছেন সেই নীলকণ্ঠের ধর্ম।

"জীবনস্মৃতি"তে প্রথম "মৃত্যুশোকে"র প্রসঙ্গে কবি বিশেষ করে বলেছেন নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কথা। মায়ের মৃত্যুর সময় কবির বয়স ছিল অল্প। মৃত্যু কি সে বোধ তখন তাঁর মনে তীব্র কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি—পারবার কথাও নয়; কবি জানেন,—অল্প বয়সের জীবন অনেক বড় বড় মৃত্যুকেও অনেক অনায়াসেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে কিন্তু মা যে তাঁর এই ঘরকন্নার মধ্যে আর কোনদিন ফিরে আসবেন না—একথা ভেবে সেই কিশোর মনও ব্যথিত হয়েছিল। মায়ের স্থান পূরণ করেন বৌদিদি কাদম্বরী দেবী; তাঁকে স্নেহে-যত্নে-আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রেখেছিলেন। জীবনটা তখন ছিল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দের আশা ও আদর্শে ভরপুর। এমন সময় অতর্কিতেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ঘটেছিল তাঁদের পরিবারে। কবি জীবনে তিনি ছিলেন—আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দের দূতী। সুতরাং এই দুঃসহ দুঃখ সেদিন তাঁর জীবনের মূল ধরেই নাড়া দিয়েছিল। কবি যেন মৃত্যুর করাল রূপটিকে সেই প্রথম

সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলেন। জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে শত সহস্র প্রশ্ন সেদিন ভিড় করে এসেছিল। এই আকস্মিক মৃত্যু সেদিন যে তাঁর জীবনে কত বড় বেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে "পুষ্পাঞ্জলি"তে। "জীবনস্মৃতি"র "মৃত্যুশোকে"ও কবি এই মৃত্যু যে তাঁর হৃদয়ে একটি স্থায়ী তাৎপর্য নিয়ে এসেছিল সে কথা স্বীকার করেছেন। সেই 'চব্বিশবছরের শোকে'র কথাই স্মরণ করেছেন 'লিপিকা'র 'প্রথম-শোক' রচনাটিতে। কাব্যজীবনের প্রথম পর্যায়েও 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা'র যুগ পর্যন্ত তিনি জীবনের মধ্যে মৃত্যুর এই বিধ্বংসী রূপটিকে প্রধানভাবে দেখেছেন। ২২।১০।১৮৯০এ লেখা "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি"—খসড়াতে মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই খণ্ডিত বা সীমিত বোধই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে—

…"মনে হয় আমাদের জীবন প্রকৃতির আভ্যন্তরিক কোন্ এক শক্তির ক্ষণিক চেষ্টা, ক্ষণিক উত্থান; থেকে থেকে অবিশ্রাম মাথা তুলে উঠছে, কিন্তু চারদিক থেকে অসীম জড় এবং অসীম মৃত্যু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে নির্বাপিত করে দিচ্ছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু জীবনের তুলনায় এই চিরস্থায়ী চিরনীরব মৃত্যু এই সর্বব্যাপী জড়ত্বের অবিশ্রাম অলক্ষ্য মাধ্যাকর্ষণ কী প্রবল! যেমনি জীবন শান্ত হয়ে আসে, যেমনি চেষ্টা একটু শিথিল হয়ে আসে অমনি ঝরে যেতে হয়, পড়ে যেতে হয়—অমনি হু হু করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে যেতে হয় অনন্ত ইহজগতে তার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই রকম করে মহারাক্ষস মৃত্যু জীবন গ্রাস করে চিরদিন বেঁচে রয়েছে"।[১]

মৃত্যুকে খণ্ড দৃষ্টিতে দেখার ফলে তার এই ধ্বংসের রূপটিই কবির কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবি ক্রমশঃ আপন মানসিক শক্তির বলে এই দুঃখ বেদনাকে ধীরে ধীরে জয় করে উত্তীর্ণ হয়ে যান এক পরিপূর্ণ সত্যবোধের মধ্যে। যে সত্যবোধ তাঁকে ধীরে ধীরে জীবনের মধ্যে একটি স্থায়ী সামঞ্জস্যের রূপ আবিষ্কার করবার শক্তি দিয়ে, এবং ঔপনিষদিক শিক্ষা ও সাধনায় পুষ্ট তাঁর প্রাণ, সৃষ্টির সমস্ত ক্ষণস্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জীবনের মধ্যে একটি পরিপূর্ণতার ছবি দেখতে পেয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর আপন উপলব্ধিজাত 'অধ্যাত্মবোধে'র সঙ্গে এই মৃত্যুচেতনা একটি সমন্বয় খুঁজে পেয়ে—খণ্ড দৃষ্টি খণ্ড অনুভূতির বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে অখণ্ড জীবনবোধের মধ্যে বিহার করেছিল। তাই 'নৈবেদ্যে'র (১৯০১ খ্রীঃ) যুগে এসে কবি বলতে পারলেন—

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি"—[বুধ, ২২ অক্টোবর ১৮৯০,—পৃঃ ২১৯-২২০ প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৬৭: ১৮৮২ শক]

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

['নৈবেদ্য'—১৪ সংখ্যক]

সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানবসত্তাকে স্থাপন করে একটি অখণ্ড নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখলে তবেই একথা বলা সম্ভব—'কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।' কারণ খণ্ড দৃষ্টিতে যা যায়, তা একেবারেই চলে যায়,—অখণ্ড দৃষ্টিতে সবকিছুই আছে—এই বিশ্বভুবনে এই নিখিল জীবনে বিলীন হয়ে ;—চোখে দেখতে না পেলেও হাতে ধরতে না পারলেও তা যে নেই—তা নয়।

মনের এই মানসিক প্রস্তুতি নৈবেদ্যের যুগে এসে গিয়েছিল বলেই—পরবর্তী কালের কয়েকটি প্রিয়জন বিচ্ছেদ যখন একে একে কবির জীবনে নেমে এল কবি সমস্ত বুক পেতে অসীম ধৈর্য এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেই সমস্ত দুঃখ বেদনাকে নিতে পেরেছিলেন। ১৯০২ সালে পত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু, ১৯০৩ সালে মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু, ১৯০৫ সালে (১৯ জানুয়ারী) পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯১৮ সালে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু কবিকে একে একে আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত করতে থাকে। এই সমস্ত প্রিয়জনের মৃত্যু কবিজীবনে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে—কবি একটু একটু করে কর্তব্যের স্নেহ সেবার ডালি নিয়ে তাঁদের জীবনের শেষদিনগুলিকে ভরিয়ে দিয়েছেন—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছেন উৎকণ্ঠ চিত্তে—বেদনায় হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি ছিঁড়ে যাবার মতো হয়েছে—অশ্রু প্লাবন নেমে আসতে চেয়েছে—কিন্তু ধীর সংযত স্বামীরূপে, পিতারূপে, তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁদের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। কোনো নিষ্ফল ব্যাকুলতা প্রকাশ করেননি—কোথাও উচ্ছ্বাস বাহুল্য নেই—ধীর স্থির সংযতবাক্ স্থিতধী পুরুষ—নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে বলিষ্ঠ চিত্তে নতমস্তকে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত আশ্রয় থেকে—বন্ধন থেকে তাঁকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন—বিরাট বিশ্বের সঙ্গে—মহামানবের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যেন যোগসূত্র বাঁধতে চাইলেন। আর এই একান্ত আশ্রয়টুকুকে আপন জীবন থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে—তিনি আপনাকে মিলিয়ে দিলেন বিশ্বব্যাপী বিরাট চৈতন্যের মধ্যে। কিন্তু জীবনের এই শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার সময়ে তাঁর অনুভূতিশীল মানসে যে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া, তার ইতিহাস ইতস্তত ছড়িয়ে আছে—তাঁর চিঠিপত্রে, কাব্য-কবিতায়। সেই খণ্ড বিচ্ছিন্ন

ইতিহাসের টুকরোগুলোকে জোড়া দিলেই কবিচেতনায় মৃত্যুর স্বরূপটি কিভাবে উদ্‌ঘাটিত, প্রকাশিত—তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্ত্রী মৃণালিনীদেবীর অকাল মৃত্যু তাঁর মনে কি প্রবল আঘাত হেনেছিল, এ শোক যে কত মর্মান্তিক—তার কোনো অধীর আবর্তময় অশান্ত অভিব্যক্তি নেই তাঁর কাব্যে। 'স্মরণ' নামক কাব্যগ্রন্থে তাঁর উদ্দেশে আপন হৃদয়ের প্রীতিঅর্ঘ্য এবং শূন্যজীবনের বেদনা গভীরভাবে সংযত স্বচ্ছতার রূপ নিয়ে প্রকাশিত। যাঁর স্মরণে এ গ্রন্থ লেখা তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি—শুধু একটি (৭ অগ্রহায়ণ) তারিখ, একটি সাল (১৩০৯ সাল)—কিন্তু ঐ তারিখ, ঐ সাল যে তাঁর কবিচিত্তে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে গেছে তা তো ভোলবার নয়। কিন্তু কবি ব্যক্তিগত জীবনের এই গভীর দুঃখকে বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় রেখে দেখেছেন—সেখান থেকেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন—

মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।

['স্মরণ'— ১৭ সংখ্যক ৬ পৌষ ১৩০৯]

অথবা—

ছোয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোক যজ্ঞ হুতাশনে
নবীন নির্মল মূর্তি ; ['স্মরণ'—১২ সংখ্যক]

শোক-দুঃখ-বেদনার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে—ব্যক্তিগত জীবন থেকে তাঁর 'হৃদয়লক্ষ্মী' আজ 'বিশ্বলক্ষ্মী' রূপে আবির্ভূতা ; তাঁর জীবন দিয়ে কবি-জীবনে যে তিনি কতখানি কি দিয়েছিলেন, তা তাঁর বিরহবেদনার মধ্যে দিয়েই কবি অনুভব করেছেন বেশী করে। এ যেন চোখের আড়াল হওয়ায় সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে একান্ত গোপনে অনুভব। শিল্পি-মানসের এই আত্মমুক্তিই বেদনার দুঃখ সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া পরম অমৃত অর্ঘ্য।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরে লেখা শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেনকে একখানা চিঠি থেকে কবির এই সময়কার মনোভাব খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

"ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের

অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে"।[১]

জীবনের এতবড় আঘাতকে এমন অটুট ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করার পিছনে যে মানসিক শক্তি তাঁর চিত্তে গোপনে কাজ করে গেছে, তা হোল তাঁর 'জীবন দেবতা' তথা 'বিশ্বদেবতা'র পরে অটুট বিশ্বাস। এ সম্পর্কে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

......"অন্তরে যতই আঘাত পান বাইরে তা কখনো বাবা প্রকাশ করতেন না। শমীর মৃত্যুর সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন কী শান্তভাবে বাবা তাঁর এই ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট সংবরণ করেছিলেন। এই বিষয়ে মহর্ষির মতোই তাঁর আত্মসংযম ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে যারা প্রিয় তাদের একে একে হারালেন। তাঁর জীবনব্যাপী সুতীব্র দুঃখ-তাপের মধ্যেও তিনি বিধাতার মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখতে পেরেছিলেন, সংসারের নানান অভিঘাতেও নিজেকে অবসাদ-গ্রস্ত হতে দেন নি"।[২]

আপন অন্তরের এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং মানসিক শক্তির ফলে 'মৃত্যু' সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। তাই রোমান্টিক কবিমন বা স্নেহকাতর মানবিক আত্মা যখনই চরম কোনো আঘাতে তীব্র বেদনা পেয়েছে, সেই বেদনাবোধ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর চিত্তের উদ্বোধন ঘটেছে। তাঁর 'মৃত্যুচেতনা'র ক্ষেত্রেও তাই সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব চলে। মৃত্যু সম্পর্কে একটি স্থায়ী ধারণায় পৌঁছানোর ফলে 'বলাকা'র যুগে তিনি অতি সহজদৃষ্টিতে জন্ম মৃত্যুকে দেখলেন—কি নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি—

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা ['৪৩' সং-'বলাকা']

কোনো দুঃখ-বেদনা, ভয়-ভাবনা, আশা-নৈরাশ্যই মানুষের জীবনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে পারে না; কারণ কাল সবকিছুকেই হরণ করে নেবে—মানুষ তার অহম-এর খুঁটি গেড়ে সবকিছু বুকে আঁকড়ে থাকবার যতই চেষ্টা করুক না কেন কালের বুকে সে তৃণ মাত্র। নিত্যকালীন আসা-যাওয়ার মাঝখানে ক্ষণকালীন উদ্ভবে বিলয়ে তার বাণী—

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিঠিপত্র'—দশম খণ্ড—শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেনকে লিখিত—[প্রকাশ: বিশ্ব-ভারতী ১৯৬৭—পৃঃ ১০, পত্র সংখ্যা—১১ ডিসেম্বর ১৯০২—১৮ই অগ্রঃ ১৩০৯ শান্তি]

২। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"পিতৃস্মৃতি"—[প্রকাশ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩—'দুঃখের আঘাত'—পৃঃ ৮৯]

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ,
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ। [ঐ]

সুতরাং কবি বলেন—আনন্দের গান গেয়ে অচির এই মানব জন্মকে সুখে-দুঃখে-মিলনে-বিরহে-পাওয়ায়-হারানোয় সার্থক করে চলে যেতে হবে। মানবের আত্মা তার দৈহিক এই সত্তার চেয়ে অনেক বড়—দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে—তার জরা, বার্ধক্য, রোগ-শোক দুঃখ-বেদনাকে জয় করে অমর আত্মার বিজয় ঘোষণাই সত্যকার মনুষ্যত্বের বিজয় ঘোষণা এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জগতে মর্ত্য পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ। মৃত্যুকে তাই কবি অস্বীকার করতে চান—সেই অমর আত্মার মহত্বকে প্রকাশ করে। 'পূরবী' কাব্যের 'কঙ্কাল' কবিতায় তাই কবি পশুর 'কঙ্কাল' মাঠের একপাশে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত হয়ে উঠে ভেবেছিলেন 'মানুষেরও বুঝি শেষ পরিণতি ওখানেই—ভেদ বুঝি কিছু নেই'। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে এল—

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?

উত্তরও তিনি খুঁজে পেলেন মানব আত্মার মহা-মহিমার জয় ঘোষণার মধ্যে—

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান, ['কঙ্কাল'—পূরবী]

মানুষের আছে সেই অপরিমেয় শক্তি যা দিয়ে দেহের অতীত আত্মার অমরত্বকে সে এই পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করতে পারে। মহামানবের ইতিহাসে মানব সভ্যতার জয়যাত্রায় মানবাত্মার এই মৃত্যুঞ্জয় অধিকারই পশুর থেকে তার পরিণামকে বিশিষ্ট ও সার্থক করে তুলেছে। তাই কবি ঘোষণা করলেন—

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ। [ঐ]

মানবসত্তার এই অটুট মহত্ত্বই মৃত্যুকে—তার দুঃখ-বেদনাকে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু আপন জীবনে এই স্থির বিশ্বাস এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁকে পৌঁছাতে হয়েছিল শোকের কাঁটা মাড়িয়ে মাড়িয়েই। অমিয়চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে বলছেন—

......"এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ

শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হোল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। এই শূন্যতার কুহক কোনদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তারপরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানালার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্ত রূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলচে, মানুষের ইতিহাসের রথ চলচে—বাধাবিঘ্ন বিপদ সম্পদের মধ্যে দিয়ে সে আপনার গতিবেগে আপনার পথ কাটচে—সেই পথই সৃষ্টির পথ। আমার জীবাত্মার যে যাত্রা সেও অমনিতর বিরাট—সেও ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আপনাকে এবং আপনার পথকে সৃষ্টি করচে—লোকে-লোকান্তরে, যুগে-যুগান্তরে। কোনো শোক দুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাকব না। আমরা সৃষ্টিকর্তা-আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্যে দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখবে না। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর গান ধর—বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নিরাসক্ত চিত্তে চিরজীবনের পথে অবাধে চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক"।[১]

উদ্ধৃত এই দীর্ঘ পত্রে ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যু-শোকের প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরণ সম্পর্কে কবিমনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার ছবিটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

এই আত্মসংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ—তাঁর আশী বছরের বয়সের জীবনে বহু প্রিয়-পরিজনকেই হারিয়েছিলেন। মৃত্যুচেতনা যে তাঁর মানসিকতায় একটি তত্ত্বরূপ নিয়ে দেখা দিয়ে বিশেষ ভাবের মধ্যেই কবিকে নিঃস্পৃহ করে রেখেছিল—তাও না। এক একটি মৃত্যু তার স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে এসেছে, কবি মনে আলোড়ন তুলেছে—নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে—পরে তার থেকে আত্মমুক্তিও ঘটেছে। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
'শ্রীযুক্ত অমিয়চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র'—[চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড, পত্র সংখ্যা—২, ২২ জুন ১৯১৭]

মৃত্যু সম্পর্কে এমনতরো বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কোথাও প্রিয় পরিজন—কোথাও বন্ধুবান্ধব কোথাও আপন মনের নানা ভবিষ্যৎভাবনা মৃত্যু সম্পর্কে নানা জীবন জিজ্ঞাসা এইভাবে বহু কবিতায় শিল্পায়িত। কবিরও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন আগতপ্রায় সুতরাং 'জন্ম-মৃত্যুকে মুখোমুখি' দেখে—তার সম্পর্কে কবিমনের বিশেষ অনুভবকে এই শেষ দশকের কাব্যেই স্পষ্টাক্ষরে পাওয়া যায়। আজ শুধু বেদনার অভিজ্ঞতা দিয়ে মৃত্যুকে চেনা নয়—আপন জীবন দিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে তাকে চিনে নেবার পালা। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' 'পূরবী' রাগিনীর বীণ কেমন করুণ অথচ দৃপ্ত স্বরে বেজেছে তা এই পর্যায়ের 'মৃত্যুচেতনামূলক' কবিতাগুলির আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'শেষপর্যায়ের কাব্য' যে যুগ থেকে ধরা হয়েছে—সেই 'পুনশ্চে'র যুগে কবি তাঁর জীবনে পেলেন চরম আর একটি আঘাত। তাঁর কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র নীতিন্দ্রনাথ জারমানীতে মারা গেলেন (৭ই আগস্ট, ২২ শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল)।—"দুঃখের ওপর উঠিবার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী কবি ; তাই দেখি অতি সহজভাবে প্রতিদিন 'পুনশ্চে'—এর গল্প কবিতা লিখিতেছেন। নীতুর মৃত্যু সংবাদ পান ৮ আগস্ট ; তার পর দিন হইতে আগস্ট মাস ভোর কবিতা পত্রধারা ভাষনাদি লিখিতেছেন, এমনকি 'দুইবোন' গল্পোপন্যাসের খসড়াটি করিলেন। মনের 'সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি' জ্বালাইয়াছেন"।[১] এই নানা কাজের মধ্যে কবিমন ডুবে থাকলেও বৃদ্ধবয়সে এই শোকাভিঘাত কবিকে খুবই লেগেছিল। (এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে তাঁর সন্তানদের মধ্যে তখন একমাত্র রথীন্দ্রনাথ ও মীরাদেবীই অবশিষ্ট ছিলেন এবং নীতিন্দ্রনাথ ও নন্দিতা ছাড়া পৌত্র বা পৌত্রী কেউ ছিল না)। এই মৃত্যুশোককে কেন্দ্র করে 'পুনশ্চে'র 'বিশ্বশোক' (১১ ভাদ্র, ১৩৩৯), 'মৃত্যু' (২৬ ভাদ্র ১৩৩৯) 'বীথিকা' কাব্যের 'মাতা' (৮ আগস্ট ১৯৩২) প্রভৃতি কবিতা লিখিত হয়।

'পুনশ্চে'র 'বিশ্বশোক' কবিতায় কবি বলছেন—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে-আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—[রবীন্দ্র-জীবনী—তৃতীয় খণ্ড—প্রকাশ : ২য় সংস্করণ-অগ্রহায়ণ-১৩৬৮—পৃঃ ৪৩৯—৪০]

কবি জানেন বিরাট এই বিশ্বসংসারে তাঁর ক্ষতি, তাঁর শোক 'কণার কণা'। সুতরাং একে বড়ো করে তুলে ধরলে আত্মার অবমাননাই ঘোষণা করা হয়। কবি জানেন—

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।

[বিশ্বশোক—পুনশ্চ]

সুতরাং মনের দুর্জয় তেজ ও সাহসের সঙ্গে এই ক্ষতিকে, এই ক্ষতকে, নীরবে সহ্য করতে হবে। কিন্তু ব্যথা তবু কত ভয়ঙ্কর হয়ে বাজে, তাও কবি জানেন—

চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল পাঁজরগুলো—

['বিশ্বশোক'[১]—'পুনশ্চ']

মনের এই অবস্থার মধ্যে 'মৃত্যু' ('পুনশ্চ') সম্পর্কে কবিমনে প্রশ্ন জাগে—

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।

এই প্রশ্নের জবাবও কবি দেন—

উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অনুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হ'ত,
যদি হত মহা সমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

['মৃত্যু'—'পুনশ্চ']

দেখা যাচ্ছে কবিমনের সেই বিশ্বাসই অটল। বিশ্বধারায় জন্মমৃত্যুর নৃত্যছন্দে তালের সমতা ঠিক আছেই আছে ; না হ'লে এতদিনে 'নিখিল তরণী' ডুবে যেত কোন্ অতলে।

অথচ একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ আসার পূর্ব মুহূর্তে আপন কন্যার কথা স্মরণ করে কবির ব্যথিত চিত্ত বলে ওঠে—

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ।

['দুর্ভাগিনী'—'বীথিকা' কাব্য—৬ আগস্ট ১৯৩২]

'মাতা' হিসাবে তাঁর কন্যার এই দুঃখবেদনা যে কত ভয়াবহ—কত মর্মান্তিক-এই বুকচাপা নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে বোবা কান্না যে 'স্থির সীমাহীন নৈরাশ্য' নিয়ে অবিরত প্রশ্ন করে চলেছে—'কেন, ওগো কেন'?—কেন ঈশ্বরের এই নির্মম আঘাত মানুষের বুকে! যাকে কোলে এনে দিলেন তাকেই এমনভাবে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কি—এ নিয়ে যুগে যুগে মানবচিত্তে শত সহস্র প্রশ্ন যে কাঁটার মত বিঁধে আছে, অনুভূতিশীল কবিমনে তা অজানা নেই।

'মাতা' ('বীথিকা'—৮ আগস্ট, ১৯৩২) কবিতায় কবি যেন কিছু সান্ত্বনার সুরে তাই শোনালেন—

অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ,
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।

'বীথিকা' কাব্যের 'বিরোধ' কবিতায় কবি বিশ্বসংসারেরর মধ্যে মৃত্যুরূপী এই যে 'বিরোধ'—তার মধ্যে সামঞ্জস্যের সুর এনে বললেন—

বিধাতার পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়।

সুতরাং 'এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা' তাকে লাভ করতে হলে মৃত্যুর মূল্যেই তাকে ক্রয় করতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই জীবনপথে এগিয়ে চলতে হবে—এই কবির নির্দেশ। 'মরণমাতা'র কোলে নবীন শোভমান'—সেই নবীনকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। কবি তাই মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করে বলেন—

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি ;

কারণ,

প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী

['মরণমাতা'—'বীথিকা']

জীবন ও মৃত্যুকে এই সহজভাবে গ্রহণের মধ্যে দিয়েই জীবন সমস্ত দুঃখ বেদনার গ্লানিকে কাটিয়ে কাটিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলতে পারে এবং 'চলাটাই' জীবন। মৃত্যুর উপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকলে জীবনও থেমে থাকে ; পৃথিবীও তার চলচ্ছন্দ হারিয়ে ফেলে। কবি জানেন—'এইজন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল'। (রুদ্ধগৃহ—'বিচিত্র-প্রবন্ধ'—র র. জন্মশতবার্ষিক সং '১৪' শঃ খঃ পৃঃ ৭২৩) তাই 'বিশ্বশোক' কবিতা লেখার পরদিন (১২ই ভাদ্র ১৩৩৯, ২৮ আগস্ট ১৯৩২) মীরাদেবীকে একখানি পত্রে লেখেন—

…"নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সবলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চলচে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চলব।

…ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সবকিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা।

…যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক ; আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে।

শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমি তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"[১]

একান্তভাবে ব্যক্তিগত এই চিঠিখানির মধ্যে কবির অন্তরের বেদনাবোধের তীব্রতা যেমন প্রতিভাত, তেমনি তিনি যে আপনার সীমিত জীবনের বোধ পেরিয়ে জীবনমুক্তির'ও

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র"—চতুর্থ খণ্ড—মীরাদেবীকে লিখিত—[পত্র সংখ্যা—৬৬, ২৮ আগস্ট ১৯৩২, ১২ ভাদ্র ১৩৩৯ শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৫১-১৫২-১৫৩ ॥ প্রকাশ প্রকাশ : পৌষ, ১৩৫০] ॥

সাধনা করে চলেছেন আপন কর্মে, চিন্তায়, চেষ্টায়, এবং এতেই যে বিরাট মানবাত্মার সার্থকতা—সে কথা এর অক্ষরে অক্ষরে অভিব্যক্ত। এ-তো শুধু কালি-কলমে লেখা নয়—সত্তা দিয়ে অনুভব; কর্ম দিয়ে জীবনে প্রত্যক্ষ রূপ দান। তাই 'বীথিকা' কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় কবি 'মৃত্যু'কে, 'জরা'কে অতিক্রম করে জীবনের সহজ চলার ছন্দটুকুকেই স্বীকার করে নিচ্ছেন।

'জয়ী' কবিতায় 'রূপহীন', বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ মৃত্যু যে ধরণীর বুকে মহাতৃষ্ণা নিয়ে আসন মেলেছে এবং 'তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যুর যে নিষ্ঠুর লীলাখেলা' চলেছে—ধরণীর বুকে, রবীন্দ্রনাথ তার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু মানবের শাশ্বত আত্মা আপনার জয় ঘোষণা করে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছে বলবে যুগে যুগে—

'বাধা নাহি মানি।' ['জয়ী'—'বীথিকা']

'নুটু'র (রমাদেবী) মৃত্যুতে কবি অনুভব করেন—'এত প্রিয়. এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়—একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়,[১] ('নুটু—বীথিকা) দুঃখ এই যে—

হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
তার ব্যথা কিছুই না বাজে,

['নুটু'—বীথিকা]

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনাও খুঁজে পান—

সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায়
স্তব্ধবীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি 'হায় হায়'।

['নুটু' – বীথিকা]

সুতরাং এই সমস্ত ব্যথা বেদনা মানুষের মনে সাময়িক ছায়া মাত্র। জীবনকে স্বচ্ছ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখলে দুঃখ-বেদনা-হাহাকারকে অবশ্যই অর্থহীন বলে মনে হয়।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কবি রোমান্টিক দৃষ্টিতে—কখনো বা ভাবুক কবির দৃষ্টিতে কখনো বা ব্যক্তিগত শোকাভিঘাতের বেদনাময় দৃষ্টিতে মৃত্যুকে যেন দূর থেকেই দেখে এসেছেন—তার একটি অশরীরী অবিচ্ছিন্ন রূপই যেন তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। ১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুইদিন হৃতচৈতন্য হয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। রোগের এই অতর্কিত আক্রমণের পরে পুনর্মুক্তি লাভকে কবির যেন নবজন্ম বলেই মনে হল। আর এই রোগযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে কবির যেন মৃত্যুর একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। "প্রান্তিক কাব্য সেই অভিজ্ঞতার ফসল। প্রান্তিক কাব্যের প্রেরণার মূলে এই একটি মাত্র পরম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।"[১] 'বিশ্বের আলোক

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্র-সরণী" ॥ প্রথম প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ ॥—[ষোড়শ অধ্যায়—মৃত্যুদূত এসেছিল...তব সভা হতে পৃঃ ৩১৯]

লুপ্ত তিমিরের অন্তরালে যখন মৃত্যু দূত চুপিচুপি এল—তখন 'এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্রগুলি' ছিন্ন হয়ে গেল এবং কবি নিজেকে 'মহা একা' রূপে দেখলেন। তাঁর সম্মুখে যেন—

অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।......

['৩' সং—প্রান্তিক]

কিন্তু 'হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে আরতি শঙ্খের ধ্বনি' যখন বাজল কবি জীবনের সব বেচাকেনা 'আশাপ্রত্যাশার কোলাহল' সাঙ্গ করে দিয়ে যাত্রা করলেন 'স্বপ্নের অরণ্যবীথি পারে পূর্ব-ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে'—('৪' সংখ্যক—'প্রান্তিক') এবং প্রার্থনা করলেন—

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছে হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।

['৫' সং—প্রান্তিক]

কবি মৃত্যুস্নানের দ্বারা আপন আত্মাকে ধৌত করে নেন এবং এই জীবনের দুঃখ সুখের লীলাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন—'মুক্তি যে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের আত্ম-অস্বীকারে' নয়—(৬ সংখ্যক—'প্রান্তিক') মুক্তি যে 'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে'—তা তিনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বুঝলেন। তাই, আজ দীপ্ত কণ্ঠে বলেন—'ধন্য এ জীবন মোর'—'দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে ব্যথার বাঁশির সুরে' (৭ সংখ্যক—প্রান্তিক)—সেই বিজয় দীপ্ত কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়—

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

['৭' সংখ্যক—'প্রান্তিক']

এই মৃত্যুবিজয়ী জ্যোতির্ময় আত্মার মুক্ত-স্বচ্ছ-উদার নিরাসক্ত জীবন-সাধনাই পরবর্তী কালের কাব্যগুলিকে দীপ্তিমান করে তুলেছে। চেতন-অবচেতনের মধ্যবর্তী আলোআঁধারের বিভ্রম কাটিয়ে মৃত্যুস্নানে শুচিশুভ্র হয়ে আজ কবির এক মুক্ত আত্মার সঙ্গে যেন পরিচয় ঘটে গেল। "মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়া যত নিকটে আসিয়াছে দেহগত দুঃখ তপস্যা জীবনকে তত বেশি জ্যোতিষ্মান তত বেশি দীপ্তিমান করিয়াছে, ততই কবি প্রাণকে বেশি করিয়া

আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন এবং প্রাণশিল্পী কবি তপস্যার আনন্দকে মানবের অপরাজেয় শক্তি ও মহিমাকে জাগ্রত জীবনকে বেশি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।"[১]

"প্রান্তিকে"র ভাবচেতনায় কবির যে স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের ক্ষেত্রে আত্মমুক্তি ঘটলো পরবর্তী কালের 'সেঁজুতি', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা' সেই আনন্দময় সত্তার একটি সর্বব্যাপী 'দেখা'র ধ্যানে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "সত্তার আনন্দময় আকুতি একেবারে যেন দ্রষ্টা ঋষিদের আনন্দস্তর স্পর্শ করিয়াছে কিন্তু কবির আনন্দ দেখার আনন্দ, তাঁহার বাণীও দেখারই বাণী। সেই দেখাই কবির ধ্যান। এবং সেই ধ্যানের দৃষ্টিই সমগ্র সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবন দৃশ্যের উপর প্রসারিত হইয়া আছে"।[২]

তাই আপন জীবনে মৃত্যুর যে ধীর সঞ্চারী আবির্ভাব তাকে কবি সুন্দরভাবেই আলিঙ্গন করে নিতে চান—

……আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম

* * *

এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

['জন্মদিন'—'সেঁজুতি']

'যাবার মুখে' ('সেঁজুতি') তাই সহজ ভাবেই সেই 'প্রণত সুন্দর অবসান'কে বরণ করে নেন—

যায় যদি তবে যাক
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।

কবি আজ নিজেকে 'চলাচল'এর ('সেঁজুতি') পথের ধারের মানুষ হিসেবে দেখছেন—

ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের ;
ওরা কাজে চলছে ছুটে, তুমি কাজের পারের।

* * *

তুমি শান্ত হাসি হাস যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাবে।

১। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' [৫ম সং—২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯—কাব্য প্রবাহ-চোদ্দ-পৃঃ ২৩৩]
২। ঐ ঐ ঐ [পৃঃ ২৩৪]

শেষদিনের জন্য কবির এই মানসিক প্রস্তুতি একটা সৌম্য বিষাদের সুরকে বহন করে অতি মনোরম হয়ে উঠেছে। —কবি যেন আজ জীবন থেকে একটা মহা 'ছুটি'র দেশের ঠিকানার উদ্দেশে যাত্রা করছেন—

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে—ছুটির মহাদেশ।

['ছুটি'—'সেঁজুতি']

মনের এই রকম উদাস বৈরাগ্যের ভাবের মধ্যে মুক্তি ঘটায় বাইরের কলকোলাহল এবং ব্যক্তিগত জীবনের আঘাত বা দুঃখ-বেদনা তাঁকে ব্যথিত করলেও পঙ্গু করে ফেলতে পারে না। ২৩।৪।৪০ তারিখে 'মংপু'তে বাসকালে 'শেষ অভিসার' ('সানাই') কবিতাটি লেখেন। মংপুর পর কবি কালিম্পঙ আসেন। সেখানে "সুরেন্দ্রনাথের ও কালীমোহনের মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে ব্যথিত করে নিঃসন্দেহেই; কিন্তু এ শ্রেণীর আঘাতে তিনি আযৌবন অভ্যস্ত, তাই মৃত্যুর আঘাত তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করে না, তিনি আপনার জগতে আপনি আছেন। শুরু করিয়াছেন এবার 'খুচরো কবিতা লিখতে'। এখনকার অনেক কবিতা তাঁহার ভাষায় 'দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ'। আপন জীবনের মধ্যে যে-সব দুর্যোগ ঘটিতেছে কী দৈহিক, কী মানসিক—সেগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে ঠেলিয়া দিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছেন আপনার সৃষ্টি সাধনায় তেমনি সমসাময়িক জাগতিক ব্যাপারের দুষ্কৃতকারীদের স্পর্ধাকে তিরস্কৃত করিতেছেন কাব্য মাধ্যমে"।[১] "সানাই" কাব্যের 'কর্ণধার' কবিতায় জীবনের 'কর্ণধার'কে বলছেন—

বক্ষে যবে বাজে মরণ ভেরি
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
ঊর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।

এই 'অন্তিম যাত্রা'র পথ যতই 'অসীম অন্ধকারে' ঢাকা হোক না কেন—কবি জানেন—

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,

['রোগশয্যায়'—২ সং]

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র-জীবনী—[৪র্থ খণ্ড ॥ প্রকাশ : ১৩৬৩ শ্রাবণ ॥ পৃঃ ২১৪]

প্রাণের এই মহিমাকেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করে যেতে হবে। মানবমনের অফুরন্ত ভালবাসাই পারে জীবনের সব দেনা মৃত্যুর কাছে শোধ করে দিয়ে অম্লান সত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে—

এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

['রোগশয্যায়'—'২৬, সং]

তাই কবি স্পষ্টভাবে এবং একান্তভাবে আজ উপলব্ধি করেন—

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়,
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,

['রোগশয্যায়'—'২৮' সং.]

'ধুসর গোধূলি লগ্নে' কবি আজ দেখতে পান—

মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,

['রোগশয্যায়—'৩৭' সং]

'আরোগ্য' কাব্যে তাই মুক্তিস্নান করে বলেন—

দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।

['আরোগ্য'—'২৯' সং]

দুঃখ বিজয়ী এই অমর চৈতন্য সত্তা উদাত্ত কণ্ঠে তাই ঘোষণা করে—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। ['শেষ লেখা'—২ সং]

কবি এও জানেন—

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' [১৪ সং—শেষলেখা]

তাঁর দ্বারে এসেছে—

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

['শেষলেখা'-১৪ সং]

মানুষের জড় জীবনের পরাভব ঘটতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই—কোনো 'ছলনাতেই' অমর আত্মার পরাজয়কে স্বীকার করে নেবেন না। মানব আত্মার মহিমা দুঃখ-সুখ আশা-নিরাশা জয়-পরাজয়ের সমস্ত দ্বন্দ্বাভিঘাত পার হয়ে, আপন শাশ্বত রূপটিকে অগ্নিস্নানে শুচি শুভ্র জ্যোতিষ্মান সুন্দর করে প্রকাশ করবে, এইটেই চিরমানবের—মহামানবের সাধনা। কবি তাই একটি—শান্ত-সমাহিত 'প্রণত-সুন্দর অবসানকে'ই (২৬ সং-জন্মদিনে) আকাঙ্ক্ষা করেন—

শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।

[আরোগ্য'-৩১ সং]

কবি যাত্রার শেষ মুহূর্তে 'স্মরণ সভার সমারোহ' চান না—কিন্তু 'অন্তিম অনুষ্ঠানে' 'উৎসবদীপ নিভায়ে' যেন 'দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায়' অসম্মানও ঘটানো না হয়—

তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

['২৯' সং—জন্মদিনে]

এ সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর উক্তিকে স্মরণ করা যায়—"বাবামশায়ের মনে-মনে তাঁর অবসানের একটি কাল্পনিক ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের কথাও তিনি বলতেন। যেমন করে ফুল পাতা খসে পড়ে, বৃদ্ধ গাছটি যেমন করে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসে, তিনি ভেবেছিলেন তেমনি করে একদিন প্রকৃতির কোলে ঝরে পড়বেন। সেই হোত কবির যথার্থ স্বাভাবিক অবসান—

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথ বৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল কিছু-মাঝে। ['জন্মদিনে'-১২ সং]

প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর ঐক্য-অনুভূতি ক্রমে ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছিল তাঁর মধ্যে"।[১]

সমস্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আপন সত্তার যে ঐক্যানুভূতিকে কবি কল্পনা করে, অনুভব করে, তাদের সঙ্গে একাত্মতার বোধে তন্ময় হয়ে থাকতেন—একটি স্বাভাবিক প্রণত সুন্দর অবসানই সেই মহান আত্মার অন্তিম যাত্রায় শান্ত-সুন্দর প্রশান্ত আবেশটুকুকে বিছিয়ে দেবে সমগ্র জীবনের পরে—এটাই তো সার্থক জয়যাত্রার কল্পনা। কবি তাই উদাস শান্ত অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই প্রার্থনা করেন—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

['১' সং-শেষলেখা]

জীবনের সমস্ত কর্মযজ্ঞকে আপন শক্তি অনুসারে, সাধ্য অনুসারে, সুন্দরভাবে সমাধা করে আজ 'শান্তি সমুদ্রে'র উদ্দেশ্যে তরী বেয়ে চলে যাবেন অনন্ত পারাবারের উদ্দেশে; 'অসীমের মাঝে ধ্রুবতারকার জ্যোতি' তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এই তো সার্থক সম্পূর্ণ একটি জীবনের একান্ত কামনা। কিন্তু ঐ গানটি নাটকের জন্য লেখা যদিও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের অবিরোধী।

একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে মৃত্যুর এবং মৃত্যুর ছায়ায় জীবনের যে চরম তাৎপর্য যে নির্মম স্বরূপ দেখলেন—যাতে সুখ নেই, দুঃখ নেই—কী আছে মানুষের ভাষায় বলা যায় না—অপরাজেয় আত্মার মুক্তিই বটে—তার নিরলংকার অতর্কনীয় বাক্‌প্রতিমা রচিত হল কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তিম তিনটি কবিতায় (এক্ষেত্রে কবি যে কবিতা লিখছেন তাও বলা যায় কি ?) তার শেষ কথা যতদূর সম্ভব সহজ ভাবেই উচ্চারণ করছেন কিন্তু যেহেতু তিনি নিত্যসিদ্ধ কবি সেজন্যই তার এ উচ্চারণও ছন্দোময়-রূপময়, যেটুকু বাদ দেওয়া যায় না—যা তার স্বাভাবিক ভাষা—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে— ['শেষলেখা'—১৩ সং]

সেই প্রশ্নের জবাব কবি সমস্ত জীবনভোর দেবার চেষ্টা করেছেন—

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে'
তার দ্বারে এসেছে — ['শেষলেখা-১৪ সং]

১। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর—'নির্বাণ' [সং—কার্তিক—১৩৬২ পৃঃ ৫৮]

কিন্তু কবি 'ছলনাময়ী'র কোন ছলনাতেই ভোলেন নি—'সত্য' কে তিনি—

আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে

['শেষলেখা'—১৫ সং]

অনুভব করেছেন; এই বাণীই মহান বিজয়ী আত্মার মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শেষ ঘোষণা। —একে তাঁর 'last will and testament' ও বলা যায় বোধ হয়।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের অপরাজেয় মহিমাকে ঘোষণা করায়, মৃত্যুও সহজ স্বাভাবিক প্রণত সুন্দর অবসান রূপে মহিমময় হয়ে উঠ্‌লো।

কবির 'মৃত্যুচেতনা'ও তাই এই প্রণত, সুন্দর, অবসানের রূপ-কল্পনায় পরিপূর্ণ প্রশান্তির রূপ নিয়ে এসেছে—সে জীবনের বিরোধ নয়—বিচ্ছেদ তো নয়ই, 'সমগ্রের রূঢ় প্রতিবাদ'ও নয়—একান্ত স্বাভাবিক সঙ্গত-শান্তিময় পরিণাম।

'ভাবসম্পদে'র দিক থেকে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' বহুমুখী জীবনচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়—যা কবির চিন্তা এবং চেতনা, মনন ও জীবনদর্শনকে, তত্ত্ব ও তথ্যের আধারে বিচিত্রভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছে। এই সমস্ত কবিতার বিচিত্র জীবন চেতনা থেকে কবির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা লাভ করি—যার থেকে কাব্যরস আস্বাদন করেও আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে চিনতে ও বুঝতে পারি। কাব্যের ভিতর দিয়ে কবিকে জানারও একটা অপূর্ব আনন্দ আছে—কবিও নিজেকে চিনিয়েছেন নানা ভাবে—আপনার জীবন পরিচয়টিকে বিচিত্র উপাদানে থরে থরে সজ্জিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

শেষপর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে এ রকম বহু কবিতা ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে যাকে কবির 'অতীত স্মৃতিচারণ' বলা চলতে পারে। এ-সমস্ত জীবন ইতিহাস 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', 'আত্মপরিচয়' 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা ভাবে পরিবেশিত। এই 'অতীত স্মৃতিচারণ' 'শেষপর্যায়ের কাব্য'গুলির একটি অমূল্য সম্পদ। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'বীথিকা' 'শ্যামলী', 'ছড়ার ছবি', 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা'—প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে এই সমস্ত অতীত স্মৃতিপাথেয়গুলি। 'চতুর্থ অধ্যায়ে'—'ভাবসম্পদে'র সেই বিশেষ সম্পদটিকে নিয়ে একটি রসগ্রাহী আলোচনা করার চেষ্টা।

কবির বাল্য জীবন-ইতিহাস আর পাঁচটা বালকের তুলনায় অনেকাংশে স্বতন্ত্র, পবিবেশগত দিক থেকে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি কবির ব্যক্তিগত অনুভাবনায় তারা একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় মহীয়ান্। এই কবি-শিশুর আবাল্যের মানস-পরিক্রমা কেমন বিচিত্র রঙে-রসে রঞ্জিত এবং রসায়িত হয়ে উঠে সর্বকালের পাঠক হৃদয়ে আনন্দ দান করতে পারে—তা এই সমস্ত স্মৃতিচারণমূলক কবিতাগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। যে শৈশবকে আমরা জীবনের পশ্চাতে ফেলে আসি. দীর্ঘ জীবন শেষে তার দিকে যখন আমরা পিছু ফিরে তাকাই—তখন তার প্রতি একটা মোহ, একটু মমত্ববোধ, আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক—কবির কাছে এ তো তুচ্ছ নয়ই ;—কারণ আপন হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে তিনি একে রচনা করে নিয়েছেন অ-লৌকিক কার্য-কারণ সূত্রে গেঁথে। তার মধ্যে 'অবিকল নকল' যতটা না থাক 'ছবি' আছে—এই ছবিটিই তো কবি-শিল্পীকে আমাদের

কাছে স্পষ্ট করে তুলবে তার নিজস্ব রঙে রাঙিয়ে দিয়ে। সেই শিশু কবিকেই আমরা নানা রূপে, নানাভাবে দেখতে পাই, 'শেষপর্যায়ে'র অনেকগুলি 'স্মৃতিচারণ'মূলক কবিতায়। ,

"জীবনস্মৃতি"র* সূচনায় (ভূমিকা-পৃঃ ৫) কবি বলেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।—কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহাকিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" তাঁর 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র বহু কবিতায়ও শৈশবের এই স্মৃতিকে কেন্দ্র করে ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-চিত্রে নিপুণ শিল্পীর মতো ছবি এঁকে চলেছেন।

বার্ধক্যে রোগজীর্ণ কবি পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলায় একবার পিছু ফিরে দেখে নেন এ জন্মের সমস্তটা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিক থেকে কবি যেমন শক্তি সামর্থ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন—মনের দিক থেকেও একটা অনিবার্য দুর্বলতা অনুভব করেছেন। বৃদ্ধ কবি এই কিশোর বয়সের স্মৃতিকে স্মরণ করেই বলেছিলেন—

…"পারিস তোরা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে আমার সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলি—যেখানে কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, মহা আনন্দে দিনগুলো কাটিয়ে দিতুম তবে"[১] (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ শ্যামলী-দুপুর)। দেহমনের নূতন কিছু সঞ্চয় অপেক্ষা পুরাতন স্মৃতি রোমন্থনই এ-সময়ে কবিমনের যেন একটি প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষতঃ যাবার বেলা বুকের কাছে যে বীণ বাজে—সে বীণ তো অনেকদিনের অনেক হারিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট সুরকে খুঁজে বেড়ায়। স্মৃতি সমুদ্রের অতল তলদেশ থেকে ডুব দিয়ে মুক্তা খুঁজে আনে। বিস্মৃতির গহন থেকে কুড়িয়ে আনা এই সমস্ত স্মৃতির কণিকাগুলি মণিমুক্তোর মতোই মহামূল্যবান। বিদায়ের বেদনা-বিধুর চোখের জলে অভিস্নাত হয়ে তারা চিক্‌মিক্ করে ওঠে।

এই জাতীয় অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই বালক কবির শৈশবের নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা,—আপন মনের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা যেমন ছড়িয়ে আছে—তেমনি শিশু ও

* "রবীন্দ্র-রচনাবলী" জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের দশমখণ্ডের অন্তর্গত 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থখানি ৪র্থ অধ্যায়ে অনুসৃত এবং তদনুসারে পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লিখিত।

১। শ্রীমতী রানী চন্দ্র—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ [১ম সং—পৃঃ ৪৯]

কিশোর কবির হৃদয়রাজ্যকে জয় করেছিলেন যে মহিয়সী নারী তাঁর অযাচিত স্নেহ, প্রেমের দাক্ষিণ্যে—তাঁর প্রতি কাব্য-অর্ঘ্য নিবেদনও একটা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে।

জীবনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবি শৈশবের সেই ফেলে আসা অনাদৃত অবহেলিত দিনগুলি বা জীবনটার কথা বার বার মনে করেছেন, স্মরণ করেছেন। ছেলেবেলার দুষ্টুমি, অপরাধ, চিন্তা, ন্যায়-অন্যায়বোধ—অন্যের চোখে যেমন—কবির বার্ধক্যেও তারা ঠিক তেমন নয়। 'পুনশ্চে'র 'বালক', 'উন্নতি'; 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'বত্রিশ', 'তেতাল্লিশ', 'চেচল্লিশ' সংখ্যক; 'ছড়ার ছবি'র 'আকাশ', 'আতারবিচি'; 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'যাত্রাপথ', স্কুলপালানে', 'ধ্বনি', 'জল'; 'জন্মদিনে'র 'উনিশ' সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় বালকবেলার নানা 'স্মৃতিরে আকার দিয়ে' আঁকতে চেয়েছেন। "বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে ঘুরিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষ মাত্রেরই মধ্যে দেখা দেয়, কবির শেষ জীবনে সেটি খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে।···কবি জীবনের শেষ কয় বৎসর সংকীর্ণ বাল্যজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ঘিরিয়া সাহিত্য নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে। এই স্মৃতির কেন্দ্রে অনেকখানি ছিলেন বউঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী"।[১]

'পুনশ্চে'র পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পরিশেষে'র 'বালক' কবিতাটিতে শৈশবের অতি প্রিয় স্মৃতিকথা স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছে—

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।

সেদিনের কবি-শিশুর একমাত্র আনন্দ ছিল উদাসী মনকে কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে ধাবিত করায়—

সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া-দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।

['পরিশেষ'-'বালক']

১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র জীবনী"—চতুর্থ খণ্ড। প্রঃ ১৩৬৩ শ্রাবণ—পৃঃ ১১৬ ১১'

'ছড়ারছবি'র 'আকাশ' কবিতায়ও এই স্মৃতিচারণ—

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তৃপ্ত ছিল। পুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনারবরণ ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।

'জীবনস্মৃতি'র কবি এই ছবিই অন্যভাবে এঁকে গেছেন— ..." তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম।...সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ঐ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদেব বাড়ির ভিতরের বাগান প্রান্তের নারিকেল শ্রেণী ,"—('ঘর ও বাহির'—পৃঃ ১১)।

"ছেলেবেলা"* গ্রন্থে এই স্মৃতিচারণ আবার ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে—

"আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। · আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুরবেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে"। (পৃঃ ১৪৮)

"জন্মদিনে"র কবি শৈশবের অন্য একটি মধুর স্মৃতিকে রূপ দেন 'উনিশ' সংখ্যক কবিতায়—

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি-দোতলার'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত -
দিন আর রাত

*"রবীন্দ্র-রচনাবলী" জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের দশম খণ্ডের অন্তর্গত 'ছেলেবেলা' গ্রন্থখানি ৪র্থ অধ্যায়ে অনুসৃত এবং তদনুসারে পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লিখিত।

আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,

* * *

বয়স—অতীত সেই বালকের মন
নিখিল প্রাণের পেত নাড়া,
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া,
তাকায়ে রহিত দূরে।

পদ্মাপারের নীলকুঠির এই সুমধুর স্মৃতি "ছেলেবেলা" (পৃঃ ১৫৩) গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে—

"পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ।...একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড় ঢালা ছাদ তত বড় ফলাও' আমার ছুটি। অজানা ভিন্ দেশের ছুটি, পুরোনো দীঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই।'

এই পদ্মানদীর স্মৃতি যে কবিমনের অনেকখানি অংশ অধিকার করে ছিল বার্ধক্যে, 'ছড়ারছবি' কাব্যের 'পদ্মায়' কবিতা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
জানিনে মন কেমন করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা।

'পুনশ্চে'র 'বালক' কবিতায় কবি হিরণ মাসির বোনপোর কথা বলতে বলতে নিজেরই বালককালের কথা অতি স্পষ্টাক্ষরে গল্প করে বলে গেছেন। এই অতীত কালের ফেলে আসা ইতিহাসের মধ্যে শিশুমনের কত রুদ্ধ বেদনা—কত ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কত আকাশ-কুসুম রচনা কত ছেলেমানুষিই না ছড়িয়ে আছে। সেই গা-খোলা ছেলের দলে কবি দিনের শেষে আর একবার স্মৃতির দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মিশে যেতে চেয়েছেন। যেখানে তার—

…জন্মেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মিলল না আমার জায়গা।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির কোণের ঘরে;
বাইরে যাওয়া মানা।

তাই— ['পুনশ্চ'—'বালক']

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।

['পুনশ্চ'—'বালক']

এ বেদনা কবির মন থেকে কোনদিনই মুছে যায় নি। ছোটবেলার সেই 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র শাসন, সেই বাঁধন কবির শিশুমনকে বাইরের দিক থেকে করেছে পীড়ন—তাই জানালার ফাঁক দিয়ে, খোলা বারান্দা অথবা আকাশ দিয়ে তাঁর খেলা ছিল—

শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দুর বাড়ীর রোদ-পোহানো ছাদে।

['পুনশ্চ'—'বালক']

'জীবনস্মৃতি'র "ঘর ও বাহির" (পৃঃ ১১) নামক রচনাংশটির এক স্থানের বর্ণনার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল—

"বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"

এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে কবির প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ। বোধকরি এই বাধার মধ্যে দিয়ে প্রথম সাক্ষাৎ বলেই কাছে পেয়ে তাকে সমস্ত দেহমন দিয়ে তার শেষ রসমাধুর্যটুকু কবি আজীবন গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

কবি শৈশবে স্কুলের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতেন—তাছাড়া মাস্টারমশাইদের পড়ানোর যে পদ্ধতি তাকেও কবি ঠিক শিশুমনের উপযোগী বলে কোনদিনই মনে করেননি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও কৌতুক করতে তিনি ছাড়েন নি। তাঁর অনেক রচনাই তার প্রমাণ দেয়। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আপন বালকবেলার এই সমস্ত স্মৃতিকথাকে স্মরণ করেই বলেছিলেন…"ছেলেবেলায় স্কুল পালাবার জন্যে কার্তিক মাসের হিমে সারারাত বাইরে পড়ে থাকতুম, কাপড় চোপড় ভিজে জবজবে হয়ে যেত। দিনে দশবার করে জুতোসুদ্ধ পা ভিজিয়ে রাখতুম, যদি কোনো রকমে সর্দি কাশি হয় স্কুল পালাতে পারব" (৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯)।[১] "জীবনস্মৃতি" এবং "ছেলেবেলা"র পাতায়ও কবির শৈশবের এই স্কুল জীবন এবং পাঠগ্রহণের নানা কৌতুককর চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পুনশ্চে'র 'উন্নতি' এবং 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'স্কুল পালানে' কবিতা দুটিতে সেই স্মৃতিচিত্রকেই পুনরায় মুখরিত করে তোলেন। 'উন্নতি' কবিতায়—

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হ'ত ইংলিশ রীডার।
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা।
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হ'ত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।

'জীবনস্মৃতি'র 'নানাবিদ্যার আয়োজন' এবং 'প্রভাতসংগীত' রচনাংশের সঙ্গে এই 'উন্নতি' অথবা 'স্কুলপালানে' কবিতা দুটির ভাবানুসঙ্গে আশ্চর্যরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়—

"তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষ জন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া (পৃঃ ২১)।

[১] শ্রীমতী রাণী চন্দ—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"—[১ম সং—পৃঃ ৪৯]

··প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের দেউড়িতেই থাকে—থাকে সার বাঁধা, সিলেবল-ফাঁক করা বানানগুলো অ্যাকসেণ্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপাল বধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না" (পৃঃ ২৩-২৪)।

"ছেলেবেলা"র কাহিনীতেও একে বেশ সুন্দর করে চিত্রায়িত করেছেন—

"দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়িধরা সময় ছিল নিরেট; এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না।····এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি করে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায়; আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত হয় না" (পৃঃ ১৪৫)।

তাই কবির শিশুমন যেন এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতো—

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ-মণ্ডলে'।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বলতেম 'দেখ্ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বার বার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত। ['পুনশ্চ'—'উন্নতি']

"জীবনস্মৃতি"র 'নর্মাল স্কুল' নামক রচনার প্রথমাংশে (পৃঃ ১৮) একেই অন্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার

একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাশ খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম"।

একেই রসিকতা করে 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'স্কুলপালানে' কবিতায় অন্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা—

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।

"ছেলেবেলা" গ্রন্থে এই স্কুলপালানো সম্বন্ধেই বলছেন—

"এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়। আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানা ঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল, তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন" (পৃঃ ১৬১)।

অথচ বাগানের গাছপালার সঙ্গে শিশু-কবির একাত্মতা। প্রাণের এই আদিম রহস্যকে জানবার জন্য শিশু চিত্ত—

শুধু তার তলে
সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম :
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,

[আকাশপ্রদীপ-স্কুলপালানে]

"জীবনস্মৃতি"র 'প্রভাতসংগীত' (পৃঃ ১০৪) রচনাংশের সঙ্গে এই স্মৃতিচিত্রটির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়—

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ

ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবা মাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়া-পথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া যাইত"।

অথচ এই স্কুলপালানো নিয়ে কবি যতই কৌতুক করুন না কেন—পড়াশুনায় তাঁর যে আলস্য ছিল না—বরং বুঝুন আর নাই বুঝুন যে কোনো বই পড়বার একটা অদম্য উৎসাহ যে তাঁর শৈশব থেকেই ছিল, তার প্রমাণও নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। আকাশ-প্রদীপের 'যাত্রাপথ' কবিতা শৈশব জীবনের এই পড়ুয়া মূর্তিকেই বহন করছে—

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে;
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।

* * *

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।

* * *

মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে।

কবি ছেলেবেলা থেকেই বুঝুন আর নাই বুঝুন নানা পাঠ্য অপাঠ্য বই যে ঝোঁকের মাথায় পড়ে যেতেন, সে-কথা 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘরের পড়া'র (পৃঃ ৫৪) নানা বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়—

"আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"...

দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' কবি সেই বয়সেই কেমন সুকৌশলে চুরি করে পড়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, 'জীবনস্মৃতি'তে। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'অবোধবন্ধু' "ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। ...অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।...শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল...বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত" ('ঘরের পড়া'-পৃঃ ৫৫-৫৬)।

'পুনশ্চে'র গল্পবলা ঢঙটির মধ্যে দিয়ে বালকবেলার স্মৃতিকথা মুখর হয়ে উঠেছে 'শেষসপ্তক' কাব্যেও। 'বত্রিশ' সংখ্যক কবিতা কবির বাল্যস্মৃতির কোনো এক গল্প শোনা সন্ধ্যাবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।

* * *

ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।

"ছেলেবেলা"য় (॥ ৬ ॥ পৃঃ ১৪১) এই গল্পশোনা সন্ধ্যাবেলার বর্ণনা আছে গদ্যভঙ্গিতে—

"ছুটির রবিবার।

আগের সন্ধ্যেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের ছায়া-ঢাকা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক্‌ধুক্‌"।

"জীবনস্মৃতি"র ('ভৃত্যরাজকতন্ত্র'-পৃঃ ১৬-১৭) নিম্নলিখিত রচনাংশের সঙ্গে এর কিছু কিছু মিল আছে—

"এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিক্‌টিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম"।

তারপর রঘুডাকাতের গল্পও মিলিয়ে যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আজ আর এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কারণ—

তারপরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর
রূপকথা শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

['শেষসপ্তক'—'বত্রিশ' সং]

এই শৈশব জীবনেরই অপর একটি ছবি 'উনিশ' ('শেষসপ্তক') সংখ্যকে—

তখন বয়স ছিল কাঁচা,
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার
জিন নেই, লাগাম নেই,

"জন্মদিনে"র "উনিশ" সংখ্যক কবিতায়ও এই চিত্রের আভাস মেলে—

টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।

"ছেলেবেলা"র (পৃঃ ১৫৪) একস্থানের বর্ণনায় এই স্মৃতিচিত্রেরই মিল খুঁজে পাওয়া যায়—

"শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে"।

"জন্মদিনে"র "উনিশ" সংখ্যক কবিতাটির একেবারে পুরোপুরি গদ্যরূপ বর্ণিত হয়েছে "ছেলেবেলা" গ্রন্থে। ঐ কবিতায় খেয়ালী শিশুমনের বিচিত্র রূপালেখ্য—

জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত সে লেখার যশ

আপন মর্মের মাঝে রয়েছে রঙিন
বাহিরের করতালিহীন।

"ছেলেবেলা"য় (পৃঃ ১৫৫) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কৌতুককর বর্ণনা আছে—

"শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে। টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় তা কলমের মুখে উঠতে চায় না"।

"ছড়ারছবি" কাব্যগ্রন্থের 'আতারবিচি' কবিতায়ও শিশুমনের এইরকম খেয়ালী কল্পনার সুন্দর বর্ণনা আছে—

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল,
দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।

"ছেলেবেলা"র (পৃঃ ১৪৫-৪৬) এক স্থানের বর্ণনাও এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়—

"বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে তা দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটেনি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে"।

কিন্তু যে শিশুমন সেদিন এই খেয়ালী খেলায় মাত্‌তো তার—

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা, আধজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে;
['শেষসপ্তক'--উনিশ সং]

কিন্তু আজ জীবনের গোধূলি বেলায় তারা স্বপ্ন! কেননা—

এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের মালখানা। [ঐ]

তাই 'অমিয় চক্রবর্তী'কে "তেতাল্লিশ" সংখ্যকে বলছেন—

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখিনে ধুলোর 'পরে।

এইভাবে জীবনের শেষ ঘাটে দাঁড়িয়ে কবি আপন স্বরূপের সূক্ষ্ম মানস বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এই আত্মবিশ্লেষণ করতে করতেই, শিশুকবির মনে, যে অলক্ষ্য 'ধ্বনি' ('আকাশপ্রদীপ') ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো কিভাবে—সেকথা সুন্দর করে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অতি শৈশবেই কবির হৃদয়বীণার সূক্ষ্ম তারগুলি বিশ্বজগতের রূপ-রস ধ্বনির প্রচ্ছন্ন সুরটিকে ধরতে পারতো—আর পাঁচজনের কাছে যা ছিল দুর্বোধ্য। কবি তাই আত্মবিশ্লেষণ করে বলেন—

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।

শেষ বয়সের একখানি চিঠিতেও এই শৈশব স্মৃতি তাঁকে নাড়া দিয়েছে—

..."আমার সেই সব ছেলেবেলাকার নির্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি করে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে"।[১]

১। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র—[চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড, পত্র সংখ্যা—২৪, ৮ই আগষ্ট ১৯২৩—পৃষ্ঠা ৩৪—৩৫]

"জীবনস্মৃতি"র 'ঘর ও বাহির' (পৃঃ ১৩-১৪) অংশে শিশুমনের এই রহস্যময়তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কী আছে বলো দেখি"। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।"

'ধ্বনি' (আকাশপ্রদীপ) কবিতায় বহুকাল পরে অন্যভাবে রূপ দেবার চেষ্টা ঠিক এই স্মৃতিকেই—

বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।

'ধরাতলে চঞ্চলতা সব-আগে' যে 'নেমেছিল জলে' তা নিয়েও কবির কম বিস্ময় ছিল না শৈশবে। "জীবনস্মৃতি"তেও ('ঘর ও বাহির'—পৃঃ ১০) তার পরিচয় আছে—

"জানালার নিচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম"।

"আকাশপ্রদীপ" কাব্যের 'জল' কবিতায় এই স্মৃতিকে স্মরণ করেই বলছেন—

উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।

* * *

একদিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোক ছায়ায় আলাপন,
অন্যদিকে দূরনিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে

অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।
সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায় ;

কিন্তু এইভাবে কবি-শিশুর শৈশবের স্মৃতিচিত্র আঁকতে আঁকতে এই বার্ধক্যের শেষ আশা-আকাঙ্ক্ষার রেশটুকুকেও যে তিনি বাদ দিতে পারেন নি—তার পরিচয় 'পরিশেষ' কাব্যের 'সাথী' এবং 'শেষসপ্তক' কাব্যের 'ছেচল্লিশ' সংখ্যক কবিতায় আছে। শেষসপ্তক কাব্যের 'ছেচল্লিশ' সংখ্যক কবিতায় কবির শৈশব-যৌবন বার্ধক্যকে ঘিরে কর্মময় জীবনের যে ইতিহাস তার সঙ্গে কবির শিল্পিমনের রোমান্টিক জীবনবোধ একত্রিত হয়ে সূক্ষ্মরূপে ধরা পড়েছে। "জীবনস্মৃতি"র ('ঘরও বাহির'—পৃঃ ১৩) মধ্যে কবি যে আত্মপরিচয় দেন—

"বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত"।

একেই গদ্যকবিতার ভাবে প্রকাশ করেছেন

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরেরবেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
* * *
বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।
["শেষসপ্তক"—'ছেচল্লিশ']

কবি-শিশুর নূতন আনন্দে বিশ্বকে চোখ মেলে দেখার স্বপ্নময় রোমান্টিক কৈশোর জীবনে—

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।

যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত

* * *

আগেকার দিনের কোন চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে [ঐ]

এই সমস্ত চরণে প্রোদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে রোমান্টিক কবিমনের স্বপ্ন-সঞ্চরণ। এ বর্ণনা "জীবনস্মৃতি"র ('ঘর ও বাহির'-পৃঃ ১৪) কথাকেই স্মরণ করায়—

"তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনো মতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না"।

এই কবি-বালকের—

তারপরে বয়স হোল
কাজের দায় চাপল মাথার পরে
দিনের পর দিন তখন হল ঠাসাঠাসি। [ঐ]

যৌবনের কর্মচঞ্চল দিনগুলির এমন স্পষ্ট স্বচ্ছ ইঙ্গিত কাব্য মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কর্মচক্রের অক্লান্ত নিষ্পেষণকে বোঝাতে গিয়ে কবি যে 'প্রয়োজনের শিকলে বাঁধা' বন্দী জীবনের কথা বলেছেন তার থেকে—

আজ নেব মুক্তি।

* * *

যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

["শেষসপ্তক"—'ছেচল্লিশ']

কবির সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত গদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কারে।

"পরিশেষে"র 'সাথী' কবিতায় কবির শৈশবের সঙ্গীদের কথা বলেছেন। 'জীবনস্মৃতি" ('ঘর ও বাহির'—পৃঃ ১২)—তে-ও এই সাথীদের কথা বর্ণিত হয়েছে—

"বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সংগতি"।

এরাই ছিল শিশু-কবির একান্ত সাথী। এই বিরাট বিশ্বভুবনের এক কোণে কবি-

শিশু আপনার একটি নিভৃত জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল—এবং সে জগতের একমাত্র সাথী ছিল কতকগুলি বোবা প্রাণ—

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে
একা একা আপনারি সঙ্গে হোত কথা।
মেঝে বসে
ঘরের গরাদে খানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।

["পরিশেষ"—'সাথী']

এরই মাঝে 'ঢঙ্ ঢঙ্ ঘণ্টার ধ্বনি', 'সইসের হাঁক,' ও পাড়ার তেল কলের বাঁশি, কাকাতুয়ার চীৎকার কবিমনে সাড়া জাগিয়ে যেত।
আর তার সঙ্গে—

একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ
একটা কয়েতবেল, একজোড়া নারকেল গাছ,
তারাই আমার ছিল সাথী।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
মনে-মনে সে ছুটি আমার। [ঐ]

কিন্তু একে কেন্দ্র করেই কবি স্বীয় জীবনের উত্থান-পতন বিরহ-মিলনের তাপ-অনুতাপকে করুণ রাগিণীতে ভরিয়ে দিয়েছেন। একদিন শিশু-কবির জীবনে—

আপনার সঙ্গে যে-খেলাতে
তাদের কাটত দিন
সে আমারি খেলা।
তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।

কিন্তু—

তারপরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,
বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।

অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মুলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে গান
রৌদ্রে ঝিলিমিলি সেই নারকেল ডালে
কেঁপেছিল তারি সুর।

*   *   *

সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের রহস্য আমার। [ঐ]

কিন্তু কবির জীবনে যৌবনের বেদনা-বিধুর এই সমস্ত দিনও ক্রমশঃ হারিয়ে গেল। কবি এখন জীবনের শেষ প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে স্মৃতির আঙিনা পার হয়ে দেখছেন 'এ জন্মের সমস্তটা'—

তারপরে অনেক বৎসর গেল
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জানলাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে-বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।

["পরিশেষ"-'সাথী']

এ কথাই "জীবনস্মৃতি"তে ('ঘর ও বাহির'—পৃঃ ১০-১১) অন্য ভাষায় ফুটে উঠেছে—

"কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে-পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দিনের ছায়া রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে"।

তাই কবি আজ জীবনশেষে দাঁড়িয়ে সেই-পুরাতন 'সাথী'দের কাছ থেকে একটি মন্ত্রে দীক্ষিত করেন আপনাকে—

পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে-কানে।

["পরিশেষ"-'সাথী']

'অতীত স্মৃতিচারণে'র মধ্যে বালকবেলার আত্মকাহিনী যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি কৈশোর অথবা যৌবনের কোনো বিশেষ ঘটনাও কবি মনে নূতন করে উঁকি মেরে গেছে। 'পরিশেষে'র 'আরেকদিন' কবিতায় কবি যৌবনের পঁচিশ বছর বয়সের একটি স্মৃতিকে এঁকে চলেছেন—

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।

কিন্তু সেদিন ও আজকের দিনে যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে তা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেন—

আজো তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইনবনের শেষে,

['পরিশেষ'—আরেকদিন]

কিন্তু তবুও কবির একমাত্র দুঃখ এই—

শুধু আমার কাঁকরঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজবে না। [ঐ]

এই বেদনার সঙ্গে যখন শুনতে পেলেন পিছনদিকে—

করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে।
"মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি"।

কবির সমস্ত ভুবনকে আচ্ছন্ন করে অতীত স্মৃতিতে মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে—

ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি। [ঐ]
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশবছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,

[ঐ]

আবার 'মায়র জাহাজে' ১৯২৭-এর ২রা অক্টোবর কবি অজানা সাগরের বুকে 'বিকেলবেলার আলো' দেখে 'তে হি নো দিবসাঃ' কবিতার মধ্যে দিয়ে অতীতের অনেক ভাললাগা স্মৃতিকে স্মরণে আনেন—

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন,
সেদিন অকারণ
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুনদিনের বেদন দিয়ে মেশা।

তাই এই প্রসঙ্গে তাঁদের স্মৃতিও কবিমনে উথ্‌লে উঠেছে—

সে গান যারা শুনতো তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু
আভাসে কেউ জানায়নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।

['পরিশেষ'—তে হি নো দিবসাঃ]

অতীত জীবনের এই সমস্ত নানা সুর—নানা ছন্দ আজ দীর্ঘদিন পরে কবিমনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

১৯৩৯ এ কবি মংপুতে আছেন। অসুস্থ দেহমনে পুরানো বহু স্মৃতিকে স্মরণ করে মনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। কি মন নিয়ে পদ্মাতীরে একদিন 'মানসী' কবিতা লিখেছিলেন সেই কথা গল্প করে বলেন এবং সেই স্মৃতিকেই স্মরণ করে "সানাই" কাব্যের 'মানসী' কবিতার জন্ম দেন—

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহাণ মাস,
তখন তরণী বাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ 'পরে।

* * *

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।

ছন্দের বুনানি গেথে অদেখার সাথে কথা কহি।

এই 'মানসী' মূর্তিকেই চিরকাল স্মরণ করে গেছেন আপন অন্তরে—

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।

["সানাই"—'মানসী']

'রোগশয্যা'র কবি 'আরোগ্য' লাভ করে নূতন চোখে আজ আবার বিশ্বকে দেখছেন। তাই আজ আবার নূতন করে মনে হচ্ছে—'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'। 'বহুলোক' যারা 'এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে'—তাদের আজ আবার নূতন করে স্মরণ করছেন স্মৃতির অর্ঘ্য রচনা করে। নূতন ভালোলাগার রঙে তাদের রাঙিয়ে গেলেন শেষবারের মত। অতীতের অনেক ভালোলাগা 'শুভক্ষণ'কে আজ আবার স্মরণ করেন সমস্ত চেতনা দিয়ে—

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুন্ঠিত আলাপে

* * *

রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।

["আরোগ্য"—৩ সংখ্যক]

এই পদ্মার স্মৃতিকে স্মরণ করে ১৯৩৫ এর ২৪শে মে একখানি চিঠিতে লিখছেন—

"আমাদের পদ্মাবোটে আশ্রয় নিয়েছি। এই বোটেই যৌবনকালে লিখেছি সোনার

তরীর কবিতা-কতকাল বাস করেছি পদ্মার চরে সম্পূর্ণ একলা। এমন হয়েছে মাসের পর মাস একটি শব্দও উচ্চারণ করি নি, নিঃশব্দ কাব্য বিস্তার করেছি লেখায়”।[১]

কবি জীবনশেষে 'শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে' এদের বন্দনা পাঠান। আজ বিদায় বেলায় এই সমস্ত সুমধুর স্মৃতি যেন গোপনে আর একবার অনুভব করতে চান আপন অন্তরে—

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে;
দু'পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

* * *

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা,
দূর প্রসারিত চর

* * *

ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুর।
পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;

[“আরোগ্য”—৪ সংখ্যক]

'এই সব উপেক্ষিত ছবি, জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা' আজ যাবার বেলায় মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

* * *

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' স্মৃতিচারণমূলক কবিতাগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে লেখা দু'একটি কবিতার সন্ধানও মেলে। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে বিদেশিনী এই নারী দেখা দিয়েছিলেন কবির ভাবের এবং সুরের পরিমণ্ডলে এক মূর্তিমতী দূতী রূপে—“যে বিদেশিনীর কথা ভাবেন কবি, সে কোনো মানবী নয়, সে কোনো প্রাচী বা প্রতীচীর

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—“চিঠিপত্র”—নবম খণ্ড—শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত [প্রকাশ: বিশ্বভারতী, ১৯৬৪ পত্র সং—১৭৩, পৃঃ ২৮৬]

দিকে চকিত ইঙ্গিত নয়, আবার সেই সঙ্গে এও ঠিক যে, কখনো হয়তো কোনো একটি বিশেষ মানবীমূর্তিই তাঁকে পৌঁছে দেয় সেই বিদেশিনী আভার দিকে, সেই সুন্দরের অবকাশে। তাই, হৃদয়ে যার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পেতে যার স্রোতোময় কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, তাকে কখনো বা তিনি সাজিয়ে দেখতে চান কোনো নারীরই মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নারীর মধ্যে। তাই, যে-গান তিনি লিখেছিলেন দূর-যৌবনের দিনে, প্রৌঢ় বয়সে সেই গান তিনি তুলে দিতে পারেন এক মানবীরই অভিমুখে : বিদেশবাসিনী কোনো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর হাতে তিনি সহজেই পৌঁছে দিতে পারেন এই কথা : 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী!' 'সত্যি কি আমাকে চিনেছিলেন?' এই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভিক্টোরিয়া, অনেক বছর পেরিয়ে। কিন্তু এই প্রশ্ন করবার আগে জেনে নেওয়া চাই : একই সঙ্গে সত্যি এই কথা যে ওই গানে তিনি আছেন এবং তিনি নেই। 'পরিচয় আর অপরিচয় আমার মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল' জেনে নেওয়া চাই এই স্বীকারোক্তি, 'জানি না যখন জানির আঁচলে গাঁটছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, ধন্য হলেম'। তাই সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে যে তুলনাহীনাকে পথে যেতে দেখেন কবি, মনে রাখা চাই যে একই সঙ্গে তিনি চেনা এবং চেনা নন, নারী এবং নারী নন। এইটুকু শুধু ঠিক যে কবিজীবনে এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল, যখন তাঁর আরো একবার এই গণ্ডিবাঁধা দেশকালকে অতিক্রম করে যাবার প্রয়োজন ঘটেছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভিক্টোরিয়ার সান্নিধ্য তাঁকে আরো একবার পৌঁছে দিচ্ছিল তাঁর 'বিদেশিনী' ভাবনার দিকে। মাত্র সেইটুকু অর্থে, এই ভিক্টোরিয়াও তাঁর বিদেশিনী, তাঁর সুন্দরের সহচরী"।[১]

ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে "বাইরের তথ্য থেকে অল্পই আমরা জানতে পাই। বুয়েনস আইরেসের অভিজাত এক পরিবারের এই কন্যা, বেড়ে উঠেছিলেন ইংরেজ আর ফরাসি গভর্নেসের দেখাশোনায়, ক্রমে হয়ে উঠলেন ও দেশের শিল্প-সাহিত্যের সংসারে গরিমাময় এক ব্যক্তিত্ব। আজ, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে দিন যাপনের অনেককাল পরে, দেশে তাঁর পরিচয় আরো ব্যাপক নিশ্চয়। কয়েকটি বইয়ের লেখক, কয়েকটি পুরস্কারের প্রাপক, কয়েকটি সংস্থার পরিচালক এবং প্রভাবময় একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা আজ দীর্ঘকাল জুড়ে আর্জেন্টিনার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁকে বরেণ্য করে রেখেছে। এদেশে আমরা তাঁকে জানি কেবল এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিষ্কম্প তাঁর অনুরাগ, আর তাঁর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের এক ভিন্ন মুখ কখনো কখনো আমরা দেখতে

১। শ্রীশঙ্খ ঘোষ—ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—ভূমিকা-অনুবাদ-অনুষঙ্গ ডিসেম্বর ১৯৭৩ 'বিদেশিনী' [পৃষ্ঠা ১৯—২০]

পাই হঠাৎ; রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁর রচনাবলি আমাদের আগ্রহের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর আগ্রহ আমাদের আনন্দের বিষয়" ।[১]

এই বিদেশিনী নারী কবিকে যখন চোখে দেখেননি, তখন থেকেই কবির রচনার মধ্যে পেয়েছিলেন নিজের জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তের পরম জিজ্ঞাসার সত্য উত্তর— হতাশার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী এবং তখন থেকেই এই বিদেশী কবিকে তিনি মনে-প্রাণে ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, গুরুর পদে বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে জীবনের কি সংকটময় মুহূর্তে তিনি 'গীতাঞ্জলি'খানা হাতে পেয়েছিলেন এবং তার প্রভাব এই তরুণীর চিত্তে কেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথা তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান—

"অল্পবয়সে আমাদের সবারই জীবনে এমনসব সংকটকাল আসে, যার থেকে আর বেরুতে পারব বলে মনে হয় না। ঠিক তেমনি এক সময়ে 'গীতাঞ্জলি' এল আমার হাতে, এ বই পড়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই দ্বিগুণ মূল্যবান হলো। ছোটো এই বইটির সান্নিধ্য পাবার এর চেয়ে ভাল সময় আর কী হতে পারত।

* * *

নিতান্ত তুচ্ছ মৃন্ময় আমার অস্তিত্ব, এ আমি জানতাম। আর সেইজন্যেই এত দূরের অধিজগৎ থেকে এলেও কবিতাগুলিকে আমার বিদেশী মনে হয়নি, সেইজন্যই এগুলি পড়ে আমি মথিত হয়ে উঠেছিলাম আনন্দ বেদনায়:

* * *

ঠিক কোথায় কখন এইসব ভাবনা এল আমার মনে, তাও যেন আজ স্পষ্ট মনে করতে পারি;

* * *

বাড়িটি এখন আর নেই! সেদিন আমার চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও নেই আজ; নেই সেই কবিও, যে কবির কণ্ঠস্বর আমাকে আপন অশ্রুর অমূল্য উপহার এনে দিয়েছিল। প্রিয়তম বন্ধুর স্নেহ আলিঙ্গনও আমায় দিতে পারেনি সে উপহার। যে-সব ছবি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে তুফান তোলে সে সবই খুব সহজে অবারণীয়ভাবে মিলিয়ে যাবে একদিন, যেমন শূন্যতায় মিলিয়ে গেছে আরো সব ছবি। কিন্তু থেকে যাবে 'গীতাঞ্জলি', গীতাঞ্জলি এমন করে সেদিন কাঁদিয়েছিল আমায়।"[১]

জীবনে চলার পথে কঠিনতম এক মানসিক বিপর্যয়ের মুখে 'ভিক্টোরিয়া'র হাতে এসেছিল 'গীতাঞ্জলি'খানা। যৌবনের আঘাতে-সংঘাতে বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ সেই তরুণী

১। শ্রীশঙ্খ ঘোষ—ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—ডিসেম্বর ১৯৭৬ 'বিজয়ার অলিন্দে' [পৃঃ ২৫—২৬]

১। শ্রীশঙ্খ ঘোষ—ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—ডিসেম্বর-১৯৭৬ ॥ ভূমিকা ॥ অনুবাদ ॥ অনুসঙ্গ ॥ "সানইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ"—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-[পৃঃ ৫৩, ৫৪, ৫৫]

অনেক গূঢ়তম তত্ত্বের, অনেক জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলন সেদিন এই গ্রন্থখানা থেকে। তাই কবির শতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেন—

"অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত এই আলোই তো আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাছে আমরা ঋণী, অন্তত: আমি, কেননা তাঁর কবিতা আবিষ্কার করছে এই রশ্মি, তাঁর তাৎপর্য আনন্দের তাৎপর্য। সমস্ত জীবন জুড়ে এর চেয়ে আর কোন্ বড়ো আবিষ্কার কেউ করতে পারেন?

* * *

পশ্চিমবাসীদের অনেকেই তাঁর কাছে কত যে পেয়েছেন, আজ এই শতবর্ষে সেকথা প্রকাশ্যে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। আর আমার ইচ্ছে যে এই স্মৃতিগুলি পৌছয় সেই দেশের মানুষের কাছে যেখানে তাঁর জন্ম, তাঁর মৃত্যু।

* * *

গোলাপে-ভরা সেই বসন্ত দিনের মতো আজও তিনি আমার খুব একান্তে, কেননা তিনি আমাকে নিয়ে গেছেন মায়া থেকে সত্যে, পৌছে দিয়েছেন এক আত্মিকতার ভূমিতে।"[১]

"এইসব পড়াশুনো আর শিশুশোভন অশ্রুজল-এর দশ বছর পর ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর এক বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ পৌছুলেন বুয়েনস আইরেসে।" ("ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ"—শ্রীশঙ্খ ঘোষ পৃঃ ৫৭) পেরু যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ 'বুয়েনস আইরেসে' নামেন এবং শরীর অসুস্থ হওয়ায় সেযাত্রায় এখানেই বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো অসুস্থ কবির বাসস্থান এবং দেখাশোনার সমস্ত ভার বহন করেন। যে কবি দূরে বসেই তাঁর হৃদয়ে অক্ষয় আসন পেতে বসেছিলেন আজ সেই কবি যখন তাঁর আঙিনায় সত্যি সত্যিই এসে আসন বিছালেন তখন ভিক্টোরিয়ার চিত্ত মথিত করে যে ভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল তা আত্মপ্রকাশ করলো এইভাবে—"......আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি এই মানুষটির সত্য আবির্ভাবের সামনে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল।" (ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ-শ্রীশঙ্খ ঘোষ—'অলিন্দ'-পৃঃ ৬৫) কবিও পরিপূর্ণভাবেই মর্যাদা দিলেন এই বিদেশিনীর প্রাণ-উজাড়-করা ভালোবাসার—শ্রদ্ধার। তাঁর নামকরণ করলেন 'বিজয়া'। তাকে নিয়ে কবিতা লিখলেন—'বিদেশী ফুল', 'অতিথি' (পূরবী) এবং পরে 'পূরবী' গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গও করলেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন পর্যন্ত এই বিদেশিনী ভক্তের, অনুরাগিনীর সঙ্গে একটি

১। শ্রীশঙ্খ ঘোষ—ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—ডিসেম্বর ১৯৭৬

"সানইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ"—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো "খোলাপথের ধারে" —[পৃঃ ৫১—৫২]

ঘনিষ্ঠতা ছিল। মানসিক দিক থেকে তাঁরা যে পরস্পর কি সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা নিয়ে পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন—একে অন্যের হৃদয়ের কাছে মেলে ধরেছিলেন নিজেকে তা তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু বুঝতে পারা যায়—"The mist of home sickness is in me too and has been in me since you left San Isidro 15 years ago. How very long it seems, how unusually long ago. Those days in "Miralrio" are some of the happiest I have ever known···. To have you living there, to see you every morning and every afternoon and every night···what an unforgotten delight. I loved you and love you, very dearly. I hope you do know it."[১]

বিশ্বকবিও এই নারীকে সামান্যা বলে দূরে সরিয়ে রাখেননি। ওকাম্পোর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদনের কাছে আপন চিত্তকে মেলে ধরতে দ্বিধা করেননি তিনি—

"I tell you all this because I know you love me.

Your friendship has come to me unexpectedly. It will grow to its fullness of truth when you know and accept my real being and see clearly the deeper meaning of my life. I have lost most of my friends because they asked me for themselves and when I said I was not free to offer away myself they thought I was proud. I have deeply suffered from this over and over again—and therefore I always feel nervous whenever a new gift of friendship comes in my way. But I accept my destiny and if you also have the courage fully to aceept it we shall ever remain friends."[১]

এই বিদেশিনী ভক্তই সেবার রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস এয়ারেস ছেড়ে আসবার সময় তাঁর জন্য জাহাজে দুটো কেবিন ভাড়া করে দেন এবং তাঁর বাড়িতে কবি যে আরাম কেদারাখানায় বসতেন সেখানাও জাহাজের কেবিনে ঢুকিয়ে দেন। এ ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ার যে কত বেগ পেতে হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি শ্রীমতী রাণী চন্দের লেখা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইতে কবির নিজের মুখের কথা থেকে। "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" বইতে (পৃঃ ৯ ১৯৩৪, ২৯শে জুলাই) কবি শ্রীমতী রাণী চন্দকে একস্থানে

১। Sri Krishna Kripalani—Victoria Ocampo—May—1979 Letter from Victoria Ocampo to Rabindranath Tagore [Page : 24]

১। Sri Krishna Kripahani—Victoria Ocampo—May 1979 Letter—From Rabindranath Tagore to Victoreia Ocampo [Page 30-31]

বলেছিলেন—"সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট্ট একটি কার্ডে লিখেছে 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখ'। একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে সে কি করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সবচাইতে সেরা সুখসুবিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল। অজস্র টাকা আমার জন্যে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সব সময় তবু আশায় থাকত আমি কী চাই। আমার চাওয়া ও প্রাণ দিয়েও মেটাবে, এমনি ভাব।"

আবার ২৩শে মে ১৯৪১ শে-ও শ্রীমতীচন্দকে (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণীচন্দ, ১৩৬৮ পৃঃ ১০৯-১১০) ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন—"সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়া, প্রথমেই আমায় বললে যে, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি। আমি যখন ওখান থেকে এলুম তখন সে করলে কী খুব দামী ইটালিয়ান জাহাজে দু-দুটো ক্যাবিন ঠিক করলে আমার জন্যে। আমি বললুম, এর প্রয়োজন কী। কিন্তু সে কিছুতেই মানবে না, বললে একটাতে তুমি দিনের বেলা কাজ করবে আর একটা ক্যাবিনে রাত্রে শোবে। এর কারণ আর কিছুই নয়, আমার জন্য কিছু করতে চায়, এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। একটা সোফা সেটা কিছুতেই ঢোকে না ক্যাবিনের দরজা দিয়ে। ক্যাপ্টেনকে বলে দরজা কাটিয়ে বড়ো করে তবে সেই সোফাকে ক্যাবিনে ঢোকালে বসে বিশ্রাম করবো তাতে। তারপর দ্বিতীয়বার যখন আবার যাই বিদেশে তখন সেও ইওরোপে ছিল। সঙ্গে ছিল সেবার আঁকা ছবিগুলো, সে বললো, আমি এগুলো এদেশে বড়ো বড়ো ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাকা খরচ করে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে তাও কত খরচ করে।"

এই আরামকেদারাখানার কথাই কবি ৫ই জানুয়ারি ১৯২৫ ওকাম্পোকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—"I pass most of my day and a great part of my night deeply buried in your armchair which at last has explained to me the lyrical meaning of the poem of Baudelaire that I read with you."[১]

অপর একটি চিঠিতেও—".. I am about to leave my easy chair in my cabin. That chair has been my real nest for these two weeks giving me rest and privacy and a feeling that my happiness is of value to somebody."[২]

১। Sri Krishnakripalani—Victoria Ocampo letter. Rabindranath Tagore to Victoria Ocampo [Page : 28]

২। Sri Krishnakripalani—Victoria Ocampo Letter : Rabindranath Tagore to Victoria Ocampo Jan. 17, 1925 [Page : 32]

এই কেদারাই সেবার অনেক দেশ ঘুরে শেষে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেছিল—"অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন"। (প্রতিমাদেবী-'নির্বাণ' ১৯৪২, পৃঃ ৭২—৭৩)

কবি জীবনের শেষপর্বে অসুস্থ শরীরে এই কেদারাখানায় বসে তাঁর বিদেশিনী ভক্তের উদ্দেশ্যে 'শেষলেখা'র ৫-সংখ্যক (৬ এপ্রিল, ১৯৪১) কবিতাটি উপহার পাঠান—

* * *

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিব বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ

ভাষা যার জানা ছিল নাকো
আঁখি যার কয়েছিল কথা
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

এ কবিতা যে ভিক্টোরিয়ার ভালোবাসার স্মৃতিকে স্মরণ করেই লেখা তা পাঠক সমাজের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না।

এই অনন্যসাধারণ নারী কবির হৃদয়কে যিনি স্থায়ীভাবে জয় করে নিয়েছিলেন তিনিও যে অলোকসামান্যা প্রতিভাময়ী নারী শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর এই উক্তি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"More than a decade after Tagore's death in 1941, my wife and I had the good fortune of meeting Victoria Ocampo in Paris. We were immediately struck by the extraordinary charms of her personality her intellectual vitality and her spiritual sensibility—a combination which is, alas ! too rare in this world."[১] এবং এই ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ওকাম্পোকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দানের সময় তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"Dauntless lady ; bright burning spirit. exemplar and defender of the unfettered

১। Sri Krishnakripalani—Faith and Frivolity New Delhi 1962 P. P. 91-92

mind…"[১] কবিও এই ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকে স্মরণ রেখেই 'শেষলেখা' কাব্যে তাঁকে অমর করে রেখে গেছেন।

শিশু বয়স থেকে শুরু করে কবির সমস্ত জীবনের অনেক সুমধুর স্মৃতি এই ভাবে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে' খণ্ড খণ্ড কবিতার মাঝে রূপ নিয়েছে।

'শেষপর্যায়ে'র 'স্মৃতিচারণমূলক' কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কবিতা জ্যোতিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী তাঁর বৌদিদি 'কাদম্বরীদেবী'র স্মৃতিকে স্মরণ করে লেখা। 'কাদম্বরীদেবী' যখন ঠাকুরবাড়ীতে এসেছিলেন নববধূ হয়ে তখন কবির বয়সের কাছাকাছিই ছিল তাঁর বয়স। কবি তাঁকে খেলার সাথী হিসেবেই পেয়েছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই অসামান্যা নারীর স্নেহ-প্রেম-মণ্ডিত ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য এবং রুচি ও শিল্পবোধ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কবির জীবনে। কবি-কল্পনার রামধনুতে নানা রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি আপন হৃদয়ের জাদুস্পর্শে—"…চিররহস্যময় জীবনের আনন্ত্যে দিশা দেখাতে আসে কদাচিৎ কোনো জনের দুর্লভ ভাগ্যে রহস্যময়ী কোনো নারী—জীবনের সত্য ও কল্যাণ ধরে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও প্রীতির আকার। দৈনন্দিন জীবনের সকালে সন্ধ্যায়, স্নেহে-ভালোবাসায় সাহচর্যে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে, বাঙালি ঘরে দেওর ভাজের আদর-কৌতুক মিশ্রিত বিচিত্র ব্যবহারে সামান্যভাবে যেমনই বুঝে থাকুন দেশকালের দূর থেকে দূরে প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ কি পর্যন্ত গভীর নিবিড় মধুর পবিত্র ভাবে অনুভব করেছেন সেই তুলনাতীত সম্পর্কটিকে, তারই আভাস পাওয়া যায় 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' (ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যের উৎসর্গপত্র) এই কবিতায় আর তা ছাড়া দীর্ঘকবিজীবনের অনেক রচনায় ও অনেক উক্তিতে।

এই রহস্যময়ী দেবী, এই অপূর্ব প্রভা এবং প্রভাবময়ী রমনী, কবি-জীবনের অনেকটা অধিকার করে থাকেননি বাস্তবে—তাতে আসলে কোনো লোকসানও হয়নি। সাময়িকভাবে দিবা দ্বিপ্রহরের আলো যদিবা অমাবস্যার অন্ধকার-সদৃশ হয়ে উঠে থাকে অকস্মাৎ, দুঃসহ আঘাতই বিমলতর বিশুদ্ধতর চেতনায় ও শ্রেয়তর পরিণামে জাগিয়ে তুলেছে শক্তিমানকে; নিরন্তর ধাবিত কালের গতিচ্ছন্দে অস্খলিত পদে ছুটে চলেছে জীবন, এবং যে 'তেইশ বছরের শোক'কে বাহ্যত ভুলে গেছেন এককালে তাঁর জীবনে সেটি যে অবিচল শান্তির একটি ভূমিকা বিছিয়ে দিয়েছে কবি তা জেনেছেন, পরিণত

১। Sri Krishna Kripalani—Victoria Ocampo [May 1979-Page : 12]

বয়সে আপাতবিস্মরণের পর্দাটি একদা একটু সরে যেতেই ছন্দে সুরে গেয়ে উঠেছেন সহসা—

ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা…

…কবির অন্তরে তুমি কবি।

কবিতা রচনা করে চলেছে একজন, সেই কবিকে রচনা করবার যদি কেউ থাকে সে কি সামান্য"[১]! ('রবীন্দ্রপ্রতিভা'—'রবীন্দ্রকাব্যে নেপথ্যবর্তিনী'-পৃঃ ১৫১-১৫২,) 'রবীন্দ্রপ্রতিভা'র আলোচনা প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-কাব্যের নেপথ্যবর্তিনী' এই শক্তি যে কাদম্বরীদেবী—কবির জীবনে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে উপরিউক্ত যে মন্তব্য শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত করেছেন তার সত্যতা সত্যই অনুধাবনযোগ্য।

শিশু-কবিকে এ নারী আশা-আনন্দে উৎসাহিত করেছেন—নূতন নূতন প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁর শিল্পসাধনার প্রথম যাত্রাপথে। "কাদম্বরীদেবীর অচিরজীবনের সাহচর্য, তাঁরই নবকৈশোরের অমল স্পর্শ, স্নেহ-সখ্য ভালোবাসা, উৎসাহবাক্য আর অনুক্ত উদ্দীপনা—রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর পরিণতিমুখী কবিপ্রতিভাকে উদ্‌বোধিত ও উদ্দীপিত করেছে, জীবনপথের দিক দেখিয়েছে তাঁর পথ চলার প্রথম সূচনাকালে আর সম্ভবতঃ তার অন্যান্য পর্বেও—তারই কয়েকটি লক্ষ্যগোচর সূত্র আমরা বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাই"।[২]

তারপর অসময়ে এই ফুল ঝরে গেল 'কালের কপোল তলে'। কবি ব্যথা পেলেন—সঙ্গীহারা হলেন—"শোকে মুহ্যমান, দুঃখে ছিন্ন-ভিন্ন। তিনি বুঝতে পারেন না, কেন, এই অভিমানিনী নারী ইহলোকের সব সম্পর্ক নিজহাতে টুকরো করে দিয়ে বহু শরৎ প্রভাতের, বহু হেমন্ত—দুপুরের বহু বর্ষা সন্ধ্যার বহু বসন্তরজনীর সহচর এই ভালোবাসার বন্ধুকে সর্বস্বান্ত করে পরলোকে পাড়ি দিলেন? কেন সংগীতে কবিতায় হাস্যপরিহাসে মুখর দিনগুলিতে টেনে দিলেন অন্ধকারের যবনিকা? কেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন হেমময় প্রেমময় দীপশিখা?

রবীন্দ্রনাথ তখন আর রবীন্দ্রনাথে নেই। অস্থির পদচারণা করেন ছাদে, প্রতিটি রাত্রি তাঁর নিদ্রাহীন এবং বুকের ভিতর কেবল হাহাকার। যে দিকে তাকান, শুধু নতুন বৌঠানের স্মৃতি আর স্মৃতি। একটি গানের কলি, একটি কবিতার লাইনও নেই, যা তিনি তাঁর এই সমব্যথী সহধর্মী প্রিয়জনের কানে গুঞ্জন করেননি। তাই বুকের জ্বালা কমাতে তাঁর ব্যথার পূজা সমাপ্ত করার আগে সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে 'পুষ্পাঞ্জলি'

১। শ্রী কানাই সামন্ত—"রবীন্দ্র-প্রতিভা"—[প্রকাশ : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—॥ রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী ॥ [পৃঃ ১৫১-১৫২]

২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৪

প্রদান করলেন পরলোকগতা বউঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে।"[১] তারপর ক্রমশঃ এই শোক শান্ত হয়ে এল। কবি জীবন-মৃত্যুর সহজ চলমান ছন্দের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রলেন; কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোনদিন তাঁকে ভোলেননি। তাঁর মধুময় স্মৃতিকে নানাভাবে কেন্দ্র করে কাব্য-অর্ঘ্য দিয়ে গেছেন বারে বারে। "মৃত্যুকে তেমন করে অনুভব করলেন, প্রত্যক্ষ করলেন কবি এই প্রথম। তার পরিণাম যে কী তা "জীবনস্মৃতিতে নিজেই অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, আর তাঁর পরবর্তী ভাব-সাধনার সর্বাঙ্গীণ ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, সংযম ও শক্তিতে ধৃতি ও শান্তিতে, সবল আনন্দে তা স্বতই প্রমাণিত হয়।

...রবীন্দ্রপ্রতিভা নিজের গুণেই আর নিজেরই শক্তিতে ক্ষুদ্র বীজ থেকে সুবিশাল অক্ষয়বটের মতো ক্রমপরিণতি লাভ করেছে। তার যথার্থ হেতু তার অন্তরেই, অথচ বাহিরেও কী বিশেষ কার্যকারণ সংযোগ ঘটেছিল, কেমন অনুকূল মৃত্তিকা জলবায়ু উত্তাপ এবং আলোক জুটেছিল, সেটিও তো জানবার বিষয়। অন্তরকে বাহিরে শরীরী ভাবে দেখা মানবমনের বিশেষতঃ কবি ও শিল্পি-মনের বিশেষ একটি প্রবণতা, কবি জীবনের আলোচনায় কাদম্বরীদেবীর স্নেহ-প্রীতি ও সাহচর্যের, জীবন ও মৃত্যুর, সেই দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্য"।[২]

জীবনের এই চরম এবং পরম অভিজ্ঞতার স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতময় প্রকাশ তাঁর সারা-জীবনের বিচিত্র রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। 'সরজিনীপ্রয়াণ', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'উত্তরপ্রত্যুত্তর', 'হায়' (গান), 'বিদেশীফুলের গুচ্ছ' ইত্যাদি বহু রচনার মধ্যে নানাভাবে এই অলোকসামান্যা নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অর্পণ করেছেন। 'পুষ্পাঞ্জলি'র বহু রচনাই খানিকটা রূপবদল করে পরবর্তীকালে 'গদ্যছন্দে'র নূতন বেশে 'লিপিকা'র প্রথম অংশের কয়েকটি রচনার মধ্যে দেখা দিয়েছে।

'শেষপর্যায়ে'র কাব্যে জীবনের সেই দুঃসহ দুঃখই সর্বব্যাপী শান্তিতে এবং সুখকর স্মৃতিতে নানা কবিতার আধারে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। 'বীথিকা' কাব্যের 'ছায়াছবি' (আষাঢ় ৪, ১৩৪২), 'নিমন্ত্রণ' (১৪ জুন ১৯৩৫), 'নাট্যশেষ' (আষাঢ় ১৩৪২) 'শ্যামলী' কাব্যের 'তেঁতুলের ফুল' (৭ই জুন, ১৯৩৬), 'মিলভাঙা' (২০শে জুন, ১৯৩৬), 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'বধূ' (২৫।১০।৩৮), 'শ্যামা' (৩১।১০।৩৮ সাঃ), 'কাঁচা আম'

১। শ্রী অমিতাভ চৌধুরী—রবি অনুরাগিনী [প্রথম প্রঃ জুন-১৯৭৭, পৃঃ ৫৬]

২। শ্রী কানাই সামন্ত—"রবীন্দ্র প্রতিভা"—[প্রকাশ : ২২ শে শ্রাবণ ১৩৬৮]
প্রবন্ধ—॥ রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্য বর্তিনী ॥ [পৃঃ১৭১-১৭২]

(৮।৪।৩৯), 'ছড়ারছবি'র 'বালক' (আষাঢ় ১৩৪৪) প্রভৃতি কবিতা নতুন বৌঠানের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই কাব্য-অর্ঘ্য নিবেদন বলে মনে হয়।

১৩৪২ এর আষাঢ়ে কবি গঙ্গাবক্ষে আপনাদের নৌকাগৃহ 'পদ্মা'য় (হৌসবোটে) ভ্রমণে বের হন। চন্দননগরের ঘাটে এসে নৌকা থামে। "কৈশোর ও যৌবনের পরিচিত এই নদীঘাটের সঙ্গে কবিজীবনের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল"[১]—তাতে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে কবি পুনরায় 'স্মৃতির আকার দিয়ে' নূতন করে আঁকতে চান। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—"বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্ভব"।[২] "নৌকা যেখানে বাঁধা হইল তার সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন। 'সে বাড়ি অত্যন্ত বে-মেরামতী অবস্থায়'* (*চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড-পত্র ৪৭)···আজ বৃদ্ধবয়সে সেই নদীঘাটে আসিয়া তাঁহার কবিহৃদয়ে অতীত যুগের নানা স্মৃতি যে জাগিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক"।[৩]

অন্য একখানি চিঠিতেও লিখেছেন—"আমাদের পদ্মাবোটে আশ্রয় নিয়েছি।···তারও আগেকার দিনে যখন আমার বয়স ছিল আঠারো, এই চন্দননগরে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল কেটেছে। ঐ সামনে দেখা যাচ্ছে দোতলা বাড়ি, ঐখানে ছিলেম জ্যোতিদাদার সঙ্গে। মনে পড়ছে কোন এক বাদলের দিনে ঘন মেঘে ছায়াচ্ছন্ন নদী, নিবিড় বৃষ্টিধারায় দিগন্ত অবগুণ্ঠিত, দীর্ঘ অপরাহ্নের কর্মহীন প্রহরে অকারণ বেদনায় মন বিরহাতুর, তখন একদা বসে বিদ্যাপতির গানটিকে সুরে বসিয়েছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

···আজ ঐ বাড়িটা অনাদরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে নইলে ঐখানেই থাকতুম"।[৪]

কবি আজ জীবন 'নাট্যশেষে' (বীথিকা) দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরে চান। সেখানে দলে দলে নানা যাত্রীর মধ্যে কাদম্বরী দেবীর কথা আজ বিশেষ করে স্মরণে আসছে। কারণ এই কবি কিশোরের প্রথম জীবনে তাঁরা নানা দিক থেকেই অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড—[প্রকাশ : ১৩৬৩ শ্রাবণ পৃঃ ১৪]
২। ঐ ঐ ঐ [পৃঃ ২৪]
৩। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ : ১৩৬৩ শ্রাবণ, পৃঃ ১৪-১৫]
৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"চিঠিপত্র"—নবম খণ্ড, শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত [সং বিশ্বভারতী ১৯৬৮]—পত্র সংখ্যা—১৭৩ চন্দননগর ২৪শে মে ১৯৩৫, [পৃঃ ২৮৬]

কবি "জীবনস্মৃতি"র 'গীতচর্চা' এবং 'সাহিত্যের সঙ্গী' অংশে তাঁদের প্রভাব সম্পর্কে স্বীকার করেছেন—"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।...তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না"। (পৃঃ ৬১ –'গীতচর্চা')

আবার 'সাহিত্যের সঙ্গী'তেও (পৃঃ ৬২) "সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম"।

"ছড়ারছবি" গ্রন্থের "বালক" কবিতায় বালকবেলার নানা স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে এই দাদা-বৌদির সঙ্গে তাঁর যে সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত ছিল সেই কথা স্মরণ করে লিখেছেন—

বয়স তখন ছিল কাঁচা হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তার সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।

এই বউঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁর যে কী নিবিড় এবং মধুর সম্পর্ক ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ "ছেলেবেলা" (পৃঃ ১৪৭) গ্রন্থেও পাওয়া যায়—

শীতের কাঁচা রোদে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর—বৌদিদির আমসত্ত পাহারা, তাছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়তো জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোন গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুণ মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরিকাটার কাজটা চলত খুব দৌড় বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেকদিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি"।

এইভাবে প্রথম জীবনে এই দাদা-বৌদিদিই কবির জ্ঞানের চর্চায়, ভাবের সাধনায়

এবং শিল্পের আরাধনায় অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন। কবি কৃতজ্ঞতা সহকারে সে ঋণকে আজীবন স্মরণ করে গেছেন। শুধু তাই না,—কবির কৈশোর জীবনে যখন মাতৃহারা হন—তখন এই নারীই তাঁর স্নেহে যত্নে ভরিয়ে রেখেছিলেন শোকাতুরা হৃদয়কে—

"বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন"। ("জীবন-স্মৃতি"—'মৃত্যুশোক' পৃঃ ১১৮)

তাই এই নারীর অকাল মৃত্যু কবির যৌবনে যে আকস্মিক আঘাত হেনেছিল—তা তাঁর সমস্ত জীবনের এক অম্লান স্মৃতি এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সে কথাও 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় ('মৃত্যুশোক'-পৃঃ ১১৮) অস্পষ্ট নয়—

"কিন্তু, আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল"।

এই দুঃসহ আঘাতকে সেদিন বুক পেতে নিয়েও শেষ বয়স পর্যন্ত নানা আকারে নানা ভাবে তাঁর জীবনে এই নারীর অজস্র দানকে স্বীকার করতে—শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেননি। এই বৌদিদি সম্পর্কেই তাঁর শেষ জীবনে শ্রীমতী রানীচন্দের নিকট বলেছেন—"মেয়েরা যে কত স্নেহ ঢেলে দিতে পারে সেই দেখলুম যখন নতুন বৌঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, এখন তা বুঝতে পারি।"[১] (৩০শে জুন, ১৯৪১)

বৃদ্ধবয়সে তাই চন্দননগর বাসকালে সেই অতীত স্মৃতিই মুখরিত হয়ে ওঠে 'ছায়াছবি' কবিতাটিতে—

প্রবল বরিষণে
পাংশু হল দিকের মুখ
আকাশ যেন নিরুৎসুক ;

১। শ্রীমতী রানীচন্দ—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"—[১ম সং—পৃঃ ১৫২-১৫৩]

নদীপারের নীলিমাছায়
পাণ্ডু আবরণে
কর্মদিন হারাল সীমা
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান। ['বীথিকা'—'ছায়াছবি']

"জীবনস্মৃতি"র 'গঙ্গাতীর' (পৃঃ ৯৬) নামক রচনাংশের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল—

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ামযন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখারিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম"।

"ছেলেবেলা"র (পৃঃ ১৫৭) একস্থানের বর্ণনার সঙ্গেও একে মিলিয়ে পড়া যায়—

"গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরী করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে।

...বৌঠাকরুণ ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগলো বলেননি—চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো"।

আজ গঙ্গাতীরে এসে এই সব পুরাতন দিনের কথা—বিশেষতঃ কাদম্বরীদেবীর কথা, "গিয়েছে তার ছায়া মুরতি কালের খেয়া পারে"—স্মরণ হচ্ছে।

"বীথিকা" কাব্যের 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় যদিও একাল সেকালের মেশা-মিশির কথা আছে—তবুও পুরোনো দিনের সেই সব সুমধুর স্মৃতি এ কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর স্মরণে এসেছে বলেই মনে হয়।

মনে ছবি আসে-ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুম-ফোঁটা ভুরু সংগমে কিবা,
শ্বেত করবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়াহেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানিনা কি।

এই স্মৃতিকথাই "ছেলেবেলা" (পৃঃ ১৫১) গ্রন্থে অন্য ভাষায় একস্থানে রূপ পেয়েছে—

"দিনের শেষে ছাদের উপর পড়তো মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচি পান।

বৌঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরী হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতি দাদা।" "নাট্যশেষ" কবিতায় এই বৌঠাকরুণকেই স্মরণ করে কবির বেদনার্ত হৃদয় গেয়ে উঠেছে—

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে-রাত্রি হয়না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে।

["বীথিকা"—'নাট্যশেষ']

জীবননাট্যের এই স্মরণীয় রাত্রিকে স্মৃতির পাতা থেকে কবি কোনদিনই মুছে ফেলতে পারেন নি। এই মৃত্যুবিচ্ছেদ তাই মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—তার থেকেই জন্ম নিয়েছে বিচিত্র রচনা সমস্ত জীবন ধরে। "পুষ্পাঞ্জলি" নামক গদ্য কবিতাগুচ্ছে এই নারীকেই স্মরণ করে লিখেছেন—

"আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে।··· কতশত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে।···যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা

অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক"।[১]

কাদম্বরীদেবীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা এই 'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার মধ্যে অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'অমিয়চক্রবর্তী'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ বালক অমিয় চক্রবর্তীকে যে সান্ত্বনাপত্র দেন তাতেও কাদম্বরীদেবী যে তাঁর জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করেছিলেন বোঝা যায়—

"আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি"।[২]

"শ্যামলী"র দুটি কবিতায় পূর্ববর্তী গদ্য কবিতাগ্রন্থের ন্যায় শৈশবের স্মৃতি-সুখকর কিছু চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। বার্ধক্যে অলসবেলার খেয়ালী ভাবনায় অনেক সময় পুরোনো দিনের বহু সুখে দুঃখে বিজড়িত স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন আপন মনে। 'তেঁতুলের ফুল' ও 'মিলভাঙা' (শ্যামলী) কবিতাদুটিতে অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির মধুময় আবেশের কথাই অনুরণিত।

"তেঁতুলের ফুল"কে কেন্দ্র করে বেশ বোঝা যায় কবি 'ঠাকুরবাড়ি'র অতীত ইতিহাসের একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন—তার সঙ্গে বালককালের গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও। 'তেঁতুলের ফুল'কে চিরদিন সকলে অবহেলা করেই এসেছে—কবিও। কিন্তু আজ বৃদ্ধ কবির চোখে ও এক অনির্বচনীয় সুষমা বহে নিয়ে এলো—

কোন্ ঘোমটার নিচে থেকে চুপি চুপি কথা।
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে।

[শ্যামলী—'তেঁতুলের ফুল']

এই লাজুক ফুলের মঞ্জরীকে কেন্দ্র করেই ঠাকুরবাড়ির পাশের শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেককালের তেঁতুলগাছের কথা মনে পড়ে যায়। তার সঙ্গে আরও মনে পড়ে—

এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পর্বে
সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে,
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।
ঐ গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে
তাদের কতলোকের নাম

১। "পুষ্পাঞ্জলি"—['ভারতী পত্রিকা'—১২৯২ বৈশাখ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড-পৃঃ ৪৮৫, ৯৫]
২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"শ্রীঅমিয়চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি"
চিঠিপত্র—[একাদশ খণ্ড প্রঃ আষাঢ় ১২৮১, পত্র সং-২, ২২ জুন ১৯১৭ পৃঃ ৮]

আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,
তাদের কত লোকের স্মৃতি
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।

[ঐ]

তাই কবির যে মুহূর্তে মনে হোল—

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি।

[ঐ]

সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে—

সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবন মদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা উতল করা
কোন্-এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্ একজনের আনন্দে রাঙা কর্ণমূলে। [ঐ]

এই 'কোন্ একজন' যে কে; তার কোন উল্লেখ নেই এখানে। কিন্তু এই বয়সেও সুন্দরের কোনো এক নূতন স্পর্শে কবি-মনে যে অপরূপ রসের সঞ্চার হয়—তারই কেন্দ্রে জেগে ওঠে অতীতের কোনো না কোনো বেদনাবিধুর স্মৃতির শিহরণ এবং এই মধুময় স্মৃতির কেন্দ্রে বৌদিদি কাদম্বরীদেবীকে স্থাপন করা হয়তো অসম্ভব কল্পনা নয়।

"মিলভাঙা" কবিতাটি এই বৌদিদিকে উদ্দেশ্য করেই যে লেখা তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর স্তবকে স্তবকে। কবি নিজের জীবনে এই মহিয়সী নারীর অফুরন্ত দানকে স্মরণ করেই বলছেন—

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।

['শ্যামলী'—'মিলভাঙা']

"ছেলেবেলা"র সামান্য কিছু অংশ তুলে নিয়ে আলোচনা করলেই এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

"বৌঠাকরুণ এলেন ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এলো পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটলো। [পৃঃ ১৫৬]

…আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুণ ভালোবাসতেন। তখন বিজলিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুণের হাত-পাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম। [পৃঃ ১৫৬-১৫৭]

…ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে,—এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে, পইতের সময়, বৌঠাকরুণ আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের। [পৃঃ ১৫৭]

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল—শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরে আমার এল তেতালার বসতি ; আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না"।

[পৃঃ ১৫৭-১৫৮]

এই সমস্ত স্মৃতিবেদনার মালাই গেথে চলেছেন "মিলভাঙা" কবিতায়—

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপি চুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।

*　　　*　　　*

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে ,
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ও পারের ডাঙায়।
মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিম্বা খেলায়।

['শ্যামলী'—'মিলভাঙা']

তারপর কবির জীবনধারা বয়ে চলেছে 'দুর্গমের মধ্যে' 'গভীরের মধ্যে', 'মন্দভালোর দ্বন্দ্ব-বিরোধে, চিন্তায় সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায়,—

কিন্তু সেখানে কবি তাঁর কাছে বিদেশী। একদিন কিন্তু জীবনের প্রথম প্রকাশের বেদনায়—

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহুযুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে। [ঐ]

আজ কিন্তু জীবনপথে কবি অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন। আজ তাঁর সৃষ্টি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে,—জীবন লাভ করেছে অনেক সম্মান—অনেক শ্রদ্ধা। তাই আজ তাঁর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—"বিহারীবাবুর মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি—কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে, 'মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী' আমি 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, একথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না"।
["জীবনস্মৃতি"—'সাহিত্যের সঙ্গী'—পৃঃ ৬৩]

আজ তাঁর ক্ষুদ্র দেবরটি যে শিল্পসিদ্ধির চরম সৌধশিখরে আরোহণ করেছে—তা আর তাঁর দেখা হোল না। কবিমনে তাই এত আনন্দও ব্যথা বয়ে আনে। কবি অকৃতজ্ঞ নন—আজ পঁচাত্তর বছর বয়সেও সৃষ্টির নব নব আনন্দ প্রেরণার যুগেও স্মরণ করেছেন সেই নারীর অসামান্য দানকে, আপন চলার পথের অফুরন্ত প্রাণাবেগের আনন্দে—

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

['শ্যামলী'—'মিলভাঙা']

আজও জীবন-বীণার নানা সুরের তানে তাঁর আঙুলের প্রথম দরদকে স্মরণ করায়—কবির ব্যথাতুর কৃতজ্ঞতায় ভরা চিরপ্রীতি-ভরা চিত্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কিশোর জীবনের পেলব রূপটিকে এমন মধুময় করে দেখা সত্যিই অপরূপ মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

"আকাশপ্রদীপ" কাব্যের 'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতাদুটিও যে বৌঠাকুরাণীর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই রচিত—তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কবির বালক বয়সে এই উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী নারীই 'ঠাকুরবাড়িতে' নববধূ হয়ে আসেন,—কবির কাছাকাছিই ছিল তাঁর বয়স। তবুও তাঁর ঘোমটার আড়ালে যে অপরিচয়ের রহস্য লুকিয়ে ছিল বালককবির কাছে সেটা ছিল পরম বিস্ময়ের—

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাকমানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নব কৈশোরের মেয়ে
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।

* * *

…ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ কাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে :

['আকাশপ্রদীপ'—'শ্যামা']

"জীবনস্মৃতি"র 'প্রত্যাবর্তন' (পৃঃ ৪৯-৫০) অংশে এই বৌদিদি সম্বন্ধেই আছে—"তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাহাকে কিছুই জানি না, অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও, বাইরে যাও। তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দুই মনে বড়ো বাজিত।"

কিন্তু একদিন এই স্বপ্ন সত্য হোল। কবির এই বিস্ময়ের ঘোর গেল কেটে—

তারপরে একদিন
জানাশোনা হোল বাধাহীন।

একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।

['আকাশপ্রদীপ'—'শ্যামা']

কিন্তু তবুও কবি দুঃখ করে বলেন—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

[ঐ]

এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় কত শ্রদ্ধা এবং মাধুর্যের দ্বারা এই নারীকে কবি আপন কল্পনায় অনির্বচনীয় করে তুলেছিলেন। এ তো কবির নিজস্ব সৃষ্টি 'আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে'-বিধাতাও যেন এখানে হার মানেন।

"কাঁচাআম" কবিতাটিকে কেন্দ্র করেও এই পুরোনো দিনের নানা কথা কবির স্মৃতিপথের অলিগলিতে উঁকি ঝুঁকি মেরে ওঠে—

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে ;
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় করে।

* * *

কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা-পরা পায়ে পায়ে
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা

তার ভাব তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে।
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;
কিন্তু, ভ্রুকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলে মানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।
তার বয়স আমার চেয়ে দুই একমাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।

['আকাশপ্রদীপ'—কাঁচা আম']

এই নববধূ—এই রহস্যময়ী নারী যে কে তা আর একটুও গোপন থাকেনি—এই বর্ণনার মধ্যে। "জীবনস্মৃতি"র উপরিউক্ত বর্ণনার সঙ্গে এর আশ্চর্যজনক মিল। জানা-অজানার ঘেরের মধ্যে এই রহস্যময়ী নারী কবিশিশুর জীবনে চির অপরিচিতই যেন রয়ে গেল। কিন্তু কবি একদিন আবিষ্কার করলেন সেই চাবি যা দিয়ে এই রহস্যপুরীর তালা খোলা যায়—

ও ভালবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।

ঐ]

কবি তাই ঝড় হলেই গাছতলা থেকে এই কাঁচা আম কুড়িয়ে আনতেন; তাঁর সঙ্গে ভাব করার জন্য শিলাবৃষ্টি, মৌমাছির কামড় সবকিছুকে তুচ্ছ করে। কিন্তু এত কষ্টের বিনিময়ে যার প্রসাদটুকু লাভ করার ইচ্ছা ছিল, তার কাছ থেকে যখন শুনতেন—

"কে বলেছে তোমাকে আনতে"। [ঐ]

অথবা—

"এমন করে ফল আনতে হবে না"।

[ঐ]

তখন কবিমন বেদনা ও অভিমানে ভরে উঠতো—

"ঝুড়ি সুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে যেতেন"।

[ঐ],

কিন্তু আজ জীবনের গোধূলিবেলায় শেষ খেয়াপারের সময় এ সমস্ত ছেলেমানুষির কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সেই নারীকেও তাঁর যথার্থ মূল্য দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিরহ বেদনা নূতন করে ভেসে উঠেছে—কয়ে তুলেছে তাঁকে আন্‌মনা ব্যথাহত—

সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি।
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুটুরি,
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগেনা।

['কাঁচাআম'—আকাশপ্রদীপ]

কিশোর জীবনের অনেক দেওয়া-নেওয়া-পাওয়া হারানোর মধ্যে দিয়ে দু'জনের জীবনের যে মধুর সম্পর্ক, এবং স্নেহ-প্রীতি-ভরা মান অভিমান, সবই আজ মধুর স্মৃতি সুখের আবেশ নিয়ে কবিমনে উঁকি মেরে যাচ্ছে; সেদিনের কত তুচ্ছতাও জীবনের কতখানি অংশ যে জুড়ে ছিল তা আজও কবির স্মরণে জাগছে। কিশোর-কবির জীবনে যে ছিল এই আশা-আনন্দের দূতী, তাকে অকালে হারানোর বেদনা কবিমনে যে ক্ষতি এবং ক্ষত বয়ে এনেছিল—তার করুণ এবং স্থায়ী বেদনাময় স্মৃতিটুকুও আজ স্মরণে আসছে।

এইভাবে কবি 'অস্তসিন্ধু কূলে' এসে বিগত দিনের বহু টুকরো স্মৃতির সঙ্গে ছেলেবেলার নানা ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা এবং আপন অন্তরের অনেক গোপন রহস্যকে নূতন করে রেখে রেখে চেখে চেখে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন।

কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে "শেষপর্যায়ের কাব্যে"র এই স্মৃতিচিত্রগুলি সত্যিই এক দুর্লভ বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায় | বিচিত্র জীবন-চেতনা

ভাবসম্পদের দিক থেকে নানা তত্ত্ব ও তথ্যবহুল রচনা কবির কাব্যফুলের সাজি ভরিয়েছে বিচিত্র বাহারে—কবিমানসের একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শনকে তারা উদ্ঘাটিত করেছে নানা রূপাঙ্গিকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটুকুই কর্ম নয়-কাব্য নয়-শিশুর মত একটি সহজ সরল মন নিয়ে জীবনকে তিনি হাসি-আনন্দে-গানে ভরে দিতে চেয়েছিলেন। এই শিশুমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যকে ছড়িয়ে রেখে গেছেন সারাজীবন ধরে গুরু-গম্ভীর নানা রচনার ফাঁকে ফাঁকে। এছাড়া নামী এবং দামী মানুষটির যে সত্তা তার বাইরে আর একটি স্বরূপ তাঁর ছিল—যে মানুষটির সাধারণ মনের সন্ধান মেলে তাঁরই গুরুত্বপূর্ণ নানা রচনার মাঝে। তিনি শুধু বিশ্বকবি নন, স্বদেশ প্রেমিক নন, সমালোচক নন, নাট্যকার নন, অতি সাধারণ মানুষ হয়ে মুক্তি খুঁজে বেড়ান সাধারণ মানুষেরই সহজ সঙ্গ-সুধারসের মধ্যে। তাই তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদের নানা তত্ত্ব ও তথ্যের মাঝে ছড়িয়ে আছে এই সমস্ত 'বিচিত্র জীবন চেতনা'র নানা ইঙ্গিত, আলোর ফুলকির মতো যা কবির জীবনের নানা দিককে উদ্ঘাটিত করেছে।

…"রবীন্দ্রনাথ কবি, বিচিত্র রসের কবি। তাঁর বাণীতে রয়েছে বিচিত্রের কথা, কাজেও তাঁর বিচিত্রের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। টুকিটাকি সে বিচিত্র জীবনকথার কিছুই ফেলবার নয়"।[১] এই বিচিত্র জীবন-চেতনার মধ্যে শিশু সাহিত্য পর্যায়ের রচনাগুলি পড়ে—যেখানে তাঁর শিশুমনের একটি সজীব স্পর্শ প্রস্ফুটিত হয়ে আছে শতদল পদ্মের মত। বার্ধক্যেও এই মুক্তিকামী শিশুচিত্তের নানা ছেলেমানুষির পরিচয় রেখে গেছেন বিচিত্র রচনা সম্ভারে। 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, ব্যথা বেদনা, দায় ও দায়িত্বের মাঝে অলসবেলার এই ছেলেমানুষি তাঁর আর একটি স্বরূপ-সত্যকে প্রকাশ করে—যাকে সম্যক না জানলে তিনি আমাদের কাছে অনেকখানিই অজানা রয়ে যাবেন। তাছাড়া কোনো একটি বিশেষ কাব্যের মধ্যে কবির ভাব এবং ভাবনা যত উচ্চ পর্যায়েরই হোক না কেন—একই সময়ে একই ভাবের অনুসঙ্গী হয়ে কবির অন্তর্জগতের যত বড় সত্যকেই তারা উদ্ঘাটিত করুক না কেন, এরই ফাঁকে ফাঁকে এমন সমস্ত রচনা ছড়িয়ে আছে যারা কবির কোনো মহৎ ভাব বা ভাবনার দর্শন বা মননের ধারক বা বাহক নয়; জীবনরসিক কবির জীবনের কোনো ক্ষণিক মুহূর্তের

১। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—"কবি-কথা" [১ম সং পৃঃ ১২০-১২১]

ভালোলাগা-মন্দলাগা, লঘু হাস্য-পরিহাস, সহজ আত্মপ্রকাশকে স্বাভাবিকতায় মুক্তি দিয়েছে এই ধরনের কিছু রচনা। এর মধ্যে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়—মানুষ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরিজন পরিবেশে দেখতে পাই। ব্যক্তিগত জীবনেও যে তিনি কত বড় রসিক এবং শিল্পী ছিলেন—বিশ্বের হয়েও সকলের জন্য তাঁর যে চিন্তা ভাবনা, কর্তব্যের ত্রুটি ছিল না—জীবনে অনেক মহৎ কর্মের দায় ও দায়িত্ব বহন করেও পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের সমস্ত বন্ধনকে তিনি যে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহন করতেন—জীবনব্যাপী এই সমস্ত স্নেহ-সুধা-স্পর্শ ছড়িয়ে আছে নানা কবিতার অঙ্গে অঙ্গে যাদের সম্যক আলোচনা কখনো সম্ভব নয়। 'বিচিত্র জীবন-চেতনা' পর্যায়ে সেই সমস্ত বিচিত্র রস কিঞ্চিৎ পরিবেশিত।

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটা কাব্যও নহে কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবনাপূর্ণ কবিতা লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়—বাণীদান ও গুরুগাম্ভীর কর্মসাধন তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হাসির পাথেয় পান ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়,—সকল পার্থিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে পাওয়া এই সব পুরস্কার। খাপছাড়া, সে, প্রহাসিনী, ছড়ারছবি, ছড়া, গল্পসল্প—সেই মুক্তিকামী মনের সৃষ্টি; অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্য আপনাকে সহজ করিয়া দেন; **relaxation relief** না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না"।[১] রবীন্দ্র-শিল্প-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে সর্বাংশেই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। শেষপর্যায়ের কাব্যের বিচিত্র রচনা সম্ভারের মধ্যে মনের এই **relief** বা **relaxation** এর জন্য যে সমস্ত কবিতার জন্ম হয়েছিল তাদের কয়েকখানি কাব্যে গ্রথিত করা হয়েছে। তার মধ্যে "খাপছাড়া", (১৩৪৩ ; "ছড়ারছবি", (১৩৪৪) "ছড়া" (১৩৪৮) শিশুদের উপযোগী অবচেতন মনের নানা লঘু রসযুক্ত রচনায় পুষ্ট। শিশুসাহিত্যের জগতে বিশ্বকবির এই দান এক দুর্লভ সম্পদ। এছাড়া আছে "বিচিত্রিতা" (১৩৪০) ও "প্রহাসিনী" (১৩৪৪) কাব্য। এরা কবির 'বিচিত্র জীবন চেতনা'র স্বতন্ত্র ফসল।

"বিচিত্রিতা" একেবারে স্বতন্ত্র জাতের কাব্য। কবির সারাজীবনের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে এর জুড়ি অল্পই। কবিতার মধ্যে কবি এতদিন কল্পনাকে শব্দে ছন্দে গেঁথে নানা ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন; কিন্তু 'পূরবী'র যুগ থেকে কবি ছবি আঁকায়ও মনোযোগ দেন। "মহুয়া"র কয়েকটি কবিতা, "পরিশেষ" ও "বীথিকা" কাব্যের কয়েকটি কবিতা অংশতঃ বিভিন্ন ছবির উপরে লেখা হয়। "বিচিত্রিতা" ও "ছড়ারছবি" কাব্য দুখানি পুরোপুরি

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রজীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ: ১৩৬৩ শ্রাবণ পৃ: ৬৯–৭০]

ছবি আশ্রয়ে রচিত। কবির এই প্রবণতা দেখে মনে হয় কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের উপর চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রভাব বিস্তার করেছেন। চিত্রের মধ্যে রেখা-রঙ-তুলির দ্বারা যে বাণীকে ফুটিয়ে তুলতে চান—তার ভাষা আজ যেন কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। কবি যেন তাই সেই মূক চিত্রগুলির ভাষাকে বাণীর অলঙ্কারে সজীব করে তুললেন। "চিত্রগুলি উপলক্ষ্য মাত্র; সামান্য এক-একটি সূত্র ধরিয়া তাঁহার কবিমানস বহুবিস্তারে রূপ হতে রূপান্তরে ছন্দ গাঁথিয়া চলে। ছবি একটি জায়গায় আসিয়া স্তব্ধ; সে যেন তাহার সমস্ত বাণী বহিয়া মূক হইয়া যায়। কবি সেই স্তব্ধ বাণীকে ভাষা ও ছন্দে গাঁথিয়া চলমান করিয়া দেন"।[১] অল্প সময়ের মধ্যে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের যে সঙ্গতি থাকে "বিচিত্রিতা"র কবিতায় তা নেই; কারণ বিভিন্ন চিত্রকে অবলম্বন করে কবির লীলায়িত ভাবতরঙ্গ ডানা মেলেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবকল্পনার দেশে। চিত্র না দেখলেও এ সব কবিতার রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না। কারণ চিত্রকে অবলম্বন করে ভাবের একটা নিটোল পরিপূর্ণতা কবির মানসপটে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা খাঁটি লিরিক কবিতার সমগোত্রীয়। এ সমস্ত রচনা 'স্মৃতিকথা' বা 'আত্মকথা' নয়, subjective নয়। মোটের উপর objective। "বিচিত্রিতা"র দু'একটি কবিতার আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।
কী যে বলে সেই সুর, কোন্‌দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

['পুষ্প'—বিচিত্রিতা]

পুষ্পের সঙ্গে নারীর অন্তরের মিলটিকে দেখিয়ে নারীহৃদয়ের পরিপূর্ণতাকে এমনভাবে অঙ্কিত করা মহান শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব। নারী হৃদয়ের মাধুর্যকে কবি সুন্দরের অজস্র, ধারাবর্ষণ রূপে ব্যাখ্যা করলেন—

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র-জীবনী"—৩য় খণ্ড [২য় সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ পৃঃ ৪২২]

সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

এই ভাবব্যঞ্জনা অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি।

'পসারিনী'কে ('বিচিত্রিতা') কেন্দ্র করেও কবি ছবিকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন অনন্তের দেশে—

পসারিণী, ওগো পসারিণী,
ক্ষণকালতরে আজি ভুলে গেলি যত বিকিকিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।

ছবির রেখা-রঙ-তুলির মূক বাণীটিকে অতিক্রম করে তার না-বলা-বাণীর অনির্বচনীয় সুরটি ডানা মেলেছে অনন্তের অব্যক্ত স্বপ্নলোকে।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রিতা' এক বিচিত্র অর্ঘ্য নিবেদন।

'প্রহাসিনী' আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কবিতা সংকলন। কবির ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয় পরিজনের সঙ্গে ছিল একটি মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক। কৌতুকপ্রিয় কবিমন মাঝে মাঝে গুরুগাম্ভীর বিষয় থেকে মুক্তি নেবার জন্য নানা হাসির পাথেয় সংগ্রহ করে বেড়াতো। আত্মীয়-অনাত্মীয় বহুলোকের সঙ্গে কবি কৌতুক করে ছন্দে গেঁথে তাঁদের চিঠিপত্রের উত্তর দিয়েছেন,—হালকা সুর, হালকা কথা এবং হালকা ভাবে; কখনো বা কাউকে কেন্দ্র করে কৌতুকরস সৃষ্টি করে গেছেন ঐ ধরনের কোনো ছন্দবদ্ধ চরণ সমষ্টির মাধ্যমে। 'প্রহাসিনী'র কবিতাগুলি তাই কবির 'বিচিত্র-জীবন চেতনা'র অন্যতম প্রবাহকে বহন করে নিয়ে চলেছে। পরিহাসপটু এই হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি অতি সাধারণ লোকেরও অন্তরের মানুষ। আমাদের মত করে আমাদের মুখের কথা মনের কথা রসিয়ে রসিয়ে বলেন। 'পরিণয় মঙ্গল' (প্রহাসিনী—'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রীদেবী ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ' ['জয়া-মটরু-শুভ সম্মিলন'] উপলক্ষে রচিত) কবিতায় রসিকতা করে কবি বলেছেন—

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা।

সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে,
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

'পাক-প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

এই সমস্ত চরণে একদিকে কবির পরিহাস রসিক চিত্তের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়—অপরদিকে বাঙালী সমাজের শাশুড়ি-স্বামী-স্ত্রীর জীবনের একটি বাস্তব সত্যের প্রতিও কবি ইঙ্গিত করতে ছাড়েননি।

'ভাইদ্বিতীয়া' ('প্রহাসিনী'—বরাহনগরের শ্রীমতী পারুলদেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন। 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটি ১৩৪৩ সালের (ইং ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্বাদস্বরূপ শ্রীমতী পারুলদেবীকে প্রেরিত হয়।) কবিতাটিতেও কবি একদিকে বাঙালী ঘরের ভাইদের সৌভাগ্যের কথা যেমন রসিকতা করে বলেন—অপরদিকে বাঙালীঘরের মেয়েদের নানা রকমের হতভাগ্যের কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েননি।—কবি রসিকতা করে বলেন—

মনে মনে বিধি-সনে
করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদি
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির র‍্যাঙ্ক এ
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে থ্যাঙ্ক-এ।

কিন্তু এই রসিকতার সঙ্গে বাঙ্গালী সংসারের একটি করুন সত্যও কবির অনুভূতিশীল হৃদয়ের কাছে ধরা পড়েছে, তা হোল—

ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত।

['ভাইদ্বিতীয়া'—প্রহাসিনী]

এ কবিতা যে ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমস্ত দেশের লোকের মনের কথা হয়ে উঠেছে তা এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত ১৯৩৭ সালে ১৪ জানুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীমতী পারুলদেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের কয়েকটি পঙক্তি থেকে বোঝা যায়—

"বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয়নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগন্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান স্বরূপে বড়ি দান করুন, এই আমার প্রত্যাশা"। (—দেশ, ৯ মাঘ ১৩৪৯, পৃঃ ৩৬১)*

'ভোজনবীর' ('প্রহাসিনী') কবিতায় বাঙ্গালীজাতির ভোজনের পারিপাট্য এবং তার পরিণতির কথা কবি বেশ ফলাও করে বলে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন—

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণ ভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

এই সমস্ত কবিতায় কবি ব্যক্তিগত পরিহাসপটুতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের ও সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিও ইঙ্গিত করে গেছেন। অম্ল মধুর এই সমস্ত রচনা তাই ব্যক্তিগত সীমাকে অতিক্রম করে সর্বজন-আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

'নারীপ্রগতি' (প্রহাসিনী) কবিতার মধ্যে আবার ঠাট্টার ছলে বলেছেন—

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে।

*দ্রঃ "গ্রন্থপরিচয়"—'প্রহাসিনী'—রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩শ খণ্ড [প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৫ পৃঃ ৫৩০—৫৩১]

শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর কাছে আবার মধু চেয়ে পাঠালেন ছন্দে গাঁথা চরণের মাধ্যমে—

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাবো নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।

['মধুসন্ধায়ী'-'১' সংযোজন—প্রহাসিনী]

এইভাবে পরিহাস ছলে কবি যে-কোনো বিষয় নিয়ে হাস্যরসের কবিতা অনায়াসে রচনা করে যেতেন। কবি-সমালোচক-শিক্ষাবিদ-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের পাশে পাশে একটি পরিহাসরসিক সাধারণ সত্তা যে সদাজাগ্রত ছিল তা কবিরও অজ্ঞানা ছিল না। তাই 'প্রহাসিনী'র 'ভূমিকা'য় বলেছেন—

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

কবি আত্মসমালোচনা করে আপন খ্যাপা মনটির যে পরিচয় দিলেন, সেই মনটির সজীবতা সম্বন্ধে তাঁর স্থির বিশ্বাস—

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।

['ভূমিকা'—'প্রহাসিনী']

সুতরাং বিচিত্র এই জগৎ ও জীবনের নানা গুরু গম্ভীর কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, হাসি-আনন্দ-গানের পাশাপাশি চলে মনের এই স্বাভাবিক মুক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্য—হাস্যপরিহাসের অনাবিল উৎসধারা—'প্রহাসিনী' সেই আন্তর রহস্যকেই ধারণ ও বহন করে রেখেছে।

নানা কাব্যের 'বিচিত্র জীবন চেতনা'র মধ্যে দিয়ে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল যে শিশুমনটির পরিচয় পাওয়া যায়—সেই শিশুমনটি 'শেষ পর্যায়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ রচনার চিন্তা-ভাবনা-দর্শন-মননের পাশে পাশে রচনা করে চলে শিশুদের জন্য "খাপ-ছাড়া", "ছড়ারছবি" ও "ছড়া" কাব্য। শিশুদের উপযোগী কবিতা, গল্প, ছড়া কবি বালক বয়স থেকেই রচনা করে আসছেন, "জীবন স্মৃতি" ও "ছেলেবেলা"র মধ্যে আপন শৈশবকালের কচি মনটিকে প্রবীণ কবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম করে দেখার চেষ্টা করেছেন। শিশুর মানস-জগৎ

যে একটি স্বতন্ত্র জগৎ, অনুভূতিশীল কবিমনে তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। শিশু যে এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বিস্ময়ে সমস্ত জগতের রহস্যকে ভেদ করতে চায়, তার জানার কৌতূহল একদিকে অসামান্য, অপরদিকে আপন মনের ক্ষমতা অনুযায়ী সে একটি রহস্যময় কল্পজগৎ আপনিই সৃষ্টি করে নেয়—বড়দের কাছে সে আমল পায় না, তার এই খেয়ালীমনের নানা প্রশ্নের উত্তরও কেউ দেয় না, তার পছন্দের-অপছন্দের কোনো দামও কারও কাছেই নেই—আছে শুধু বকুনি—শাসন, ছোট বলে অবহেলা—কবি এ সমস্ত যেন নিজের জীবনকে দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন। কবি-শিশু নিজের জীবনের এই বেদনাকে দেখতে পেয়েছিলেন অন্য শিশুদের মাঝে। তাই শিশুদের জন্য চিরকাল তাঁর দরদ ছিল অফুরন্ত। তাঁর শিশু সাহিত্যের জন্ম হোল এই মানসিকতা থেকেই। অবশ্য এ সমস্ত রচনা যে সবসময় শিশুমনের মাপ-মত তৈরি তা নয়, কারণ শিশু ছোটো বলেই যে কোনো বড় জিনিসকে জানতে বা বুঝতে চাইবে না, এটা তিনি মানতে চাইতেন না। তার মনের সামনে মেলে ধরলে সে আস্তে আস্তে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু অংশ গ্রহণ করবে এটা কবি বিশ্বাস করতেন। "ছড়ার ছবি"র 'ভূমিকা'য় তাই বলেছেন—

"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়"।

বিষয়ের থেকে রচনার ধ্বনি ও সুরের প্রতিই যে শিশুমনের আকর্ষণ বেশী তা কবি বুঝেছিলেন, তাই তাঁর শিশুসাহিত্য এমন অনিন্দ্যসুন্দর।

শিশুসাহিত্য বলতে আমাদের দেশে কিছু 'রূপকথা' গল্পের আকারে এবং কিছু 'ছড়া' প্রচলিত ছিল লোকের মুখে মুখে, কিছু বা সাহিত্যে। কিন্তু তার জন্ম ইতিহাস জানার কোনো উপায় নেই। এছাড়া সচেতনভাবে সৃষ্ট এই সাহিত্যকে প্রথম পাওয়া গেল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে; কিন্তু সেখানে শিশুশিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তককেই শিশু-সাহিত্য হিসেবে পাওয়া যায়। শিশুদের আনন্দ বর্ধনের জন্য কোনো হাস্যোজ্জ্বল রচনার সন্ধান সেখানে মেলে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল যে সমস্ত শিশুসাহিত্য রচনা করেন, তা সবই উদ্দেশ্যমূলক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "বালক" পত্রিকার সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেইশ বৎসরের যুবক, তাঁরই হাতের "বালকে"র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"ই প্রকৃতপক্ষে শিশুমনের উপযোগী প্রথম সার্থক রচনা। "শিশু" কাব্যগ্রন্থে পরবর্তী কালে এ কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। ভাবসম্পদের দিক থেকে, গঠন-

নৈপুণ্যে, ছন্দের সুরধর্মিতায়, এ কবিতা সমস্তকালের শিশুহৃদয়েই আসন করে নিয়েছে। প্রাণরসে সমুজ্জ্বল শিশুমনের উপযোগী সার্থক কবিতা সেই যেন আমরা প্রথম পেলাম। সেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা "ছড়া" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্য, গম্ভীর রসোজ্জ্বল নানা জাতীয় শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। "শিশুর জবানীতে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে, আর কোনো কবি কবিতাও রচনা করেন নি। বহির্জগৎকে শিশু যে চোখে দেখে ও বিচার করে রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি হলেও তাঁর চিত্তে সেই অনুভূতির উদয় শিশুসাহিত্য রচনাকালে বারংবার ঘটেছে। তাঁর শিশুসাহিত্যের বহু কবিতায় এটি প্রতিভাত।

যে বয়সে মানুষ তার বহুদূরে ফেলে-আসা শৈশবের রঙিন ও নিরুদ্বেগ দিনগুলিকে স্মরণ করে বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করে "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটি তাঁর সে বয়সে রচিত নয়। আর, শিশুর স্বল্পকালের, স্বল্প-পরিসর জীবনেও সুমধুর অতীত চিন্তার উদয় এবং তা উপভোগের অবকাশ ঘটে না একথাও সত্য। অতি স্বল্পকালের অতীত জীবনের ঘটনাবলী তার কাছে গৌণ; সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। তার সমগ্র চেতনা অধিকার করে থাকে বর্তমানের জগৎ। কিন্তু কবিতাটির অনেকাংশেই মনে হয়, সেগুলি পরিণত বয়সেরই উক্তি, যদিও স্বয়ং কবি তখন তরুণ।"[১]

সেই তেইশ বছরের তরুণ কবি যে সার্থক শিশুকবিতা রচনা করলেন পরবর্তী পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর ধরে তাকেই তিনি নানাভাবে পুষ্ট ও পরিণত করে শিশুমনের বিচিত্র মানসলীলাকে গতিদান করেছেন। গুরুগম্ভীর নানা রচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন শিশুজগতের হাল্‌কা ভাবকল্পনার মধ্যে পক্ষবিস্তার করেছে মাঝে মাঝে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি তাঁর রুগ্না কন্যা রেণুকার বায়ুপরিবর্তনের জন্য কিছুকাল 'আলমোড়া' বাস করেন। এই সময় 'শিশু'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। পূর্ববর্তী-কালে লেখা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতাও এ কাব্যের অন্তর্গত। 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র (১৩২৮—ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক) অধিকাংশ কবিতাই শিশুর জবানীতে মাকে উদ্দেশ্য করে রচিত। মাতা এবং সন্তানকে ঘিরে যে বাৎসল্যরস মানবজীবনের প্রানোন্মেষের কালে সহস্রধারায় প্রবাহিত হয়—তা যেন এই কাব্যদুখানিতে টলমল করছে। "রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য রসের আকর। শিশুসাহিত্যে রসের পরিমাণ অধিক দেওয়ার পক্ষে ছিলেন কবি। সেজন্যে তাঁর রচনাবলী রসালো। কিন্তু বাল্যে সকল-প্রকার সাহিত্যরস উপলব্ধি ও জীর্ণ করার শক্তির অভাব থাকে"।[২] তাই তাঁর রচিত

১। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—"রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য পরিক্রমা" [প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ । ১ । সূচনা-পৃঃ ২—৩]

২। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—"রবীন্দ্র-শিশু-সাহিত্য-পরিক্রমা" [প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ । ২ । শিশু ও শিশু ভোলানাথ-পৃঃ ৯]

শিশুসাহিত্য শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্করাও সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। ভাবে এবং ভাষায়, ছন্দে এবং গঠন পারিপাট্যে একেবারে সহজ কথায় সহজ সুরে লেখা যে খুব সহজ নয়-তা কবি "খাপছাড়া"র প্রথমেই ব'লেছেন—

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয়তো।

এই যা-তা লেখা যে তেমন সহজ নয়—তা কবি বেশ জানতেন। 'বৃদ্ধের খোলসটা খসিয়ে' সহজ হবার চেষ্টাও করেছেন তাই বার বার। এ মন বার্ধক্যেও রোগজীর্ণ শরীরে, তার অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে 'ছড়া' কাব্যের অনবদ্য ভাবসৌরভে ও সজীব প্রাণচেতনায়। "জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রস্ত; মন যখন প্রকাশ অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ হয়, তখন কবিচিত্ত আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্য উপহাসে। গাণিতিক নিয়মে curve-এর মতন যেন ইহার গতিরেখা-কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রসউদ্বেলিত গানের ধারার পরে এই চক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পান। তাই 'জীবনের রস আজ মজ্জায়' রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে। সে রসপ্রলাপ কখনো 'প্রহাসিনী'র কৌতুক-হাস্যে কখনো 'ছড়া'র প্রলাপে ব্যক্ত। এই সব ছড়া হাল্কা ভাবের মুক্তশৃঙ্খল কল্পনায় পূর্ণ, দায়িত্বহীন আনন্দ কোলাহলে মুখর।"[১]

বড়দের সচেতন বুদ্ধিজীবী মনটির আড়ালে যে একটি চিরশিশু সুপ্ত অবস্থায় আছে, সেও মাঝে মাঝে ঘরছাড়া হয়ে যায় এই 'খাপছাড়া' ভাবের মধ্যে। হিসেবী মনটার বাইরেই তো আমাদের সত্যিকারের মুক্তি। "শিশুর মধ্যেই বৃদ্ধের আত্মআবিষ্কার ঘটে ষোল আনা; নূতন দর্পনে সেই পুরাতন ছবিটি দেখেই তো বৃদ্ধের সময় হবে সংসার থেকে বিদায় নেবার।"[২]

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার রায়ের রচনা, শ্রীরাজশেখর বসুর রচনা এবং বিদেশী লেখক লেভ তলস্তয়ের শিশুসাহিত্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুমনের বিচিত্র লীলাবৈচিত্র্যে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়, ভাব ও সুরঝঙ্কারের

১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্র জীবনী"—৪র্থ খণ্ড [প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৬৩—পৃঃ ২০৫]
২। শ্রীকানাই সামন্ত—"রবীন্দ্র-প্রতিভা"—[প্রকাশ: ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ শিশু পৃঃ ১৪৪]

পারিপাট্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির মত এতেও ভাবের গভীরতা গঠন-কল্পনায় শিল্প-সুষমার চমৎকারিত্ব এনে শিশুসাহিত্যেও তাঁর অদ্বিতীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম জীবন এবং শেষ জীবনের শিশুসাহিত্যের মধ্যে ভাব-ভাষা-কল্পনা-মনন-দর্শন সবকিছুর একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। "শিশু" "শিশু ভোলানাথে" শিশু ও মায়ের মনের বিচিত্র লীলাকে কেন্দ্র করে ভাবকল্পনা সুদূরে ডানা মেলেছে। কিন্তু 'শেষপর্যায়ের শিশুসাহিত্য'-মূলক গ্রন্থগুলিতে—"খাপছাড়া", "ছড়ারছবি", "ছড়া"তে কবির রচনা অনেক বেশী মননশীল ও বুদ্ধিজীবী। শিশু শুধু কল্পনার জগতে ভাবের ডানা মেলেনি, বুদ্ধি দিয়ে ভাবের এবং বিষয়ের রসসৌরভকে আস্বাদন করার আবেদন এসব কাব্যের মধ্যে রয়েছে। 'শেষপর্যায়ে'র গদ্য রচনার মধ্যে "গল্পসল্প", "সে" এবং "ছেলেবেলা" ও উল্লেখযোগ্য। "গল্পসল্পে" এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা 'খাপছাড়া', 'ছড়ারছবি' প্রভৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে বাঁধা। শিশুরঞ্জন কবিতার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় 'চিত্রবিচিত্র'—অর্থাৎ ওর কিছু কবিতা অন্যত্র পাওয়া যাবে না। 'সহজপাঠে'র কবিতাও একমাত্র ওতেই পাওয়া যাবে—সে কবিতাও অনিন্দ্য।

ছন্দবদ্ধ রচনার মধ্যে "খাপছাড়া", "ছড়ারছবি", "ছড়া" তিনটি তিন জাতের রচনা। "ছড়ারছবি"— নিঃসন্দেহে কবিতা, কিছু বা ছড়া-কবিতার সন্ধিস্থলে—বড়ো-ছোটো উভয়ের জন্য রচিত। "খাপছাড়া"—ছড়ার চুটকি, বড়ো-ছোটো উভয়েরই যজ্ঞভাগ আছে পৃথক পৃথক। "ছড়া" দীর্ঘছন্দের ছড়া—এর বহুলাংশ একেবারে পুরোপুরি বয়স্কদের জন্যই।

"খাপছাড়া"র রচনাগুলির কোনো নামকরণ নেই, প্রত্যেকটি খণ্ড খণ্ড ছন্দবদ্ধ রচনা সংখ্যা দিয়ে বিশেষ সীমার মধ্যে বাঁধা পড়েছে। সংক্ষিপ্তি এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভাবকল্পনাতেও—

ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

['ভূমিকা'—খাপছাড়া]

কবির যে 'অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না'—('উৎসর্গপত্র'—খাপছাড়া)—তা "খাপছাড়া"র মধ্যে প্রমাণ করেছেন। 'সংযোজন' অংশ নিয়ে মোট ১২৯টি ছড়া আছে এই গ্রন্থের মধ্যে। মাথায় তারা সকলেই প্রায় সমান—"আকারে কোনটিই দীর্ঘ নয়, প্রকারেও সবগুলি হালকা যেন একদল আনন্দ চঞ্চল শিশু। তাদেরই মধ্যে কয়েকটি কিছু গম্ভীর, কয়েকটি কিছু ম্লান, কিন্তু মুখে সংযত হাসি বলা যায়। (পৃঃ ১৬৯)

..."খাপছাড়া"য় নানা বয়সের নানা চরিত্রের মানুষের দেখা পাওয়া যায় যারা সাধারণ মানুষের গণ্ডীতে পড়ে না। লোকসমাজে তারা "খাপছাড়া" আখ্যায় ভূষিত হয়ে থাকে।

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ী ও মতিলাল নন্দী থেকে আরম্ভ করে সংখ্যায় তারা অনেক। বাস্তব জীবনে এদের দেখা পাওয়া না গেলেও এদের মতো চরিত্রের লোকের অভাব নেই। নির্লজ্জ, নির্মম, লোভী, ঔদারিক, ভীরু, শঠ, মিথ্যাবাদী, অলস, আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন ও চালবাজ প্রভৃতি বহু চরিত্র শিশুপাঠকবর্গের আসরে হাজির করে কবি যেন তাদের জীবনপথে সকৌতুকে সতর্ক করে দিয়েছেন। (পৃঃ ১৭৩-১৭৪)

…"খাপছাড়া"কে "উইট এণ্ড হিউমার" (wit and humour) বলাই যেন ঠিক। আমাদের বাংলার শিশুসাহিত্যে এ ধরনের রচনা বিরল। বাস্তবিকই এ এক জাদুর খেলা।"[১] (পৃঃ ১৭৫)

শিশুজগতে এমনকি বয়স্ক জগতেও, গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশিয়ে এমন হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। এ প্রসঙ্গে 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে'র কথা মনে পড়ে যায়—কিন্তু দু'য়ের জাত আলাদা। অথচ আমাদের চেতনা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকেও এ সমস্ত ছড়া নাড়া দিয়ে যায়। সমস্ত রচনাই যে শিশুমনের উপযোগী তা বলা যায় না। "খাপছাড়া প্রমাণ করেছে যে ছেলেমানুষের কথা লেখা এক কথা (এবং এই দুরূহ কাজ রবীন্দ্রনাথ "শিশু"তে যত ভালো পেরেছেন, জগতের আর কোনো কবি কখনো সে রকম পেরেছেন বলে জানি না), ছেলেমানুষের জন্যে লেখা আর।

…'খাপছাড়া' মহাকবির অবসরের ফুলকি—আবোল তাবোল ভালো কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। 'খাপছাড়া'য় পদে-পদে অপ্রত্যাশিত চমক লাগানো মিলের চকমকি, ছন্দটা হালকা চালের, এবং ঠাট্টার ইঙ্গিতগুলি এমন তির্যক ছাঁদে বিচ্ছুরিত যে কোনো শিশু যে তা পড়ে হাসতে পারবে এমন সম্ভাবনা অল্পই। ছন্দ-মিলের ঝঙ্কারে শিশুর মন খুশী হবে; কিন্তু সম্পূর্ণ রসটা বয়স্ক মনেরই উপভোগ্য।"[২]

তাই এ সমস্ত রচনা যে শিশুমনের উপযোগী তা বলা যায় না। তবে কিছু কিছু রচনা শিশুমনের কাছে সানন্দে গৃহীত হয়েছে—

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচবোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।

['১' সং—'খাপছাড়া]

১। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—"রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য পরিক্রমা" [প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১ পৃঃ ১৬৯, ১৭৩—১৭৫]

২। 'কবিতা" (আষাঢ় ১৩৪৫) "খাপছাড়া" সমালোচনা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ['নতুন কবিতা'-পৃঃ ৫৬]

বা

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেটকি।

['২' সং—'খাপছাড়া']

এই সমস্ত ছোটো মাপের পঙক্তিতে কবি মিলের কারিকুরি দিয়ে এমন ধ্বনি সৃষ্ট করেছেন যে অর্থ বুঝে হাসবার আগেই বালকবালিকারা ধ্বনির মোহে পড়ে যায়। কবি যে বলেছেন—'ওরা অর্থলোভী জাত নয়', কেবল 'খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে'—('ভূমিকা'—'ছড়ারছবি') তা সত্যি। তারপর এ ছড়াগুলির অর্থও তাদের অফুরন্ত আনন্দ দেয়। 'শাড়িগুলো উনুনে বিছিয়ে' 'হাঁড়িগুলো আলনায়' রাখা বা 'নিন্দুকের ভয়ে নিজেরা লোহার সিন্দুকে থেকে টাকাকড়িগুলোকে হাওয়া খাওয়ার জন্য খোলা জানলায় রাখা'—বেশ কৌতুকজনক বৈকি! তবে খুব ছোটো শিশুরা অর্থ বুঝে কৌতুক অনুভব করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টিতে শিশুদের উচ্ছলিত করেছে—

ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলা ব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।
বনমালী খুড়ো বলে,—
'করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়ো না বক্ষে'।
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু 'ক্যাঙ'।

['৬৭' সং—খাপছাড়া]

অথবা

'শুনব হাতির হাঁচি',
এই ব'লে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।

শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি,
সাত জ্বালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি,

*   *   *

হেঁচে দু-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা

['২৯' সং—খাপছাড়া]

কিংবা

ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন, চড়েছেন চৌঘুড়ি।
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।
পথ দেখালো মাছরাঙাটায়, দেখল এসে চিংড়ি ঘাটায়
ঝুমকো ফুলের বোঝাই নিয়ে মোচার খোলা ভাসে।
খোকন বাবু বিষম খুশি খিলখিলিয়ে হাসে।

['৫' সং-সংযোজন—খাপছাড়া]

এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতির সাহায্যে যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, বিশুদ্ধ-নির্মল-শুভ্র-সংযত এবং শিশুমনের পক্ষে একান্তভাবেই উপযোগী। এই রকম কিছুসংখ্যক ছড়া "খাপছাড়া" গ্রন্থকে পরিপুষ্ট করলেও অধিকাংশ ছড়াই কিন্তু বয়স্কদের মনেই আনন্দ জাগাতে সক্ষম। সেই সঙ্গে জীবনের নানা অসঙ্গতিকেও যেন কবি কৌতুকহাস্যে নাড়া দিয়ে গেছেন। শিশুরা অনায়াসে এর অর্থ বুঝে আমোদ পেয়ে হাসবে এমন তো মনে হয় না। এরকম ছড়াই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। যেমন—

টেরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টম বাবা,
নাম নিল বেনু।
শুদ্ধ নিয়ম মতে
মুরগিরে পালিয়া,
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া;

মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু।

['১২' সং—'খাপছাড়া']

কবি সমাজের যে শ্রেণীর লোকের প্রতি এর মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন এবং কটাক্ষবাণ হেনেছেন তাঁরা সকলেই আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু এ রচনা পড়ে. শিশুরা আমোদ পাবে তা কখনো সম্ভব নয়।

ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের নানারকম আবিষ্কারের প্রতি কটাক্ষ হেনে কবি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূল বাবু বলে, 'ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ করে চাষ করা শস্য।

['১৮' সং—'খাপছাড়া']

আধুনিক কবি এবং কাব্যের প্রতি কটাক্ষ হেনেও কবি তার সম্পর্কে নানারকম ব্যঙ্গোক্তি করতে ছাড়েননি। আধুনিক কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য এবং তা নিয়ে কবিদের যে নিজস্ব যুক্তি কবি কৌতুকছলে তাকে কশাঘাত করেছেন অম্ল-মধুর ভাষণে। যেমন—

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলু থালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা;
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

['২০' সং—'খাপছাড়া']

এই সমস্ত ছড়ার ভাবভঙ্গী যতই হাসির খোরাক যোগাক না কেন—সমাজের নানা শ্রেণীর লোকচরিত্রে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য আছে তাদের প্রতি ইঙ্গিত যে

এ সমস্ত রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। কবি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সব সময় যে এই সমস্ত রচনার জন্ম দিয়েছেন তা হয়তো নয়, চরিত্রচিত্র এঁকেছেন কৌতুকসুখে। তবে হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অসঙ্গতি আমাদের বেশ নাড়া দিয়েও যায়। বুদ্ধিদীপ্ত এই সমস্ত ব্যঙ্গকৌতুকের যে অর্থ বা যে ধরনের হাসির খোরাক এ সমস্ত ছড়া যোগায় তা শিশুমানসের পক্ষে ততখানি উপভোগ্য নয়—যতখানি বড়দের পক্ষে। তাছাড়া এমন অনেক কঠিন শব্দ, ইংরাজী শব্দ বা বিদেশী শব্দ আছে যার অর্থ বোঝাও কেবলমাত্র অপরিণত শিশুমনের সামর্থ্যে কুলায় না। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে "খাপছাড়া"য় আমাদের জগৎ ও জীবনের "খাপছাড়া" অসঙ্গত দিকটাকে নিয়ে কৌতুক করে কবি ছোটোবড়ো সকল চিত্তকেই হাস্যরস যুগিয়েছেন। কাউকেই কবি বঞ্চিত করেননি। বার্ধক্যেও কবিকে আমরা নূতন রূপে পেলাম। এ রচনা যেন তাঁর শেষজীবনের অন্যতম সোনার ফসল।

"ছড়ারছবি"তে কবি বর্ণনা চাতুর্যে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। ১৯৩৭-এর ২৯শে এপ্রিল কবি আবার 'আলমোড়া' যাত্রা করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই "শিশু"র অধিকাংশ কবিতার জন্ম হয়। বার্ধক্যে কবি কি সেই কথা স্মরণ করে আবার শিশুপাঠ্য রচনায় হাত দিলেন? শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত অনেকগুলি ছবি কবির সঙ্গে ছিল, এই সমস্ত ছবির অব্যক্ত বাণীকেও কবি যেন কবিতার ছন্দে গাঁথতে চাইলেন। আমাদের চোখের সামনে যে চলমান জগৎ ও জীবন বর্তমান—তারই আশে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি জগতের অনির্বচনীয় রূপসৌন্দর্যের লীলা মাধুর্য। চিত্রশিল্পী একে রঙের রেখার তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন জীবন্ত করে। কবি তাকে ভাষা-ছন্দে-ভাবে গেঁথে নবজন্ম দেন আর এক ভাবরূপের মধ্যে।

কিন্তু 'ছড়া'র জগৎ আর এক স্বতন্ত্র জগৎ—শিশুরাজ্যের রূপকথার জগৎ—অসংলগ্ন তার ভাব-কল্পনা-ছন্দের গাঁথুনি। কোনো সচেতন কবি-শিল্পীর সযত্ন পরিকল্পিত শিল্পপ্রয়াস এর অঙ্গে বর্তমান ছিল না। একের পর এক ছবির মেলা—চিত্র এবং সুরের মাধুর্যে শিশুমন মাতাল হয়ে ওঠে এই প্রাচীন গ্রাম্য ছড়াগুলির মধ্যে। কিন্তু বিশ্বকবির হাতে ছড়াগুলি অসংলগ্ন ভাবপরিকল্পনায় বাঁধা পড়েনি, বেশ সুসংগতিই লাভ করে ছন্দের 'প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া' ('ভূমিকা'—'ছড়ারছবি') চঙটিকে আয়ত্ত করে অপূর্ব চিত্রধর্মিতা ও ধ্বনিসুষমা লাভ করেছে। সমস্ত কবিতাগুলিই বেশ আকারে দীর্ঘ, প্রকারে শিশুমনের চেনাজানার সীমানাকে পার হয়ে দূর-লোকে কল্পনায় ডানা মেলেছে। কোনো পাণ্ডিত্য নেই, কোনো দার্শনিকতা নেই, ভাব-ভাষার মধ্যে দুরধিগম্য কোনো কাঠিন্য নেই; অন্তরে-বাইরে, ভাষায়-কল্পনায়, ভাবে-ছন্দে যেন একদল আনন্দ চঞ্চল শিশু নৃত্য করে চলেছে। অথচ চিত্রের দিক থেকে একটা চিত্রের পরে আর একটা চিত্র অনায়াসে সংযোজন করে

গল্পগাঁথার রূপ নিয়ে তারা ছুটে চলেছে দূর দেশে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নদী-মাঠ-খাল-বিল-আকাশ-প্রবাস পার হয়ে কোন্ রূপকথার দেশে। শিশুমন স্বভাবতঃই এই সহজ গল্পরস আস্বাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

অনেকগুলি কবিতা কবির বালক বয়সের স্মৃতি দিয়ে আঁকা। তার মধ্যেও আপন শিশুমনের বিচিত্র ভাবকল্পনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এরই গদ্য রূপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "জীবনস্মৃতি" ও "ছেলেবেলা"য়। কবি নিজের শৈশব জীবনের কথা মনে রেখে "রোলার চালিয়ে" ("ভূমিকা"—ছড়ারছবি) সবগুলি রচনার মাথা "সমান সুগম" ("ভূমিকা"—ছড়ারছবি) করেননি, কারণ, সুর বা ধ্বনিই শিশুমনকে প্রথম আকর্ষণ করবে এই তাঁর অভিমত। অর্থ নিয়ে শিশুদের কোনো নালিশ নেই, অর্থ তাদের বোঝালেও আপন মনের ক্ষমতা অনুসারে কল্পনা বলে তারা একটা রূপকথার জগৎ আপনিই সৃষ্টি করে নেয়; শব্দের অর্থ এবং উচ্চারণ ব্যাপারেও শিশুরা নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে তাকে প্রয়োগ করে, অর্থ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই তাদের। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন সচেতনভাবে "ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার" ('ভূমিকা'—ছড়ারছবি) কোনো সুযোগ কেউ কখনো ছড়াকে দেয়নি। এর "ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে"ই ('ভূমিকা'—ছড়ারছবি) এতদিন এসেছে। কিন্তু 'এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য যে সহজে প্রবেশ করে,···অজ্ঞাতসারে'—('ভূমিকা'—ছড়ারছবি) তা কবি টের পেয়েছিলেন অনেকদিন আগেই, তাই আপন শিল্পসাধনা দিয়ে কেবল শিশুদের জন্য নয় বড়দেরও আনন্দদানের উপযোগী করে বাংলা প্রাকৃতভাষার ভাব ও রূপ সৌন্দর্যকে নবজন্ম দান করে গেলেন "খাপছাড়া", "ছড়ারছবি" ও "ছড়া"তে। "ছবি ও গানের যুগ্ম উপাদানে ছড়া রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দুটিই আয়ত্ত বলিয়া ছড়া রচনায় তাঁহার দক্ষতা আছে। মহৎ কবি হইলেই যে ভাল ছড়া লিখিতে পারে এমন নয়—ছড়া লিখিবার জন্যে বিশেষ এক প্রকার শক্তি আবশ্যক, মহৎ কবিত্বের সঙ্গে যাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই"।[১]

"ছড়ারছবি"র "জলযাত্রা" কবিতায় ছড়ার ছন্দে গেঁথে কবি কেমন 'ছবি' এঁকে চলেছেন—

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।

১। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ"—১ম খণ্ড [সং-আশ্বিন ১৩৬৮ পৃঃ ৪১]

সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া,
যদুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুরবেলার খাওয়া ;
তারপরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
একপহরে চলে যাব মুখলুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।

এমনি করে একের পর এক চিত্র যোজনা করে কবি "জলযাত্রা" সমাপন করেছেন। একটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে কবিতাটি এগিয়ে চলেনি—একের সঙ্গে আর এক বিচ্ছিন্ন ছবি এসে যুক্ত হয়ে ছড়া গেঁথে চলেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কবি তাঁর শিল্পিমনের কাব্যসৌন্দর্যবোধের আভাসও রেখে গেছেন যা শিশুমনকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত না করলেও বড়দের অবশ্যই করে—

লাগবে আলোর পরশমণি পূব আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।

['জলযাত্রা'—'ছড়ারছবি']

ছড়ার ছন্দের একটানা ধ্বনি-সুষমার মধ্যে ছন্দের এই অভিনবত্বও কাব্যরসিক মনকে পুলকিত করে। অথচ এই বিচিত্র চলচ্ছবির মাঝে গ্রামীণ জীবনের একখানি নিখুঁত রূপ-রেখা আঁকা পড়েছে কবির সুনিপুন তুলিতে—

বোষ্টম সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকালবেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
হেলেদুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।

অথবা [ঐ]

সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্দুরে।
গিয়ে ভজন ঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মূলো, কিনব সজনে ডাঁটা।

['জলযাত্রা'—ছড়ারছবি]

সাধারণ জীবনের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন অনির্বচনীয় কাব্যসুষমা লাভ করেছে।

"ভজহরি" কবিতাটি ছোটদের চিত্তকে আরও আকর্ষণ করে। নানা রকম পাখি-ফড়িং-এর এমন চমৎকার গল্প যা তাদের জগতেরই কথা। কবি "পুনশ্চ" কাব্যের 'ছেলেটা' কবিতায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

'থাকতো ওর নিজের জগতের কবি,
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনো দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি'।

তাই 'ভজহরি' ('ছড়ারছবি') কবিতায় কবি যেন সেই দুঃখ ঘোচালেন বালকদের--

হংকঙেতে সারা বছর আপিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা,
দিয়েছিলেন মাকে,
ঢাকার নিচে যখন-তখন শিষ দিয়ে সে ডাকে
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িং ধরে।

এই ভজহরি বলত—

"পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না এক রত্তি।

* * *

একদিন সে ফাগুনমাসে মাকে এসে বলল,
গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।
শুনে আমার লাগল ভারি মজা,
এই আমাদের ভজা,
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।

['ভজহরি'—'ছড়ারছবি']

শুনে তো ভারি মজা সব বালকেরই লাগে, মজা আরও সপ্তমে পৌঁছায় যখন দেখা যায়

এই 'ভজু'র মেয়ে 'কে'—এবং তার বিয়েতে কেমন ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া-বাজনা-বাদ্যি হবে। 'ভজু' সগৌরবে বিয়ের ফিরিস্তি দেয় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

"বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে" ?
ভজু বললে, "খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে।
কেউবা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।
মোটা মোটা ফড়িং দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা ;
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম্‌ ;
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানা রকম।

['ভজহরি'—'ছড়ারছবি']

বলাই বাহুল্য এমন গল্প এবং ধুমধামের বহর শুনে সমস্ত বালক বালিকাই আনন্দে নেচে উঠবে, বড়রাও কবির এ বয়সের শিশুমনের পরিচয় নূতন করে পেয়ে ধন্য হবেন।

কতকগুলি কবিতা কবির শৈশবের অতীত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। 'কাঠেরসিঙ্গি', 'খাটুলি', 'পদ্মায়', 'বালক', 'আতারবিচি', 'যোগীনদা' প্রভৃতি। 'যোগীনদা'র চরিত্রটি কবির নিজের বাল্যস্মৃতি মেশানো। 'যোগীনদা'র 'শেষবয়সের স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে'—যদিও—

"জুলুম তোদের সইব না আর" হাঁক চালাতেন রোজই, কিন্তু—পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই। তাঁর দরবারে কোনো ছেলে মেয়ের ফাঁক পড়বার জো ছিল না। তিনি তখনই—

ডেকে বলতেন, "কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোঁকি" !
"ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া"
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারি গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চারদিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি।
কেউ বা লজঞ্জুস,
সেটা ছিল মজলিসে তার হাজির দেবার ঘুষ।

'যোগীনদা' এমনি করে ছেলেদের দরবারে সবার ওপরে তাঁর আসন করে নেন। কবি বার্ধক্যে শিশুমহলে তাঁর যে কদর ছিল তাকে স্মরণ করে অনেক কথাই লিখেছেন এই কবিতায়। মিট্‌মিটে তেলের আলোয় যখন গল্প উঠত জমে, তখন—

শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক ;
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হত উলটো-পালটা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবই।

বাঁধা-ধরা পথের শাসন-বাঁধন-নিয়ম-কানুনের বাইরে যে মানুষটি, তাঁকে তো শিশুরা আপন মনের সঙ্গী বলেই গ্রহণ করে থাকে ; বয়সের দূরত্ব সেখানে কোনো বাধাই নয়, যোগীনদার শিশুমনটিই তাঁকে অমর করে রেখেছে চিরকালের শিশুমহলের কাছে।

'পিস্‌নি', 'বুধু', 'অচলাবুড়ি', 'সুধিয়া', 'মাধো' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে নানা রকমের চরিত্র সৃষ্টি করে কবি যেন মজার মজার গল্প বলে চলেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি ছড়াই আকারে দীর্ঘ, গল্পের আধারে কবি নানা রকমের রস পরিবেশন করে চলেছেন। সমাজের নানা রকমের মানুষ ও তাদের চরিত্রের যে বিভিন্ন দিক তা যেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সকলকে সজাগ করে দিয়েছে।

'পিস্‌নি' বুড়ির করুণ চরিত্র সৃষ্টি করে কবি সংসারে মানুষের মস্ত বড় দাম কিসে এবং তার অভাবে মানুষ যে কত অসহায়, সেই করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন—

একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো,
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হল।

এ সংসারে কোথাও তার আর কোনো দাম নেই, কোথায় যে তার একটু ঠাঁই আছে তাও সে জানে না—কারণ,

দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্ঝাটে
তাদের বেলা কাটে।
তারা এখন আর কি মনে রাখে
এত বড়ো অদরকারি তাকে।

['পিস্‌নি'—'ছড়ারছবি']

কি মর্মান্তিক ভাবেই না কবি সংসারের এই 'এতবড় অদরকারি' চরিত্রটির ছবি এঁকেছেন। কি অসহায় কি করুণ তার অবস্থা ; অথচ মায়াময় এই সংসারে সে আজও কাউকে না কাউকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চায়। রাত থাকতে গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েও—

দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে।

চিরচেনা গ্রামটিকে—একটি আশ্রয়কে ছেড়ে সে যে কোথায় গিয়ে উঠবে—এতবড় বিশ্বের কোনো দরজাই যে তার সামনে খোলা নেই এই মস্ত বড় শূন্যতাটাই তার পথের পরে বসে পড়া এবং উদাস দৃষ্টিতে শূন্য পানে চেয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। সামান্য এই একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবির যে অন্তর্দৃষ্টি এবং বাস্তব জীবন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় তা খুবই বিস্ময়কর। অবশ্য এই অনুভব শিশুমনের উপযোগী নয়—এটা পুরোপুরি বয়স্কমনের অনুভবের জিনিস।

'অচলাবুড়ি'র (ছড়ারছবি) চরিত্র আবার অন্য জাতের। টাকা পয়সার পরে তার তেমনি মায়া। তার চেহারার বর্ণনাও কবি বেশ সুন্দর করে দিয়েছেন।—

অচলবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতিমধুর জরা।

'স্নেহের রসে পরিপক্ক' এই মনটি এ সংসারে জাত মানে না, ধর্ম বোঝে না, সর্বসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মানুষের প্রয়োজনের সময়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। এ সংসারের ছোটো বড়ো সকল প্রাণের জন্যই তার দরদ—

গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে,
সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে।

আবার 'সাৎরাপাড়ার কায়েত বাড়ির বিধবা এক মেয়ে' যখন হাসপাতালের কাজ নিল, সকলে ছি ছি করলো—কিন্তু বুড়ি—

সে বলে, "তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।"

তেমনি 'রাই ডোম্‌নি'র ছেলেকে মিথ্যে দোষী করে জেলে দিলে সে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যায় তখন—

প্রতি মাসে অচলবুড়ি দামোদরের পারে
মাসকাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে।

অবশেষে 'পাতানো এক নাতনি'কে অসুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে দিল প্রাণ এবং যাবার আগে—

ডোম্‌নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।

এই সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করে কবি যেন মানবচরিত্রের স্থায়ী সত্যবোধকে মনুষ্যত্ববোধকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন কচিমনের কাছে। গল্পের মধ্যে দিয়ে কবি জীবনের বিচিত্র ছবি এঁকে চলেছেন সে ছবি শুধু অসংলগ্ন হাস্যকৌতুক নয়।

'ছড়ারছবি'র কয়েকটি কবিতা গল্প হলেও serious। তাতে ধনী মহাজন জমিদারের অত্যাচার ও গরীবের প্রতিরোধ সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে। রচনার পটভূমিতে চটকল ধর্মঘট জাতীয় বাস্তব ঘটনাবলী আছে।

'সুধিয়া' (ছড়ারছবি) কবিতার 'তুনি চাঁদ বেনে'র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অত্যাচারী মহাজনদের কথা কবি বোঝাতে চেয়েছেন, টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব মানুষকে কিনে নিতে চায় আর টাকার বলে সব অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দিতে চায় সেই শোষক শ্রেণীর কথা। 'সামরু' গোয়ালা দেখিয়েছে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ কেমন করে করতে হয়।

'মাধো' (ছড়ারছবি) কবিতার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক এবং সংঘর্ষের কথা। ধনী মালিকশ্রেণীর যে অত্যাচার দরিদ্র শ্রমিকদের উপর তা এই কবিতায় পাটকল শ্রমিক ধর্মঘটের অবতারণা করে কবি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে ধনী মহাজনের অর্থবলের থেকে দরিদ্রের চারিত্রবল ও সত্যের বল যে আসল শক্তি, মনুষ্যত্বের মূল্যবোধের নিকট যে সকলেই একদিন পরাজিত—এই সত্যটি 'সুধিয়া' ও 'মাধো' কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। গরিব হলেও এরা যে বেইমান নয়, সত্যের জন্য এরা যে ধন-প্রাণ সব দিতে পারে কিন্তু 'মান' দিতে পারে না, তা ছা-পোষা গরিব 'মাধো'র উক্তি থেকেই বোঝা যায়। মালিক সাহেব ধর্মঘটের সময় মাধোকে প্রলোভন দেখিয়ে—

বললে, "মাধো ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে"।
মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে"।
মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে"।

মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও চারিত্রশক্তি যে অর্থকে অবহেলা করতে পারে, তুচ্ছ করতে পারে এবং সেখানে কোনো ভয়, কোনো ক্ষতিই যে প্রবল নয়—তা সমাজের এই সমস্ত অবহেলিত নিরন্ন অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকদের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন। 'সামরু', 'মাধো' ('ছড়ার ছবি') চরিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'ছড়া' কাব্যগ্রন্থে অসংলগ্ন মনের খাপছাড়া ভাবকল্পনা একের সঙ্গে আর এক এসে যুক্ত হয়ে মালা গেঁথে চলেছে। 'ছড়ার ছবি'তে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ছবি এঁকে চলেছেন কবি। কিন্তু 'ছড়া' একেবারে শিশুচিত্তের এলোমেলো ভাবকল্পনার জগতে ডানা মেলে অনবদ্য হয়ে উঠেছে 'ছড়া'র জগতে। গ্রাম্য ছড়াগুলির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—তা

'খাপছাড়া' বা 'ছড়ার ছবি'তে তেমনতরো মহিমায় ফুটে ওঠেনি যেমন 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থে উঠেছে। মানুষের অবচেতন মনের অলস বেলাতেই যে 'ছড়া'র জন্ম এ কথা কবি এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়্ঘড়ানি,
যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ—

এই 'এলোমেলো ছিন্নচেতন টুক্রো কথার ঝাঁক, ফাঁক খুঁজে বেরিয়ে আসে কবির জীবনে। কবি জানেন না তাঁর জীবনে এই 'খ্যাপা ধূমকেতু', কেন মাঝে মাঝে 'গম্ভীরের ঝুঁটি'কে (মুখবন্ধ—প্রহাসিনী) নাড়িয়ে দেয়—'কর্মরথের ঘড়্ঘড়ানি' থামলে এই স্বপ্নরাজ্যের ছিন্নচেতন ভাবনাগুলো 'দিনের বেলার গর্ত ছেড়ে' যেন বেরিয়ে পড়ে। এদের 'কারো আছে ভাবের আভাস—কারো নেই অর্থ'। কিন্তু অসংলগ্ন বা এলোমেলো বলে গোটাটাই গোলমেলে নয়। একের সঙ্গে আর একের যোগ ভাবের দিক থেকে ঠিক না থাকলেও পারস্পরিক চিত্র যোজনার দিক থেকে এদের মধ্যে একটা সংগতি অবশ্যই আছে। কোনো কোনো স্থানে এমন চিত্র বা শব্দযোজনা করেছেন—যা একেবারেই বালক বালিকার রসবোধের যোগ্য নয়। 'ছড়া'তে কিছু কিছু বয়স্ক ঠাট্টা টিট্কারি আছে, অর্থাৎ 'সমালোচনা' উদ্দেশ্যমূলক বলাও চলে, যদিও তার সংখ্যা অল্প। 'ছড়া'গুলির কোনো নামকরণ নেই—(সাময়িক পত্রে প্রত্যেকটির নাম ছিল, যা যা বেরিয়েছিল) সংখ্যা দ্বারা একের পর এক মনের ছিন্নচেতন ভাবনাকে কবি রূপ দিয়ে গেছেন একেবারে চল্তি ভাব এবং ভাষায়। যেমন—

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।

বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।

['১' সং—ছড়া]

এইভাবে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন কবি। 'আদমদিঘির পাড়ে লাল বাঁদরের নাচন' দেখা রামছাগলের ঘাড়ে বেশ কৌতুককর বৈকি! এ-তো যে-কোনো শিশুর পক্ষেই মজার ব্যাপার। তারপর মজা আরও জমাট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়—

হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।

[ঐ]

এই হাঁচির চোটে চারদিকে যে উলোটপালট কাণ্ড ঘটে গেল—তা নিয়ে কবি বেশ কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। আবার বিশুদ্ধ কৌতুকই নয়, 'হিং টিং ছটে'র ছোটো ভাই।

দ্বিতীয় ছড়াটিতে তেমনি একটা মিষ্টি মধুর কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। 'কদমাগঞ্জ উজাড় করে' সমস্ত মাল যখন মালদহে আসছিল তখন চড়ায় নৌকাডুবি হয়ে—

তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে

তাই—কদিন ধরে—

আসামেতে সদ্কি জেলায়
হাংলু—ফিড়াঙ পর্বতের
তলায় তলায় কদিন ধরে
বইল ধারা শর্বতের।

তাই খেয়ে তো সব মাছই—

'মিঠাই-গজার ছোটোভাই' ('২' সং—ছড়া) হয়ে উঠলো।

ছড়াটি বেশ সকৌতুক ভাবরসের সৃষ্টি করেছে এবং ছোটো বড় সকল চিত্তকেই বেশ নাড়াও দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির 'কী পাগলামি'তে যে 'কলম উঠল খেপে' তাই—

মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।

এবং কবি শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হাস্যরসকে অতিক্রম করে 'ক্রমবিকাশ থিওরি' প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন; আর বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা এর সঙ্গে যোগ করে—

'চচ্চড়িতে মোরব্বাতে' যে 'একাত্মবাদ অত্যাচার' এটা জানিয়ে দিতে চেয়েছেন।

এমনিভাবে কোনো কোনো 'ছড়া'র মধ্যে কবি কৌতুক করে কটাক্ষবাণ হেনেছেন সমাজের নানা ধরনের অসংগত চরিত্রের প্রতি। এডিটরদের কটাক্ষ করে '৩' সং ছড়ায় বলেছেন—

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে স্ট্রোকর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধরে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাঠাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাকাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ
পোলিটিক্যালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।

খবরের কাগজের এডিটররা যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করে তুলতে ওস্তাদ আর পোলিটিক্যালের গন্ধ যে তাঁরা সবকিছুর মধ্যেই পান—এই ইঙ্গিত এই চরণ কয়টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

আবার বর্তমান সভ্যসমাজে রাজনৈতিক নেতাদের চাল এবং ব্যবসাদারের জিনিসে ভেজাল মেশানো প্রভৃতি ব্যাপাব নিয়েও কবি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। '৬' সংখ্যক ছড়াতে—

বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।
ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
দেশবিদেশে শহর গ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।

এইভাবে কবি শাসক ও শোষকশ্রেণীর সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের বিচিত্র কৌশলের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ হানতেও দ্বিধা করেননি। 'বোঁচা গোঁফ' বলতে এখানে 'হিটলার'কে বোঝাতে চেয়েছেন।

'৭' সংখ্যক ছড়াতে আবার বেশ সকৌতুকে কবি ছড়া গেঁথে চলেছেন—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।

কিন্তু এরই মাঝে—

মুখ ভেংচিয়ে হেডমাষ্টার
মন্তরে করে ঠাট্টা।

ব'লে মাষ্টারমশায়ের চরিত্রের এই বিশেষ অসংগতির প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন।

শিশু কাব্যগুলিতে এমনিতরো ভাবে কবি যে কেবল বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা কৌতুকরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন তা নয়। শিশুমনের বুদ্ধি, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বাইরে আছে এমন অনেক বিষয় ও ভাবও এ সমস্ত ছড়াগুলিতে ঠাঁই করে নিয়েছে। তাই শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও এ সমস্ত কাব্য থেকে সমান আনন্দ সংগ্রহ করে নিতে পারে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে বৃদ্ধ কবির কাছ থেকে পাওয়া এ সমস্ত রচনা এক বিস্ময়কর দান।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে', 'বিচিত্র জীবনচেতনা'র ধারাটি কেবল যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। মোটামুটিভাবে সময় ও ভাবের দিক থেকে সঙ্গতি রেখে একই ভাবের কবিতাগুচ্ছকে এক একটি কাব্যে সংকলিত করা হয়েছে এটা ঠিক; কিন্তু কবির ভাবকল্পনা কোনো বাঁধা নিয়মের পথ ধরে চলে না বা কবিও বিশেষ ভাবচেতনার মধ্যে স্থিতধী হয়ে অবস্থান করেন না। সুতরাং গুরুগম্ভীর ভাব বা ভাবনার পাশে পাশে জীবনচর্যার বিচিত্র তত্ত্ব ও দর্শনের মাঝে মাঝে চলে হালকা ধরনের ভাবের সাধনা। কবিমন মুক্তি পায় এই হালকা ডানায় ভর দিয়ে এলোমেলো বাতাসে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে। তাই 'পুনশ্চ', 'বীথিকা', 'শ্যামলী', 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা'—প্রভৃতি-বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও এই 'বিচিত্রধর্মী' জীবনচেতনার সন্ধান পাওয়া যায়।

যে বাস্তব জীবনবোধ কবির শেষ জীবনের কাব্যগুলিকে অধিকতর স্পষ্ট এবং জীবন-ধর্মী করে তুলেছে, সেই বোধই কবিকে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে চোখ মেলে দেখতে সাহায্য করেছে। এ হোল 'নূতনচোখে বিশ্বদেখা'। কবি আপন অনুভবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র অবহেলিত বিষয় ও ভাবের মধ্যে। কবির জীবনচেতনার নিগূঢ় স্পর্শে তারা যেন সত্য হয়ে উঠলো সার্থক হয়ে উঠলো আপন মহিমায়। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কবি যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যে-কোনো তুচ্ছ বিষয়কে তার স্বক্ষেত্রে রেখেও কাব্য করে তোলা যায় কিনা—এই পর্যায়ের কিছু কিছু কবিতার মধ্যে সেই প্রবণতা যেন গোপনে কাজ করে চলেছে।

এ যুগে কবির অনুভবকে কবি মানবলোক-প্রকৃতিলোকের বাইরে তুচ্ছ জীবলোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কীটের সংসার', 'শালিখ', 'বীথিকা'র 'কাঠবিড়ালি, 'আকাশপ্রদীপে'র 'পাখীরভোজ', 'বেজী', 'ময়ূরের দৃষ্টি', 'নবজাতক' কাব্যের

'প্রজাপতি', 'রোগশয্যায়' কাব্যের '৬' সংখ্যক, 'আরোগ্য' কাব্যের '১৪' সংখ্যক 'শেষলেখা' কাব্যের '৩' সংখ্যক প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দিয়ে তুচ্ছ এই কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীদের উপেক্ষিত জীবনধারা একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য নিয়ে কবির কাছে ধরা পড়েছে। এর আগে কাব্যের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশে হয়তো কখনো কোথাও এরা এসেছে একটু আধটু; কিন্তু বিষয়বস্তু হিসাবে এমন স্বতন্ত্র মহিমা এর আগে এরা লাভ করেনি। 'পুনশ্চ' কাব্যেই প্রথম তারা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোল। এই সব তুচ্ছ প্রাণীদেরও যে একটা জগৎ আছে, সে জগতে তাদের সংসারে তারাও যে অনন্য, এমন করে এ জীবজগতের দিকে কবির দরদী দৃষ্টি এর আগে পড়েনি। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন 'কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি' এবং 'নেড়া কুকুরের ট্র্যাজেডি'কে তাঁর সাহিত্যে রূপ দিতে পারেননি —এ যেন সেই আক্ষেপরই সান্ত্বনা।

'কীটের সংসারে'র (পুনশ্চ) মাঝখান দিয়ে কবি যান-আসেন,—কিন্তু—

শব্দ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত
চৈতন্যধারার,
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।

[কীটের সংসার]

'ঐ মাকড়সার বিশ্বচরাচরে, ঐ পিঁপড়ে সমাজে' কবির প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। মানুষের অপারসীম ক্ষমতার সাথে সাথে কত অক্ষমতা যে রয়েছে জড়ানো তাও অনুভব করেন এই প্রসঙ্গে—

আমি মানুষ,
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।

কবি তাই তাঁর 'সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ সংসারের ধারেই' বহু গুরুগম্ভীর হাল্‌কা মধুর নানা ধরনের চিন্তার পাশে ঠাঁই দেন 'শালিখ'টার ('পুনশ্চ') ভাবনাকে—

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।

*

জীবনে ওর কোনখানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।

কাঠবিড়ালি'র (বীথিকা) ক্ষুদ্র জীবনটির একটি মধুর ছবি ধরা পড়েছে তাঁর কাছে—

কাঠবিড়ালির ছানাদুটি
আঁচলতলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা

জীবনের বিচিত্র মিষ্ট-মধুর স্মৃতির সঙ্গে এই মনোহর ছবিটিও তাকে ক্ষণকালের জন্য আন্‌মনা করে দেয়—

তেমনিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।

['কাঠবিড়ালি"—'বীথিকা']

এই সমস্ত ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাখির দল কবিকে শুধু যে আনমনা করেছে তাই না—কবির হৃদয়কে অনেকখানি জয় করেও নিয়েছে। 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যের 'পাখির ভোজ' কবিতায় দেখা যায় কবি ভোরবেলা উঠেই তাদের নিমন্ত্রণ করেন মুড়ি দিয়ে—

ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।

কবির শেষজীবনের অলসবেলার অসুস্থ দেহমনের কাছে ওরা যেন কেমন স্থায়ী সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল—

চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।

শুধু তাই না কবি আবিষ্কার করেন তাদের মধ্যে—

শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

*　　*　　*

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুকফুলিয়ে হেলে দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।

তাদের সঙ্গে খানিকপরে এসে যোগ দেয়—

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।

ধীরে ধীরে কবির অনুভবের কাছে তারা ঠাঁই করে নিয়েছে—

প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।

কবি 'প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার' 'সমান অধিকার'কে স্বীকার করে নিয়ে কাব্যমালিকায় গেঁথে তাদের অমর করে গেলেন।

তাই পোষা 'বেজি' ('আকাশ প্রদীপ') 'ময়ুর' সকলকেই কবি স্মরণীয় করে রেখে গেছেন তাঁর কাব্যে।

'প্রজাপতি' ('নবজাতক') কবির 'লেখার ঘরে' ঢুকে শেলফের 'পরে দুটি ডানা মেলে বসে থাকে না শুধু—ডানা মেলে কবির মানসপটে! তার বোধের জগতে সবই যে অন্ধকার সেকথা আজ কবির বোধের কাছে যেন নূতন করে ধরা পড়ে—

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়—
অন্ধকারময়।—

'রোগশয্যায়'-এর অলস মন্থর দিনগুলিতে 'চড়ুইপাখি' ('৬' সং—'রোগশয্যায়') তাঁর সঙ্গী হয়ে ওঠে—

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,

একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শাসির 'পরে ঠোকর মার এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।

রোগ-দুঃখ-পীড়িত কবি এই অতিথির অপেক্ষা করে থাকেন পরম আগ্রহে—

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।

'ভক্ত কুকুর'ও ('১৪' সং—'আরোগ্য) কবির সঙ্গ লাভে ধন্য হয়ে ওঠে—

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।

এছাড়া আরও নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের উপরও কিছু কিছু কবিতা আছে যার মধ্যে কবির 'বিচিত্রজীবনচেতনা'র স্বাদ ছড়িয়ে আছে। জীবনের সাধারণ পরিবেশ-পরিজনের মাঝে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে, তাঁর গভীর অনুভবে ধন্য হয়ে তাই অবহেলিত 'সাঁওতাল মেয়ে' ও ('বীথিকা') আজ অপরিসীম মূল্য পেয়ে ধন্য হয়ে ওঠে—

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুল গাছের তলে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে।

তারপর এই নারীর একটি নিটোল মূর্তি কবির চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু কবির 'মাটির ঘর' ('শ্যামলী') নির্মাণের কাজে এদের তো লাগানো হয়েছে, নারী জীবনের পূর্ণ মূল্য তাকে দেওয়া হয়নি—কবির চেতনার কাছে এই করুণ বেদনা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি বলেন—

আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শাস্তি আত্মনিবেদন পরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।

আন্তর ঐশ্বর্যে সব নারীই যে পৃথিবীতে সমান, 'পয়সার সিঁধকাঠি' দিয়ে নারীর সেই মূল্য এবং মর্যাদাকে যে খর্ব করা হয়েছে কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনের কাছে, এটা মস্ত বড় অপরাধ বলেই মনে হয়েছে ; মানবিক মর্যাদাবোধের দিক থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে তর-তমের কোনো ভেদ নেই, তা এখানে স্পষ্ট। 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ('আকাশপ্রদীপ') তা নিয়ে ছড়া গেঁথে গেছেন—

পাকুড়তলির মাঠে
বামুন মারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা

* * *

ছড়ার জগৎ থেকে কবি আবার এসে হাজির হয়েছেন বিজ্ঞানের অতি আধুনিক জগতে 'পক্ষীমানব' ('নবজাতক') কবিতায় 'যন্ত্রদানব' যে 'মানবে করিলে পাখি' তা বলে কবি কৌতুক করেছেন। কিন্তু যন্ত্রদানব আকাশে ওড়াতে মানুষকে সাহায্য করলেও পাখিদের মত জীবনের বাণী যে সে বয়ে আনতে পারেনি তাও অনুভব করেছেন—

আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।

আবার এই প্রাণটা যে 'রাতের রেলগাড়ি' ('রাতের গাড়ি'-'নবজাতক') তা নিয়েও কবি কৌতুক করেছেন—

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

'ইস্‌টেশন'-এ ('নবজাতক') এসে কবি আবার—

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।

এই চেয়ে-দেখার মধ্যে দিয়ে কবিমন মুক্তি পায় সুদূরে—

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—
কেবল যাওয়া-আসা।

সকাল-বিকেল ইস্টেশনে এসে চেয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে শিশুচিত্তের যে স্বাভাবিক উল্লাস অভিব্যক্ত হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে কবির দার্শনিক মন 'নিত্য-মেলা' 'নিত্য-ভোলার' রাজ্যে যাওয়া-আসা করেছে।

কৌতুক করে এই কবিই 'জবাবদিহি' ('নবজাতক') করেছেন নাত্‌নি মহলের কাছে—

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।

সিংহলে 'ক্যাণ্ডীয় নাচ' ('নবজাতক') দেখে কবি তাকেও স্মরণীয় করে গেলেন—

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ।

'বাদলবেলায় গৃহকোণে রেশমে পশমে জামা বোনে' যে, সেই 'সোনামণি'কেও 'নামকরণ' ('সানাই') করে গেলেন।

জীবনের নানা চলন্ত ছবির মাঝে 'অপঘাত' ('সানাই') এসে যে শান্তজীবনধারার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, আধুনিক সভ্যতার এই ভ্রূকুটিকে কবি 'অপঘাত' কবিতায় তুলে ধরেছেন—

সূর্যাস্তেরপথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।

এরই মাঝে—বিচালি বোঝাইগাড়ি চলে
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।

এমন সময় —

মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে

*　　　*　　　*

বুনোহাঁস গুগ্‌লি-সন্ধানে।

*　　　*　　　*

জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে

কিন্তু সবকিছু ভেদ করে 'অপঘাতে'র মত—

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হোল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে

এইভাবে কবিমনে ছোটো-বড়ো সব ঘটনারই ছায়াপাত ঘটে, কিন্তু কোনো কিছুই স্থায়ীভাবে দাগ কাট্তে সমর্থ হয় না।

'শেষপর্যায়ের কাব্য'—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য় কিছু কিছু ভিন্ন অনুভূতির কবিতা বর্তমান। এগুলিতে কবিমনের বিশেষ দর্শন, মনন বা বিশেষ মানসিকতার তত্ত্বগাম্ভীর্য নেই কিন্তু জরাগ্রস্ত রোগক্লিষ্ট দেহ আজও যে আত্ম-অস্বীকার করে মনের অমোঘ রসপিপাসু হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে জয়যুক্ত করে তুলতে পেরেছে এগুলি তারই আত্মঘোষণা। তাই কবিমনের ক্ষণকালীন ভালোলাগা মন্দলাগা তুচ্ছ কোনো বিষয় শিল্পিমনের রসানুভূতির জাদুস্পর্শে অমরত্ব লাভ করে।

'গহন রজনী মাঝে রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে' ('৭' সং—রোগশয্যায়) কার 'জাগ্রত আবির্ভাব' কবিজন্মকে সার্থক করে তোলে।

নারীর যে তুচ্ছ ঘরকন্নার কাজে সহজ পটুত্ব তা কবির অলস মনের কাছে ধরা পড়ে নারীকে এক নূতন মহিমা দান করে—

পুরুষ আপন চারি দিকে জমায় আবর্জনা,
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।

অতি হালকা চালে সরস করে সংসারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কার ভূমিকা কতটুকু তা কাব্যাকারে বলে গেলেন। তাই সেই নারীরই সেবা নিরতা রূপটিকে স্মরণ করে কবি বলেন—

কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কি না;
উদ্‌বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন।

['১৪' সং—রোগশয্যায়]

এ সমস্ত সাধারণ চিত্র, প্রতিদিনের তুচ্ছতা, 'রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে' ('৭' সং— রোগশয্যায়] ধরা পড়ে সত্য হয়ে ওঠে আপন মাধুর্যে।

আবার জেগে উঠে পায়ের কাছে কমলালেবুর ঝুড়ি দেখে অজানা কোন ভক্তের উদ্দেশ্যে আপন মনের পরম কৃতজ্ঞতা জানান। সে অজানাও কাব্যে স্থান পেয়ে অমর হয়ে রইলো—

এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা। ['১৭' সং—'রোগশয্যায়']

তাই 'রোগী কক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়'-এ সত্য হয়ে ওঠে কোন নাম-না-জানা সেবিকার কল্যাণী রূপ। কবি তাঁর সেবার মাধুর্যকে মহামূল্য দান করেন—

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে

['১৯' সং—রোগশয্যায়]

কবির আজ 'নিষেধে অনুশাসনে শোওয়া বসা চলে' ('১৯' সং—রোগশয্যায়)। কিন্তু 'বৃদ্ধভাগ্য তার শাসনের ভার কিছুদিন নূতন ভাগ্যের হাতে' ('১৯' সং—রোগশয্যায়) সঁপে দেয়।

কিছুক্ষণ
বিরোধের স্পর্ধা করি,
তার পরে ভালো ছেলে হয়ে
যেমন চালায় তাই চলি।

['১৯' সং—রোগশয্যায়)

কারণ 'এ রাজ্যে' কবি 'সেই দণ্ড'কে মেনে নিয়েছেন যা 'মৃণালের চেয়ে সুকোমল'। ('১৯' সং—রোগশয্যায়)

'৩৩' সংখ্যকে (রোগশয্যায়) দেখা যায় কোন অতীতের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে বর্তমানকে মাধুর্যমণ্ডিত করে দেখা। দূরকালের কোন হস্তের সেবারস নিয়ে আজ অন্য নারী তাঁর—

আতপ্ত ললাট•••আজো ধীরে করিছে পরশ!

এইভাবে চিরন্তনের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে নারীকে কবি মহিমান্বিত করে তুলেছেন। তাই রুগ্ন দেহে মনে একান্তভাবে নির্ভরশীল কবি তাঁর শুশ্রূষাকারিণীর সম্বন্ধে বলেন—

তোমারে দেখিনা যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।

['৩৯' সং—রোগশয্যায়]

অথচ এই একান্তভাবে নির্ভর করেন যার পরে সে নারী অতি সামান্যা, সে নত হয়ে বুনিছে পশম ; কিন্তু কবি দেখেন তাঁর পাশে বসে আছেন যেন—

সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে আপন মনের মাধুর্যস্পর্শে নারীকে নূতন নূতন করে রচনা করে যে মহিমা দান করা যায় তা কবি প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়ে গেলেন; এতদিন এ ছিল কবির সাধনায়। 'রোগশয্যায়' কাব্যের এই জাতীয় কবিতাগুলি 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'র এক নূতন সম্পদ।

'আরোগ্য' কাব্যেও দেখা যায় কবিমনের নানা ভাব-ভাবনা, তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু হৃদয়ের অমৃতস্পর্শে মহামহিমায় ভরে উঠেছে। যাবার বেলা যারা কাজে সঙ্গ দিয়েছে, যারা সেবা-যত্নে প্রীতিমাধুর্যের স্নেহ সুধারসে ধরণীর ক্ষণকালীন জীবনছন্দকে মধুময় করে তুলেছে তাদের কবি হৃদয়ের প্রীতি-অর্ঘ্যে শেষ প্রণতি জানান—

পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম নাই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।

['১৫' সং—'আরোগ্য']

কারণ—

সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে। [ঐ]

মানুষকে এই অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দেখার জন্য সে তার ক্ষুদ্র পরিচয় থেকে চিরন্তন সত্যে পৌঁছে যায়। তাই তাঁর কাছে—

দিদিমণি—
অফুরান সান্ত্বনার খনি।

['১৯' সং—'আরোগ্য']

'বিশুদাদা'ও (শ্রীনন্দলাল বসুর পুত্র বিশ্বরূপ বসু) তাই—

সেবার ভিতরে শান্তি দুর্বলের দেহে করে দান
বলের সম্মান।

['২০' সং—'আরোগ্য']

আবার— 'সরোজদাদা'ও—

দায়হীন মানুষের অভাবিত এই আবির্ভাব
দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

—এর মত। ['২১' সং—'আরোগ্য']

সেই মন নিয়েই কবি সেবা নিরতা নারীকে 'জীবলক্ষ্মী'র আসনে বসান—

নারী তুমি ধন্যা
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।

সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,

['২৩' সং—'আরোগ্য']

নারীর প্রেমময়ী স্নেহময়ী রূপ তিনি বহুবার এঁকেছেন, কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় রেখে তার 'জীবপালিনী' রূপ—কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাকে মানবী থেকে স্বর্গের দেবীতে রূপান্তরিত করতে দেখা যায়নি এর আগে।

এইভাবে 'জন্মদিনে' কাব্যের '১৫' সংখ্যক কবিতার মধ্যেও শৈলতটের নিভৃত কুঠির এবং তার অধিবাসীদের কথা মনে পড়ে—

কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
'যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা

'শেষলেখা' কাব্যের মধ্যে তাই দেখা যায়—কবি, জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পাশে পাশে স্নেহপাত্রীর বিবাহিত জীবনের রসমাধুর্যের কথা স্মরণ করে বলেন—

পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখস্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।

('৮' সং—শেষলেখা')

আবার কোনো প্রিয়পাত্র বা পাত্রীর শুভ জন্মদিনে আপনার আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন—

বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
আজি তা সার্থক হল,
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ—

['১২' সং-শেষলেখা]

এইভাবে 'অলস শয্যার পাশে' যে 'জীবন মন্থরগতি চলে', সেও 'জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়' ('২৪' সং—'আরোগ্য') রেখে যায় এ সমস্ত কাব্যে। কবির অবারিত হৃদয়ের সুনিবিড় স্পর্শে এই সমস্ত 'বিচিত্র জীবন-চেতনা' প্রাণময় হয়ে উঠেছে 'শেষপর্যায়ের কাব্যে'।

জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা-তত্ত্ব-দর্শনের পাশে পাশে এই সমস্ত সাধারণ জীবনের নানা ভাব-ভাবনা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে উদ্বোধিত করে এবং একটি সজীব রসিক চিত্তের পরিচয় দেয়।

'বিচিত্র' এই 'জীবনচেতনা'র ছন্দোগভীরে কবির এই সজীব আত্মপরিচয়ই মানবিক মাহাত্ম্যবোধের তথা দীপ্ত চৈতন্যের বিজয়ঘোষণা।

উপসংহার

'রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে' 'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' দুই আলোচনাই স্থান পেয়েছে।

'বহিরঙ্গে'র আলোচনায় ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, পাঠান্তর কাব্যশিল্পের এইসব বাইরের দিক্‌কার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত আলোচনা হয়তো যথেষ্ট নির্ভুল বা গভীর হয়নি। কারণ অতগুলি কাব্যের 'আঙ্গিক' এবং 'ভাবসম্পদ' দুয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে করতে গিয়ে কোনো একটি বিষয়কেই যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্র-কাব্যের যে বিপুল ভাবসম্পদ বা শিল্পকৃতি —তার প্রত্যেকটি দিক নিয়েই স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা হতে পারে এবং সে অবকাশও যথেষ্ট আছে। এই গ্রন্থে উনিশখানি কাব্যের বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটি বিষয়ের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশের অবকাশ খুবই অল্প। তত্ত্বের বা তথ্যের আলোচনায় তাই বহুক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাত্রা টান্‌তে গিয়ে একটি অতৃপ্তিবোধ পীড়া দিয়েছে অহরহ কিন্তু আলোচনা নাতিদীর্ঘ করার প্রবণতা লোভ সম্বরণে বাধ্য করেছে।

'ভাবসম্পদে'র আলোচনায় বিভিন্ন ভাবের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অখণ্ড বা সামগ্রিক মূর্তিই বার বার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে – এই অখণ্ড ভাবমূর্তি হচ্ছে মনুষ্যত্বের এক অভিনব প্রকাশ। খণ্ড দৃষ্টিতে বা বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কবিপ্রতিভার এক একটা দিক নিয়ে যখন আলোচনা করি, তখন বলি—রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রকর, স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার বৈচিত্র্যে এবং ব্যাপকতায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি। সুতরাং যার যে বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ বা আকর্ষণ বেশি সে রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই দিকটিকে নিয়েই তন্ময় হয়ে যাই—তাই সামগ্রিক দৃষ্টিতে সেই অমর আত্মার সর্বতোমুখী প্রতিভার অখণ্ড রূপটি আমাদের অনেকেরই দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। তাঁর খণ্ড রূপেই আমরা মন্ত্রমুগ্ধ—বিস্ময়াবিষ্ট—প্রকৃত সত্তাটির সত্যকার পরিচয়টিই রয়ে যায় গোপনে।

রবীন্দ্র-কাব্যের 'ভাবসম্পদে'র আলোচনা করলেই দেখা যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আত্মচেতনা', 'অধ্যাত্মচেতনা', 'প্রকৃতিচেতনা', 'প্রেমচেতনা', 'মৃত্যুচেতনা', 'স্বদেশচেতনা'—যে-কোনো নামেই এক এক পর্যায়ের কবিতাকে অভিহিত করি না কেন—মূল ভাব বা প্রেরণার দিক থেকে তারা একটি অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে 'মানুষ'

রবীন্দ্রনাথের একটি অখণ্ড ভাবসত্তা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত—এই ভাবসত্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায়। বিরাট বিশ্বমহাসৃষ্টির বুকে মানবকে দাঁড় করিয়ে তার একটি শাশ্বত রূপ কবি আঁকতে চেয়েছেন। দেশ-কাল অনালিঙ্গিত এই শাশ্বত সত্তার কল্পনা স্বীয় জীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ ভারতীয় ঔপনিষদিক চিন্তাধারার দ্বারা পুষ্ট এবং সৃষ্টির একটি অখণ্ড সত্তা বা শক্তির সঙ্গে সেই বোধ সম্পৃক্ত। কোন সংকীর্ণ চিন্তা বা দেশ-কাল-ধর্মের খণ্ডবোধ কবিকে তাই গ্রাস করতে পারেনি—সাময়িকভাবে বেদনা দিয়েছে কখনো সখনো এইমাত্র। মানবের এই চিরন্তন সত্য রূপটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবিমনের আস্থা বা বিশ্বাসের মূল এত গভীরে যে বাইরের দমকা হাওয়ায় মাঝে মধ্যে ডালপালায় সাড়া লাগলেও মূলে গিয়ে কোনো নাড়া দিতে পারেনি। এই স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়ায় কোনো খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চেতনাকে আবিল করতে পারেনি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ সত্তাটির পরিচয় তাঁর একান্ত সত্যপরিচয় হলেও 'সব পরিচয়' বা 'শেষ পরিচয়' নয়। "রবীন্দ্র জীবন-দর্শন শুধু উপনিষদের পাতায় খুঁজলে চলবে না। ধর্ম জিজ্ঞাসার চাইতে জীবন জিজ্ঞাসা ঢের বড় জিনিস—বিশেষ করে কবি সাহিত্যিকের জীবনে। সেই জীবনের মধ্যেই তাকে পেতে হবে। জীবনভর কি ভেবেছেন, কি চেয়েছেন, কি করেছেন, কিসে আনন্দ পেয়েছেন, কিসে দুঃখ—এর মধ্যেই তাঁর পূর্ণ পরিচয়।"[১] আমাদের এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে তিনি এক দুর্লভ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন একথা যেমন সত্য—তেমনি 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ মানুষ' হিসেবে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-সুখের বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে কেমন করে জীবনপথে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে গেছেন এবং তারই মধ্যে দিয়ে তাঁর 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা' কেমনতরো—তাঁর জীবন এবং কাব্য আমাদের কাছে সে কথাই তুলে ধরেছে। যে দুর্লভ প্রতিভার একান্ত সাধনার ফল স্বরূপ তাঁর আত্মা আজ 'কবি-ঋষি' রূপে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পূজিত—সে অ-লৌকিক প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে চেনা বা জানা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—এই কথা বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখলে বোধকরি সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হবে এই আমাদেরই। 'কবি-ঋষি' এই পরিচয়টুকুই যদি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় হোত তাহলে তাঁর আত্মা কালের বুকে এমন অক্ষয় আসন পেত না! আমাদের মতই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখবোধের মধ্যে জন্মে সকলের জন্য দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য করেও আপন

১। দেশ—সাপ্তাহিক পত্রিকা [২৩ আগষ্ট ১৯৮০ ৪৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৭ ভাদ্র ১৩৮৭]
প্রবন্ধ—"তুমি মোর পাও নাই পরিচয়"—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পরিবার-পরিজন, দেশ ও দশের জন্য কতটুকু কি তিনি করেছেন—বিশেষ করে জীবনের সুখে-দুঃখে তাঁর আত্মার স্থির অচঞ্চল মূর্তি ; সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য তাঁর ঐকান্তিক ত্যাগ স্বীকার ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সদম্ভ প্রতিবাদ—আবার তারই পাশাপাশি ক্ষণকালীন এই জীব জীবনকে রূপে-রসে-স্নেহে-প্রেমে-কর্তব্যে-সেবায় কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে আনন্দের গান গেয়ে যে চলে যাওয়া—সেই পার্থিব জগতের চিরন্তন সুরটুকুকে কবি কিভাবে আপন জীবন-বীণার তারে ধরতে পেরেছিলেন—সেই গোপন সুরসাধনার তত্ত্বটুকুকে জানাই—কবিকে সবটুকু জানা—সবটুকু চেনা ! কবির জীবনে, বাণীতে, একটি সংগীত মুহূর্মুহু ধ্বনিত তা হচ্ছে—এই অসীমকালের বুকে সৃষ্টি-রহস্যের অজানিত লোকে আমরা সকলেই ক্ষণকালের যাত্রী—জীবযাত্রার ইতিহাসে এইটুকুই একমাত্র সত্য—তবুও মানুষ ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং অনেক সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে অমর আত্মাকে ম্লান করতে থাকে। চিত্তের এই যে দীনতা তা সর্বাংশেই পরিত্যাজ্য। মানুষ জীবনকে ভোগ করবে—কিন্তু পশুর মত নয়—মানুষের মত। সেখানে ক্ষণকালীন লোভ-মোহ-ঈর্ষা-গ্লানি সবকিছুই সত্য কিন্তু স্বীয় আত্মশক্তির বলে চিত্তের এই দীনতাকে, অপূর্ণতাকে জয় করতে হবে—নির্ভিক চিত্তে 'আনন্দ-অমৃত' সত্যের সাধনা করতে হবে। এই সাধনার কথাই কবি তাঁর সমগ্র জীবনের শিল্পসাধনায় মূর্ত করে গেছেন—গেঁথে গেছেন বিভিন্ন কাব্যে—তারই সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ ঘটেছে 'রোগশয্যায়' কাব্যের 'পঁচিশ' সংখ্যক কবিতায়—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে,
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে
হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ।

'শেষপর্যায়ের কাব্যে' সেই দুর্লভ মনুষ্যত্বের বিচিত্র জীবন সাধনার কথাই নানাভাবে অভিব্যক্ত ও বিধৃত।

কবি-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১৮৬১ : ৭ই মে, বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ (শকাব্দ ১৭৮৩) সোমবার শেষরাত্রে কোলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। জননী সারদাদেবী।

১৮৬৮ : প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র। পরিবারে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত কাদম্বরীদেবীর বিবাহ।

১৮৬৯ : বিচ্ছিন্ন কবিতাচর্চার চেষ্টা।

১৮৭০ : নর্মালস্কুলে একবৎসর পাঠ, গৃহে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা।

১৮৭১ : বেঙ্গল একাডেমি নামক ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিন্তু বিদ্যালয়পাঠে অমনোযোগ।

১৮৭২ : কলিকাতায় ডেংগুজ্বরের প্রকোপ হওয়ায় কিছুকাল নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত বাস এবং প্রকৃতির সহিত প্রথম স্বাধীন পরিচয়।

১৮৭৩ : ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫শে মাঘ ১২৭৯) ১১ বছর ৯ মাস বয়সে উপনয়ন। পিতার সহিত উত্তর ভারত ও হিমালয় ভ্রমণ। পিতার নিকট সংস্কৃত, ইংরাজি ও জ্যোতিষ্ক শাস্ত্রে শিক্ষালাভ। 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়' নামক নাটক রচনা—পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট। প্রথমে গৃহশিক্ষক রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট অধ্যয়ন। ম্যাকৃবেথের কিছু অংশ অনুবাদ।

১৮৭৪ : সেণ্টজেবিয়ার্স স্কুলে কিছুকালের জন্য অধ্যয়ন পরে পুনরায় নানাভাবে গৃহশিক্ষার আয়োজন। অনুবাদ চর্চা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'অভিলাষ' নামক কবিতাটি 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা' বলিয়া প্রকাশিত।

১৮৭৫ : ১০ই মার্চ মাতার মৃত্যু। ২৫শে ফেব্রুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত—স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা। নিয়মিত কবিতা রচনা ও গীতরচনা। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'বনফুল' কাব্য প্রকাশ।

১৮৭৬ : স্কুলে যাত্রা বন্ধ। কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি একাধিক রচনা পত্রিকায় প্রকাশ।

১৮৭৭ : 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪ সাল) মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা, 'করুণা' নামক অসমাপ্ত উপন্যাস, 'কবি-কাহিনী' নামক দীর্ঘ

কবিতা প্রকাশ। দাদা জ্যোতিরীন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর কোরবো না' প্রহসনে 'অলীকবাবু'র পাট-এ প্রথম অভিনয়। 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে পদাবলী রচনা।

১৮৭৮ : কবিকাহিনী রচনা। বিলাত যাইবার পূর্বে আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাস, আন্না তরখড়ের সহিত পরিচয়। বিলাতযাত্রা, ব্রাইটনের স্কুলে প্রবেশ।

১৮৭৯ : লণ্ডনে পড়াশুনা ও নানাস্থানে বাস, কয়েকটি রচনা এবং ধারাবাহিকভাবে বিলাতবাস সম্বন্ধে পত্র প্রেরণ, ভারতীতে প্রকাশ।

১৮৮০ : লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও নানা সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ।

১৮৮১ : বাল্মীকিপ্রতিভা ও রচনা অভিনয়। আরও কিছু কিছু কাব্য, কাব্যনাট্য ও গদ্য রচনা। বিলাতযাত্রার পুনরায়োজন ও যাত্রা, কিন্তু মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন চন্দননগরে বাস।

১৮৮২ : বৌঠাকুরানীর হাট ও সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের কবিতাবলী রচনা, কালমৃগয়া রচনা ও অভিনয়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক কবিকে প্রশস্তিজ্ঞাপন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা, কিছুকাল দার্জিলিঙে বাস।

১৮৮৩ : সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই সন্নিকট কারোয়ার সহরে কিছুকাল অবস্থান। প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনা। ছবি ও গানের পর্ব। ৯ই ডিসেম্বর ২২ বছর বয়সে যশোহর জেলার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ঠাকুরবাড়ীতে ভবতারিণী দেবীর নূতন নামকরণ হয় মৃণালিনী দেবী।

১৮৮৪ : কড়ি ও কোমলের কবিতা রচনার পর্ব, নানা ধরনের গীতরচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় মৃত্যু (১৯ এপ্রিল, ৮ বৈশাখ ১২৯১), কবির গভীর শোকবেদনা। তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৮৫ : সারস্বতকৃত্যে প্রবলতা, ব্রহ্মসংগীত রচনা, রামমোহন রায় সম্বন্ধে সিটি কলেজ সভায় অভিভাষণ। বালক পত্রিকার দায়িত্বগ্রহণ ও মুকুট, রাজর্ষি প্রভৃতি শিশুসাহিত্য রচনা। কিছুকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান।

১৮৮৬ : ২৫শে অক্টোবর প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলার জন্ম। জাতীয় কংগ্রেসে স্বকণ্ঠে সংগীত পরিবেশন।

১৮৮৭ : মায়ার খেলা ও মানসী কাব্যপর্বের সূচনা। সপরিবারে কিছুদিন দার্জিলিঙে বাস।

১৮৮৮ : সপরিবারে কিছুকাল গাজীপুরে বাস। ১৯ শে অক্টোবর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা। ২৭শে নভেম্বর পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৮৯ : বোম্বাই, পুনা ও সোলাপুরে কিছুকাল অবস্থান ও রাজা ও রাণী রচনা। শিলাইদহ পদ্মাতীরে কিছুকাল বাস।

১৮৯০ : শিলাইদহ, কোলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সাময়িক ভাবে বাস। একমাসের জন্য লণ্ডন গমন।

১৮৯১ : ২৩শে জানুয়ারী দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা বা রাণীর জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের উপর স্থায়ীভাবে জমিদারি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ।

১৮৯২ : সপরিবারে বোলপুর বাস। জমিদারির কাজে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ।

১৮৯৪ : ১৮৯৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি তৃতীয়া কন্যা মীরার জন্ম। কয়েক মাসের জন্য 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ।

১৮৯৫ : সাধনার প্রকাশ বন্ধ। ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতায় স্বদেশী জিনিসের দোকান ও কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসা আরম্ভ।

১৮৯৬ : জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ অধিবেশনে কবি কর্তৃক 'বন্দে মাতরম্' গান। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৯৮ : ভারতী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারী 'সিডিশন' বিলের প্রতিবাদে টাউন হলে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ।

১৯০১ : নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯০২ : ২৩শে নভেম্বর কলিকাতায় কবিজায়া মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু। স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ রচনা।

১৯০৩ : মধ্যমকন্যা রেণুকার মৃত্যু।

১৯০৫ : ১৯শে জানুয়ারি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যু। কবি-কর্তৃক ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ ও রাজনৈতিক আলোচনা; স্বদেশী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, কবির স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশী সংগীত রচনা। ১৬ অক্টোবর কার্জন-কর্তৃক বঙ্গচ্ছেদ ও সেই উপলক্ষে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন এবং বিপুল উদ্দীপনা। শান্তিনিকেতনে 'দেহলি' নামে নূতন বাড়ী নির্মাণ ও তথায় বাস।

১৯০৬ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে উদ্যোগ। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ত্যাগ।

১৯০৭ : বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত। মুঙ্গেরে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯০৮ : বাঙলা দেশের চারিদিকে জাতীয় উত্তেজনা ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ, গুপ্ত বিপ্লবীদের নানাবিধ প্রচেষ্টা, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব। শান্তিনিকেতনে গঠনমূলক কর্মে কবির আত্মনিয়োগ।

১৯১০ : গীতাঞ্জলির সংগীত রচনার পর্ব, শান্তিনিকেতনে খ্রীষ্ট জন্মোৎসব উদ্‌যাপন। শরতের ছুটিতে শিলাইদহে বাস।

১৯১১ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ, শান্তিনিকেতনে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। সম্রাট ৫ম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার। এই বৎসরই কলিকাতায় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান গীত হয়।

১৯১২ : গীতাঞ্জলি-পর্বের গান ও কবিতার ইংরাজি তর্জমা, ১৬ই জুন বিলাত গমন এবং ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয়, ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্য সর্বত্র কবির সমাদর। রাজা ও ডাকঘরের ইংরাজি অনুবাদ। ইয়েট্‌সের ভূমিকাসহ ইংরাজি গীতাঞ্জলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ। লণ্ডন হইতে কবির মার্কিন দেশে যাত্রা।

১৯১৩ : ১৩ই নভেম্বর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ। ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে ডি. লিট্ উপাধি প্রদান।

১৯১৪ : প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও কবির আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া সবুজপত্রের প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিকস্ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সহিত শান্তিনিকেতনের সংযোগ। বলাকার যুগ আরম্ভ।

১৯১৫ : গান্ধীজীর প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন। ৩রা জুন সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' উপাধি দান।

১৯১৬ : জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯১৭ : দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৮ : জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু। ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তি স্থাপন।

১৯১৯ : দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত মত-বিরোধ, জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি বর্জন করিয়া লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট খোলা চিঠি প্রেরণ। বিশ্ব-ভারতী শিক্ষণ বিভাগ উন্মোচন।

১৯২০ : ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সফর, জালিয়ানওয়ালাবাগ

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কবির স্যার উপাধি ত্যাগের ঘটনায় ইংলণ্ডের সুধীসমাজে কবির প্রতি নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা। আমেরিকা যাত্রা।

১৯২১ : পুনরায় ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ, জনসংযোগ, বক্তৃতা, মনীষীদের সহিত আলাপ-পরিচয়, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২২ : দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফর।

১৯২৩ পশ্চিম ভারত, আসাম প্রভৃতি ভারতের আরও নানা স্থানে ক্রমাগত পর্যটন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিরূপে বারাণসী গমন ও অবস্থান। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের জন্ম।

১৯২৪ : চীন যাত্রা, চীনে বিপুল কবিসম্বর্ধনা। জাপান ভ্রমণ। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় পেরুর পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থতার জন্য কিছুকাল অবস্থান, রাজধানী বুয়েনস এয়ারিসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ।

১৯২৫ : ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং গান্ধীজীর চরকা ও খদ্দর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২৬ : পুনরায় ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, যুগোশ্লোভিয়া, চেক, অষ্ট্রিয়া, হাংগেরি প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভ্রমণ বক্তৃতা, বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ।

১৯২৭ : পশ্চিম ভারত, আসাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালী, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চলে সফর। কবির চিত্রাঙ্কন প্রয়াস।

১৯২৯ : কানাডা ও জাপান সফর।

১৯৩০ : উত্তর ও পশ্চিম ভারত সফর, বিলাতের পথে ফরাসী দেশে। প্যারিসে কবির প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির হিবার্ট বক্তৃতা, বিষয় 'মানুষের ধর্ম।' ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল পবিদর্শন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ। ইউরোপ ঘুরিয়া আমেরিকা আগমন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবির চিত্রপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন মনীষীর সহিত সাক্ষাৎকার।

১৯৩১ : লণ্ডনে বার্নার্ড শ-র সহিত দীর্ঘ আলোচনা। ভারতে প্রত্যাবর্তন। হিজলী বন্দীনিবাসে-বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পীড়িত শরীরে মনুমেণ্টের জনসভায় যোগদান ও শাসকবর্গের প্রতি কবির ধিক্কার। বক্সা দুর্গে বন্দী বাঙালী যুবকদের অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সংবাদে কবিতা প্রেরণ। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধ রচনা। কলিকাতায় গীতোৎসব ও The Child-এর অনুবাদ 'শিশুতীর্থ'র অভিনয়।

১৯৩২ : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থায় উদ্বেগ। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য নিষ্ঠুর দুঃশাসনের প্রতি কবির বিদ্রূপ ও ক্ষোভ কবিতায় প্রকাশিত। পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। কলিকাতায় 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' প্রদর্শনী। গদ্যছন্দে কাব্যরচনার উদ্যম। জার্মানীতে দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু। গান্ধীজীর অনশন। কবির পুনায় গমন ও যেরবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছু সময়ের জন্য 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং 'কমলা বক্তৃতা' দেন।

১৯৩৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ক কমলা-বক্তৃতামালা। বোম্বাইয়ে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবিকে সম্বর্ধনা প্রদান। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। ১৮ই জানুয়ারি কলিকাতায় সিনেটহলে রামমোহন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতনে আগমন। পুনাচুক্তি গ্রহণ দ্বারা বাংলার হিন্দুসমাজের প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিয়া গান্ধীবিরোধী মনোভাব ; কবিকেও তজ্জন্য সমালোচনার ভাগী হইতে হয়। তদ্বিষয়ে কবির কৈফিয়ৎপত্র। অন্ধ্র ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ।

১৯৩৪ : পুনরায় সিংহল যাত্রা এবং মাসাধিককাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, মাদ্রাজে নানাস্থানে বক্তৃতা ও গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা। শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডুকে অভ্যর্থনা।

১৯৩৫ : কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দান। শান্তিনিকেতনে 'শ্যামলী' নামক মৃৎগৃহের উন্মোচন ও বাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবি সম্বর্ধনা। চন্দননগরের ঘাটে নৌকাগৃহে আশ্রয় নেন কিছুদিনের জন্য। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবিসম্বর্ধনা।

১৯৩৬ : চিত্রাঙ্গদা অভিনয়গোষ্ঠী লইয়া অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানাস্থানে সফর। গান্ধীজী বিশ্বভারতীর জন্য একখানি ষাট হাজার টাকার চেক দেন। দিল্লী হিন্দু কলেজে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ভারত সচিবের নিকট আবেদন পত্রে কবির প্রথম স্বাক্ষরপ্রদান। ১৫ই জুলাই টাউনহলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা। ১১ই অক্টোবর শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ।

১৯৩৭ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় ভাষণদান। যুদ্ধ ও

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতিপদ গ্রহণ। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি ও আলমোড়ায় বিশ্রামগ্রহণ। আন্দামানের রাজবন্দীদের উপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব। উত্তরায়নে আকস্মিক অসুস্থতা ও কয়েকদিনের জন্য সংজ্ঞালোপ।

১৯৩৮: ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডিলিট' উপাধি দেন। বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু। জাপানের কবি নোগুচির সহিত তাঁহার মতবিরোধ এবং পত্রযোগে আলোচনা। ইউরোপ ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান যুদ্ধায়োজনে কবির উদ্বেগ।

১৯৩৯: মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর শান্তিনিকেতনে সম্বর্ধনা। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন। সুভাষচন্দ্রের উপর হইতে কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লইবার জন্য মহাত্মাজীকে টেলিগ্রাম।

১৯৪০: শান্তিকুঞ্জে গান্ধীজীর সম্বর্ধনা। ৫ই এপ্রিল এন্‌ড্রুজের মৃত্যু। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে উপস্থিত কবিকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' বা 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি দান। কালিম্পঙ-এ থাকাকালীন গুরুতর পীড়া ও অসুস্থ কবিকে কলিকাতায় আনয়ন, দুইমাস পীড়ার পর শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন।

১৯৪১: নববর্ষ উৎসবে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ। ১৩ই মে ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধিগণের শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দান। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস্ র‍্যাথবোরণ ভারতের নিন্দা করিয়া এক খোলা চিঠি প্রদান করেন—কবি খোলা চিঠিরূপেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি দেন (৫ জুন)। কবির অসুস্থতা বাড়িতে থাকে এবং তাঁহাকে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আনা হয়। ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ) বেলা ১২-১০ মিনিটে ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে, তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।*

---

*শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী', শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'রবীন্দ্র জীবন-পঞ্জী' এবং ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-মনীষা'র 'কবিজীবনের উল্লেখযোগ্য তথ্যপঞ্জী' হইতে এই ঘটনাবলীর তালিকা প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

[১৮৭৮—১৯৭১]

কবিকাহিনী—প্রথম মুদ্রিত আখ্যানকাব্য ১৮৭৮ (১২৮৫)

বনফুল—আখ্যানকাব্য ১৮৮০ (১২৮৬)

বাল্মীকি-প্রতিভা—গীতিনাট্য ১৮৮১ (১২৮৭)

রুদ্রচণ্ড—আখ্যানকাব্য ১৮৮১ (১২৮৭)

ভগ্নহৃদয়—নাট্যকাব্য ১৮৮১ (১২৮৮)

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র—১৮৮১ (১২৮৮)

সন্ধ্যাসংগীত—কাব্য ১৮৮২ (১২৮৮)

কালমৃগয়া—গীতিনাট্য ১৮৮২ (১২৮৯)

বউঠাকুরাণীর হাট—উপন্যাস ১৮৮৩ (১২৯০)

প্রভাত সংগীত—কাব্য ১৮৮৩ (১২৯০)

বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রবন্ধ ১৮৮৩-৮৪ (১২৯০)

ছবি ও গান—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯০)

প্রকৃতির প্রতিশোধ—নাট্যকাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)

নলিনী—গদ্যনাট্য ১৮৮৪ (১২৯১)

শৈশবসংগীত—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)

ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী—১৮৮৪ (১২৯১)

আলোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৫ (১২৯২)

রবিচ্ছায়া—সংগীত-সংকলন ১৮৮৫ (১২৯২)

কড়ি ও কোমল—কাব্য ১৮৮৬ (১২৯৩)

রাজর্ষি—উপন্যাস ১৮৮৭ (১২৯৩)

চিঠিপত্র—পত্রাকারে প্রবন্ধ ১৮৮৭ (১২৯৪)

সমালোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৮ (১২৯৪)

মায়ার খেলা—গীতিনাট্য ১৮৮৮ (১২৯৪)

রাজা ও রাণী—নাট্যকাব্য ১৮৮৯ (১২৯৬)

বিসর্জন—নাট্যকাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)

মন্ত্রি-অভিষেক—প্রবন্ধ ১৮৯০ (১২৯৭)

মানসী—কাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ১ম—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯১ (১২৯৮)

চিত্রাঙ্গদা—নাট্যকাব্য ১৮৯২ (১২৯৯)

গোড়ায় গলদ—প্রহসন ১৮৯২ (১২৯৯)

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ২য়—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯৩ (১৩০০)

বিদায়-অভিশাপ—নাট্যকাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)

সোনার তরী—কাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)

ছোটগল্প, বিচিত্রগল্প, কথা-চতুষ্টয়, গল্পদশক—ছোটগল্প-সংকলন ১৮৯৩-৯৬ (১৩০০—১৩০১

চিত্রা—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০২)

চৈতালি—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)

মালিনী—নাট্যকাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)

বৈকুণ্ঠের খাতা—প্রহসন ১৮৯৭ (১৩০৩)

পঞ্চভূত—প্রবন্ধ ১৮৯৭ (১৩০৪)

কণিকা—ক্ষুদ্র কবিতা ১৮৯৯ (১৩০৬)

কথা, কাহিনী—কাব্য ১৯০০ (১৩০৬)

উপনিষদব্রহ্ম—প্রবন্ধ ১৯০০ (১৩০৭)

কল্পনা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)

ক্ষণিকা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)

গল্পগুচ্ছ—ছোটগল্প-সংকলন ১৯০০-০১ (১৩০৭)

ব্রহ্মমন্ত্র—প্রবন্ধ ১৯০১ (১৩০৮)

নৈবেদ্য—কাব্য ১৯০১ (১৩০৮)

স্মরণ—কাব্য ১৯০২ (১৩০৯)

চোখের বালি—উপন্যাস ১৯০৩ (১৩০৯)

আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ—প্রবন্ধ ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

স্বদেশ—কাব্য ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

বাউল—গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

স্বদেশ—কাব্য ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

বাউল—গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

খেয়া—কাব্য ১৯০৬ (১৩১৩)

নৌকাডুবি—উপন্যাস ১৯০৬ (১৩১৩)

বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য—প্রবন্ধ ১৯০৭ (১৩১৪)

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক—প্রহসন ১৯০৭ (১৩১৪)

প্রজাপতির নির্বন্ধ—উপন্যাস ১৯০৮ (১৩১৪)

রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ শিক্ষা,

শব্দতত্ত্ব ও ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

কথা ও কাহিনী—কাব্য ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

মুকুট ও শারদোৎসব—নাটক ১৯০৮ (১৩১৫)

শান্তিনিকেতন ১ম—৩য়, বিদ্যাসাগর চরিত্র—প্রবন্ধ ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

প্রায়শ্চিত্ত—নাটক ১৯০৯ (১৩১৬)

চয়নিকা—কাব্যসংকলন ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

শিশু—কাব্য ১৯০৯ (১৩১৬)

গোরা—উপন্যাস ১৯১০ (১৩১৬)

গীতাঞ্জলি—কাব্য ১৯১০-১১ (১৩১৭)

রাজা—নাটক ১৯১০ (১৩১৭)

শান্তিনিকেতন ৪র্থ-১০ম—প্রবন্ধ ১৯১০ (১৩১৭)

আটটি গল্প ও চারিটি—ছোটগল্প সংকলন—১৯১১-১২ (১৩১৮)

ডাকঘর—নাটক ১৯১২ (১৩১৮)

জীবনস্মৃতি—আত্মস্মৃতি ১৯১২ (১৩১৯)

ছিন্নপত্র—পত্রসাহিত্য ১৯১২ (১৩১৯)

অচলায়তন—নাটক ১৯১২ (১৩১৯)

উৎসর্গ—কাব্য ১৯১৪ (১৩২১)

গীতিমাল্য ও গীতালি—কাব্য ১৯১৪ ১৩২১)

শান্তিনিকেতন—প্রবন্ধভাষণ ১৯১৫-১৬ (১৩২২)

ফাল্গুনী—নাটক ১৯১৬ (১৩২২)

ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ—উপন্যাস ১৯১৬ (১৩২৩)

সঞ্চয় ও পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯১৬ (১৩২৩)

বলাকা—কাব্য ১৯১৬ (১৩২৩)

গল্প সপ্তক—ছোট গল্প-সংকলন ১৯১৬ (১৩২৩)

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—প্রবন্ধ ১৯১৭ (১৩২৪)

গুরু—নাটক ১৯১৮ (১৩২৪)

পলাতকা—কাব্য ১৯১৮ (১৩২৫)
জাপান-যাত্রী—ভ্রমণ ১৯১৯ (১৩২৬)
অরূপ-রতন—নাটক ১৯২০ (১৩২৬)
ঋণশোধ—নাটক ১৯২১ (১৩২৮)
মুক্তধারা—নাটক ১৯২২-২৩ (১৩২৯)
লিপিকা—গদ্যকথিকা ১৯২২ (১৩২৯)
শিশু ভোলানাথ—কাব্য ১৯২২ (১৩২৯)
বসন্ত—গীতিনাট্য ১৯২৩ (১৩২৯)
পূরবী—কাব্য ১৯২৫ (১৩৩২)
গৃহপ্রবেশ—নাটক ১৯২৫ (১৩৩২)
প্রবাহিনী—গানের সংকলন ১৯২৫-২৬ (১৩৩২)
চিরকুমার সভা—নাটক ১৯২৬ (১৩৩২)
শেষবর্ষণ—গীতিনাট্য ১৯২৬ (১৩৩৩)
রক্তকরবী, শোধবোধ ও নটীর পূজা—নাটক ১৯২৩ (১৩৩৩)
লেখন—ক্ষুদ্র কবিতা ১৯২৭ (১৩৩৪)
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—গীতিনাট্য ১৯২৭ (১৩৩৪)
শেষরক্ষা—প্রহসন ১৯২৮ (১৩৩৫)
যাত্রী—ভ্রমণ ১৯২৯ (১৩৩৬)
পরিত্রাণ ও তপতী—নাটক ১৯২৯ (১৩৩৫-৩৬)
যোগাযোগ—উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬)
শেষের কবিতা—উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬)
মহুয়া—কাব্য ১৯২৯ (১৩৩৬)
ভানুসিংহের পত্রাবলী—পত্র ১৯২৯ (১৩৩৬)
নবীন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৭)
রাশিয়ার চিঠি—ভ্রমণ ১৯৩১ (১৩৩৮)
বনবাণী—কাব্য ১৯৩১ (১৩৩৮)
গীতবিতান—গীতসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮)
শাপমোচন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৮)
সঞ্চয়িতা—কাব্যসংকলন ১৯৩১ (১৯৩৮)
পরিশেষ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
কালের যাত্রা—নাটক ১৯৩২ (১৩৩৯)

পুনশ্চ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
দুইবোন—উপন্যাস ১৯৩৩ (১৩৩৯)
মানুষের ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯৩৩ (১৩৪০)
বিচিত্রিতা—কাব্য ১৯৩৩ (১৩৪০)
চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী—নাটক ১৯৩৩ (১৩৪০)
ভারতপথিক রামমোহন রায়—প্রবন্ধ ১৯৩৩-৩৪ (১৩৪০)
মালঞ্চ—উপন্যাস ১৯৩৪ (১৩৪০)
শ্রাবণগাথা—গীতিনাট্য ১৯৩৪ (১৩৪১)
শেষসপ্তক—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
সুর ও সংগতি—পত্রপ্রবন্ধ ১৯৩৫ (১৩৪২)
বীথিকা—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৬ (১৩৪২)
পত্রপুট—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
ছন্দ—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
জাপানে-পারস্যে—ভ্রমণ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
শ্যামলী—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
সাহিত্যের পথে—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
খাপছাড়া—ছড়া ১৯৩৭ (১৩৪৩)
কালান্তর—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
সে—গল্প ১৯৩৭ (১৩৪৪)
ছড়ারছবি—কাব্য ১৯৩৭ (১৩৪৪)
বিশ্বপরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
প্রান্তিক—কাব্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
চণ্ডালিকা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
পথে ও পথের প্রান্তে—ভ্রমণ ১৯৩৮ (১৩৪৫)
প্রহাসিনী ও সেঁজুতি—কাব্য ১৯৩৮-৩৯ (১৩৪৫)
বাঙলাভাষা-পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৮ (১৩৪৫)
আকাশ প্রদীপ - কাব্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)
শ্যামা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)
পথের সঞ্চয়—ভ্রমণ ১৯৩৯ (১৩৪৬)

নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়—কাব্য ১৯৪০ (১৩৪৭)

আরোগ্য—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৭)

ছেলেবেলা—আত্মস্মৃতি ১৯৪০ (১৩৪৭)

তিনসঙ্গী—ছোটগল্প ১৯৪০ (১৩৪৭)

জন্মদিনে—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৮)

গল্পসল্প—গল্প ১৯৪১ (১৩৪৮)

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, সভ্যতার সংকট—প্রবন্ধ ১৯৪১ (১৩৪৮)